প্রথম প্রকাশ / ৬ আশ্বিন ১৩৬৭ ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক

বি. রায়

দেশকাল

৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে

কোলাজ

২ জওহরলাল নেহরু রোড

কলকাতা-৭০০ ০১৩

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি
এবং পাভেল করচাগিন

কোন কোন জীবৎকালে মহা মহা কীর্তিকলাপ সাধিত হয়। আবার গোটা জীবনই একটা মহাকীর্তি, এমনও হয়। বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক এবং এই বইখানির লেখক নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির (১৯০৪ - ১৯৩৬) জীবন ছিল এমনই। জীবনের শেষ বারো বছর গুরুতর অসুস্থ এবং শেষ আট বছর অন্ধ অবস্থায় থেকে তিনি মারা যান বত্রিশ বছর বয়সে।

তবু, যথার্থ অমর উত্তরাধিকারই তিনি রেখে গেছেন। পুরুষের পর পুরুষ নওজোয়ানের দিশারী-আলোক হয়ে রয়েছে তাঁর 'ইস্পাত'।

নিযুত-নিযুতখানা ছাপা হয়েছে এই বইয়ের, বইখানি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পরিচিত। ১৯৩৭ সালে বইখানি ইংরেজী ভাষায় তরজমা হলে লন্ডনের 'টাইম্স্' পত্রিকায় পুস্তক-পরিচয় স্তম্ভে এই তরুণ লেখক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, এই উপন্যাস লেখা আরম্ভ করার আগে থেকেই তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী এবং অন্ধ। উপন্যাসখানি বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক; তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মারা

গেছেন। ঐ পুস্তক-পরিচয়দাতা লিখেছিলেন, নতুন রাশিয়ার তরুণ বীর-নায়ক পাভেল করচাগিনের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য তুলে ধরেছেন অস্ত্রভ্স্কি; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুনর্গঠনের কালপর্যায়ের পটভূমিতে তিনি এঁকেছেন এই আলেখ্যখানি। পটভূমি খুবই বাস্তবতাসম্মত, প্রধান চরিত্রটি প্রত্যয়জনক, সমগ্র কাহিনীটিই এক-ফালি বাস্তব জীবন,—খুব জোরালোভাবে, পরমোৎকৃষ্ট রুচিবোধ আর সূক্ষ্ম নাটকীয়তাবোধ অনুসারে সেটাকে উপস্থিত করা হয়েছে।

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির উপন্যাসখানি সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। আমরা আশা রাখি, এই নতুন বাংলা সংস্করণটি আরও বহু নতুন পাঠক-পাঠিকার সমাদর পাবে।

অস্ত্রভ্স্কি বলেছিলেন: 'বীরত্ব জন্মে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, আর কঠোর অবস্থার ভিতর দিয়ে তার পরীক্ষা হয়।'

তাঁর নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনে কঠোর অবস্থা আর সংগ্রাম এসেছে নিরন্তর...

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে এই লেখকের বয়স ছিল মাত্র তের, তবু, কঠোর শ্রম আর দারিদ্র্যের অর্থটা তাঁর জানা ছিল তার আগেই। একটা রেল-স্টেশনের রেস্তোরাঁয় তাঁকে কাজ করতে হত দিনে বার-চোদ্দ ঘণ্টা, সরু আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দিয়ে ভারি-ভারি সামোভার তুলতে-নামাতে হত, চুল্লিতে জালানি যোগানের কাজ করতে হত, বিজলি মিস্ত্রিকে সাহায্য করতে হত।

পনর বছর বয়সে তিনি গৃহযুদ্ধে লড়তে নেমেছিলেন। পরে, কিয়েভ রেলওয়ে মেরামতী কারখানা এবং রেলপথ নির্মাণের কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, নদীতে কাঠ ভাসিয়েও তিনি কাজ করেছিলেন।

অস্ত্রভ্স্কি ইউক্রেনে একজন উৎসাহী কমসোমল সংগঠক ছিলেন। যে-কোন কাজে তিনি হাত দিতেন তাতে তিনি ঢেলে দিতেন নিজের অন্তর-মন।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেখা গেল সেটা মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগ। বাল্যে অপুষ্টি আর মাত্রাতিরিক্ত শ্রম, গৃহযুদ্ধের ফ্রণ্টে জখম, দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনঃসংস্থাপনের কাজে তাঁর অতিমানুষিক পরিশ্রম---এইসবেরই ফল হল ঐ রোগ। এই সাহসী যোদ্ধা সহসা দেখতে পেলেন তিনি অচল--সারা দেশ তখন পুনরুজ্জীবনের সৃজনী আগুনে উদ্দীপ্ত। নওজোয়ানেরা তখন সামনের সারিগুলিতে---দেশের নতুন নতুন সম্পদ আর নতুন জীবন গড়ার কাজে তারা ব্যাপৃত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা সেরা ক্লিনিকে সেরা সেরা ডাক্তারেরা অস্ত্রভ্স্কির চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু রোগের অবস্থা ছিল চিকিৎসার অসাধ্য। এই তরুণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে গেল, তারপরে গেল দৃষ্টিশক্তিও। রোগই জিতে গেল-- রোগ তাঁকে যোদ্ধাশ্রেণী থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর 'শয্যা-সমাধি' অবধারিত করে দিল।

কী করবেন তিনি তখন? বেঁচে থাকবেন কী ভাবে? ঐভাবে কি বেঁচে থাকা যায়?

তাঁর বইয়ের নায়ক পাভেল করচাগিনের সামনে এল এইসব মর্মান্তিক প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের উত্তর বের করবার জন্যে চলল অস্ত্রভ্স্কির অতি কষ্টকর প্রচেষ্টা।

'সংগ্রাম করার ক্ষমতাকেই সে জীবনে সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছে, সেই ক্ষমতাটাকেই হারিয়ে বসার পর আর বেঁচে রইবে কিসের জন্য? আজকের আর নিরানন্দ আগামীকালের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তিটা কী? কী দিয়ে

ভরে তুলবে সে তার দিনগুলোকে? টিকে রইবে শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আর পান-আহার করবার জন্যে? কমরেডরা সব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে, আর সে শুধু পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখে যাবে?'

উদ্ধার পাবার একটা চিন্তা এল: আত্মমৃত্যু। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি দৃঢ়ভাবে সেই উপায়কে বাতিল করলেন: 'জীবন যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কি করে বাঁচতে হয় সেটা শেখো। জীবনটাকে কাজে লাগাও।'

১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অতি নিদারুণ শেষ আঘাত হয়ে এল সম্পূর্ণ অন্ধতা---তখন অস্ত্রভ্স্কি তাঁর বন্ধু পিওৎর্ নভিকভের কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন:

'নিজের জীবনটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার একটা পরিকল্পনা আমার আছে, - নিজ অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্যে সেটা দরকার। পরিকল্পনাটা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল। পরিকল্পনাটা যদি কিছু নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে তখন তোমাকে এ বিষয়ে আরও কিছু জানাব।

'...শয্যাশায়ী হলেও আমি অসুস্থ নই। ওসব ভুল। এক-গাদা বাজে কথা। আমি একদম সুস্থ। আমার পা চলে না, দেখতে পাই নে ছাই কিছুই---সবই একটা নিদারুণ ভুল...'

একেবারে বীরত্ব দিয়েই লেখা এই চিঠিখানা সত্যিই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষাকষি—মৃত্যু তখন দংষ্ট্রাকরাল-হাসিমুখে তাঁর পাশেই সমুপবিষ্ট। রোগ আরও ছড়িয়েই পড়ছিল, ডাক্তারেরা রোগটাকে শায়েস্তা করতে অক্ষম। আর কখনও তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না, ভোরের আলোয় তাঁর চোখ মেলবে না আর কখনও। তাহলে কী উপায়!

তিনি উঠে দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে হেঁটে এসে যাবেন সোজা জীবনের মাঝখানে---নিজের বইখানির পৃষ্ঠাগুলি থেকে।

পরবর্তী পুরুষের কাছে অস্ত্রভ্স্কি কী বলতে চান সেটা তাঁর জানা ছিল অনেক আগে থেকেই। বিপ্লবের এক যোদ্ধা, তাঁকে কখনও জোর করে পিছু হঠানো যায় না—তাঁরই জবানবন্দি হবে সেটা।

প্রথমে তাঁকে সাহায্য করবার মতো কেউ ছিল না। তাঁর স্ত্রী কাজে যেতেন সকালে, আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে। অসাড় আঙুলগুলো দিয়ে পেন্সিল চেপে ধরে অস্ত্রভ্স্কি অতি কষ্টে একটা-একটা করে অক্ষর ফুটিয়ে তুলতেন, কিন্তু প্রায়ই এক-একটা পঙক্তি তার আগেরটার উপর পড়ে দুটো পঙক্তিই দুষ্পাঠ্য হয়ে যেত।

তবে, হাতখানাকে দিশা দেবার জন্যে একটা খাঁজকাটা বোর্ডের ব্যবস্থা হল শিগগিরই। একটা মামুলী পিজবোর্ডের ফাইল থেকে তৈরি এই জিনিসটা ছিল সহজ-সরল। ফাইলটার উপরের পাল্লা থেকে সমান্তরালভাবে ৮ মিলিমিটার চওড়া ফালি-ফালি কেটে নেওয়া হয়েছিল—তখন ফাইলটার ভিতরে এক-খণ্ড কাগজ ঢুকিয়ে দেওয়া হলে তিনি 'কশি'গুলো বরাবর লিখে যেতে পারতেন।

অস্ত্রভ্স্কি লিখতেন সাধারণত রাত্রে—যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত। তাঁর স্ত্রী কিংবা মা পঁচিশ-ত্রিশ খণ্ড কাগজ ফাইলে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেন, আর সরু করে কাটা কয়েকটা পেন্সিল রেখে যেতেন বিছানার পাশে। সাধারণত তিনি রাতারাতি সমস্ত কাগজই লিখে ফেলতেন। তখন তাঁর পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকে কেউ পাঠোদ্ধার করে সেই লেখা টাইপ করে দিত।

'এই বইয়ের কাজই হয়ে উঠেছে আমার সমগ্র জীবন,' অস্ত্রভ্স্কি লিখেছিলেন এক বন্ধুর কাছে। 'কাজ ধরেছি 'রাতের শিফটে', ভোরে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত্রে সব খুব শান্ত,

কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই। আমার সামনে ঘটনার পর ঘটনা উঠে আসে, যেন ফিল্মের মতো, মনশ্চক্ষে আবার ফুটে ওঠে কত যে ছবি আর গোটা গোটা দৃশ্য...'

সেই ভয়ঙ্কর বছরগুলোতে অস্ত্রভ্স্কিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল তাঁর অদম্য মনোবল, সংকল্পের দৃঢ়তা আর প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি।

'ইস্পাত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

তার পরে--মস্কো, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাস। অস্ত্রভ্স্কি সবে সোচি থেকে রাজধানীতে এসেছেন। সোভিয়েত সাহিত্যক্ষেত্রে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তিনি লেনিন অর্ডার পেয়েছেন। 'ঝঞ্ঝায় উদ্ভব' নামে দ্বিতীয় উপন্যাস লেখা শুরু করেছেন তিনি।

কেটে-যাওয়া সময়ের মাঝে ফিরে গিয়ে ৪০ নং গোর্কি স্ট্রীটে লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজার ঘণ্টি বাজিয়ে আমরা ঢুকলাম।

অস্ত্রভ্স্কি শুয়ে আছেন, তাঁর গায়ে নিচের দিকটা কম্বলে ঢাকা। তাঁর একটা টান-টান ভাব। এ মন কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না--তারই অনুপ্রাণিত অভিব্যক্তি তাঁর মুখে। তাঁর উঁচু কপালখানায় ডাইনের ভ্রূর উপরে একটা ছোট খাঁজ--একটা পুরন জখমের দাগ। কোটরগত চোখদুটো একেবারে খোলা--মনে হয় যেন তিনি দেখতে পান। গায়ে একটা খাকি শার্ট। তাঁর বুকে এ'টে দেওয়া হল লেনিন অর্ডার।

...কামরাটায় আবছা আলো। রাস্তার আওয়াজ আটকাবার জন্যে বড় জানলাটায় ভারি পর্দা টানা।

বিছানার উপরে দেয়ালে লেনিনের প্রতিকৃতি। আসবাব সাদাসিধে। একটা ডেস্ক, একখানা চামড়া-বাঁধানো কৌচ, একটা

পিয়ানো, একটা বইয়ের শেলফ, আঁরি বারবুসের একটা আবক্ষ মূর্তি।

কামরাটায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকবার সময়ে শোনা গেল তরুণ বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রীতি-সম্ভাষণ। নিজের পাশে বসতে বলে অস্ত্রভঙ্গিক বাড়িয়ে দিলেন বাঁ হাতখানা। তাঁর কবজিতে কিছু চলনশক্তি অবশিষ্ট আছে। ক্ষীণভাবে তিনি হাতে চাপ দেন, যতক্ষণ থাকা হয় তিনি হাত ছাড়েন না।

বেশ বোঝা যায় এই হাত-আঁকড়ে-থাকা, আর যেভাবে তিনি মাঝে মাঝে হাতে হঠাৎ একটা অস্থির চাপ দেন, সেটা একটা সেতুর মতো, মানুষটি কেমন সেটা বুঝতে তাঁর সুবিধে হয় ঐ সূত্র দিয়ে।

তাঁর পাশে যত বেশি সময় বসে থাকা যায়, মানুষটির সাংঘাতিক রোগের কথা মনে আসে ততই কম। তাঁর কথাবার্তায়, তাঁর অনুপ্রাণিত চিন্তার দ্রুত সঞ্চরণে কোথায়ও অশক্তের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। তিনি বলতে থাকেন, 'যখন চোখ বুঁজি', তখন মনেই হয় না ঐ চোখ দুটি বুঁজে আছে কত বছর হয়ে গেল। তিনি বলেন, 'ফ্লুর এই ভীষণ উৎপাত', মনে হয় আর কোন কষ্টই তাঁর নেই। তাঁর কথার ধরনধারন এই রকমের – 'এখন পড়ছি', 'এখন লিখছি', 'ভাবছি যাবো...', 'মহাফেজখানায় গিয়ে দেখব', 'কংগ্রেসের জন্যে আমার বক্তৃতা তৈরি করছি'।

তিনি শুয়ে রয়েছেন, তাঁর রোগে মৃত্যু নিশ্চিত - কিন্তু তাঁর থেকে বিকীর্ণ হয় এমন আমেজ আর কর্মোদ্যোগ যাতে করুণা-সমবেদনার বদলে এই চমৎকার যোদ্ধার জন্যে বিপুল গর্ববোধই আসে।

লেখক এবং তাঁর সৃষ্টি করা চারিত্রগুলির মধ্যে সাধারণত একটা পার্থক্য টেনে দেখা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু লেখক এবং

তাঁর নায়ক অভিন্ন, উভয়ে একই জীবনের ভাগীদার, তাঁদের প্রকৃতির ইস্পাত পোড় খেয়ে মজবুত হয়ে উঠেছে একই আগুনে।

অস্ত্রভ্স্কির বইয়ে বর্ণিত সময় এবং ঘটনাবলি এখন অতীতের বস্তু, তবু, আমাদেরই এযুগের বীর-নায়ক হয়ে রয়েছেন পাভেল করচাগিন।

তাঁর প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই কিসের জন্যে?

প্রথমত, সেটা হল জীবনের সেই 'সুড়ঙ্গগুলো' দিয়ে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলার ক্ষমতা,- সেগুলোর বর্ণনা করেছিলেন মহান ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ তাঁর এক তরুণ বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে: 'তোমার মতো বয়সে আমার উপর ধাক্কা এসেছিল মাত্রা ছাড়িয়েই। তেমনটা ঘটলে নিজের মনে বোলো (আমার এই উপলব্ধি এসেছিল অনেক পরে--গোটা জীবৎকালের অভিজ্ঞতার ফলে) ওগুলি রাস্তা পারাপারের সুড়ঙ্গের মতো: ওগুলোর ভিতর দিয়ে পার হওয়াটা অবধারিত, সেটা আমাদের করতেই হবে - কেননা, সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে বেরিয়ে পাওয়া যায় ঝলমলে রোদ আর তাজা হাওয়া... অন্তরে বলিষ্ঠতা নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলাই প্রধান জিনিস।'

আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব সুড়ঙ্গগুলো: গতকালের, আজকের, আগামীকালের। সেগুলোর ভিতর দিয়ে পার হবার জন্যে চাই সাহস। তাতে আনুকূল্য পাওয়া যায় অস্ত্রভ্স্কি-করচাগিনের কাছ থেকে।

অস্ত্রভ্স্কি কিংবা তাঁর নায়ককে ঘিরে নেই কোন অলৌকিক মহিমা, তাঁরা দু'জনেই খুবই মানুষেরই মতো।

নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ আর ভুলভ্রান্তির ষোল-আনা অর্থই জানা ছিল শেপেতোভ্কার এই কালো-চোখ ছেলেটি পাভেল করচাগিনের।

নিজের জীবনের সারমর্মটি ফুটিয়ে তুলে সে একবার বলেছিল, লড়াইগুলোকে তার এড়িয়ে যেতে হয় নি, তীব্র সংগ্রামের মধ্যে সে পেয়েছিল নিজের জায়গাটি, বিপ্লবের লাল পতাকায় রয়েছে তারও কয়েক ফোঁটা রক্ত, এ জন্যে সে আনন্দিত।

করচাগিন যে ভাব-ধারণা থেকে প্রেরণা পেয়েছে তার পরাক্রমের মধ্যেই তার শক্তি নিহিত।

বহুবার আমি আলাপ করেছি 'আসল করচাগিনের' সঙ্গে। একদিন তিনি বলেছিলেন:

'আত্মসর্বস্ব মানুষ শেষ হয়ে যায় সবার আগে। তার অস্তিত্ব কেবল তার নিজেরই জন্যে, তার 'আমি'টা ঘা খেলেই তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু, সমাজের স্বার্থের ভাগীদার হয় যে-জন, যে-জন তার ভাগ্যকে মিলিয়ে দেয় মানুষ-ভাইদের সঙ্গে, তাকে চূর্ণ করা যায় না সহজে... সৈন্যশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে যে সৈনিক প্রাণ দেয়, তার কমরেডরা এগিয়ে চলেছে এটাই যার সর্বশেষ সচেতন অনুভূতি, সে পায় চূড়ান্ত আর পরিপূর্ণ তৃপ্তি।'

১৯৩৬ সালে মারা যাবার স্বল্পকাল আগে সোচিতে অস্ত্রভ্স্কির সঙ্গে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌' পত্রিকার সংবাদদাতার একটা সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ফাশিবাদ, যুদ্ধ এবং আগামী বিজয় সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ চলেছিল। এই সংবাদদাতা বলেছিলেন, বহু বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাতাদি হয়েছে, তবু, এই সাক্ষাৎকারের কথা, কিংবা এর থেকে পাওয়া শিক্ষার কথা তিনি কখনও ভুলবেন না।

আপনি অত্যন্ত সাহসী,' বলেছিলেন এই সংবাদদাতা। 'কমিউনিজমে বিশ্বাস থেকেই আপনি পান এই সাহস, নয় কি?'

'ঠিক,' উত্তরে অস্ত্রভ্স্কি বলেছিলেন, 'আরও পাই সুখ।'

করচাগিনের জীবনকাহিনী থেকে প্রত্যয়জনকভাবেই প্রমাণিত হয় যে, মহৎ লক্ষ্য থাকলে, একমাত্র তবেই মানুষের জীবন মহৎ হয়ে উঠতে পারে।

করচাগিনকে, এই সাধারণ মেহনতী তরুণটিকে যথার্থ মহৎ করে তুলেছে ঐ মহৎ লক্ষ্যই।

যা হতে পারত সেটা নয়, যা ছিল বাস্তব জীবনে তারই কথা লিখেছেন অস্ত্রভ্স্কি। নিজেরই জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর বইখানি; আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব সেটা যদি সম্ভব হয়ে উঠে থাকে, সেটা লেখকের কল্পনার দরুন নয়, সেটা হয়েছে জীবনেরই ফলে, বাস্তব জীবনই সৃষ্টি করেছে এমনসব মানুষ যারা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। অস্ত্রভ্স্কি না লিখে পারেন নি—তিনি জানতেন সেটাই ছিল তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে একমাত্র যুক্তি।

রূঢ় এবং যথার্থ বাস্তবতা নিয়েই তাঁর এই বইখানি।

রোমাঁ রোলাঁ এই লেখক সম্বন্ধে বলেছেন: 'বিপ্লবের যুগের শিল্পকলার মহত্তম সৃষ্টি হল এই বিপ্লব থেকে উদ্ভূত মানুষগুলি। এমনই একজন হলেন নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি।'

সেমিয়ন ত্রেগুব্

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

'তোমাদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দেবার জন্যে ইস্টারের ছুটির আগে আমার বাড়ি এসেছিলে, তারা উঠে দাঁড়াও!'

কথাটা যিনি বললেন, মোটাসোটা তাঁর দেহের ওপর পাদ্রীর আলখাল্লা-পরা, গলায় ঝুলছে একটা ভারি ক্রুশ। তাঁর তীব্র চোখের চাউনিতে গোটা ক্লাস-ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল আর তাঁর ছোট ছোট চোখের কঠিন দৃষ্টি যেন তাদের ভেতর পর্যন্ত কুরে নিল। যে চারটি ছেলে, দু'টি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এরা আশঙ্কার চোখে তাকাল আলখাল্লা-পরা লোকটির দিকে।

'তোমরা বসো,' বললেন পাদ্রীমশাই মেয়ে দু'টির দিকে হাত নেড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল তারা।

ফাদার ভাসিলির চেরা-চোখের দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হল বাকি চারজনের ওপর।

'তোরা এদিকে আয় দিকি, বাছাধনরা আমার!' চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভাসিলি, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়ো-সড়ো হয়ে দাঁড়ানো ছেলেগুলির দিকে।

'তোদের এই ক'জন গুণ্ডা চ্যাংড়ার মধ্যে কে বিড়ি খাস্?'

'বিড়ি আমরা খাই না, ফাদার,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল চারজন।

লাল হয়ে উঠল ফাদার ভাসিলির মুখ।

'বিড়ি খাস্ না, না? শয়তান! আমার কেক্-এর জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় তাহলে তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল কে? কে? দেখছি এখুনি বিড়ি খাস্ কিনা। দেখি, পকেটগুলো তোদের উল্টে দেখা! কই, যা বলছি কর! উল্টে দেখা পকেটগুলো!'

তিনজন তাদের পকেট থেকে জিনিসপত্র বের করে টেবিলের ওপর রাখতে লাগল। পাদ্রীমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলাইয়ের ভাঁজগুলো পরীক্ষা করলেন তামাকের গুঁড়ো পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছু না পেয়ে তিনি তাকালেন চার-নম্বর ছেলেটির দিকে। কালো-চোখ কিশোর, ধূসর রঙের শার্ট গায়ে, নীল পাৎলুনের হাঁটুর কাছটায় পটি মেরে সেলাই করা।

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন পুতুলের মতো?'

প্রশ্নকর্তার দিকে একটা চাপা ঘৃণার দৃষ্টি হেনে রুষ্ট গলায় ছেলেটি বলল, 'আমার পকেট নেই।'

'পকেট নেই, না? আচ্ছা! এমন শয়তানি করে কে আমার কেক্-এর জন্যে তৈরি ময়দা নষ্ট করে দিয়েছিল সেদিন, ভেবেছিস — জানি নে আমি! এবারও তোকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস? না হে ছোকরা, মজাটা টের পাইয়ে দেব এবার। গতবারে তোর মা এসে কাকুতি-মিনতি করাতেই তোকে ইস্কুলে রেখেছিলাম। কিন্তু এবারে আর পার পাবি নে। যা, বেরিয়ে যা!' নির্মমভাবে ছেলেটার কান মুচড়ে ধরে ফাদার ভাসিলি তাকে হিঁচড়ে বাইরের বারান্দায় ঠেলে দিয়ে জোরে বন্ধ করে দিলেন ক্লাস-ঘরের দরজাটা।

নিস্তব্ধ, সন্ত্রস্ত ক্লাস-ঘর। কেন পাভেল করচাগিনকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তা একমাত্র পাভেলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সেগেই ব্রুঝাক ছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউই বুঝে উঠতে পারল না। সে-ই দেখেছিল পাভেলকে ফাদার ভাসিলির রান্নাঘরে গিয়ে ইস্টার-ভোজের কেক্-এর জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় একমুঠো ঘরে-তৈরি তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে। ওরা ছ'জন ক্লাসের পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ে, তখন ফাদার ভাসিলির কাছে আরেকবার পরীক্ষা দেবার জন্যে গিয়ে তাঁর আসার অপেক্ষায় ছিল সেই রান্নাঘরে।

স্কুল-বাড়ির সিঁড়ির শেষ ধাপটায় এসে বসল পাভেল। বিষণ্ণ মনে ভাবছিল, মা তার মুখে ঘটনাটা শুনে কী বলবে। গরিব মা তার, আবগারি-দারোগার বাড়িতে রাঁধুনির কাজে সকাল-সন্ধ্যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে এল পাভেলের।

'কী করি এখন? এই হতভাগা পাদ্রীটার জন্যেই এই কাণ্ড। কেক্-এর ময়দায় তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দেবার দুর্বুদ্ধিটা যে কোথা থেকে এসে ভর করেছিল মাথায়! মতলবটা জুগিয়েছিল সেরিওঝ্কাই। 'আয়, বুড়ো ঘাগীটাকে একটু জব্দ করি,' বলেছিল সেরিওঝা। আর তাই করেছিলাম। এখন কিনা সেরিওঝাটা পার পেয়ে গেল আর আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হবে হয়তো!'

ফাদার ভাসিলির সঙ্গে তার শত্রুতা অনেকদিনের। যেদিন মিশ্কা লেভচুকভ-এর সঙ্গে মারামারি করার শাস্তি হিসেবে পাভেলকে লাঞ্চ খেতে না দিয়ে ইস্কুলে আটকে রাখা হয়, ব্যাপারটার শুরু সেদিন থেকেই। খালি ক্লাস-ঘরে যাতে সে দুষ্টুমি করতে না পারে, তার জন্যে মাস্টারমশাই তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা ক্লাস-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। পেছনের

একটা জায়গায় বসেছিল পাভেল। কালো কোর্তা-গায়ে, হাড়-জিরজিরে, ছোটখাটো মাস্টারমশাইটি তখন পৃথিবী আর গ্রহ-তারকা সম্বন্ধে বলছিলেন। পৃথিবীর বয়েস কোটি কোটি বছর আর তারাগুলো সব এক-একটা পৃথিবীর মতোই—একথা শুনে তো পাভেলের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল অবাক বিস্ময়ে। শুনতে শুনতে পাভেলের এতোই চমক লেগে গিয়েছিল যে আর-একটু হলেই সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলে ফেলেছিল আর-কি, 'কিন্তু বাইবেলে তো তা বলে না!' কিন্তু পাছে আরও কিছু শাস্তি কপালে জোটে এই ভয়ে সে কিছু বলে নি।

পাদ্রীমশাই বাইবেলের পরীক্ষায় তাকে বরাবর পুরো নম্বর দিয়ে এসেছেন। প্রার্থনার শ্লোকগুলো পাভেলের প্রায় সবই মুখস্থ, বাইবেলের পূর্বভাগ আর উত্তরভাগও তাই। সপ্তাহের কোন্ দিনে ঈশ্বর কোন্ কোন্ জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন সে সব ঠিকঠাক জানা আছে তার। ফাদার ভাসিলির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করবে বলে সে মনে মনে ঠিক করল। পরের ক্লাসেই — পাদ্রীমশাইয়ের জুৎ করে চেয়ারে বসামাত্রই—পাভেল হাত তুলল। বলবার অনুমতি পেয়েই সে উঠে দাঁড়াল, 'ফাদার, দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাস্টারমশাই বলছিলেন, পৃথিবীর নাকি কোটি কোটি বছর বয়েস। কিন্তু বাইবেলে তো বলে পাঁচ হাজা...' ফাদার ভাসিলির কর্কশ চিৎকারে কথা বন্ধ হয়ে গেল তার।

'কী বললি রে শয়তান? এই বুঝি তোর বাইবেল শেখা হচ্ছে!'

কী যে ব্যাপারটা ঘটল, তা ভালো করে বুঝবার আগেই পাদ্রীমশাই পাভেলের কান ধরে দেয়ালে তার মাথাটা ঠুকে দিতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে ভয়ে আর যন্ত্রণায় অস্থির

পাভেল দেখতে পেল যে সে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

তার মাও সেবার তাকে খুব বকাঝকা করেছিল।

পরের দিন সে গিয়ে ফাদার ভাসিলিকে কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল পাভেলকে ইস্কুলে ফিরিয়ে নিতে। সেইদিন থেকে পাভেল মনেপ্রাণে পাদ্রীকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে আর ভয় করে। যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার কিশোর-হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—তা সে অন্যায় যতোই সামান্য হোক না কেন। বিনা কারণে এই মার খাবার জন্যে সে পাদ্রীমশাইকে ক্ষমা করতে পারে নি। ফলে, তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল তার মন।

তারপর থেকে ফাদার ভাসিলির কাছ থেকে পাভেল নানান্ লাঞ্ছনা ভোগ করে আসছে। সর্বদাই তাকে ক্লাস-ঘর থেকে বের করে দিতেন পাদ্রীমশাই। যৎসামান্য ত্রুটির জন্যে তাকে তিনি ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেন দিনের পর দিন, সপ্তাহ-ভর। কখনও তাকে পড়া জিজ্ঞেস করেন না। তার ফলে, ইস্টারের ছুটির আগের দিন ক্লাসের লেখাপড়ায় পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের সঙ্গে পাভেলকে পাদ্রীমশাইয়ের বাড়ি যেতে হয়েছিল পরীক্ষা দেবার জন্যে। সেখানেই সেদিন রান্নাঘরে গিয়ে সে কেক তৈরির জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় তামাকের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল।

ব্যাপারটা কেউ দেখে নি, তবু পাদ্রীটা ঠিক ধরেছেন দোষটা কার।

...শেষ পর্যন্ত ক্লাস শেষ হল, ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে এল বাইরের আঙিনায়, ভিড় জমিয়ে তুলল পাভেলকে ঘিরে। পাভেল বিষণ্ণ আর গম্ভীর। সেরিওঝা ব্রুঝাক শুধু পেছনে থেকে গিয়েছিল ক্লাস-ঘরে। তার মনে হচ্ছিল সেও অপরাধী, কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য করার মতো তার কিছু করবার নেই।

মাস্টারমশাইদের ঘরের খোলা জানলাটার ফাঁকে হেডমাস্টার ইয়েফ্রেম ভাসিলিয়েভিচ তাঁর মাথাটা বের করে হাঁক দিলেন, 'করচাগিনকে এখনুনি পাঠিয়ে দাও আমার কাছে!'

চমকে দাঁড়িয়ে উঠল পাভেল হেডমাস্টারের জলদগম্ভীর স্বরে। তারপরে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল হুকুম তামিল করতে।

রেল-স্টেশনের রেস্তোরাঁর মালিক, ফ্যাকাসে আর মধ্যবয়সী লোকটা তার নিষ্প্রভ বিবর্ণ চোখ তুলে একটু দেখে নিল পাভেলকে।

'বয়স কতো এর?'

'বারো।'

'বেশ, থাকুক এখানে। মাসে আট রুবল আর কাজের দিনে খেতে পাবে। একদিন-অন্তর এক-নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কিন্তু ছিঁচকেমি চলবে না, মনে থাকে যেন।'

'আজ্ঞে না, কর্তা, চুরিচামারি করবে না ও। সে জন্যে আমি দায়ী থাকলাম।' মা তাকে তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বলল ভয়ে ভয়ে।

'আজ থেকেই কাজে লাগুক,' হুকুম দিল রেস্তোরাঁর মালিক। কাউণ্টারের পেছনে মেয়েটিকে বলল, 'জিনা, ছেলেটাকে রান্নাঘরে নিয়ে যাও। ফ্রসিয়াকে বলো, গ্রিশ্কার জায়গায় একে কাজে লাগাতে।'

মাংস কাটছিল মেয়েটা, ছুরিটা নামিয়ে রেখে পাভেলের দিকে মাথা নেড়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেল হলঘর পার হয়ে একপাশের একটা দরজার দিকে -- সেই দরজার ওধারে থালা-বাটি ধোওয়া-মাজা-রাখা হয়। পাভেল চলল তার পিছু-পিছু। তার মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার কানে কানে

বলল, 'দেখিস্, পাভ্লুশ্কো, লক্ষ্মী ছেলে, ভাল করে কাজ করিস বাবা। নিন্দের ভাগী হোস্ নে।'

বিষণ্ণ চোখে মা তাকিয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে, তারপর চলে এল।

বাসনপত্তর ধোবার ঘরে পুরোদমে কাজ চলছিল। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে থালা, কাঁটাচামচ, ছুরি। জনকতক মেয়ে কাঁধে ঝোলানো তোয়ালে দিয়ে সেগুলো মুছে নিচ্ছে।

পাভেলের চেয়ে একটু বড়ো, ঝাঁটার মতো ঝাঁক্ড়া আর লাল চুলওলা একটি ছেলে তদ্বির করছিল দুটো বিরাট সামোভার।

একটা বড়ো পাত্রে জল ফুটছে, তারই মধ্যে ডিশ্গুলো ধোওয়া হচ্ছে আর বাষ্পে ভরে গেছে বাসনপত্তর ধোবার ঘরটা। প্রথমে তাই পাভেল মেয়েদের মুখগুলো দেখতে পায় নি। অনিশ্চিতভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ কেউ তাকে বলে দেবে কী করতে হবে না-হবে, তারই অপেক্ষায়।

ডিশ্-ধোয়া একটি মেয়ের কাছে গিয়ে জিনা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এই যে, ফ্রসিয়া, গ্রিশ্কার জায়গায় এই নতুন ছেলেটিকে নেওয়া হল। কী করতে হবে ওকে বলে দাও।' তারপর, সে ফ্রসিয়া বলে যাকে ডেকেছিল, তাকে দেখিয়ে পাভেলকে বলল, 'ও এখানকার কাজকর্ম চালায়। কী করতে হবে তা ওই তোমাকে বলে দেবে।' বলেই জিনা ঘুরে চলে গেল খাবার হল-ঘরে।

'আচ্ছা,' মৃদু গলায় বলে পাভেল প্রশ্নভরা চোখে তাকাল ফ্রসিয়ার দিকে। কপালের ঘাম মুছে ফ্রসিয়া তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল - যাচাই করে নিল মনে মনে। তারপর কনুইয়ের ওপর পড়া জামার হাতাটা গুটিয়ে নিয়ে

গভীর আর আশ্চর্যরকম মিষ্টি গলায় বলল, 'কাজটা বিশেষ কিছু না, খোকা, কিন্তু খাটতে হবে তোমায় সমস্তক্ষণ। সকালবেলায় গরম করতে হবে ওই তামার পাত্তরটা, সমস্তক্ষণ গরম রাখতে হবে ওটাকে যাতে সবসময় ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। তাছাড়া, কাঠ কেটে রাখতে হবে, সামোভারগুলোরও তদ্বির করতে হবে। কাঁটাচামচ আর ছুরিগুলো মাঝে মাঝে তোমায় মেজে দিতে হবে, এঁটোকাটাগুলো আর নোংরা জল বাইরে ফেলে আসতে হবে। অনেককিছুই করতে হবে, খোকা!' ফ্রসিয়ার উচ্চারণের ভঙ্গিটা স্পষ্ট কস্ত্রমা অঞ্চলের লোকদের মতো, 'আ'-কারগুলো টানা-টানা। তার কথা বলার ভঙ্গি, লাল হয়ে ওঠা মুখ, ছোট অল্প-বোঁচা নাক সব মিলিয়ে পাভেলের একটু ভালো লাগল।

'দিব্যি মেয়েটি,' সিদ্ধান্ত করল পাভেল। তারপর লজ্জা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করতে হবে আমায়, মাসি?'

কথাটা শুনে এক দমক উচ্চকিত হাসি হেসে উঠল ডিশ্-ধোয়া মেয়েরা।

'ও মা! ফ্রসিয়া এক বোন-পো জুটিয়ে এনেছে, দ্যাখ্...'

সবচেয়ে বেশি মন-খুলে হাসল ফ্রসিয়া নিজে। ঘন বাষ্পের জন্যে পাভেল লক্ষ্য করে নি যে, ফ্রসিয়া অল্পবয়সী মেয়ে -- আঠারো বছরের বেশি তার বয়েস নয়।

ঘাব্‌ড়ে গিয়ে পাভেল সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে আমায় এখন?'

ছেলেটা শুধু চাপা হেসে বলল, 'মাসিকে জিজ্ঞেস করো, বলে দেবে সব। আমি চলি।' বলেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল রান্নাঘরের দিককার দরজাটা দিয়ে।

ডিশ্ ধুচ্ছিল যারা, তাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী মেয়ে

ডাক দিল, 'এদিকে এসো, কাঁটাগুলো মুছে ফেলতে হাত লাগাও।' অন্যদের ধমক দিয়ে বলল, 'হাসাহাসি বন্ধ করো। এমন কিছু হাসির কথা বলে নি ছেলেটা। এই যে, এটা নাও,' পাভেলের দিকে একটা ডিশ-মোছার তোয়ালে এগিয়ে দিল সে। 'একটা দিক দাঁতে চেপে অন্য দিকটা টান করে ধরো। এই নাও একটা কাঁটা, কাঁটার ফাঁকে ফাঁকে তোয়ালেটা ঢুকিয়ে চালাচালি করে নাও। দেখো, যেন ময়লা-টয়লা লেগে না থাকে। এ ব্যাপারে এখানে এদের বড়ো কড়া নজর, খদ্দেররা সবসময় কাঁটাগুলো পরখ করে দেখে — এক কণা ময়লা পেলেই দারুণ গন্ডগোল বাধাবে আর গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে এক মুহূর্তে।'

'গিন্নি?' পাভেল প্রতিধ্বনি করল, 'আমাকে কাজে লাগাল যে কর্তা, তাকেই তো মালিক বলে ভেবেছিলাম।'

হেসে উঠল মেয়েটা, 'না রে খোকা, কর্তাটি এখানে শুধু ঘর-সাজানো আসবাব গোছের। আসল মালিক হলেন গিন্নিটি। আজ এখানে নেই। দু'দিন কাজ কর এখানে, নিজেই সব দেখতে পাবে।'

বাসন-ধোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ময়লা ডিশে স্তূপীকৃত বারকোশগুলো নিয়ে তিনজন ওয়েটার ঢুকল। তাদের মধ্যে কাঁধ-চওড়া, ট্যারা-চোখে, বড় চৌকা মুখ আর ভারি-চোয়াল লোকটি বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করো বরং। বারোটার গাড়ি যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে আর এদিকে তোমরা কি-না নিট্‌পিট্‌ লাগিয়েছ।'

পাভেলকে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'

'ও নতুন লাগল কাজে,' বলল ফ্রসিয়া।

'নতুন কাজে লাগল বুঝি? বেশ, শোনো খোকা।' পাভেলের কাঁধে ভারি হাতটা দিয়ে তাকে সামোভারগুলোর দিকে

ঠেলে নিয়ে এসে বলল, 'এই দুটো যাতে সব সময় ফুটতে থাকে — সেদিকে নজর রাখা তোমার কাজ। এই দেখো, একটা গেছে নিভে, আরেকটাও নিভন্ত। আজকের মতো আর কিছু বলব না, কিন্তু যদি ফের এরকমটা হয়, তাহলে পিটিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেবো!'

একটাও কথা না বলে পাভেল সামোভারগুলো নিয়ে কাজে লেগে গেল।

তার মেহনতের জীবন আরম্ভ হল এইভাবে। প্রথম এই দিনটির মতো আর কোনদিন পাভকা এতো খাটে নি। এটুকু বুঝেছিল যে এটা বাড়ি নয় যেখানে মা-র কথা না শুনলেও পার পেয়ে যাবে। কথা-মতো কাজ না করলে কপালে যে দুঃখ আছে — সেটা ওই ট্যারা-চোখ ওয়েটারটা বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল।

চিম্‌নির মুখে উঁচু বুটজোড়ার একটা ধরে হাপরের মতো চালিয়ে দিল পাভেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেট-মোটা বড়ো বড়ো সামোভারদুটোর মধ্যে থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছিট্‌কে বেরুতে থাকল। ময়লা জলের পাত্রটা তুলে নিয়ে ছুটল জঞ্জাল ফেলার জায়গাটার দিকে। জল ফোটার পাত্রটার নিচে জালানি কাঠ গুঁজে দিল। ডিশ-মোছার ভিজে তোয়ালেগুলো গরম সামোভারদুটোর গায়ে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিল। এক কথায়, যা যা করতে বলা হল, সবই করল। সেদিন অনেক রাত্রে ক্লান্ত পাভেল ঢুকল গিয়ে রান্নাঘরে। তার পেছনে বন্ধ হয়ে আসা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ডিশ্‌-ধোওয়া মেয়েদের মধ্যে সেই মধ্যবয়সী আনিসিয়া মন্তব্য করল, 'অদ্ভুত ছেলেটা। দেখেছো কেমন পাগলের মতো ছুটোছুটি করে। ওকে কাজে লাগাবার বিশেষ কোন কারণ ছিল নিশ্চয়।'

'ভাল কাজ করছে,' বলল ফ্রসিয়া, 'তাড়া দিতে হয় না।'

'শিগগিরই মিইয়ে আসবে,' মত প্রকাশ করল লুশা, 'প্রথম প্রথম সবাই খুব খাটে...'

একটা গোটা রাত্রি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকার পর, পরের দিন সকাল সাতটায় অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে পাভেল ফুটন্ত সামোভারদুটো জিম্মা করে দিল তার জায়গায় যে-ছেলেটি কাজে এসেছে তার কাছে।

গোলগাল-মুখ এই ছেলেটার চাউনিতে একটা স্পর্ধা ফুটন্ত সামোভারদুটোকে পরখ করে সব ঠিক আছে দেখে নিশ্চিত হবার পর সে তার পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে নিয়ে উপরওয়ালার মতো অবজ্ঞা-মেশানো ভঙ্গিতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলল। বর্ণহীন চোখে পাভেলকে বিঁধে ঝগড়াটে গলায় বলল, 'আচ্ছা, শোন হে পোঁটা-নাক ছোঁড়া, কাল ঠিক ছ'টায় কাজে হাজির থাকা চাই, বুঝলে?'

'ছটায় কেন?' জিজ্ঞেস করল পাভ্‌কা, 'কাজের সময়-বদ্‌লি হয় তো সাতটায়, না-কি?

'কাজ-বদ্‌লির সময় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ছ'টায় হাজির থাকবে। বেশি বক্‌বক্‌ করবি তো মুণ্ডুটা গুঁড়িয়ে দেব। আস্পর্ধা দেখো না! আজই কাজে লেগে এর মধ্যেই কিনা ওস্তাদি মারতে লেগেছে।'

ডিশ্‌-ধোওয়া মেয়েদের যাদের সবে কাজের সময় শেষ হয়েছে, তারা কৌতূহলের সঙ্গে এই দুটি ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুনছিল। ওই ছেলেটার দাম্ভিক মেজাজ আর ধমকানি আর কর্তালির ধরনধারনে রেগে গেল পাভেল। প্রতিপক্ষের দিকে এক-পা এগিয়ে এসে মুঠো পাকিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময়ে নতুন-পাওয়া চাকরিটা হারাবার ভয়ে থেমে গেল সে। রাগে মুখ কালো করে বলল, 'বেশি চেঁচাস্‌ নে, থাম্‌। মুখ সামলে কথা বলবি, নইলে

টের পাইয়ে দেব মজাটা। কাল সাতটায় আসব আমি, আর মনে রাখিস্—হাত চালাতে আমিও কম যাই নে। দেখ্‌বি না-কি? আস্‌বি তো চলে আয়!'

পাভেলের ক্রুদ্ধ ভঙ্গি দেখে আশ্চর্য হয়ে হাঁ-করে তাকিয়ে তার প্রতিপক্ষ গুটিয়ে নিল নিজেকে, পিছু হঠে জল ফোটার পাত্রটা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। এতোটা শক্ত পালটা জবাব সে আশা করে নি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।' বিড়বিড় করে বলল সে।

চাকরির প্রথম দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটেছে। কাজের শেষে এই যে ছুটি, এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই—এরকম একটা মনোভাব নিয়েই পাভেল তাড়াতাড়ি চলল বাড়ির দিকে। এখন থেকে সেও তো শ্রমজীবী, কেউ আর তাকে পরগাছা বলে দোষ দিতে পারবে না।

করাত-কলের এলোমেলো ছড়ানো বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে তখন সূর্য উঠে আসছে। একটু বাদেই লেশ্চিনস্কিদের বাগানের পেছনে পাভেলদের ছোট বাড়িটা দেখা দেবে।

'মা নিশ্চয়ই এইমাত্র উঠেছে, আর আমি এই কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি,' শিস দিতে দিতে জোরে পা চালিয়ে পাভেল ভাবছিল, 'ইস্কুল থেকে বের করে দেওয়াটা খুব মন্দ হয় নি দেখছি। হতচ্ছাড়া পাদ্রীটা তা এক মুহূর্ত শান্তি দিত না আমায়, চুলোয় যাক ব্যাটা এখন।' বাড়ি পেঁৗছে বেড়ার দরজা খুলতে খুলতে পাভেল মনে মনে বলল, 'আর ওই গোলমুখোটা, ওর মুখে ঠিক ঝাড়ব একটা ঘুষি।'

আঙিনায় মা সামোভারটায় আগুন ধরাতে ব্যস্ত ছিল, পাভেলকে আসতে দেখে মুখ তুলে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কেমন?'

'দিব্যি,' বলল পাভেল।

মা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছে, এমন সময় খোলা জানলাটা দিয়ে পাভেল তার দাদা আরতিওম-এর চওড়া পিঠের দিকটা দেখতে পেল।

'আরতিওম এসেছে বুঝি?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, কাল রাতে এসেছে। ও থাকবে এখন এখানে। ডিপোয় কাজ করবে।'

একটু ইতস্তত করে পাভেল সামনের দরজাটা খুলল।

দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিলের ধারে বসে ছিল আরতিওম। পাভেল ঢুকতে বিরাট দেহটা ঘুরিয়ে সে তার কালো ঘন ভুরুর নিচে দুই চোখের কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল পাভেলের দিকে, 'এই যে, তামাকু-ছোঁড়া এসে গেছে। তারপর, চলছে কেমন?'

কথাবার্তাটা কোন্ দিকে মোড় নেবে আন্দাজ করে শঙ্কিত হয়ে উঠল পাভেল। 'আরতিওম সবই জেনে বসে আছে দেখছি,' ভাবল মনে মনে, 'দুর্ভোগ আছে দেখছি কপালে--বকুনি আর পিটুনি!'

কিন্তু আরতিওমের বকাঝকা-মারার ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। টুলটার ওপরে বসে টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে পাভেলকে লক্ষ্য করতে লাগল কৌতুক আর বিদ্রূপ মেশানো চাউনিতে।

'তাহলে, তুই তো পাশ করে বেরিয়ে এলি দেখছি ইউনিভার্সিটি থেকে, অ্যাঁ? সেখানে শেখার যা ছিল সব শিখে নেবার পরে এখন থেকে তাহলে এঁটোকাটা সাফ করা নিয়েই থাকবি, কি বল্?'

মেঝের একটা তক্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটা পেরেকের মাথা লক্ষ্য করতে থাকল পাভেল। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আরতিওম চলে গেল রান্নাঘরটায়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল ভাবে, 'যাক্, মারধোর করবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

পরে চা খেতে খেতে আরতিওম পাভেলকে ইস্কুলের সমস্ত ঘটনাটা জিজ্ঞেস করল। যা যা ঘটেছিল সবই বলল পাভেল।

মা দুঃখিত ভাবে বলল, 'বড়ো হয়ে যদি এমন বেয়াড়া হয়ে উঠিস, তাহলে কী হবে তোর? কী করব তোকে নিয়ে? কার মতো যে হলি, তাই ভাবি! হায় ভগবান, কী ভোগান্তিই না ভোগাচ্ছে আমায় ছেলেটা!' বিলাপ করল মা।

খালি বাটিটা ঠেলে দিয়ে পাভেলের দিকে ফিরে বলল আরতিওম, 'আচ্ছা, শোনো ভাই। যা হয়ে গেছে তার আর কোন চারা নেই। কিন্তু এখন থেকে খেয়াল রেখো, ভালো করে কাজ করতে হবে। ওসব বাঁদ্‌রামি চলবে না। এখান থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়, তাহলে ধোলাই দেব তোমায় একচোট—মনে থাকে যেন। মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছ। সব সময় একটা গোলমাল পাকাতেই আছ দেখছি। ওসব আর চলবে না। এখানে বছরখানেক কাজ করা হলে পর চেষ্টা করব যাতে তোকে আমাদের ডিপোয় শিক্ষানবিস হিসেবে নেওয়া হয়—জীবন-ভোর খাবার-দোকানের এঁটো-ময়লা পরিষ্কার করে তো আর চলবে না। একটা-কিছু কাজ শিখতে হবে। এখন তোর বয়েস খুব কম--দেখব বছরখানেক বাদে কী করা যায় না যায়। নিতেও পারে তোকে হয়তো। আমি তো এখন এখানেই কাজ করব। মাকে আর কাজ করতে যেতে হবে না। যথেষ্ট খেটে মরেছে মা যতসব শুয়োরগুলোর ঝি-গিরি করে। কিন্তু তোকে মানুষ হতে হবে পাভকা—এইটে খেয়াল রাখিস।'

দাঁড়িয়ে উঠল আরতিওম, তার বিরাট দেহটার তুলনায় ঘরের অন্য সব কিছুকে নেহাত খাটো দেখাল। চেয়ারে ঝোলানো

কোর্তাটা গায়ে দিয়ে মাকে বলল, 'ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমাকে একবার বেরুতে হবে।'

একটু ঝুঁকে দরজাটা পেরিয়ে চলে গেল সে। জানলার পাশ দিয়ে বেড়ার কাছে যেতে যেতে ভেতরে তাকিয়ে পাভেলকে বলল, 'এক জোড়া বুটজুতো আর একখানা ছুরি এনেছি তোর জন্যে। মা তোকে দেবে এখন।'

স্টেশনের রেস্তোরাঁটা সারা দিনরাত খোলা থাকে।

পাঁচটা আলাদা আলাদা রেল-লাইন এসে মিশেছে এই জংশনে, সর্বদাই লোকের ভিড়ে জমজমাট স্টেশনটা। কেবল রাত্রিবেলায় দুটো ট্রেন আসার ফাঁকে এক সময় দু'-তিন ঘণ্টার জন্যে জায়গাটা কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। চতুর্দিকে শত শত ট্রেন এই স্টেশনের ওপর দিয়ে যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে হাজার হাজার আহত আর পঙ্গু মানুষ ফিরিয়ে এনেছে আর ফ্রণ্টের দিকে একঘেয়ে ধূসর সামরিক উর্দি-পরা নতুন নতুন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বয়ে নিয়ে গেছে।

দু-বছর কাজ করা হল এখানে পাভেলের এই দু-বছরে সে বাসন-ধোবার ঘর আর রান্নাঘর ছাড়া আর কিছুই দেখে নি। মাটির নিচুতলার প্রকাণ্ড রান্নাঘরে জনা কুড়ি হন্যে হয়ে কাজ করে। খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে দশজন ওয়েটার অনবরত হুড়মুড়িয়ে যায় আর আসে।

পাভেল আট রুবল থেকে দশ রুবল পাচ্ছে এতদিনে। এই দু-বছরে সে লম্বায় আর চওড়ায় বেড়েছে, অনেক কিছু ঝক্কিও গেছে তার ওপর দিয়ে। ছ'মাস পাভেল রান্নাঘরে খানসামার কাজ করেছে, কিন্তু তাকে আবার ফেরত পাঠানো হয় বাসন-ধোবার ঘরে। সর্বশক্তিমান বড়ো বাবুর্চি তাকে অপছন্দ করে--কি জানি, বলা যায় না, বেশি বেশি ঘুষি-টুসি

মারলে আবার কখন হয়তো গোঁয়ার ছোঁড়াটা ছুরি-টুরি মেরে বসবে। সত্যিই, পাভেলের দারুণ রাগী মেজাজের জন্যে তার চাকরিটা অনেক আগেই চলে যেত, কিন্তু সে যে থেকে যায় তা শুধু ওর পরিশ্রম করার প্রচণ্ড ক্ষমতার জন্যেই। অন্য যে-কোন লোকের চেয়ে সে বেশি পরিশ্রম করতে পারত, ক্লান্ত হত না যেন কখনও।

যে-সব সময়ে খাবার-ঘরে সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে, ও তখন ডিশে ভর্তি বারকোশগুলো নিয়ে এক-এক লাফে চার-পাঁচটা সিঁড়ি পার হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটোছুটি করত।

রাত্রিবেলায় যখন রেস্তোরাঁর হল-ঘর দুটোয় গোলমাল থেমে আসে, ওয়েটাররা তখন এসে জড়ো হয় নিচে রান্নাঘরের ভাঁড়ারগুলোয়—উদ্দাম আর বেপরোয়া তাস-বাজি শুরু হয়ে যায় তখন। পাভেল প্রায়ই ওদের টেবিলে প্রচুর টাকা দেখেছে। আশ্চর্য হয় নি সে এত টাকার ছড়াছড়ি দেখে। পাভেল জানে, প্রতি শিফ্‌ট্‌-এ এক-একজন ওয়েটার মোট তিরিশ থেকে চল্লিশ রুবল পায় বখ্‌শিশের এক রুবল আর আধ-রুবল মিলিয়ে। এই টাকাটা তারা পরে খরচ করে মদ খেয়ে আর জুয়ো খেলে। ঘৃণা করে এদের পাভেল।

'হতভাগা শুয়োর যত সব!' মনে মনে ভাবে সে, 'আরতিওম—প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ কারিগর—সে কিনা সর্বসাকল্যে পায় মাসে আটচল্লিশ রুবল, আর আমি পাই দশ। আর এরা শুধু খাবারের থালাগুলো বয়ে নিয়ে যায় আর আসে—তাতেই এক-দিনেই পায় এতো। তারপরে সবটা উড়োয় মদে আর তাসে।'

পাভেলের কাছে তার মালিকদের মতোই এই ওয়েটাররাও ভিন্ন আর শত্রুভাবাপন্ন জগতের লোক। 'এখানে তো এই শুয়োরগুলো হুজুরে-হাজির থাকে সব সময়, আর ওদিকে

এদের বৌ-ছেলেপুলে শহরে চলা-ফেরা করে বড়োলোকের মতো।'

মাঝে মাঝে ওদের বৌ আর ছেলেরা এখানে আসে। ছেলেদের গায়ে থাকে কেতাদুরস্ত ইস্কুলের উর্দি, বৌগুলো ভালো থাকে, ভালো খায়দায়, তাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কোমল-শরীর। 'যে সব ভদ্দরলোকদের ওরা খানসামাগিরি করে, তাদের চেয়ে এদের পয়সা বেশি—বাজি রেখে বলতে পারি,' ভাবে পাভেল। রাত্রে রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে কোণে কিংবা ভাঁড়ারঘরে যে-সব কান্ড ঘটে, তা দেখেও ছেলেটা আর মনে ধাক্কা খায় না। খুব ভালো করেই ও জানে যে ডিশ্-ধোবার কিংবা খদ্দেরদের মদ জোগাবার কাজে যে মেয়েরা আছে, তাদের বেশি দিন চাকরি থাকবে না যদি তারা এখানে ক্ষমতাধর প্রত্যেকের কাছে কয়েক রুবলের জন্যে নিজেদের বিকিয়ে না দেয়।

জীবনের প্রতি পাভেলের আগ্রহ অসীম—সে এখানে জীবনের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত দেখে নিয়েছে, কুৎসিত সে-গর্তটার একেবারে তলা থেকে পাঁকে ভরা নর্দমার পচা ভ্যাপ্সা গন্ধ উঠে এসেছে।

ডিপোয় ভাইকে শিক্ষানবিস হিসেবে ঢুকিয়ে নিতে পারে নি আরতিওম। পনের বছরের কম বয়সী কাউকে সেখানে নেওয়া হয় না। কিন্তু পাভেল ওই কালি-পড়া ইঁটের প্রকান্ড বাড়িটার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কবে যে এই রেস্তোরাঁটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তারই আশায় সে দিন গোণে।

সে প্রায়ই ডিপোয় গিয়ে আরতিওমের সঙ্গে দেখা করে তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাড়িগুলো দেখে, পারলেই তার কাজে সাহায্য করে।

ফ্রসিয়া চলে যাবার পর থেকে [illegible] [illegible] [illegible] লাগে।

হাসিখুশি আর আমুদে এই মেয়েটা চলে যাবার পরে পাভেল আরও বেশি করে অনুভব করেছে ফ্রসিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বটা তার কী জিনিস ছিল। আজকাল সকালে বাসন-ধোবার ঘরটায় এসে পাভেল সেখানে উদ্বাস্তু মেয়েগুলির তীক্ষ্ন গলার ঝগড়া শোনে আর একটা একাকিত্ব আর শূন্যতার বোধ তাকে কুরে কুরে খায়।

একদিন রাত্রে, কাজে যখন চাপ কম, বয়লারে কাঠ দিতে দিতে খোলা চুল্লিটার সামনে পাভেল উবু হয়ে বসে আছে শিখাগুলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে—তখন আপনা থেকেই ফ্রসিয়ার কথা এসে গেল পাভেলের মনে; কিছুদিন আগে দেখা একটা দৃশ্য ভেসে উঠল তার মনের পটে।

শনিবার রাত্রে কাজের বিরতির সময়টুকুতে পাভেল রান্নাঘরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে নামছে, এমন সময় কৌতূহলী হয়ে সে জালানি কাঠের একটা স্তূপ বেয়ে উঠে নিচ তলার ভাঁড়ারঘরটার দিকে তাকাল যেখানে জুয়াড়ীরা সাধারণত জড়ো হয়।

তখন পুরোদমে খেলা চলেছে। জালিভানভ তখন বাজি জিতছে, উত্তেজনায় তার মুখ লাল।

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘুরে তাকিয়ে প্রশকাকে দেখে পাভেল সিঁড়ির নিচে সেঁধিয়ে গেল যতক্ষণ না লোকটা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। সিঁড়ির নিচে অন্ধকার, তাই প্রশকা তাকে দেখতে পেল না। সে যখন সিঁড়ির বাঁকটা ঘুরছে তখন পাভেল তার চওড়া পিঠ আর বিরাট মাথাটা দেখতে পেল।

ঠিক সেই সময়ে কে যেন হাল্‌কা পায়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওয়েটারটার পিছু পিছু। একটা পরিচিত গলার ডাক শুনতে পেল পাভেল, 'দাঁড়াও, প্রশকা!'

প্রশকা থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ওপর-মুখো তাকাল।

'কি চাই?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

পায়ের শব্দটা নেমে আসতেই ফ্রসিয়াকে দেখা গেল।

ওয়েটারটার হাত চেপে ধরল সে। ভাঙা আর রুদ্ধস্বরে বলল, 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ তোমায় যে টাকাটা দিয়েছে, সেটা কই, প্রশকা?'

হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রশকা বলল, 'কিসের টাকা? তোমাকে তো দিয়েছি টাকা, নাকি দিই নি?' তীক্ষ্ম আর ভয়ঙ্কর তার গলার স্বর।

'কিন্তু ও তো তোমাকে তিন-শো রুবল দিয়েছিল,' চাপা-কান্নায় ভেঙে পড়ল ফ্রসিয়ার গলা।

'তাই নাকি? তিন-শো!' নাক সিটকে বিদ্রূপ করল প্রশকা, 'সবটাই পেতে চাও, অ্যাঁ? ডিশ্‌-ধোনেওয়ালীর পক্ষে বড্ড বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে না-কি, সুন্দরী? ওই পঞ্চাশ যা দিয়েছি, তাই প্রচুর। তোমার চেয়ে ঢের ভালো দেখতে—এমন কি লেখাপড়া-জানা মেয়েরাও—অতো পায় না। যা পেয়েছ তাতেই তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত—এক রাত্তিরের জন্যে পুরো পঞ্চাশ রুবল তো খাসা! আচ্ছা, আরও দশ দিচ্ছি—যাক্ গে, না হয় কুড়িই হল, ব্যস! বোকা না হও তো এমনি আরও রোজগার করতে পারবে। আমি সাহায্য করব।' বলেই প্রশকা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল রান্নাঘরটায়।

'বদমাইশ! শুয়োর!' চিৎকার করে উঠল ফ্রসিয়া তার উদ্দেশে। কাঠের স্তূপে ঠেস দিয়ে জ্বালাধরা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কাঠের পাঁজার ওপরে ফ্রসিয়া পাগলের মতো মাথা ঠুকছে—সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে দেখতে পাভেল যে কী আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু নিজেকে দেখতে দেয় নি পাভেল। শুধু তার

আঙুলগুলো কেঁপে কেঁপে চেপে চেপে ধরেছিল সিঁড়ির পাশের লোহার শিকগুলো।

'ওরা তাহলে ফ্রসিয়াকেও বেচেছে জাহান্নমে যাক ওরা! ফ্রসিয়া, ফ্রসিয়া...'

প্রশকার প্রতি ঘৃণা আরও বেশি জ্বালা ধরিয়ে দিল পাভেলের মনে। চতুর্দিকের সব কিছু অত্যন্ত ঘৃণ্য আর ন্যক্কারজনক। 'আমার গায়ে তেমন জোর থাকলে মেরে খুন করতাম শয়তানটাকে! আহা, আরতিওমের মতো লম্বা-চওড়া আর জোয়ান হতাম যদি!'

বয়লারের নিচে আগুনের শিখা জ্বলে উঠে মিইয়ে এল, তাদের লাল জিভগুলো কেঁপে কেঁপে পরস্পরের গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে লম্বা আর নীলচে একটা সর্পিল আকার নিতে থাকল। পাভেলের মনে হল যেন কোন ক্ষুদে শয়তানের বাচ্চা তার দিকে জিভ বের করে ভেংচি কেটে বিদ্রূপ করছে।

নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে ঘরটা—শুধু আগুনে কাঠ ফাটার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে আর কলটার মুখে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় একটা মাপা সময়ের ব্যবধানে।

চক্‌চকে করে মাজা শেষ পাত্রটা ক্লিমকা তাকের ওপর রেখে হাত মুছল। আর কেউ নেই রান্নাঘরে। এই সময়টায় যে-বাবুর্চির হাজিরা রাখার কথা, সে আর তার সহকারী মেয়েরা পোশাক রাখার ঘরটায় ঘুমুচ্ছে। রাত্রির তিন ঘণ্টার শান্তি নেমেছে রান্নাঘরটায়। এই সময়টুকু ক্লিমকা রোজ ওপরতলায় পাভেলের সঙ্গে কাটায়। রান্নাঘরের ফাইফরমাস-খাটা এই কিশোরটির সঙ্গে কালো-চোখ ওই বয়লার-বর্‌দার ছেলেটির একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ওপরে এসে ক্লিমকা দেখে, মুখ-খোলা চুল্লিটার সামনে উবু হয়ে বসে আছে পাভেল। দেয়ালের গায়ে তার পরিচিত ঝাঁকড়া-চুলো দেহের ছায়াটা

পড়তে দেখে পাভেল তার দিকে না ফিরেই বলল, 'বোস্, ক্লিমকা।'

ছেলেটি কাঠের পাঁজার উপর উঠে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে নির্বাক পাভেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেসে বলল ক্লিমকা, 'কপালের লিখন পড়ছিস্ বুঝি আগুনে?'

আগুন-শিখার হিস্‌হিসে জিভগুলোর দিকে আটকে-যাওয়া দৃষ্টি ছিনিয়ে এনে ক্লিমকার দিকে তাকাল পাভেল—বড়ো বড়ো চক্‌চকে তার চোখ দুটোয় উপছে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনা। ক্লিমকা তার বন্ধুকে এত বিষণ্ণ দেখে নি আর কোন দিন।

'কি হয়েছে তোর আজ, পাভেল?' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল সে, 'ঘটেছে নাকি কিছু?'

পাভেল উঠে এসে ক্লিমকার পাশে বসল। নিচু গলায় বলল, 'ঘটে নি কিছু। কিন্তু এখানে আমার পক্ষে টেকা খুব কঠিন, ক্লিমকা।' হাঁটুর ওপরে রাখা তার হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল।

'কী হয়েছে আজ তোর?' কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে পীড়াপীড়ি করতে লাগল ক্লিমকা।

'আজই শুধু? এ কাজে ঢোকার পর থেকে বরাবরই আমার এই রকম লাগছে। কী জায়গা! আমরা ঘোড়ার মতো খাটি, আর ভালো কথার বদলে পাই ঘুষি—যে-কেউ ধরে তোকে মার লাগাতে পারে, কিন্তু তোর হয়ে কথাটি বলার কেউ নেই। মালিকরা আমাদের নেয় তাদের কাজ করে দেবার জন্যে, কিন্তু গায়ে যার জোর আছে তারই অধিকার আছে আমাদের ধরে পেটাবার। ছুটোছুটি করে মরে গেলেও সবাইকে খুশি করা যাবে না কিছুতেই, আর যাদের খুশি করতে পারবে

না, তাদের হাতে মার খেতেই হবে সব সময়। যাতে কেউ তোমার কাজে খংত ধরতে না পারে তার জন্যে যতোই চেষ্টা করো না কেন, সবাইকে তো সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। আর, একজনের বেলায় দেরি হলেই গর্দানের ওপর এসে পড়বে একটি ঘুষি...'

'চেঁচাস্ নে অমন করে,' ভয় পেয়ে বাধা দিল ক্লিমকা, 'কেউ এসে পড়লে শুনে ফেলবে।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পাভেল।

'শুনুক গে, আমি ছেড়ে তো দেবই কাজটা। এখানে আটকে থাকার চেয়ে বরং রাস্তায় বরফ সাফ্ করব সেও ভালো... যত সব জোচ্চোরের আস্তানা! কী টাকাটা করেছে এরা একবার দেখ্! আমাদের সঙ্গে তো এমন ব্যবহার করে যেন আমরা নেহাতই নোংরা জিনিস, আর মেয়েগুলোকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে। যারা ভালো মেয়ে তারা যদি এদের খুশিমতো না চলে, তাহলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেয় আর তাদের জায়গায় কাজে নেয় উপোসী উদ্বাস্তু মেয়েদের যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এ ধরনের মেয়েরা যা-হোক করে থেকে যায়, কারণ এখানে অন্তত তারা দুটো খেতে পায় আর এদের অবস্থা এতোই খারাপ যে এরা একটুকরো রুটির জন্যে সব কিছুই করতে পারে।'

এমন ক্রোধের সঙ্গে পাভেল কথাগুলি বলে গেল যে ক্লিমকা তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল—পাছে কেউ কথাগুলো শুনে ফেলে এই ভয়ে। আর পাভেল তার মনে ছাপিয়ে ওঠা সমস্ত তিক্ততা ঢেলে দিয়ে বলে চলল।

'আর ক্লিমকা, তুই তো সমস্ত মার পড়ে পড়ে পিঠ পেতে নিস। কখনো মুখ খুলিস নে কেন?'

টেবিলের কাছে একটা টুলের ওপর বসে পড়ল পাভেল,

হাতের তেলোয় মাথাটা রাখল ক্লান্তভাবে। আগুনে কিছু কাঠ গুঁজে দিয়ে ক্লিমকাও বসল টেবিলটার পাশে।

'আজ পড়বি না?' জিজ্ঞেস করল সে পাভেলকে।

'পড়বার কিছু নেই,' বলল পাভেল, 'বইয়ের দোকানটা বন্ধ।'

'আজকে বন্ধ কেন?' একটু অবাক হল ক্লিমকা।

'পুলিস ধরে নিয়ে গেছে বইওয়ালাকে। কি যেন পেয়েছে তার কাছে।' বলল পাভেল।

'ধরে নিয়ে গেছে? কেন?'

'লোকে তো বলছে রাজনীতি করার জন্যে।'

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে ক্লিমকা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে। 'রাজনীতি? সে আবার কী?'

কাঁধ কুঁচকে পাভেল বলল, 'কী তা শয়তানই জানে! লোকে তো বলে, জারের বিরুদ্ধে গেলেই নাকি রাজনীতি করা হয়।'

চমকে গেল ক্লিমকা, 'সে রকম কোন কাজও করে নাকি লোকে?'

'কি জানি,' বলল পাভেল।

দরজাটা খুলে গেল, বাসন-ধোবার ঘরে ঢুকল গ্লাশা, ঘুম পেয়ে তার চোখ দুটো ফোলা-ফোলা।

'ঘুমোস্ নি কেন তোরা দুটি? ট্রেনটা আসার আগে ঘণ্টাখানেক তো ঘুমিয়ে নেবার সময় আছে। একটু বরং জিরিয়ে নে পাভেল। আমি ততক্ষণ বয়লারটা দেখব এখন।'

পাভেল যা ভেবেছিল তার আগেই তাকে চাকরিটা ছাড়তে হল। আর এমন ভাবে যে ছাড়তে হবে তাও সে ভাবে নি।

একদিন বরফ-ঝরা জানুয়ারির সকালে পাভেল তার কাজের শিফ্ট্ শেষ করে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হয়ে ছিল, দেখল যে-ছেলেটি এসে তার কাজের ভার নেবে সে তখনও আসে

নি। মালিকের গিন্নির কাছে গিয়ে পাভেল জানাল, সেই ছেলেটি আসুক বা না আসুক, সে চলে যাচ্ছে, কিন্তু গিন্নি শুনবে না সে কথা। কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর উপায় রইল না—যদিও পুরো একটা দিন-রাত্রির কাজের শেষে সে একেবারে শ্রান্ত। সন্ধ্যের দিকে পাভেল যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়। রাত্রিতে কাজের অবসর সময়টুকুতে তার বয়লারগুলো ভর্তি করে রাখার কথা—যাতে তিনটের ট্রেন আসার সময়ে সেগুলো ফুটন্ত অবস্থায় এসে যায়।

কলের মুখটা খুলে দিল পাভেল, কিন্তু জল নেই; বোঝা গেল পাম্প্ চলছে না। কলের মুখটা খোলা রেখে কাঠের ঢিবির ওপর সে শুলো একটু; কিন্তু ক্লান্তির কাছে হার মানতে হল—অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল।

কয়েক মিনিট পরেই কলের মুখে হিস্‌হিস্ শব্দে জল এসে গেল, কুল্‌কুল্ শব্দে জল পড়তে লাগল বয়লারটায়, ভর্তি হয়ে উপছে উঠে জল ছড়িয়ে পড়ল বাসন-ধোবার ঘরের টালি-লাগানো মেঝেটায়—এই ঘরটা তখন ফাঁকা ছিল। জল ঝরে পড়তে পড়তে গোটা ঘরের মেঝেটা ভর্তি হয়ে উপ্‌ছে উঠে দরজাটার ফাঁক দিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতরে এসে পড়ল। ঘুমে ঝিমন্ত ট্রেন-যাত্রীদের প্যাঁটরা-থলি-পুঁটুলির নিচে জল জমে উঠল। কিন্তু মেঝের ওপর শুয়ে থাকা একজন যাত্রীর গায়ে জল না লাগা পর্যন্ত কেউ তা লক্ষ্য করে নি। চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল লোকটি। এবার ছোটাছুটি পড়ে গেল জিনিসপত্রগুলো সাম্‌লাবার জন্যে, শুরু হয়ে গেল দারুণ হৈ-হল্লা।

আর, জল ঝরে পড়তেই থাকল সমস্তক্ষণ।

দু-নম্বর হল-ঘরটায় প্রশকা টেবিলগুলো পরিষ্কার করছিল।

গন্ডগোল শুনে ছুটে এল সে। জল-জমে-ওঠা জায়গাগুলো লাফিয়ে পার হয়ে দরজাটার ওপর পড়ে প্রচন্ড ধাক্কায় খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে, সেই দরজায় আটকে রাখা ভেতরে জমে-ওঠা জলের রাশি ধারাবেগে এসে পড়ল হল-ঘরে।

শুরু হয়ে গেল আরও বেশি চেঁচামেচি। ডিউটিরত ওয়েটাররা ছুটে এল বাসন-ধোবার ঘরটায়। প্রশকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত পাভেলের ওপর।

ঘুষির ওপর ঘুষি এসে পড়ল ছেলেটার মাথায়, অভিভূত করে দিল তাকে।

তখনও আধা-ঘুমন্ত পাভেল, বুঝতেই পারে নি কী ঘটল ব্যাপারটা। চোখের সামনে ধাঁধাঁ লাগানো কতকগুলো বিদ্যুতের চমক আর সমস্ত দেহে নিদারুণ যন্ত্রণার খোঁচা—শুধু এইটুকুর চেতনা তার ছিল।

এতো প্রচন্ড মার খেয়েছে পাভেল যে সে কোনরকমে নিজেকে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে।

সকাল বেলায় ভ্রূকুটি-গম্ভীর মুখে আরতিওম তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল।

সবই বলল পাভেল।

'কে মেরেছিল তোকে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল আরতিওম।

'প্রশকা।'

'ঠিক আছে। এখন শুয়ে থাক্ চুপ করে।'

আর কোন কথা না বলে আরতিওম বেরিয়ে গেল তার কোর্তাটা পরে নিয়ে।

ডিশ্-ধোওয়া মেয়েদের একজনকে সে জিজ্ঞেস করল এসে, 'ওয়েটার প্রখোরকে কোথায় পেতে পারি?'

বাসন-ধোবার ঘরে এসে-যাওয়া মজুরের পোশাক-পরা অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়ে গ্লাশা বলল, 'এখুনি সে এসে যাবে এখানে।'

দরজার চৌকাঠে তার বিরাট দেহের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইল মজুরটি, 'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।'

একটা বারকোশের ওপর ডিশের পাহাড় নিয়ে দরজাটা পায়ের ধাক্কায় খুলে প্রখোর বাসন-ধোবার ঘরটায় ঢুকল।

মাথা নেড়ে গ্লাশা বলল, 'এই যে সে।'

এক পা এগিয়ে এসে প্রখোরের কাঁধে ভারি হাত একখানা রেখে আরতিওম সোজা তার চোখে চোখ রাখল।

'আমার ভাই পাভকাকে মেরেছ কেন?'

ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল প্রখোর, কিন্তু প্রচন্ড একটা ঘুষি খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর; উঠবার চেষ্টা করতেই আরও ভীষণ আরেকটা ঘুষি তাকে যেন গেঁথে দিল মেঝের সঙ্গে।

আতঙ্কগ্রস্ত ডিশ্-ধোওয়া মেয়েরা ছুটোছুটি আরম্ভ করল চারদিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আরতিওম বেরিয়ে এল।

চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল প্রশকা মেঝের ওপর, থেঁৎলে-যাওয়া মুখখানা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সেদিন সন্ধ্যেয় ডিপো থেকে বাড়ি ফিরল না আরতিওম। মা জানতে পারল, তাকে পুলিসে আটকেছে।

ছ'দিন পরে গভীর রাত্রে ফিরে এল আরতিওম — মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাভেল উঠে বসেছিল বিছানায়, তাকে আরতিওম কোমল গলায় বলল, 'আগের চেয়ে ভাল মনে হচ্ছে তো?' পাভেলের পাশে বসে আরতিওম বলল, 'আরও খারাপের দিকে যেতে পারত।' তারপরে এক মুহূর্ত চুপ

করে থেকে সে বলল, 'যাক্ গে, তুই বিদ্যুৎ-স্টেশনে কাজ করবি। আমি ওদের বলে রেখেছি তোর কথা। সত্যিকারের একটা কাজ শিখ্‌বি তুই ওখানে।'

আরতিওমের বলিষ্ঠ হাতখানা পাভেল দু-হাতে চেপে ধরল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো সেই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ল এই ছোট্ট শহরটায়: 'জারকে উৎখাত করা হয়েছে!'

শহরের লোকে বিশ্বাস করতে চাইল না কথাটা।

তারপরে শীতের একদিন ঝড়ের মধ্যে গুঁড়ি মেরে একটা ট্রেন এসে থামল স্টেশনে আর তার ভেতর থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল দু-জন ছাত্র—তাদের পরনে সামরিক ওভারকোট, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল, সঙ্গে একদল বিপ্লবী সৈন্য, তাদের বাহুতে লাল ফিতে বাঁধা। তারা স্টেশনের পুলিসদের, একজন বৃদ্ধ কর্নেলকে আর শহরে মোতায়েন সৈন্যদলের কর্তাকে গ্রেপ্তার করল। এবারে খবরটায় বিশ্বাস হল শহরবাসীদের। হাজারে হাজারে তারা বরফ-ঢাকা রাস্তা বেয়ে এসে জমা হল শহরের ময়দানে।

আগে যে-সব কথা তারা কখনও শোনে নি সেই সব কথা তারা সাগ্রহে শুনল: স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব।

কয়েকটা উদ্দাম দিন কেটে গেল — উত্তেজনা আর আনন্দে ভরা দিন। তারপরে একটা ঝিমিয়ে পড়া ভাব এসে গেল। শুধু যেখানে মেনশেভিকরা আর বুন্দপন্থীরা এসে ঘাঁটি গেড়েছিল, সেই টাউন-হলের মাথায় উড়ন্ত লাল নিশানটা পরিবর্তনটুকু মনে করিয়ে দিতে লাগল। আর সব কিছুই যেমনটি ছিল তেমনিই থাকল।

শীতের শেষ দিকে অশ্বারোহী গার্ডের একটা রেজিমেণ্টকে শহরে মোতায়েন করা হল। সকাল বেলায় তারা দলে দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ত রেল-স্টেশনের দিকে — যারা দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে লুকিয়ে ফিরছে তাদের খুঁজে বের করার জন্যে।

এই সৈন্যরা সব বিরাট-দেহ, মেদবহুল লোক, মুখ দেখে বোঝা যায় এরা ভাল খায়-দায়। এদের অফিসারদের বেশির ভাগই রাজারাজড়া-জমিদার। কাঁধে তাদের সোনালি পট্টি আর পায়ে রুপোর কাজ, ঠিক জারের সময়ে যেমনটি ছিল — যেন কোন বিপ্লবই হয় নি।

১৯১৭ সাল কাটতে থাকল। পাভেল, ক্লিমকা আর সের্গেই ব্রুঝাক্-এর পক্ষে কিছুই অদলবদল হল না। ওপরওয়ালারা ঠিকই আগেকার মতো রইল। শেষে নভেম্বর থেকে অসাধারণ কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে থাকল। নতুন ধরনের একদল লোক দেখা দিল স্টেশনে, তারা কিছু কিছু তৎপরতা লাগিয়ে দিল, এদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকল, — তাদের একটা বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে সামনের সারির লোক। 'বলশেভিক' — এই অদ্ভুত নামে তাদের পরিচয়।

কেউ জানে না কোথা থেকে এই ধ্বনিমুখর আর ভারি কথাটা এসেছে।

গার্ড-ফৌজের লোকদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে-আসা সৈন্যদের আটকানোটা ক্রমশই বেশি করে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। রাইফেলের দুম্‌দাম্ আর কাচ ভেঙে পড়ার ঝন্‌ঝনানি স্টেশন থেকে ক্রমশই বেশি করে শোনা যেতে লাগল। ফ্রণ্ট থেকে দল বেঁধে লোক আসছে আর আটক করতে গেলেই তারাও বেয়নেট নিয়ে লড়ছে। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তারা আসতে লাগল ট্রেন-বোঝাই হয়ে।

গার্ড-সৈন্যেরা তোড়জোড় করে স্টেশনে আসে ফ্রণ্ট-ফিরতি সৈন্যদের রুখবার জন্যে, কিন্তু মেশিনগানের গুলিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রেলগাড়ির কামরা থেকে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে নামে, মরা তাদের গা-সহা।

ধূসর কোট-পরা ফ্রণ্টের লোক গার্ড-ফৌজকে তাড়িয়ে দিল শহরের মধ্যে। তারপরে ফিরে এল স্টেশনে, যে যার গন্তব্যের দিকে রওনা হল ট্রেনের পর ট্রেন ভর্তি হয়ে।

১৯১৮-এর বসন্তকালে একদিন তিনটি কিশোর বন্ধু সেগেই ব্রুঝাকদের বাড়ি থেকে তাস খেলে ফিরবার পথে করচাগিনদের বাগানে ঢুকে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বড় একঘেয়ে লাগছে তাদের। সাধারণত তারা সময় কাটানোর জন্যে যা যা করে, তার সবই নিরস হয়ে উঠেছিল। তাই দিন কাটানোর জন্যে নতুন ধরনের কোন উপায়ের সন্ধানে যখন তারা ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। রাস্তা বেয়ে একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। রাস্তা আর বাগানের নিচু বেড়ার মাঝখানকার খানাটাকে এক লাফে পার হয়ে এল ঘোড়াটা। পাভেল আর ক্লিমকার দিকে চাবুকটা নেড়ে সওয়ারটি বলল, 'এই খোকারা, এদিকে এসো তো একটু!'

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল পাভেল আর ক্লিমকা বেড়াটার কাছে। ধুলোয় ভরে গেছে ঘোড়সওয়ারের শরীর। মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া তার টুপির ওপরে, খাকি কোর্তায় আর ব্রিচিজে ধূসর ধুলোর পুরু স্তর জমেছে। তার ভারি ফৌজী কোমরবন্ধনীটায় ঝুলছে একটা রিভলভার আর দুটো জার্মান হাত-বোমা।

'একটু খাবার জল জোগাড় করে দিতে পার, খোকারা?'

জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার। পাভেল বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল জল আনবার জন্যে। সের্গেই ঘোড়সওয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তারদিকে ফিরে ঘোড়সওয়ার বলল, 'তোমাদের শহরে এখন কোন সরকার আছে বলো দেখি খোকা?'

এক নিঃশ্বাসে সের্গেই সমস্ত স্থানীয় খবর বলে গেল এই আগন্তুকটিকে, 'দু-সপ্তাহ ধরে এখানে কোন সরকার নেই। নিজেরাই নিজেদেরই এখন রক্ষা করি। বাসিন্দারা সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে পালা করে রাত্রে ঘুরে ঘুরে শহর পাহারা দেয়। আচ্ছা, আপনি কে?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল সের্গেই।

হাসল ঘোড়সওয়ারটি, 'বেশি জেনে ফেললে আবার তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে, জানো তো?'

বেরিয়ে এল পাভেল এক-মগ জল নিয়ে। তৃষ্ণার্ত ভঙ্গিতে ঘোড়সওয়ার এক চুমুকে মগটা খালি করে ফিরিয়ে দিল পাভেলকে। তারপর ঘোড়ার রাশে ঝাঁকুনি দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল পাইন বনের দিকে।

'কে লোকটা?' পাভেল জিজ্ঞেস করল ক্লিমকাকে।

ঘাড় কুঁচকে সে বলল, 'কি করে জানব?'

'মনে হচ্ছে কর্তৃত্বের বদল হবে ফের। সেইজন্যেই তো লেশ্চিনস্কিরা কাল শহর ছেড়ে গেছে। বড়লোকরা পালাচ্ছে, তার মানেই পার্টিজানরা আসছে।' রাজনীতিক প্রশ্নটাকে দৃঢ়ভাবে ফয়সালা করে দিয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্ত দেবার ভঙ্গিতে বলল সের্গেই।

তার কথার যুক্তিটা এতই নিশ্চিত রকমের প্রমাণ-নির্ভর যে পাভেল আর ক্লিমকা তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একমত হল।

এরা কথাটার আলোচনা শেষ করার আগেই বড় রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। তিনজনেই ছুটে ফিরে এল বেড়াটার কাছে।

প্রধান বনপরিদর্শকের বাড়িটা গাছের ফাঁকে কোনক্রমে দেখতে পাওয়া যায়। সেই বাড়িটার পাশ কাটিয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়ি-ঘোড়া আর লোকজন, আর বড় রাস্তার ওপরে আড়াআড়ি রাইফেল ঝোলানো আরও জন-পনেরো ঘোড়সওয়ার। তাদের সামনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে একজন বয়স্ক লোক, গায়ে খাকি কোর্তা, অফিসারের কোমরবন্ধনী আর বুকের ওপর ঝোলানো সামরিক দূরবীন, আর যার সঙ্গে এই ছেলেরা এইমাত্র কথা বলেছে সেই লোকটি তার পাশে। বয়স্ক লোকটির বুকের ওপর একটা লাল ফিতে পরানো।

'কী বলেছিলাম তখন?' পাভেলের পাঁজরায় কনুয়ের ঠেলা দিয়ে বলল সের্গেই, 'দেখেছিস লাল ফিতেটা? পার্টিজান ওরা! না হয় তো কি বলেছি...' আর আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল সে। বাকি দু'জন তাকে অনুসরণ করল আর সবাই মিলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এগিয়ে-আসা ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সওয়াররা যখন বেশ কাছাকাছি এসে গেছে, তখন তাদের সেই চেনা লোকটি ওদের দিকে মাথা নেড়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে লেশ্চিনস্কিদের বাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কে থাকে?'

সওয়ারের পাশাপাশি থাকার চেষ্টায় পাভেল ছুটতে ছুটতে বলল, 'উকিল লেশ্চিনস্কি। কাল পালিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আপনাদের ভয়ে...'

'কী করে জানলে আমরা কে?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল বয়স্ক লোকটি।

'ওই তো, ওটা কী?' লাল ফিতেটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল পাভেল, 'সবাই বলতে পারে...'

লোকজন বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল শহরে ঢোকা এই ফৌজীদলটার দিকে। এই তিনটি কিশোর-বন্ধুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ধুলো-মাখা ক্লান্ত লাল-রক্ষী দলটাকে এগিয়ে যেতে দেখল।

তারপরে যখন রাস্তার খোয়া-নুড়ির ওপর দিয়ে সৈন্যদলটির একমাত্র কামান আর মেশিনগান বয়ে-নিয়ে-যাওয়া গাড়িগুলো শব্দ তুলে চলে গেল, ছেলেরা তখন পার্টিজানদের পিছু ধরল। দলটি যতক্ষণ পর্যন্ত না শহরের মাঝখানটায় এসে থেমে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কেউ বাড়ি ফিরল না।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় লেশ্চিনস্কিদের প্রশস্ত বসার ঘরে ভারি আর পায়া-খোদাই-করা প্রকাণ্ড টেবিলের চারধারে চার জন লোক বসেছিল: সৈন্যদলের অধিনায়ক কমরেড বুলগাকভ — বয়স্ক, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, এবং দলের অন্য তিনজন কম্যাণ্ডার।

এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর দিয়ে আঙুল চালনা করছিলেন বুলগাকভ।

‘কমরেড ইয়েরমাচেঙ্কো, তুমি বলছ, আমাদের এই জায়গাটায় একটা লড়াইয়ের ঘাঁটি গাড়া উচিত,’ উঁচু চোয়াল আর বড় বড় দাঁতওয়ালা যে লোকটি সামনে বসেছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন বুলগাকভ, ‘কিন্তু আমার তো মনে হয়, সকালেই আমাদের রওনা দেওয়া দরকার। আরও ভাল হত যদি রাত্রেই চলা শুরু করা যেত, কিন্তু আমাদের সৈন্যদের খানিকটা বিশ্রাম দরকার। কাজাতিন-এ জার্মানরা আসার আগেই সেখানে সরে আসাটা হচ্ছে আমাদের কাজ। আমাদের যা সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে শত্রুকে রুখতে যাওয়াটা হাস্যকর হবে। একটা কামান আর ত্রিশ রাউণ্ড গোলা, দু’শো পদাতিক সৈন্য আর

ষাটজন ঘোড়সওয়ার। জার্মানরা যখন ইস্পাতের বন্যার মতো এগিয়ে আসছে, তখন এটাকে খুব একটা জোরদার সামরিক শক্তি নিশ্চয়ই বলা চলে না। অন্য সব হঠে-আসা লাল দলগুলির সঙ্গে যোগ দিতে না পারা পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না। তাছাড়া, কমরেড, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জার্মানরা ছাড়াও আমাদের পথে অসংখ্য প্রতিবিপ্লবী ফৌজীদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি, সকালে প্রথমে স্টেশনের ওধারে রেল-সাঁকোটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা সরে যাব। ওটা মেরামত করে নিতে জার্মানদের দু'-তিন দিন লাগবে। ইতিমধ্যে রেলপথ ধরে তাদের এগিয়ে আসাটা আটকে থাকবে। কী বল তোমরা, কমরেড? আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে...' টেবিলের চারপাশে তিনি অন্যান্যের দিকে তাকালেন।

বুলগাকভের কোনাকুনি উল্টোদিকে বসেছিল স্ত্রুঝ্‌কভ। ঠোঁট চিবিয়ে সে প্রথমে ম্যাপটার দিকে, তারপরে বুলগাকভের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'আমি বুলগাকভের সঙ্গে একমত।'

এদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়সী, মজুরের কোর্তা-পরা লোকটিও মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল, 'বুলগাকভ ঠিক বলেছেন।'

কিন্তু ইয়েরমাচেঙ্কো — যে কয়েক ঘণ্টা আগে পাভেলদের সঙ্গে কথা কয়েছিল — সে মাথা নাড়ল, 'তাহলে আমরা এই সৈন্যদলটাকে জড়ো করতে গিয়েছিলাম কিসের জন্যে? লড়াই না করেই জার্মানদের সামনে থেকে সরে আসার জন্যে? আমি যতদূর বুঝেছি, এইখানেই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। পিছু হট্‌তে হট্‌তে তো একেবারে হদ্দ হয়ে গেছি। আমার ওপরে যদি ভার থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানেই ওদের সঙ্গে লড়তাম...' চেয়ারটা পেছন দিকে

সজোরে ঠেলে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করল।
কথাটায় সায় না দিয়ে বুলগাকভ তাকালেন তার দিকে, 'আমাদের মাথা খাটাতে হবে, ইয়েরমাচেঙ্কো। যে-লড়াইয়ে আমরা মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য, সে রকম কোন লড়াইয়ের মধ্যে সৈনিকদের ঠেলে দিতে পারি না আমরা। তাছাড়া, হাস্যকর ব্যাপার হবে সেটা। আমাদের ঠিক পেছনেই রয়েছে ভারি কামান আর সাঁজোয়া-গাড়িতে সুসজ্জিত একটা পুরো ডিভিশন... ইস্কুলের ছেলেদের মতো বাহাদুরি করার সময় এটা নয়, কমরেড ইয়েরমাচেঙ্কো।' অন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'তাহলে তাই ঠিক হল, আমরা কাল সকালে এখান থেকে সরে যাচ্ছি...'
'আচ্ছা, এখন পরের প্রশ্নটায় আসা যাক — যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারটা কি করা যায়,' বলে যেতে লাগলেন বুলগাকভ, 'আমরাই শেষ দল যারা জায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছি, সুতরাং জার্মান সৈন্যসারির পেছনে কাজ চালানোটাকে সংগঠিত করা আমাদেরই কাজ। মস্তবড়ো একটা রেল-জংশন এটা, দুটো স্টেশন আছে শহরটায়। রেলপথে কাজ চালাবার জন্যে একজন নির্ভরযোগ্য কমরেড যাতে থাকেন সে-ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। কাজটা চালিয়ে যাবার জন্যে এখানে কাকে রেখে যাওয়া যায় সেটা আমাদের এখনই ঠিক করতে হবে। তোমাদের মনে আসছে কারুর কথা?'
ইয়েরমাচেঙ্কো টেবিলটার দিকে আসতে আসতে বলল, 'আমার মনে হয়, নৌবাহিনীর ফিওদর ঝুখ্‌রাই-এর এখানে থাকা উচিত। প্রথমত, সে স্থানীয় লোক। দ্বিতীয়ত, সে ফিটার মিস্ত্রি, স্টেশনে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে একটা। আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে কেউ তাকে দেখে নি — আজ রাত্রের আগে সে এখানে আসছে না। কাঁধের ওপর মাথাটা তার দিব্যি

খোলসা, সে ঠিকমতো কাজ চালিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, সে এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।'

মাথা নাড়লেন বুলগাকভ, 'ঠিক। আমি তোমার সঙ্গে একমত। কোন আপত্তি নেই তো অন্য কমরেডদের?' অন্যদের দিকে তাকালেন তিনি, 'কোন আপত্তি নেই তাহলে। আচ্ছা, তাহলে এ ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে গেল। ঝুখ্রাই-এর কাজের জন্যে লাগতে পারে এমন কিছু টাকা আর পরিচয়পত্র আমরা তার কাছে দিয়ে যাব... আচ্ছা, এবারে তাহলে তৃতীয় আর শেষ আলোচনাটা। এই শহরে জমা করে রাখা অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে। কুড়ি হাজার রাইফেলের বেশ বড়ো রকম একটা স্তূপ জমা আছে এই শহরে জারের সময়কার যুদ্ধের আমল থেকে— সবাই ভুলে গেছে ব্যাপারটা। এক চাষীর চালাঘরে পাঁজা হয়ে আছে। খবরটা জানলাম সেই চালার মালিকের কাছ থেকে, সে তো ওগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ব্যস্ত। আমরা তো ওগুলো জার্মানদের জন্যে ফেলে যেতে পারি না। আমার মতে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত, এবং সেটা এখনই, যাতে সকালের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে যায়। শুধু একটা মুশকিল আছে — আশেপাশের কুঁড়ে ঘরগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটা হল শহরের বাইরের সীমানায় যেখানে গরিব চাষীরা থাকে।'

স্ত্রুঝ্কভ নড়েচড়ে বসল তার চেয়ারে। গড়নটা তার বলিষ্ঠ, তার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেশ কয়েকদিন ক্ষুরের স্পর্শ পায় নি। 'পোড়াবো কেন রাইফেলগুলো? তার চেয়ে শহরের লোকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়াই তো ভালো।'

বুলগাকভ তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন তার দিকে, 'বিলি করে দিতে বলছ?'

'চমৎকার প্রস্তাব!' উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল ইয়েরমাচেঙ্কো।

'মজ্বরদের, আর অন্য যারা চায়, তাদের দিয়ে দাও ওগ্বলো। জার্মানরা যখন জীবন দ্বর্বিষহ করে তুলবে, তখন পাল্টা মার দেবার মতো অন্তত কিছ্ব একটা হাতে থাকবে। ওরা তো সবচেয়ে খারাপ অবস্থা করবেই। তারপরে যখন ব্যাপারটা বেশ পাকিয়ে উঠবে, তখন লোকে অস্ত্র-হাতে দাঁড়াতে পারবে। স্ত্রব্ঝ্কভ ঠিক বলেছে: রাইফেলগ্বলো বিলি করেই দিতে হবে। কিছ্ব রাইফেল গ্রামে নিয়ে গেলেও মন্দ হয় না। চাষীরা ল্বকিয়ে রাখবে আর জার্মানরা যখন সৈন্যদের জন্যে সব কিছ্ব নিয়ে নিতে থাকবে তখন রাইফেলগ্বলো কাজে লাগবে।'

ব্বলগাকভ হাসলেন, 'তা ঠিক। কিন্তু জার্মানরা নিশ্চয়ই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলবে, আর সবাই তখন হ্বকুম মানবে।'

'সবাই না,' আপত্তি তুলে বলল ইয়েরমাচেঙ্কো, 'কিছ্ব লোকে মানবে, কিন্তু বাকি লোকে মানবে না।'

সপ্রশ্ন চোখে ব্বলগাকভ টেবিলের চারপাশে লোকদের দিকে তাকালেন।

'আমি রাইফেলগ্বলি বিলি করে দেওয়ার পক্ষে,' অল্পবয়সী মজ্বরটি ইয়েরমাচেঙ্কো আর স্ত্রব্ঝ্কভকে সমর্থন করল।

'আচ্ছা, তাহলে তাই ঠিক হল,' মত দিলেন ব্বলগাকভ। চেয়ার থেকে উঠে বললেন, 'এখনকার মতো তাহলে এই। সকাল পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম করতে পারি। ঝুখ্রাই এলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, তার সঙ্গে কিছ্ব কথা আছে। ইয়েরমাচেঙ্কো, তুমি বরং সান্ত্রীদের পাহারার জায়গাগ্বলো একবার তদ্বির করে এসো।'

আর সবাই চলে যাবার পর ব্বলগাকভ পাশের শোবার ঘরে গিয়ে গদিটার ওপরে ওভারকোট বিছিয়ে শ্বয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে পাভেল বাড়ি ফিরছিল বিদ্যুৎ-স্টেশন থেকে। সেখানে সে আজ বছর-খানেক হল কাজ করছে — চুল্লিতে যারা কয়লা জোগান দেয় তাদের একজন সাহায্যকারী হিসেবে।

রাস্তায় পড়েই সে বুঝল চলছে একটা বিশেষকিছু। শহর জুড়ে একটা অসাধারণ উত্তেজনা। যতই এগুতে থাকে ততই বেশি বেশি লোক দেখতে পায়, প্রত্যেকের কাঁধে একটা, দুটো, কখনও তিনটে করে রাইফেল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি চলে এল সে। লেশ্চিন্স্কিদের বাগানবাড়িটার সামনে পাভেল তার আগের দিনের পরিচিত ফৌজী-লোকজনদের ঘোড়ায় চড়তে দেখতে পেল।

ছুটে বাড়ির মধ্যে গিয়ে পাভেল তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নিল। আরতিওম তখনও বাড়ি আসে নি — মার কাছ থেকে শুনেই আবার ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সের্গেই ব্রুঝাকের সঙ্গে দেখা করতে এল। সে থাকে শহরের আরেক প্রান্তে।

সের্গেইয়ের বাবা ইঞ্জিন-ড্রাইভারের একজন সাহায্যকারী। নিজের ছোট্ট বাড়ি আর এক ফালি জমি আছে। সের্গেই বাড়ি নেই। মোটাসোটা ফ্যাকাশে-মুখ তার মা পাভেলের দিকে অপ্রসন্ন চোখে তাকাল, 'শয়তান জানে গেছে কোথায়! সকালে উঠেই ছুটে বেরিয়ে গেল যেন ভূতে পেয়েছে। বলে গেল, কোথায় যেন রাইফেল বিলি করছে। ওইখানেই গেছে বলে মনে হচ্ছে। তোদের এই নাক দিয়ে জল-পড়া লড়্‌নেওয়ালাদের একচোট ধরে মার দেওয়া দরকার — একেবারেই বয়ে গেছিস তোরা। মায়ের দুধ মুখে শুকোতে না শুকোতেই একেবারে বন্দুক ধরবার জন্যে ছুটেছিস! হারামজাদাটাকে বলে দিস, এ বাড়িতে যদি একটাও কার্তুজ এনে ঢোকায় তাহলে আমি ওকে জ্যান্ত ধরে চামড়া ছাড়িয়ে

নেব। কে জানে কী এনে ঢোকাবে বাড়িতে আর আমাকে তখন তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। তুইও চলেছিস সেখানে, না কি?'

কিন্তু সের্গেই-এর মায়ের বকুনি শেষ হবার আগেই পাভেল ছুট্ লাগাল রাস্তা বেয়ে।

বড় রাস্তার ওপর দুই কাঁধে দুই রাইফেল ঝোলানো একটা লোকের সঙ্গে তার দেখা।

ছুটে গেল পাভেল তার কাছে, 'কোথায় পেলেন এগুলো, হাঁ কাকা?'

'ওই ভের্খোভিনায়।'

যত তাড়াতাড়ি পারে চলল পাভেল। দুটো রাস্তার পরেই সে ধাক্কা খেল একটি ছেলের সঙ্গে--বেয়নেট-আঁটা একটা ভারি পদাতিকবাহিনীর রাইফেল টেনে নিয়ে চলেছে ছেলেটি। পাভেল থামাল তাকে, 'কোথায় পেলে বন্দুকটা?'

'পার্টিজানরা এগুলো দিয়ে দিচ্ছিল সবাইকে--ওইখানে, ইস্কুলের সামনে। কিন্তু আর তো নেই। সব খতম। সারারাত্রি ধরে বিলি হয়েছে। এই আমার আরেকটা হল,' গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল ছেলেটি।

অত্যন্ত দমে গেল পাভেল খবরটা শুনে। 'হায়রে কপাল! সরাসরি ওখানে গেলেই পারতাম।' নিজের ওপর ভারি রাগ হল তার, 'আর তো সময় নেই!'

হঠাৎ একটা ফন্দি এসে গেল তার মাথায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'-তিন লাফে সে এগিয়ে যাওয়া ছেলেটিকে ধরে ফেলল, এক টানে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা তার হাত থেকে।

'তোমার একটাই যথেষ্ট। এটা আমার।' এমন স্বরে সে বলল কথাটা যার আর কোন প্রতিবাদ নেই।

উন্মুক্ত দিবালোকে এই রাহাজানির ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে

ছেলেটি ছুটে এল পাভেলের দিকে। কিন্তু সে একলাফে পিছিয়ে এসে বেয়নেটটা উ'চিয়ে ধরল তার প্রতিপক্ষের দিকে।

'দেখিস, নইলে জখম হবি,' চে'চিয়ে উঠল পাভেল।

প্রচণ্ড ক্ষোভে কে'দে ফেলল ছেলেটি, অসহায় ক্রোধে গাল দিতে দিতে ছুটে পালাল। নিজের ওপর ভারি খুশি হয়ে বাড়ির দিকে পা চালাল পাভেল। এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে ঢুকল চালাঘরটায়, চালার নিচে আড়কাঠের ওপর জোগাড়-করা জিনিসটিকে রেখে খুশিতে শিস্ দিতে দিতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

ইউক্রেনে গরমকালের সন্ধ্যাগুলি অতি সুন্দর—বিশেষ করে শেপেতোভ্কার মতো ছোট শহরগুলোয়, যেখানে প্রান্তসীমা গ্রামের সঙ্গেই মেলে বেশি।

এখানকার শান্ত গ্রীষ্মসন্ধ্যা সমস্ত অলপবয়সীদের টেনে আনে ঘরের বাইরে। জোড়ায় জোড়ায়, দলে দলে তাদের দেখতে পাওয়া যাবে বারান্দায়, বাড়ির সামনে ছোট ছোট বাগানগুলিতে, কিংবা রাস্তার পাশে জড়ো করা কাঠের স্তূপের ওপর বসে থাকতে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় তাদের খুশি-ভরা হাসি আর গানের প্রতিধ্বনি ওঠে।

ফুলের গন্ধে ভারি বাতাস কে'পে কে'পে যায়। আকাশের গভীরে তারাগুলি সূচীমুখের মতো সূক্ষ্ম অস্পষ্টতায় জ্বল জ্বল করে, আর দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে যায় গলার স্বর...

পাভেল অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে বড় ভালবাসে। মিষ্টি সুরে ভরা এই যন্ত্রটিকে সে কোলের ওপর সযত্নে রেখে ডবল-সারি চাবিগুলোর ওপরে আলতোভাবে আঙুলগুলি দ্রুত চালিয়ে দেয়। বেরিয়ে আসে খাদের সুরে একটা দীর্ঘশ্বাস আর এক দমক মন-নাচানো সুরঝঙ্কার...

বাজনাটির ভাঁজ-করা হাপর ক্রমান্বয়ে খুলে গিয়ে আর বন্ধ হয়ে যখন খুশির আমেজ-ভরা সুর বের করতে থাকে, তখন কি আর চুপ করে থাকা যায়! জানতে পারার আগেই পা দুটি সুরের গভীরতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার কী আনন্দ!

সেদিন সন্ধ্যেটা ছিল একটু বিশেষ আনন্দের। পাভেলদের বাড়ির বাইরে একটা কাঠের স্তূপের ওপরে ভিড় জমিয়ে তুলেছে আমুদে একদল তরুণ। এদের মধ্যে সবচেয়ে খুশিতে উচ্ছল গালোচ্‌কা—পাভেলদের পাশের বাড়ির রাজমিস্ত্রির মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে নাচতে আর গাইতে ভালো লাগে গালোচ্‌কার। তার গলার স্বর গভীর, নরম আর চড়া।

গালোচ্‌কাকে একটু ভয় ভয় করে চলে পাভেল, কারণ বড়ো মুখরা মেয়েটা। পাভেলের পাশে বসে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের হাসি হাসছিল গালোচ্‌কা।

'কী আশ্চর্য মানুষ হয়ে যাও তুমি ওই বাজনাটা বাজাবার সময়!' বলল গালোচকা, 'বড্ড ছোট তুমি—এই যা আপসোস, নইলে দিব্যি বর হতে পারতে তুমি আমার! অ্যাকর্ডিয়ন বাজানেওয়ালা ছেলেদের ভারি ভালবাসি আমি, মনটা আমার একেবারে গলে যায়।'

চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে গেল পাভেলের—ভাগ্যিস অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাই কেউ দেখতে পেল না সেটা। প্রগল্‌ভা মেয়েটির কাছ থেকে একটু সরে বসল পাভেল, কিন্তু মেয়েটি তাকে জাপটে ধরেই রইল। হাসতে হাসতে বলল, 'ওগো পালিয়ে যেও না আমায় ছেড়ে। তুমি যে আমার বড্ডো ভালোবাসার মানুষ।'

তার উন্নত বুকের স্পর্শ লাগল পাভেলের কাঁধে, কেমন যেন একটা অদ্ভুত নাড়া খেল পাভেলের মন নিজের অজ্ঞাতেই,

আর অন্য সবার উচ্চকিত হাসি উঠে পথের অভ্যস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দিল।

গালোচকার কাঁধে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে পাভেল বলল, 'সরে বোসো। বাজাবার জায়গা নেই।'

ফলে আরেক দমক হাসি, কৌতুক আর ঠাট্টার হুল্লোড় উঠল।

পাভেলের উদ্ধারে এগিয়ে এল মারুসিয়া, 'করুণ সুরের কিছু একটা বাজাও, পাভেল, মনের তারে মোচড় লাগাবার মতো একটা কিছু।'

ধীরে ধীরে ভাঁজ ছড়ানো হাপরটার চাবিগুলোকে সযত্নে আদর করে গেল পাভেলের আঙুল, আর একটা পরিচিত প্রিয় গানের সুরে ভরে উঠল বাতাস। গালোচকাই প্রথম গলা মেলাল, তারপরে মারুসিয়া, তারপরে আর সবাই:

> কুটির-কোণে বিহানবেলায়
> জুটল যত নেযে,
> বিধুর মোরা মধুর
> সেই ব্যথার গান গেয়ে...

তরুণ গাইয়েদের কেঁপে কেঁপে ওঠা কচি তাজা গলার স্বর ভেসে ভেসে গেল দূর বনপ্রান্ত পর্যন্ত।

'পাভ্‌কা!' আরতিওমের গলার ডাক।

বাজনার হাপরটা চেপে বন্ধ করে পাভেল বাঁধনগুলো আটকে দিল, 'আমাকে ডাকছে ওরা। আমি চলি।'

মারুসিয়া তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বসাবার চেষ্টা করল, 'আর একটু বাজাও না! এত তাড়া কিসের গো?'

কিন্তু বাধা মানল না পাভেল, 'পারব না। কাল আবার গান-বাজনা হবে, এখন যেতে হবে আমাকে। ডাকছে আরতিওম।' বলেই সে রাস্তাটা ছুটে পার হয়ে সামনে ছোট্ট বাড়িতে ঢুকল।

আরতিওম ছাড়া আরও দু'জন মানুষকে ঘরে দেখতে পেল

সে: রোমান—আরতিওমের এক বন্ধু, অন্যজন অপরিচিত। একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল তারা।

'ডেকেছ আমাকে?' জিজ্ঞেস করল পাভেল।

তার দিকে মাথা নেড়ে অপরিচিত মানুষটিকে বলল আরতিওম, 'এই সেই আমার ভাই, যার কথা বলছিলাম।'

অপরিচিত মানুষটি পাভেলের দিকে গিঁটেপড়া হাত বাড়িয়ে দিল।

'শোন্ পাভ্‌কা,' আরতিওম বলল তার ভাইকে, 'বিদ্যুৎ-স্টেশনের ইলেকট্রিশিয়ানের অসুখ করেছে বলেছিলি। তার জায়গায় কোন ভাল লোক পেলে ওরা নেবে কি না, সেটা তুই কাল খোঁজ নিবি—এটা করতে হবে তোকে। যদি নেয়, তাহলে জানাবি আমাদের।'

অপরিচিত মানুষটি বাধা দিয়ে বলল, 'না, তা করার দরকার নেই। আমি বরং কাল ওর সঙ্গে গিয়ে মালিকের সঙ্গে নিজেই কথা বলব।'

'ওদের লোক দরকার তো বটেই। স্তান্‌কোভিচ অসুস্থ বলেই তো আজ বিদ্যুৎ-স্টেশনে কোন কাজ হয় নি। মালিক দু'বার দেখতে এসেছিল—স্তান্‌কোভিচের জায়গায় কাজ করতে পারে এমন একজনের খোঁজে ঢুঁড়ে বেরিয়েছে সে, কাউকে পায় নি। মোটে একজন কয়লা-জোগানদারকে নিয়ে মেশিন চালাতে সে ভরসা পায় নি। এদিকে ইলেকট্রিশিয়ানের টাইফাস হয়েছে।'

'তাহলে তো ঠিক আছে,' বলল অপরিচিত লোকটি, 'আমি কাল এসে তোমায় ডেকে নিয়ে একসঙ্গে যাব ওখানে।'

'বেশ।'

পাভেলের দৃষ্টি পড়ল অপরিচিত মানুষটির শান্ত ধূসর চোখের দিকে। সে পাভেলকে খুঁটিয়ে দেখছিল। দৃঢ় আর অচঞ্চল এই সন্ধানী চাউনির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ

করছিল পাভেল। আগন্তুকের গায়ে ধূসর রঙের একটা কোর্তা, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোতাম লাগানো। জামাটা যে তার গায়ে বেশ একটু আঁটসাঁট হয়েছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়— কারণ, তার চওড়া বলিষ্ঠ পিঠের দিকে সেলাইটায় রীতিমতো টান পড়েছে। পেশীবহুল, ষাঁড়ের মতো গলাটায় তার মাথা আর ঘাড় জোড়া পড়েছে। লোকটার সমস্ত শরীরে পুরনো ওক্‌গাছের দৃঢ় বলিষ্ঠতার আভাস।

আরতিওম আগন্তুককে ঝুখ্‌রাই-নাম ধরে সম্বোধন করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা আর বিদায় জানিয়ে বলল, 'কাল তুমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কাজটা ঠিক করে ফেলবে।'

সৈন্যদলটা চলে যাবার তিনদিন পরে জার্মানরা শহরে ঢুকল। স্টেশনটা ইদানীং জনহীন হয়ে থাকছিল, তাদের আসার খবরটা ঘোষিত হল সেই স্টেশনে একটা ট্রেনের সিটি দিয়ে। শহরে বিদ্যুতের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল, 'জার্মানরা আসছে!'

খোঁচা-খাওয়া পিঁপড়ের ঢিবির মতো চঞ্চল হয়ে উঠল শহরটা। শহরবাসীরা যদিও কিছুদিন থেকে জানত জার্মানদের আসার কথা, তবু তারা কেমন যেন কথাটা ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি। শেষ পর্যন্ত এই ভয়ংকর জার্মানরা শুধু যে কাছাকাছি এসে গেছে তাই নয়, বাস্তবিকপক্ষে তারা এখানে, এই শহরের মধ্যেই চলে এসেছে। বেড়া আর দরজার পিছন থেকেই শহরবাসীরা উঁকি দিল, রাস্তায় বেরুতে সাহস হয় না।

একজনের পেছনে আর একজন—এইভাবে বড় রাস্তার দু'পাশে দুই সারি বেঁধে জার্মানরা ঢুকল। পরনে জলপাই-রঙের মেটে সবুজ সামরিক উর্দি, তারা রাইফেল বাগিয়ে চলেছে। চওড়া ছুরির মতো বেয়নেট গোঁজা তাদের রাইফেলের

ডগায়, মাথায় ভারি হেল্‌মেট, পিঠে বাঁধা বিরাট বোঁচকা। স্টেশন থেকে শহরে ঢুকছে তারা এক অফুরন্ত ধারায়—সন্তর্পণে, যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ রুখবার জন্যে তৈরি—যদিও তাদের আক্রমণ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

সামনে চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে দু'জন অফিসার, হাতে তাদের মোজার-পিস্তল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে তাদের দোভাষী—সে হেট্‌ম্যান বাহিনীর সার্জেণ্ট-মেজর, গায়ে একটা নীল ইউক্রেনীয় কোট, মাথায় লম্বা পশমের টুপি।

শহরের মাঝখানে ময়দানটায় সারবন্দি হয়ে দাঁড়াল জার্মানরা। দামামা বেজে উঠল। শহরবাসীদের মধ্যে যারা একটু বেশি সাহসী, তাদের একটা ছোট ভিড় জমে উঠল। ইউক্রেনীয় কোট-পরা সেই হেট্‌ম্যানের লোকটা ডাক্তারখানার উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠে জার্মান কম্যাণ্ড্যাণ্ট মেজর কর্ফ-এর একটা হুকুমনামা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাল সবাইকে:

§ ১

এতদ্বারা আমি আদেশ জারি করিতেছি:

এই শহরের সমস্ত অধিবাসীকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই জমা দিতে হইবে। এই আদেশ অমান্যের শাস্তি—গুলিতে মৃত্যু।

§ ২

এতদ্বারা শহরে সামরিক আইন জারি করা হইল এবং শহরের অধিবাসিদিগকে রাত্রি আটটার পর রাস্তায় বাহির হইতে নিষেধ করা যাইতেছে।

মেজর কর্ফ, শহরের কম্যাণ্ড্যাণ্ট।

আগে যে বাড়িটা পৌরশাসনসভা ব্যবহার করত এবং বিপ্লবের পরে যেটা শ্রমিক-প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যালয় হয়েছিল, জার্মান কম্যান্ড্যাটুর সেইখানে ঘাঁটি গাড়ল। দেউড়িতে একজন সান্ত্রী খাড়া হল -- বিরাট একটা রাজকীয় ঈগল-শোভিত কুচকাওয়াজের শিরস্ত্রাণ তার মাথায়। নাগরিকরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবে, তার জন্যে গুদামের জায়গা ওই বাড়িটারই পেছনের আঙিনায়।

গুলি করে মারার শাসানিতে ভয় পেয়ে শহরবাসীরা সারাদিন ধরে অস্ত্রশস্ত্র এনে জমা দিতে লাগল। বড়োরা দেখা দিল না, কিশোর আর বাচ্চা ছেলেরা নিয়ে এল সেগুলো। কাউকে আটকাল না জার্মানরা।

যারা সশরীরে আসতে চাইল না, তারা রাত্রে অস্ত্রগুলো পথের ওপর ফেলে রেখে গেল। সকালে জার্মান চৌকিদাররা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা সামরিক গাড়িতে জড়ো করে কম্যান্ড্যাটুরে নিয়ে গেল।

বেলা একটায় অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবার চব্বিশ ঘণ্টা সময় শেষ হবার পর জার্মান সৈন্যরা তাদের সংগৃহীত মালের হিসেব নিতে বসল: চোদ্দ হাজার রাইফেল। তার মানে ছ'হাজার জমা পড়ে নি। যে ব্যাপক খানাতল্লাশি তারা চালাল, তাতে ফল হল নগণ্য।

দু'জন রেলশ্রমিকের বাড়িতে লুকানো রাইফেল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের শহরের বাইরে ইহুদিদের পুরনো গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে পরের দিন ভোরবেলায় গুলি করে মারা হল।

কম্যান্ড্যান্টের হুকুম শুনেই আরতিওম ছুটে বাড়ি এল। পাভেলকে আঙিনায় দেখে তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত কিন্তু

দৃঢ় স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোন অস্ত্র এনেছিলি না-কি বাড়িতে?'

রাইফেলের কথা মোটেই বলার ইচ্ছে ছিল না পাভেলের, কিন্তু দাদার কাছে মিথ্যা বলতে পারল না। সোজাসুজি বলল সব কথা।

দু'জনে মিলে তারা গেল সেই চালাঘরটায়। আড়কাঠের ওপর লুকানো জায়গাটা থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিয়ে আরতিওম সেটার বল্টু আর বেয়নেট খুলে নলটা ধরে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আছাড় মারল বেড়ার একটা খুঁটির ওপর—চুরমার হয়ে গেল বাঁটটা। রাইফেলটার বাকি অংশটুকু বাগানের ওপারে একটা পোড়ো জমিতে ছুঁড়ে দিয়ে আরতিওম বেয়নেট আর বল্টুটা পায়খানার গর্তে ফেলে দিল।

কাজটা শেষ হলে আরতিওম তার ভাইয়ের দিকে ফিরল, 'তুই আর কচি খোকাটি নোস্, পাভ্কা। বন্দুক নিয়ে খেলা করা চলে না, তাও তোর জানা উচিত। খবরদার এরকম কোন কিছু আনবি না বাড়িতে—ভয়ানক জরুরী কথা এটা। ইদানীং এ ধরনের ব্যাপারে প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে। আর ওসব চালাকি-টালাকি করবি না কক্ষণো—কারণ ওরকম কোন জিনিস যদি তুই বাড়িতে নিয়ে আসিস আর ওরা সেটা ধরে ফেলে, তাহলে প্রথমেই আমাকে গুলি করে মারবে। তোর মতো বাচ্চাকে তো ওরা ছোঁবে না। ভয়ানক সাংঘাতিক দিনকাল—বুঝলি তো!'

পাভেল প্রতিজ্ঞা করল।

দুই ভাই যখন আঙিনা পার হয়ে বাড়ি ঢুকছে, তখন লেশ্চিনস্কিদের ফটকে একটা গাড়ি এসে থামল। উকিলমশাই, তাঁর বউ আর দুই ছেলেমেয়ে—নেলি আর ভিক্তর—নামল।

'এই যে, সুখের পায়রাগুলো আবার ফিরে এসেছে দেখছি

বাসায়,' রেগে গজগজ করল আরতিওম, 'এইবার তো মজা জমবে। হতভাগা ব্যাটারা!' ভেতরে চলে গেল সে।

রাইফেলটার কথা ভেবে সারাদিন মন খারাপ হয়ে রইল পাভেলের। ইতিমধ্যে ভীষণ কাজে ব্যস্ত তার বন্ধু সের্গেই। পুরনো পরিত্যক্ত একটা চালাঘরের দেয়ালের ঠিক পাশেই মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ছিল সে। শেষ পর্যন্ত তৈরি হল খোঁদলটা। ভাল করে চটে মোড়া আনকোরা রাইফেল তিনটি তার মধ্যে রাখল সের্গেই। লাল-রক্ষী দলটা যখন জনসাধারণের মধ্যে রাইফেল বিলি করছিল, তখনই ও এগুলো জোগাড় করেছিল, জার্মানদের কাছে এগুলো ফেরত দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার ছিল না। সারা রাত সে কঠিন পরিশ্রম করেছে যাতে এগুলোকে নির্বিঘ্নে লুকিয়ে রাখা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

গর্তটা ভরাট করে মাটিটা পায়ে চেপে সমান করে দিয়ে সে তার ওপরে একরাশ জঞ্জাল জমা করে দিল। পরিশ্রমের ফলটা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সে তার টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছল, 'এইবার তল্লাশি করুক ওরা। যদিও বা পায় খুঁজে, কে যে এখানে রেখেছে তা জানতে পারবে না, কারণ এই চালাঘরটার তো মালিক নেই কেউ।'

পাভেল আর সেই গম্ভীর-মুখ ইলেকট্রিশিয়ানটির মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ঝুখরাইয়ের এই বিদ্যুৎ-স্টেশনে পুরো একমাস কাজ করা হল। সে এই কয়লা-জোগানদারের সহকারীটিকে দেখিয়ে দিয়েছে কী ভাবে ডাইন্যামোটা তৈরি, কী করে সেটা চলে।

বুদ্ধিমান চটপটে কিশোরটিকে এই জাহাজী মানুষটির ভালো লেগেছে। ছুটির দিনে সে প্রায়ই আরতিওমের কাছে

যায়। মায়ের সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট-ভাবনাচিন্তার কথা ধৈর্যের সঙ্গে শোনে, বিশেষ করে ছোট ছেলেটার দুষ্টুমির কথা বলে মা যখন অভিযোগ করে। মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নার ওপরে চিন্তাশীল আর ধীর ঝুখ্‌রাই একটা শান্ত নিশ্চয়তার প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গ পেয়ে মারিয়া তার দুঃখ ভোলে আর হাসিখুশি হয়ে ওঠে।

একদিন পাভেল যখন বিদ্যুৎ-স্টেশনের আঙিনায় জালানি কাঠের উঁচু উঁচু স্তূপগুলির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, ঝুখ্‌রাই তাকে আটকাল।

'তোমার মা বলছিলেন, তুমি নাকি মারামারি করতে খুব ভালোবাস,' হেসে বলল ঝুখ্‌রাই, 'উনি বলছিলেন, ছেলেটা লড়াইয়ের মুরগির মতো ডানপিটে।' সমর্থনের হাসি হেসে ঝুখ্‌রাই বলল, 'আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, লড়নেওয়ালা হলে কোন ক্ষতি নেই যদি জানা থাকে কার সঙ্গে লড়তে হবে আর কেন লড়াই করতে হবে।'

পাভেল ঠিক বুঝতে পারল না ঝুখ্‌রাই ঠাট্টা করছে, না, সত্যিই বলছে কথাগুলো। সে জবাব দিল, 'আমি বিনা কারণে লড়াই করি না। যা ন্যায্য আর ঠিক তার জন্যেই লড়ি।'

'ঠিকমতো লড়াই কী করে করতে হয়, আমার কাছে শিখতে চাও?' অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞেস করে বসল ঝুখ্‌রাই।

'ঠিকমতো, মানে?' পাভেল তাকাল তার দিকে অবাক হয়ে।

'দেখবে।'

তারপর মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে পাভেল একটা ছোট বক্তৃতা শুনল ঝুখ্‌রাইয়ের কাছে।

এ ব্যাপারে পাভেল খুব সহজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি। অনেকবার তাকে ঝুখ্‌রাইয়ের ঘুষির ধাক্কায় হড়কে মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে হয়েছে। কিন্তু সে নিজেকে একাগ্র আর ধৈর্যবান

শিষ্য বলে প্রমাণ করল—শেষে কৌশলটা আয়ত্ত করে ফেলল।

একদিন যখন গরম পড়েছে, পাভেল ক্লিম্‌কাদের বাড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে কী করবে ভাবতে ভাবতে ঠিক করল—তাদের বাড়ির পেছনে বাগানের কোণে চালাঘরটার চালে তার প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে বসবে। পেছনের উঠোন পার হয়ে বাগানে এসে ভাঙা তক্তাগুলো বেয়ে চালাটার ওপরে উঠল সে। চালাটার ওপর নুয়ে পড়া চেরিগাছগুলোর ঘন শাখা ফাঁক করে করে চালের মাঝখানে এগিয়ে এসে শুয়ে পড়ে রোদ পোয়াতে লাগল পাভেল।

চালাটার একটা পাশ লেশ্চিনস্কিদের বাগানের ওপর কিছুটা এগিয়ে গেছে। চালের এক প্রান্ত থেকে গোটা বাগানটা আর বাড়িটার একটা দিকের সবটাই দেখা যায়। ধার দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে পাভেল উঠোনের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। লেশ্চিনস্কিদের ওখানে যে জার্মান লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ বাসা নিয়েছে, তার আর্দালিটা কর্তার পোশাক ঝাড়ছে।

এই লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌টিকে পাভেল কয়েকবার ফটকের কাছে দেখেছে। বেঁটে, মোটা, লালমুখো লোকটির ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, চোখে প্যাঁশ্‌নে-চশমা, মাথায় চক্‌চকে চামড়ার কানাওয়ালা টুপি। পাভেল আরও জানত, লোকটা থাকে পাশের ঘরে, যার জানলাটা বাগানের দিকে খোলে, আর ওই চালাটার চাল থেকে দেখা যায় ঘরটা।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ সেই সময় টেবিলে বসে লিখছিল। একটু পরেই লেখাটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে গেল। কাগজটা আর্দালিকে দিয়ে বাগানের পথ ধরে ফটকের দিকে গেল। লতাপাতায় ছাওয়া বাগান-ঘরটার কাছে এসে সে ভেতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। নেলি লেশ্চিনস্কি বেরিয়ে এল।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ তার হাত ধরল, দু'জনে একসঙ্গে ফটকের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

পাভেল তার ঘাঁটি থেকে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমের আমেজ আসতেই সে চোখ বন্ধ করতে যাবে—এমন সময় দেখতে পেল আর্দালিটা লেফ্‌টেন্যাণ্টের ঘরে ঢুকছে। একটা উর্দি ঝুলিয়ে রেখে বাগানের দিকে জানলাটা খুলে ঘরটা ঝাড়পোঁছ করল সে। তারপর বেরিয়ে গেল পেছনের দরজাটা বন্ধ করে। এর পরে পাভেল তাকে দেখতে পেল আস্তাবলের কাছে যেখানে ঘোড়াগুলো বাঁধা।

খোলা জানলাটা দিয়ে সমস্ত ঘরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল পাভেল। টেবিলের ওপরে রাখা একটা কোমরবন্ধনী আর চক্‌চকে কি একটা জিনিস।

অদম্য একটা কৌতূহলের টানে পাভেল চুপিসারে নিঃশব্দে চাল থেকে চেরিগাছ বেয়ে নেমে এল লেশ্চিন্‌স্কিদের বাগানে। গুঁড়ি মেরে বাগানটা পার হয়ে জানলার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে। সামনেই টেবিলের ওপরে কাঁধ-টানা পরানো একটা কোমরবন্ধনী আর একটা চামড়ার খাপে চমৎকার বারো-টোটার একটা মান্‌লিশের পিস্তল।

নিঃশ্বাস বন্ধ করল পাভেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল, কিন্তু বেপরোয়া দুঃসাহসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। ঘরে ঢুকেই খাপটাকে হাতিয়ে নতুন ইস্পাত-নীল অস্ত্রটাকে টেনে বের করে নিয়েই বাইরে লাফিয়ে পড়ল। চারিদিকে দ্রুতচোখে দেখে নিয়ে সাবধানে পিস্তলটাকে পকেটে ফেলেই একছুটে বাগান পেরিয়ে এল চেরিগাছটার কাছে। বাঁদরের পটুত্ব নিয়ে সে উঠে এল চালে, তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়াল পেছনে দেখবার জন্যে। আর্দালিটা তখনও খোশ মেজাজে সহিসটার

সঙ্গে কথা বলছে, বাগানটা নিস্তব্ধ আর জনহীন। অন্য দিক দিয়ে নেমে এসে পাভেল ছুটে বাড়ি এল।

মা রান্নাঘরে সন্ধ্যের খাবার রাঁধতে ব্যস্ত, তাকে বিশেষ লক্ষ্য করল না।

একটা তোরঙ্গের পাশ থেকে খানিকটা ছেঁড়া কাপড় টেনে নিয়ে পকেটে গুঁজে মার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল সে। দৌড়ে উঠোনটা পার হয়ে, এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ল বনের দিকে যাবার রাস্তায়। ঊরুর ধাক্কায় ভারি পিস্তলটির দোলানি বন্ধ করার জন্যে সেটাকে চেপে ধ'রে যত তাড়াতাড়ি পারে পাভেল বনে ছুটে এল একটা পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজার ধ্বংসাবশেষের দিকে।

পা দুটো তার যেন মাটি ছোঁয় নি, বাতাস শিস্ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে।

পুরনো পাঁজাটার চারিদিক নিস্তব্ধ। কাঠের চাল এখানে-ওখানে ধসে পড়েছে, ভাঙা ইঁটের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ, ভেঙে পড়া উনুন—দৃশ্যটা মনকে দমিয়ে দেবার মতো। আগাছায় ভর্তি জায়গাটা। পাভেল আর তার দুই বন্ধু এখানে মাঝে মাঝে খেলতে আসে, তাছাড়া আর কেউ এদিকে আসে না। পাভেলের অনেকগুলো গোপন জায়গা জানা আছে, যেখানে চুরি করা এই সম্পদটাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যায়।

একটা চুল্লির ফাঁকে উঠে সে সাবধানে চারিদিকে দেখল, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। শুধু পাইনগাছগুলো একটা নরম নিঃশ্বাস ফেলল আর মন্থর বাতাস নাড়া দিয়ে গেল রাস্তার ধুলোকে। বাতাসে কড়া রজনের গন্ধ।

কাপড়ে জড়ানো পিস্তলটাকে পাভেল চুল্লির মধ্যে মেঝের এক কোণে রেখে সেটাকে পুরন ইঁটের একটা স্তূপের নিচে চাপা দিল। বেরোবার সময় পুরনো পাঁজাটার ঢোকার মুখ

আলগা ইঁটে ভরাট করে ঠিক জায়গাটা বেশ ভাল করে দেখে নিল, তারপর বাড়ির দিকে রওনা হল আস্তে আস্তে। লক্ষ্য করল, হাঁটু দুটো তার কাঁপছে।

'এখন কী হবে কে জানে!' ভাবতে ভাবতে বিপদের আশঙ্কায় তার মন ভারি হয়ে উঠল।

বাড়ি ফেরাটা এড়াবার জন্যে সে এল বিদ্যুৎ-স্টেশনে—সাধারণত যে-সময়ে আসে তার একটু আগেই। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে মেশিন-ঘরের চওড়া দরজা খুলে ফেলল। ছাই পরিষ্কার করে বয়লারে জল পাম্প্ করে নিয়ে আগুনটা জ্বালাতে জ্বালাতে ভাবতে লাগল—লেশ্চিন্স্কিদের বাড়িতে এতক্ষণ না-জানি কী হচ্ছে।

এগারোটা নাগাদ ঝুখ্রাই এসে পাভেলকে বাইরে ডাকল। খাটো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাড়িতে আজ খানাতল্লাশি হল কেন?'

চমকে উঠল পাভেল, 'খানাতল্লাশি?'

অল্প একটু থেমে বলল ঝুখ্রাই, 'আমার ভাল মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। কিসের খোঁজে ওরা এসেছিল আন্দাজ করতে পারো কিছু?'

কিসের খোঁজে যে ওরা এসেছিল তা পাভেল খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু পিস্তল-চুরির কথাটা ঝুখ্রাইকে বলার ঝুঁকি সে নিতে পারল না। আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি আরতিওমকে গ্রেপ্তার করেছে?'

'গ্রেপ্তার কেউ হয় নি, কিন্তু ওরা বাড়ির সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে।'

কথাটায় সামান্য একটু আশ্বস্ত হল পাভেল, যদিও তার উদ্বেগ কাটল না। কয়েক মিনিট সে আর ঝুখ্রাই দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইল প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে। একজন

জানে খানাতল্লাশি কেন হয়েছে, ফলাফল ভেবে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অন্যজন সেটা জানে না বলেই সচকিত।

ঝুখ্‌রাই ভাবছিল, 'হতভাগারা বোধহয় আমার সম্বন্ধে কোনকিছু টের পেয়েছে। আরতিওম আমার কথা কিছু জানে না, কিন্তু খানাতল্লাশিটা হল কেন? আরও সাবধান হতে হবে।'

একটাও কথা না বলে দু'জনে যে যার কাজে চলে গেল।

ওদিকে লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে দারুণ গণ্ডগোল বেধে গেছে।

পিস্তলটা নেই দেখে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডেকে পাঠিয়েছিল তার আর্দালিকে। আর্দালি বলল, অস্ত্রটা নিশ্চয়ই চুরি গেছে। ফলে, অফিসারটি মহা রেগে তার সংযম হারিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একটি ঘুষি ঝেড়ে বসল আর্দালির কানের ওপর। ঘুষিতে টলতে টলতেও আর্দালি কাঠের পুতুলের মতো কেতামাফিক খাড়া দাঁড়িয়ে নিরীহভাবে চোখ পিটপিট করতে লাগল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তারই প্রতীক্ষায়।

জবাবদিহি করার জন্যে ডাকা হল উকিলমশাইকে। চুরির ঘটনায় ভয়ানক চটেমটে তিনি তো লেফ্‌টেন্যাণ্ট-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন তাঁর বাড়িতে এমন-ধারা ব্যাপার ঘটতে পেরেছে বলে।

ভিক্তর লেশ্চিনস্কি তার বাবাকে বলল, পিস্তলটা পড়শীরা — বিশেষ করে ওই ক্ষুদে শয়তান পাভেল করচাগিন — চুরি করে থাকতে পারে। ছেলের সিদ্ধান্তটা বাবা লেফ্‌টেন্যাণ্টের কানে তুলে দিতে দেরি করলেন না। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশির হুকুম দিল।

খানাতল্লাশিটা নিষ্ফল হল এবং হারানো পিস্তলের এই ঘটনাটায় পাভেল দেখল যে, এমন বিপজ্জনক কাজও অনেক সময়ে সফল হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে তনিয়া তাকিয়ে দেখছিল জমকালো পপ্‌লারগাছের সারি দেওয়া তার বড় পরিচিত বাগানটিকে। মৃদু হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে গাছগুলো। যেন বিশ্বাসই হয় না যে এই যে জায়গায় তার ছেলেবেলা কেটেছে, সেখান থেকে যাবার পর পুরো একটি বছর পার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মাত্র গতকাল বাড়ি থেকে চলে গিয়ে আবার আজ সকালের ট্রেনেই ফিরে এসেছে।

বদলায় নি কিছুই: সারি সারি র‍্যাস্প্‌বেরির ঝাড়গুলো সযত্নে ছাঁটাকাটা আছে বরাবরের মতোই। জ্যামিতিক নির্দিষ্টতায় টানা বাগানের পথগুলো দু'ধারে মায়ের সেই প্রিয় প্যাঞ্জি-ফুলের গাছে সাজানো। বাগানের সবকিছুই তকতকে ঝক্‌ঝকে। সর্বত্র যেন এক উদ্যানপালনবিশারদের নিপুণ হাতের ছাপ। পরিষ্কার আর নিখুঁতভাবে টানা পথগুলো দেখতে দেখতে একটু একঘেয়ে লাগল তনিয়ার।

যে উপন্যাসটা পড়ছিল, তুলে নিল সেটা। বারান্দার দরজাটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বাগানে। রঙ্‌-করা ছোট ফটকটা ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে জল-পাম্পের স্টেশনটার পাশে পুকুরটার দিকে।

সাঁকোটা পার হয়ে এসে পড়ল গাছের সারি-দেওয়া রাস্তাটায়। তনিয়ার ডান দিকে উইলো আর অ্যাল্‌ডার-ঝোপে ঘেরা পুকুরটা, বাঁ দিকে শুরু হয়েছে বন।

পুরন পাথর-খনিটার কাছে পুকুরটার ধারে যাবে তনিয়া — এমন সময়ে জলের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা মাছ-ধরা ছিপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা বাঁকা উইলোগাছের গঁ্ড়ির ওপরে ভর দিয়ে ডালপালাগ্লো ফাঁক করে সামনে দেখল — রোদে-পোড়া, খালি-পা, হাঁটুর ওপরে প্যান্ট-গ্টানো একটা ছেলে, তার পাশে মরচে-ধরা একটা টিনের পাত্রে কতকগ্লো কেঁচো। ছেলেটা মাছ ধরায় নিবিষ্ট বলে তাকে দেখতে পায় নি।

'এখানে মাছ পাওয়া যাবে বলে মনে করেছ নাকি?'

ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্তভাবে তাকাল পাভেল।

উইলোগাছটা ধরে জলের ধারে ঝ্ঁকে-পড়া একটি মেয়ে, তার পরনে সাদা নাবিক-ছাঁদের একটা ব্লাউজ, গলায় নীল ডোরা-কাটা কলার, হাল্কা-ধ্সর রঙের খাটো স্কার্ট। রোদে-পোড়া তার নিটোল পায়ে রঙীন বেড়-দেওয়া ছোট মোজা। বাদামী চুলের গোছা মোটা বিন্নিতে বাঁধা।

ছিপ-ধরা হাতখানার অল্প একটু কাঁপ্নিতে স্তোয় বাঁধা হাঁস-পালকের ফাৎনাটা নড়ে উঠল মস্ণ জলের ব্কে ঢেউয়ের চক্র তুলে।

'দেখো, দেখো, টোপ গিলেছে!' উত্তেজিত গলায় স্বর উঠল পাভেলের পেছনে।

এইবারে পাভেল তার স্থৈর্য সম্প্র্ণ হারিয়ে স্তোটায় এত জোরে টান দিল যে ডগায় বেঁধা পাক-খাওয়া পোকাটা সমেত বঁড়শিটা জল থেকে বেশ খানিকটা লাফিয়ে উঠল।

অত্যন্ত বিরক্ত মনে পাভেল ভাবল, 'আর মাছ ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা নেই, ধ্ত্তোরি ছাই! কোথা থেকে জ্টল এসে মেয়েটা এখানে!' ছিপ টানার বোকামিটুকু সামলে নেবার জন্যে আরও দ্রে ছ্ঁড়ে দিল বঁড়শিটা ঠিক এমন একটা জায়গায় যেখানে সেটা ফেলা উচিত ছিল না — বঁড়শিটা গিয়ে

পড়ল দুটো কাঁটা-শ্যাওলার মাঝখানে যেখানে সুতোটার সহজেই আটকে যাবার সম্ভাবনা।

কী ঘটেছে সেটা বুঝতে পারল পাভেল এবং মাথাটা না ফিরিয়ে তীব্র ফিস্‌ফিসানির স্বরে ওপরে পাড়ে বসা মেয়েটির উদ্দেশে বলল, 'চুপ করে থাকো না। চেঁচিয়ে মাছগুলোকে ভড়কে দেবে দেখছি।'

ওপর থেকে ঠাট্টার স্বরে শোনা গেল, 'তোমার কালো চোখের চাউনিতেই অনেক আগে মাছ ভেগেছে। তাছাড়া, যারা সত্যিই মাছ ধরতে জানে, তারা কখনও বিকেলের দিকে ছিপে বসে না।'

পাভেল ভদ্র ব্যবহার করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু এটা বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হল তার। দাঁড়িয়ে উঠে চোখের ওপর নামিয়ে দিল টুপিটা ঠেলে — চটে গেলে সে এরকম করে। দাঁত চেপে, তার জানা সবচেয়ে ভদ্র ভাষায় বিড়বিড় করে বলল, 'এখান থেকে তুমি সরে পড়লেই ভাল হয়।'

তনিয়ার চোখ দুটো একটু কুঁচকে এল, সেই চোখে হাসির নাচ, 'আমি কি সত্যিই তোমার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি?'

তার গলায় ঠাট্টার সুরটা চলে গেছে, বন্ধুত্বমূলক একটা আপোসের সুর এসেছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মেয়েটাকে সত্যিই দুটো কড়া কথা শোনাবে বলে পাভেল মনস্থির করেছিল, কিন্তু এখন সে নিরস্ত্র হয়ে পড়ল।

'থাকতে চাও তো থাকো, দেখো বসে বসে। আমার আর কি।' ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল সে, তারপর আবার বসে পড়ল ফাৎনাটার দিকে মন দেবার জন্যে। ওটা আটকে গেছে একটা কাঁটা-শ্যাওলায়। বঁড়্‌শিটা যে শেকড়ে গেঁথে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। টান দিতে ভয় হল পাভেলের। যদি

আটকে গিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়াতে পারবে না আর নিশ্চয় হেসে উঠবে মেয়েটা। ওর চলে যাওয়াই কামনা করল সে।

তনিয়া ততক্ষণে অল্প দূলতে থাকা উইলোগাছের গুঁড়িটার ওপরে আরাম করে বসেছে। হাঁটুর ওপর বইটা নিয়ে দেখছে এই রোদে-পোড়া কালো-চোখ অমার্জিত ছেলেটাকে, যে তাকে এমন অভদ্র অভ্যর্থনা জানিয়েছে আর এখন ইচ্ছে করেই তাকে উপেক্ষা করছে।

পুকুরের আয়নার মতো বুকে পাভেল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার প্রতিবিম্ব। বইয়ের মধ্যে সে যখন ডুবে গেছে বলে তার মনে হল, তখন সে সাবধানে জড়িয়ে যাওয়া সুতোটায় টান দিল। ফাৎনাটা ডুবে গেল জলে, টান-টান হয়ে এল সুতোটা ।

'আটকে গেছে, আরে গেল যা!' কথাটা চট্ করে খেলে গেল তার মনে, আর সেই মুহূর্তেই দেখল জলের মধ্যে থেকে মেয়েটার হাসিমুখ তাকে লক্ষ্য করছে।

ঠিক সেই সময়ে পাম্প্-স্টেশনের সাঁকোটা পার হয়ে আসছিল দু'জন তরুণ — দু'জনেই হাই ইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এদের মধ্যে একজন ডিপোর কর্তা ইঞ্জিনিয়র সুখার্কো-র সতের বছর বয়সী ছেলে — ফ্যাকাসে চুলওয়ালা, তিল-চিহ্নিত মুখ, চোয়াড়ে, নিষ্কর্মা গোছের। স্কুলের সহপাঠীরা তার নাম দিয়েছে 'দাগীমুখো শুর্কা'। একটা শৌখীন ছিপ আর সুতো তার হাতে, মুখের কোণে একটা সিগারেট আট্কানো। তার সঙ্গে আসছে ভিক্তর লেশ্চিন্স্কি — সুঠাম, মেয়েলি গোছের ছোক্রা।

সঙ্গীর দিকে ঝুঁকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে সুখার্কো বলেছিল, 'দেখো, এই মেয়েটা একটা রাঙা আপেল। এরকমটি

এদিকে আর কেউ নেই। একেবারে অসাধারণ — এই যা বললাম কথাটা মনে রেখো। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে কিয়েভের ইস্কুলে। এখন এসেছে ওর বাবার কাছে গরমের ছুটি কাটাতে। ওর বাবা এখানকার প্রধান বনপরিদর্শক। আমার বোন লিজার সঙ্গে ওর আলাপ আছে। আমি একবার ওকে একটা চিঠি লিখেছিলাম — কিছুটা আবেগের সঙ্গেই আর কি। 'আমি তোমার প্রেমে পাগল,' তুমি তো ধরনটা জানোই, 'দুরু দুরু বুকে রয়েছি তোমার উত্তরের অপেক্ষায়।' এমন কি, নাদসন থেকে কিছু জুৎসই কবিতাও উদ্ধার করেছিলাম।'

'তা ফলটা কী হল?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল ভিক্তর।

'এ ব্যাপারে ওর ভারি দেমাক,' বলল সুখারকো মিইয়ে যাওয়া গলায়, 'আমায় বলে কিনা চিঠি লিখে যেন. কাগজ নষ্ট না করি, হেন-তেন কত কি। কিন্তু গোড়ার দিকে ওই রকমই হয় সব সময়। এসব ব্যাপারে আমি তো পাকা লোক। সত্যি কথা বলতে কি, ওসব হৃদয়াবেগঘটিত বাজে ন্যাকামি আমার কাছে চলবে না — দিনের পর দিন কাকুতি-মিনতি করো আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল। তার চেয়ে ঢের সহজে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে মিস্ত্রিদের পাড়ায় চলে যাও, সেখানে তিন রুবল দিয়ে এমন সুন্দর মেয়ে পাবে যে জিভে জল আসবে তোমার। ওসব বাজে ব্যাপারও নেই। আমি ওখানে যেতাম ভাল্‌কা তিখোনভের সঙ্গে। সেই রেল-কারখানার ফোরম্যানকে চেনো না?'

তাচ্ছিল্যভরে ভুরু কুঁচকাল ভিক্তর, 'কী বলছ শুরা? তুমি এই সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে যাও নাকি?'

সিগারেটটা চিবিয়ে থুতু ফেলে খেঁকিয়ে উঠল শুরা, 'অত সাধুপনা কোর না। তুমি যে এদিকে কোন্ তালে ঘোরো তা আমরা জানি।'

ভিক্তর তাকে বাধা দিল, 'তোমার এই রাঙা আপেলটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয়। চলো তাড়াতাড়ি যাই, নইলে ও আমাদের এড়িয়ে কেটে পড়বে। কাল সকালে ও একাই মাছ ধরতে গিয়েছিল।'

দুই বন্ধুতে তনিয়ার কাছাকাছি এল। মুখের সিগারেটটা নামিয়ে নিয়ে সুখার্‌কো তাকে খুব একটা কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানাল, 'কেমন আছেন, শ্রীমতী তুমানভা? আপনিও মাছ ধরতে এসেছেন না কি?'

'না, এই দেখছি আর কি,' বলল তনিয়া।

ভিক্তরকে বাহু ধরে টেনে এনে সুখার্‌কো তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনাদের আলাপ নেই, না? এই আমার বন্ধু ভিক্তর লেশ্চিনস্কি।'

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভিক্তর তনিয়ার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আলাপটা চালিয়ে যাবার চেষ্টায় সুখার্‌কো জিজ্ঞেস করল, 'আজ মাছ ধরছেন না কেন?'

তনিয়া উত্তর দিল, 'আমার ছিপটা আনতে ভুলে গেছি।'

'আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি আরেকটা,' বলল সুখার্‌কো, 'ইতিমধ্যে আপনি আমারটা নিতে পারেন। আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

তনিয়ার সঙ্গে ভিক্তরের আলাপ করিয়ে দেবার কথা সে রেখেছে। এখন সে ওদের দু'জনকে একটু একা থাকতে দেবার জন্যে ব্যস্ত।

তনিয়া বলল, 'না, আমি বরং মাছ ধরব না। শুধু শুধু ব্যাঘাত করা হবে। এখানে আরেকজন মাছ ধরছে।'

'কাকে ব্যাঘাত করা হবে?' জিজ্ঞেস করল সুখার্‌কো, 'ও,

ওরই কথা বলছেন বুঝি?' এই প্রথম সে ঝোপের নিচে বসে থাকা পাভেলকে দেখতে পেল। 'আচ্ছা, দুই ধাক্কায় ওকে ভাগিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে।'

তনিয়া বাধা দেবার আগেই সে নেমে গেছে ছিপ আর সুতো নিয়ে ব্যস্ত পাভেলের কাছে।

সুখার্‌কো পাভেলকে বলল, 'ছিপ গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ো এখান থেকে।' পাভেল শান্তভাবে মাছ ধরেই চলছে দেখে সে আবার বলল, 'তাড়াতাড়ি করো, এই!..'

মাথা তুলে পাভেল সুখার্‌কোর দিকে তাকাল, তার চাউনিটার রকমসকম সুবিধের ছিল না, 'এই চুপ! লাটসাহেব এলেন যেন!'

'কি বললি!' ফেটে পড়ল সুখার্‌কো, 'মুখের ওপর জবাব দেবার সাহস তোর! হাঘরে কোথাকার! ভাগ্‌ এখান থেকে!' কেঁচোর টিনটায় ভীষণ এক লাথি লাগাল সে। শূন্যে পাক খেয়ে পড়ে গেল সেটা পুকুরের মধ্যে, জলের ছিটে লাগল তনিয়ার মুখে।

'ছিঃ ছিঃ সুখার্‌কো, করছ কী?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

লাফিয়ে উঠল পাভেল। সে জানত, আরতিওম যেখানে কাজ করে সেই ডিপোর বড়কর্তার ছেলে সুখার্‌কো। এই মোটাসোটা লাল হাঁদাটাকে যদি সে মারে, তাহলে সে তার বাপের কাছে গিয়ে নালিশ করলে আরতিওম বিপদে পড়তে পারে। শুধু এই চিন্তাটাই তাকে একটু বাধা দিচ্ছিল, নইলে সে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলত।

পাভেল তাকে মুহূর্তের মধ্যেই মেরে বসবে আন্দাজ করে, সুখার্‌কো ছুটে এগিয়ে এসেই দুই হাতে ধাক্কা লাগাল পাভেলের বুকে। জলের পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল পাভেল, বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে প্রাণপণে দুই হাত ছড়িয়ে সে

নিজেকে সাম্‌লে নিল, কোনরকমে বাঁচাল নিজেকে জলে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে।

এই সুখার্‌কো পাভেলের চেয়ে দু-বছরের বড়ো, ঝগ্‌ড়াটে গুন্ডা হিসেবে সে কুখ্যাত।

বুকে ঘুষি খেয়ে মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল পাভেলের।

'দেখ্‌বি তাহলে? এই দেখ্‌!' বলেই হাতটা অল্প একটু ঘুরিয়ে পাভেল একটা প্রচন্ড ঘুষি বসাল সুখার্‌কোর মুখে। ঘুষিটা সে সামলে নেবার আগেই, পাভেল তার ইস্কুলে পরা উর্দিটা চেপে ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে জলের মধ্যে নামিয়ে দিল।

হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে সুখার্‌কো, পালিশ করা জুতো আর প্যাণ্ট তার ভিজে গেছে, প্রাণপণে সে পাভেলের শক্ত মুঠি থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগল। উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হওয়ার পর পাভেল লাফিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

প্রচন্ড রাগে আবার সুখার্‌কো তাকে তাড়া করল, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে সে পাভেলকে।

ঘুরে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাভেল স্মরণ করল: 'বাঁ পায়ের ওপর দেহের ভর রাখো, ডান পা টান করে হাঁটু বেঁকিয়ে নাও। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ওপরের দিকে থুত্‌নির নিচে ঘুষি বসাও।'

মোক্ষম একটি ঘুষি!

পাভেলের ঘুষিটা পড়তেই দাঁত কড়মড়ের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর থুত্‌নিতে আর কামড়ানো জিভের অসহনীয় যন্ত্রণায় চিঁচিঁ চিৎকার করতে করতে সুখার্‌কো দুই হাত ছড়িয়ে জলের মধ্যে ঝপ্‌ করে পড়ে গেল।

ডাঙার ওপর হাসিতে ভেঙে পড়ছে তনিয়া। হাততালি দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেশ করেছ, শাবাশ্‌!'

আটকে যাওয়া ছিপের সুতোটায় এত জোরে টান দিল পাভেল যে তার ডগাটা গেল ছিঁড়ে, তারপর পাড় বেয়ে উঠে এল রাস্তার ওপরে।

চলে যেতে যেতে সে শুনল, ভিক্তর বলছে তনিয়াকে, 'এই হল পাভেল করচাগিন—এক নম্বর গুন্ডা একটা।'

স্টেশনে গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, রেললাইনের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করতে লেগেছে। পরের বড়ো স্টেশনটার ডিপোর শ্রমিকরা বড়ো রকমের একটা কান্ড পাকিয়ে তুলছে। ঘোষণাপত্র নিয়ে যাচ্ছিল বলে সন্দেহ করে জার্মানরা দু'জন ইঞ্জিন-চালককে গ্রেপ্তার করেছে। যে-সব শ্রমিকদের গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য—কারণ, জমিদাররা জমিদারিতে ফিরছে, জবরদখল শুরু হয়েছে।

হেটম্যান সান্ত্রীদের চাবুকে চাষীদের পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। গোটা গুবের্নিয়া জুড়ে গড়ে উঠছে পার্টিজান-আন্দোলন। বলশেভিকরা ইতিমধ্যেই ডজনখানেক পার্টিজান সৈন্যদল গড়ে তুলেছে।

ঝুখ্‌রাইয়ের বিশ্রামের ফুরসত নেই ইদানীং। শহরে থেকে সে এর মধ্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে। বহু রেলশ্রমিকের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে, তরুণদের সমাবেশে উপস্থিত থেকেছে, ডিপোর মিস্ত্রীদের আর করাত-কলের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একটা জোরালো দল গড়ে তুলেছে। আরতিওমের মনোভাবটা কী তা জানবার চেষ্টা করেছে সে: একবার জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে—বলশেভিক পার্টি আর সেই পার্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কী মনে করে আরতিওম। উত্তরে বলিষ্ঠ-দেহ এই মিস্ত্রী জানিয়েছিল, 'আমি এই সব পার্টি সম্বন্ধে বিশেষ

কিছু জানি না, ফিওদর। তবে কিছু সাহায্যের দরকার হলে আমি সেটা করব জেনো।'

নিশ্চিন্ত হয়েছিল ফিওদর। সে জানে, আরতিওম খাঁটি লোক, সে তার কথা রাখবে ঠিকই। 'পার্টির ব্যাপারে সে এখনও তৈরি নয়। তাতে কিছু যায় আসে না,' মনে মনে ভাবল সে, 'যা দিনকাল, তাতে ও শিগগিরই নিজেই সব কিছু বুঝে নেবে।'

ফিওদর বিদ্যুৎ-স্টেশন ছেড়ে ডিপোয় একটা কাজ নিয়েছে। সেখানে তার কাজকর্ম চালানো আরও সুবিধে। বিদ্যুৎ-স্টেশনে থাকার সময়ে সে রেলওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ট্রেন-যাতায়াত ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে। ইউক্রেন থেকে জার্মানরা হাজার হাজার গাড়ি-বোঝাই লুটের মাল পাঠাচ্ছে জার্মানিতে যব, গম, গরু-ভেড়ার পাল...

.

স্টেশনে তারের খবর দেওয়া-নেওয়া করে পনোমারেঙ্কো, তাকে একদিন হেটম্যান সান্ত্রীরা গ্রেপ্তার করল। রক্ষী ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে মারা হল তাকে। সে-ই যে আরতিওমের একজন সহযোগী শ্রমিক রমান সিদোরেঙ্কোর কথা বলে দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল।

ডিপোয় যখন কাজ চলছে, তখন রমানকে ধরতে এল দু'জন জার্মান এবং একজন হেটম্যান সান্ত্রী, স্টেশন অধিনায়কের সহকারী। রমান যেখানে কাজ করছে, সেইখানে এসে একটাও কথা না বলে সহকারী-অধিনায়ক চাবুক মেরে তার মুখটা কেটে দিল।

'আয় আমাদের সঙ্গে, শুয়োরের বাচ্চা! তোমার কিছু জবাবদিহি করতে হবে।' বিশ্রীরকম মুখ ভেঙিয়ে সে মিস্ত্রীর হাতটা ধরে ভয়ানক জোরে মুচড়ে দিল। 'শিখিয়ে দিচ্ছি কী করে আন্দোলন করে বেড়াতে হয়!'

রমানের পাশের যন্ত্রটাতেই কাজ করছিল আরতিওম। হাতের উখাটা রেখে সে তার বিরাট দেহটার ভীষণ রকম একটা ভঙ্গি করে এগিয়ে এল সহকারী-অধিনায়কের দিকে। জমে উঠতে থাকা ক্রোধ যথাসম্ভব সামলাবার চেষ্টা করে কর্কশ গলায় বলল আরতিওম, 'মারতে যাবি নে, বেজম্মা কোথাকার!'

সহকারী-অধিনায়ক পিছিয়ে গেল পিস্তলের চামড়ার খাপটা খুলতে খুলতে। গাঁট্টাগোট্টা বেঁটে একজন জার্মান কাঁধ থেকে তার চওড়া বেয়নেট লাগানো রাইফেলটা খুলে নিয়ে বল্টুটা খট্ করে নামিয়ে নিল।

'থামো!' খেঁকিয়ে উঠল জার্মানটা, আর এক পা এগুলেই গুলি করার জন্যে প্রস্তুত সে।

লম্বা, বলিষ্ঠ মিস্ত্রী অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এই ক্ষুদে সৈনিকটার সামনে --কিছু করবার নেই তার।

রমান আর আরতিওম দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হল। এক ঘণ্টা বাদে ছেড়ে দেওয়া হল আরতিওমকে, কিন্তু মাটির নিচের একটা গুদাম-ঘরে তালাবন্ধ হয়ে রইল রমান।

এই গ্রেপ্তারের দশ মিনিটের মধ্যেই একজন লোকও কাজে রইল না। স্টেশন-সংলগ্ন পার্কে ডিপোর শ্রমিকেরা এসে জমায়েত হল, সেখানে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ট্রেন-চলাচলের যোগাযোগ-রক্ষী কর্মীরা আর সরবরাহ-বিভাগের শ্রমিকেরা। দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হল, রমান আর পনোমারেঙ্কোর মুক্তির দাবি জানিয়ে একজন একটা লিখিত খসড়া রচনা করল।

বিক্ষোভ আরও বেশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল যখন এক দল রক্ষীর সঙ্গে একটা পিস্তল আস্ফালন করতে করতে সহকারী-অধিনায়ক পার্কে ছুটে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাজে ফিরে যাও

সব, নইলে প্রত্যেকটি লোককে এখানেই গ্রেপ্তার করব! তোমাদের কয়েকজনকে গুলি করে মারাও হবে!'

উত্তরে ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা এমন একটা গর্জন করে উঠল যে সহকারী-অধিনায়ককে ছুটতে হল স্টেশনে আশ্রয় নেবার জন্যে। ইতিমধ্যে অবশ্য সে শহরের জার্মান সৈন্যদের আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিল, গাড়িভর্তি জার্মান সৈন্যদল স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

জমায়েত ভেঙে দিয়ে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল। কেউ কাজে রইল না, এমনকি স্টেশনমাস্টারও না। ঝুখ্‌রাই যে তাদের মধ্যে কাজ করেছে, সেটার ফল ফলতে লাগল। এই প্রথম স্টেশন-শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামী ব্যবস্থা অবলম্বন করল।

ভারি একটা মেশিনগান স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর বসাল জার্মানরা। শিকারের গন্ধ পাওয়া কুকুরের মতো সেটা সেখানে মুখ উঁচিয়ে খাড়া রইল, তার ঘোড়াটায় হাত রেখে পাশেই উবু হয়ে বসে রইল একজন জার্মান কর্পোরাল্‌।

জনহীন হয়ে গেল স্টেশনটা।

রাত্রিবেলা শুরু হল ধরপাকড়। যাদের নিয়ে গেল, তাদের মধ্যে আরতিওম একজন। সে-রাত্রে বাড়ি না ফিরে ঝুখ্‌রাই পার পেয়ে গেল।

যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে বিরাট একটা মালগাড়ি রাখার চালার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলা হল, হয় তাদের কাজে যেতে হবে, নয় তো সামরিক আইনে তাদের বিচার হবে।

আগাগোড়া রেল-লাইন জুড়ে সমস্ত রেল-শ্রমিকই ধর্মঘট করেছিল। একটা পুরো দিনরাতের মধ্যে একখানা ট্রেনও যাতায়াত করে নি। প্রায় একশ' কুড়ি কিলোমিটার দূরেই লড়াই চলেছে একটা বিরাট পার্টিজান-বাহিনীর সঙ্গে, তারা

রেল-লাইন উপড়ে ফেলে সাঁকোগুলো উড়িয়ে দিয়েছে।

রাত্রিবেলায় জার্মান-সৈন্য-ভর্তি একটা ট্রেন এসে লেগেছিল, কিন্তু সেটা আটকে গেল। সেটার ইঞ্জিনচালক, তার সহকারী আর ফায়ারম্যান, তিনজনেই সরে পড়েছে। স্টেশনের পাশের লাইনে আরও দুটো ট্রেন আটকে আছে ছাড়ার অপেক্ষায়।

মালগাড়ির চালাটার ভারি দরজাটা খুলে গেল এবং স্টেশন-অধিনায়ক, একজন জার্মান লেফ্টেন্যাণ্ট্, তার সহকারী এবং একদল অন্যান্য জার্মান এসে ঢুকল।

'করচাগিন, পলেন্তভ্স্কি, ব্রুঝাক্,' হেঁকে গেল সহকারী-অধিনায়ক, 'তোমাদের তিনজনকে একটা ইঞ্জিন চালাবার দল হিসেবে এখুনি একটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি রাজি না হও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে তোমাদের। কী বলার আছে তোমাদের?'

শ্রমিক তিনজন গম্ভীর মুখে সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। সহকারী-অধিনায়ক যখন পরবর্তী ট্রেনের চালক, সহকারী আর ফায়ারম্যানের নাম ডাকছে, ততক্ষণে পাহারাধীনে তাদের নিয়ে যাওয়া হল ইঞ্জিনখানার কাছে।

ক্রুদ্ধ একটা আওয়াজ করে এক ঝলক স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল ট্রেনের ইঞ্জিনটা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল রাত্রির গভীরে সামনের অন্ধকার ঠেলে। আরতিওম চুল্লিটায় বেল্চা করে কয়লা গুঁজে দিল, চুল্লির মুখটা পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে খাড়া-নাক চায়ের পাত্র থেকে এক চুমুক জল খেয়ে সে বুড়ো ইঞ্জিনচালক পলেন্তভ্স্কির দিকে তাকাল, 'তাহলে, খুড়ো, ট্রেনটা চালাতেই হচ্ছে আমাদের?'

ঘন ঝুলে-পড়া ভুরুর নিচে পলেন্তভ্স্কির চোখ দুটো

বিরক্তিতে পিটপিট করে উঠল, 'পেছনে বেয়নেট বাগিয়ে থাকলে চালাতেই হবে।'

কয়লাগাড়িটার ওপরে বসে থাকা জার্মান সৈনিকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্রুঝাক বলল, 'সব ছেড়েছুড়ে সরে পড়লে কেমন হয়?'

আরতিওম বিড়বিড় করে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আমাদের পেছনে ওই যে ঘাগীটা বসে আছে।'

জানলা দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ব্রুঝাক বলল, 'তা বটে।'

আরতিওমের কাছাকাছি সরে এল পলেন্তভ্স্কি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'ট্রেনটাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না কিছুতেই, বুঝলে? সামনে লড়াই চলছে, আমাদের লোক রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে। এই শুয়োরগুলোকে ওখানে নিয়ে যাওয়া মানে এদের গুলির মুখে আমাদের ওই লোকদের সংপে দেওয়া। এমন কি, জারের আমলেও ধর্মঘটের সময়ে আমি ট্রেন চালাই নি, বুঝলে? এবার চালাব? কক্ষণো না। নিজেদের লোকই যদি আমাদের জন্যে মারা পড়ে, তবে সে কলঙ্ক আর জীবনে ঘুচবে না। আমাদের আগে যারা ইঞ্জিন চালাচ্ছিল, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তারা কিন্তু পালিয়েছে। আমাদেরও ট্রেনটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না, কি বলো?'

'ঠিক বলেছ, খুড়ো, কিন্তু এর ব্যবস্থা কী করবে?' বলে সে সৈন্যটাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাল।

ভুরু কুঁচকাল ইঞ্জিন-ড্রাইভার। এক মুঠো ছেঁড়া ন্যাতা দিয়ে ঘর্মাক্ত কপাল মুছে, রক্তাক্ত চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইঞ্জিনের চাপ-নির্দেশক যন্ত্রটার দিকে—যেন, তোলপাড়-করা প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছে সে সেইখানে। তারপরে রাগে বেপরোয়া হয়ে গাল পাড়ল একটা।

আরেকবার জল খেল আরতিওম। দু'জন লোকই একই কথা ভাবছে, কিন্তু কেউই উদ্বিগ্ন নীরবতাটুকু ভাঙতে পারছে না। আরতিওমের মনে পড়ল ঝুখ্‌রাইয়ের প্রশ্ন: 'আচ্ছা, ভাই, বলশেভিক পার্টি আর কমিউনিস্টদের ধারণা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?' আর, মনে পড়ল তার জবাবে নিজের উক্তি, 'আমি সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত, আমার ওপর নির্ভর করতে পারো...'

'সাহায্যটা করছি বটে বড় চমৎকার,' মনে মনে ভাবল সে, 'নিয়ে চলেছি পিটুনি ফৌজ...'

পলেন্তভ্‌স্কি এতক্ষণে আরতিওমের পাশে টুল-বাক্সটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। শুক্‌নো গলায় সে বলল, 'ওই লোকটাকে খতম করে দিতে হবে, বুঝলে?'

চমকে উঠল আরতিওম। পলেন্তভ্‌স্কি দাঁত চেপে বলল, 'আর কোন উপায় নেই। মাথায় মারতে হবে ওর, তারপরে ইঞ্জিনের বাষ্পনালীটা আর লেভারগুলো খুলে নিয়ে চুল্লিতে ফেলে দিয়ে, বাষ্পটাকে বের করে দিয়েই নেমে পড়তে হবে।'

একটা ভারি বোঝা যেন কাঁধ থেকে নেমে গেল আরতিওমের—বলল, 'ঠিক!'

ব্রুঝাকের দিকে ঝুঁকে আরতিওম তাকে সিদ্ধান্তটা জানাল।

তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না ব্রুঝাক। তিনজনেই একটা বিরাট ঝুঁকি নিতে চলেছে। প্রত্যেকেরই বাড়িতে এক-একটা পরিবারের কথা ভাববার আছে। পলেন্তভ্‌স্কিরটাই সবচেয়ে বড়ো: ন'জন পোষ্য তার। কিন্তু তিনজনেই জানে ট্রেনটাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে কিছুতেই পারে না তারা।

'বেশ, আমি আছি তোমাদের সঙ্গে,' বলল ব্রুঝাক, 'কিন্তু ওটার কি ব্যবস্থা? কে ওকে...' কথাটা শেষ করল না সে. কিন্তু মানেটা আরতিওমের কাছে যথেষ্টই স্পষ্ট।

বাষ্পনালীটা নিয়ে ব্যস্ত পলেস্তভ্স্কির দিকে ফিরল আরতিওম, ঘাড় নেড়ে জানাল ব্রুঝাক তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত-না-হওয়া একটা প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে বুড়ো মানুষটার দিকে সে এগিয়ে এল।

'কিন্তু কী ভাবে?'

পলেস্তভ্স্কি তাকাল আরতিওমের দিকে, 'তুমি লাগো আগে। তোমার গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি, আমরা শাবলটা দিয়ে ঘা লাগাব, ঢুকে যাবে।' বৃদ্ধ ভয়ানক উত্তেজিত।

ভুরু কুঁচকাল আরতিওম, 'আমি তা পারব না। না। শেষ পর্যন্ত যদি ভেবে দেখো, এই লোকটার দোষ নেই কোন। ওকেও তো জোর করে বেয়নেট দেখিয়ে লাগানো হয়েছে এই কাজে।'

চোখে আগুন জ্বলে উঠল পলেস্তভ্স্কির, 'দোষ নেই বলছ? আমরাও যে বাধ্য হয়ে এই কাজটা করছি, তাতে আমাদেরও কোনো দোষ নেই। কিন্তু ভুলে যেও না, আমরা নিয়ে চলেছি একটা পিটুনি ফৌজ। এই সব 'নির্দোষ' সৈন্যরা আমাদের পার্টিজানদের গুলি করে মারতে চলেছে। তাহলে কি পার্টিজানদের দোষ? না হে ছোকরা, ভালুকের মতো জোয়ান তুমি, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার একটু কম...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভাঙা গলায় বলল আরতিওম। শাবলটা তুলে নিল সে।

কিন্তু পলেস্তভ্স্কি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'আমি করছি ওটা, সেটা বরং আরও ভাল হবে। তুমি বেল্‌চাটা নিয়ে উঠে যাও কয়লাবাক্স থেকে কয়লা দেবার জন্যে। দরকার হলে তুমি এক ঘা দেবে বেল্‌চাটা দিয়ে। আমি কয়লা ভাঙার ভান করব।'

ব্রুঝাক্ কথাটা শুনে মাথা নেড়ে সায় দিল। 'ঠিক বলেছো বুড়ো,' বলে সে বাষ্পনালীটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লাল বেড় দেওয়া সামরিক টুপি পরে জার্মান সৈনিকটা বসেছিল কয়লা রাখার গাড়িটার ওপরে। দু'পায়ের মাঝে রাইফেলটা রেখে চুরুট খাচ্ছে সে। ইঞ্জিন-চালানেওয়ালা এই তিনজন লোকের কাজকর্মের দিকে সে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিল।

কয়লা রাখার গাড়িটার ওপরে যখন আরতিওম উঠে আসে, তখন সান্ত্রীটা বিশেষ কোন নজর দেয় নি। তারপরে, পলেন্তভ্স্কি যখন কয়লার স্তূপটার ওপাশে বড়ো বড়ো চাঙড়গুলো নেবার ভান করে তাকে সরে যাবার ইসারা করল, তখন জার্মানটা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে ইঞ্জিনের দিকে সরে এল।

শাবলের আঘাতে জার্মানটার খুলি ফেটে যাবার হঠাৎ একটা শব্দে চম্‌কে লাফিয়ে উঠল আরতিওম আর ব্রুঝাক, যেন গরম লোহার ছোঁয়া লেগেছে তাদের গায়ে। ন্যাতার মতো গড়িয়ে গেল সান্ত্রীর দেহটা। দ্রুত রক্তের স্রোত গড়াল ধূসর পশমের টুপিটার ফাঁকে, কয়লা গাড়ির লোহার দেয়ালে ঠুকে গেল তার রাইফেলটা।

'খতম,' শাবলটা রেখে ফিসফিসিয়ে বলল পলেন্তভ্স্কি, 'এখন আর আমাদের পিছিয়ে যাবার পথ নেই।'

তার মুখখানা হেঁচকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তারপর চাপা নীরবতা ভেঙে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'বাষ্পনালীটার প্যাঁচ খুলে দাও, জল্‌দি!'

দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজটা। ট্রেনটা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে তার।

ঘন আঁধারে ঘেরা দু'পাশের গাছগুলো ইঞ্জিনের আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে পরক্ষণেই আবার মিশে যাচ্ছে পেছনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। হেডলাইটগুলো বৃথাই চেষ্টা করছে রাত্রির ঘন যবনিকাকে ভেঙ্গে দিতে, সামনের দিকে মাত্র কয়েক

গজ ফুঁড়ে যেতে পারছে। ক্রমশই ইঞ্জিনটার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ভারি হয়ে আসছে। গতিটা কমে আসছে, যেন তার শেষ শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেছে।

'লাফিয়ে পড়ো!' পেছনে পলেস্তভ্‌স্কির গলা শুনে আরতিওম হাতলটা ছেড়ে দিল। ট্রেনের গতিবেগ তার বলিষ্ঠ দেহটাকে সামনের দিকে এক ধাক্কায় ঠেলে দিল, তারপরে একটা ঝাঁকুনি খাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটিটা নিচ থেকে ওপরে উঠে এসে ঠেকে গেল তার পায়ে। দু'-এক পা দৌড়ে গিয়ে আরতিওম হোঁচট খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে গেল।

একই সঙ্গে আরও দুটো ছায়ামূর্তি লাফিয়ে নেমে গেল গাড়িটার দু'পাশ থেকে।

ব্রুঝাকের বাড়িতে গভীর বিষণ্নতা। সের্গেই-এর মা আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা গত চারদিন ধরে ভাবনায়-চিন্তায় প্রায় পাগল। কোন খবর নেই তার স্বামীর। শুধু এইটুকু সে জানে যে জার্মানরা তাকে করচাগিন আর পলেস্তভ্‌স্কির সঙ্গে একটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। গতকাল হেটম্যান তিন জন সান্ত্রী এসে বিশ্রীরকম গালমন্দ করে তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে গেছে।

ওদের কথা থেকে খুব অস্পষ্টভাবে সে বুঝেছে যে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভয়ানক উদ্বিগ্ন মনে, লোকগুলো চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সে মাথায় রুমালটা বেঁধে রওনা হল মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনার বাড়ি—যদি ওখানে তার স্বামীর কোন খবর পেতে পারে।

রান্নাঘরটা গোছগাছ করছিল তার বড় মেয়ে ভালিয়া, সে মাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ, মা?'

জল-ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা বলল, 'করচাগিনদের ওখানে। দেখি, ওরা হয়তো তোর বাবার খবর কিছু জানতে পারে। সের্গেই বাড়ি এলে বলিস, সে যেন স্টেশনে গিয়ে পলেস্তভ্স্কিদের ওখানে একবার দেখা করে আসে।'

মায়ের গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ভালিয়া। দরজার কাছে মাকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'ভেবো না, মাগো।'

বরাবরের মতোই মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনা সাদর অভ্যর্থনা জানাল আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনাকে। দু'জনেই আশা করেছিল যে অন্যজনের কাছে কিছু খবর পাওয়া যাবে, কিন্তু কথা বলতেই সে আশা মিলিয়ে গেল।

করচাগিনদের বাড়িতেও রাত্রে খানাতল্লাশি হয়ে গেছে। সৈন্যরা আরতিওমের খোঁজে এসেছিল। মারিয়া ইয়াকোভলেভনাকে বলে গেছে, তার ছেলে বাড়ি ফিরলেই যেন সে কম্যাণ্ড্যাটুরে খবর দেয়।

সান্ত্রীর দলটা বাড়িতে আসতেই মারিয়া করচাগিনার ভয়ে প্রায় বুদ্ধি লোপ পাবার মতো হয়েছিল। বাড়িতে সে একা, পাভেল রাত্রির শিফ্টে বিদ্যুৎ-স্টেশনে ছিল সাধারণত যেমন থাকে।

ভোরবেলায় কাজ থেকে ফিরে মার কাছ থেকে তল্লাশির কথা শুনে পাভেলের দারুণ দুশ্চিন্তা হল দাদার নিরাপত্তার জন্যে। দুই ভাইয়ের চরিত্রের অমিল আর আরতিওমের আপাত কঠোরতা সত্ত্বেও, তাদের দু'জনের মধ্যে একটা গভীর টান আছে। এ ভালোবাসা দৃঢ়, কিন্তু সেটার কোন বাহ্যিক প্রদর্শনী নেই। পাভেল জানে, ভাইয়ের জন্যে কোন রকম আত্মদানেই সে ইতস্ততঃ করবে না।

জিরিয়ে নেবার জন্যে না বসেই পাভেল স্টেশনে ছুটে এল ঝুখ্‌রাইয়ের খোঁজে। তাকে পাওয়া গেল না। অন্যান্য চেনা শ্রমিকও বেপাত্তা মানুষগুলোর খবর কিছু বলতে পারল না। ইঞ্জিনচালক পলেন্তভ্‌স্কির পরিবারও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। উঠোনে তার ছোট ছেলে বরিসের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, ওর কাছ থেকে সে শুধু এইটুকুই জানতে পারল যে রাত্রিবেলায় তাদের বাড়িতেও খানাতল্লাশি হয়ে গেছে। ফৌজের লোকজন পলেন্তভ্‌স্কিকে খুঁজছে।

মাকে দেবার মতো কোন খবর না পেয়েই পাভেল ফিরে এল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে শয়ে পড়ল বিছানাটায়, সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে গেল গভীর ঘুমে।

দরজাটায় ঘা পড়তেই মুখ তুলে তাকাল ভালিয়া। আগলটা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

খোলা দরজাটার ফাঁকে ক্লিমকা মারচেঙ্কোর উষ্কখুষ্ক লাল-চুলওয়ালা মাথাটা দেখা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল সে ছুটে এসেছে—হাঁফাচ্ছে আর লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ দৌড়ানোর পরিশ্রমে। ভালিয়াকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার মা বাড়ি আছেন?'

'না, বেরিয়ে গেছেন।'

'কোথায়?'

'করচাগিনদের বাড়ি বোধ হয়।' ক্লিমকা যেই ছুটে বেরিয়ে যাবে, অমনি তার জামার হাতাটা চেপে ধরল ভালিয়া।

ইতস্তত করে মেয়েটার দিকে তাকাল ক্লিমকা।

'একটা দরকারে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই,' সাহস করে বলল ক্লিমকা।

'কী ব্যাপার?' ভালিয়া ছাড়ল না তাকে, 'শিগ্‌গির বল্‌,

লালমাথা ভালুক কোথাকার, ভাবনার মধ্যে ফেলিস না, বলছি।' হুকুমের স্বরে বলল মেয়েটা।

ঝুখ্‌রাইয়ের সাবধানবাণী ভুলে গেল ক্লিমকা। বিশেষ করে বলে দিয়েছিল সে, একমাত্র আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনার হাতেই যেন সে চিরকুটটা দেয়। পকেট থেকে এক টুকরো ময়লা কাগজ বের করে ক্লিমকা ভালিয়ার হাতে দিল। সের্গেই-এর এই সুন্দর-চুল বোনটাকে সে কখনও 'না' বলতে পারে না—সত্যি বলতে কি, এই মেয়েটার প্রতি তার একটু দুর্বলতা আছে। অবশ্য, ভালিয়াকে যে তার ভাল লাগে, সেটা এমন কি নিজের কাছেও বলার মতো সাহসও তার নেই। কাগজটা তাড়াতাড়ি পড়ল ভালিয়া:

> 'তনিয়া! কিছু ভাবনা কোর না। খবর সব ভাল। আমরা নিরাপদে ভাল আছি। শিগ্‌গিরই আরও খবর পাবে। অন্যদের জানিয়ে দিও—সব ঠিক আছে, তাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই চিরকুটটা নষ্ট করে ফেলো।
>
> জাখার।'

ভালিয়া ছুটে এল ক্লিমকার কাছে, 'ছোট্ট লাল ভালুক আমার! কোথা থেকে পেলে এটা? কে দিয়েছে এটা?' বলতে বলতে সে ক্লিমকাকে এমন জোরে ঝাঁকানি দিল যে সে তার উপস্থিতবুদ্ধি হারিয়ে, নিজে বুঝতে পারার আগেই, দ্বিতীয় ভুলটা করে বসল।

'ঝুখ্‌রাই স্টেশনে এটা আমাকে দিয়েছে।' তারপরেই কথাটা যে তার বলা উচিত হয় নি সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'কিন্তু তোমার মাকে ছাড়া আর কাউকে এটা দিতে সে আমাকে বারণ করেছে।'

'ঠিক আছে,' হেসে উঠল ভালিয়া, 'আমি কাউকে বলব না। আচ্ছা, তাহলে ছোট্ট লক্ষ্মী ভালুকটি, ছুটে যাও পাভেলদের বাড়ি, ওখানে পাবে মাকে।' আস্তে একটা ধাক্কা দিল সে ক্লিমকার পিঠে। মুহূর্তের মধ্যে বাগানের বেড়াটার বাইরে ক্লিমকার লাল মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনজন রেলকর্মীর কেউই বাড়ি ফিরল না। সন্ধ্যার দিকে ঝুখ্‌রাই করচাগিনদের বাড়ি এসে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনাকে ট্রেনের ঘটনাটা সব বলল। আতঙ্কিত মাকে শান্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে। বারবার করে তাকে বলল, তিনজনেই নিরাপদে আছে ব্রুঝাকের কাকার বাড়িতে এমন একটা গ্রামে যেটা একটু চল্‌তিপথের বাইরে। এখন অবশ্য তারা ফিরতে পারবে না, কিন্তু জার্মানরা বেশ একটু মুশকিলে পড়েছে এবং যে-কোন দিন অবস্থা বদ্‌লে যেতে পারে।

মানুষ তিনটি অদৃশ্য হয়ে যাবার ফলে তাদের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল আগেকার চেয়ে। ওদের কাছ থেকে ক্বচিৎ কখনও যে সব চিঠিপত্র আসে, তা এরা সবাই আনন্দ করে পড়ে, কিন্তু ওরা না থাকায় বাড়ি ফাঁকা আর বিষণ্ণ বলে মনে হয়।

একদিন ঝুখ্‌রাই পলেন্তভ্‌স্কির স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এল—ভাবখানা যেন সে এই দিক দিয়েই যাচ্ছিল। কিছু টাকা দিল তাকে।

'এই কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছে আপনার স্বামী আপনার চালাবার মতো,' বলল সে, 'শুধু দেখবেন, আর কারুর কাছে বলবেন না কথাটা।'

সকৃতজ্ঞভাবে তার হাতখানা চেপে ধরে বৃদ্ধা বললেন, 'ধন্যবাদ! ভয়ানক দরকার পড়েছিল আমাদের। ছেলেমেয়েদের খেতে দেবার মতোও কিছু নেই।'

আসলে, বুলগাকভ যে টাকাটা রেখে গিয়েছিলেন, তার থেকেই এটা দিল ঝুখ্‌রাই।

স্টেশনে ফিরে যেতে যেতে মনে মনে বলল ঝুখ্‌রাই, 'দেখা যাক, কতদূর কি হয়। গুলির ভয়ে যদিও বা ধর্মঘট ভেঙে গেছে, শ্রমিকেরা কাজে ফিরে গেছে, তবু আগুন তো জ্বলে উঠেছে, সেটাকে আর নেভানো যাবে না। আর ওদের তিনজনের কথা যদি বলতে হয়, ওরা শক্ত মানুষ, সত্যিকারের প্রলেতারিয়ান।'

ভরোবিয়েভা বাল্‌কা গ্রামের বাইরের দিকে ছোট্ট একটা পুরনো কামারশালা। ধোঁয়ায় কালো তার সামনের দিকটা রাস্তামুখো। জ্বলন্ত হাপর-চুল্লিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলেন্তভ্‌স্কি, আগুনের আঁচে চোখ কুঁচ্‌কে গেছে। লাল করে তাতানো একটা লোহার পাত সে উল্টিয়ে দিল একটা লম্বা চিম্‌টে দিয়ে।

মাথার ওপরে একটা আড়কাঠ থেকে ঝোলানো হাপরটা টেনে টেনে চালাচ্ছিল আরতিওম।

'ইদানীং গ্রামে ভাল কাজ জানা মিস্ত্রী ঝামেলায় পড়বে না। অনেক কাজ আছে—যত চাও,' দাড়ির মধ্যে হেসে খুশি মনে বলছিল ইঞ্জিনচালক, 'আর দু-এক সপ্তাহ এরকম চালাতে পারলেই বাড়ির লোকজনদের কিছু গম আর মাংস পাঠাতে পারব। চাষীরা সব সময়েই কামারদের খাতির করে হে। দেখে নিও, পুঁজিপতিদের মতো খাব আমরা, হাঃ হাঃ। জাখারটা আমাদের থেকে একটু ভিন্ন রকম — কৃষকদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে ওর ওই খুড়োর মারফত ওর শিকড় আট্‌কেছে জোতজমিতে। না, আমি অবশ্য ওর দোষ দিয়ে বলছি না কথাটা। তুমি আর আমি, বুঝলে আরতিওম, আমাদের বাপু

সেই যে বলে না-আছে লাঙল, না-আছে জাঙল। শক্ত পিঠ আর একজোড়া হাত ছাড়া কিছুই নেই — যাকে বলে, চিরকালের প্রলেতারিয়ান, আমরা হচ্ছি তাই—হাঃ হাঃ। কিন্তু জাখারটার যেন দু'-নৌকায় পা—এক পা গাঁয়ে আর এক পা রেল-ইঞ্জিনে।' লাল করে তাতানো লোহাটা চিম্‌টেয় ধরে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে আরেকটু গম্ভীর হয়ে সে বলল, 'কিন্তু আমাদের ব্যাপার-স্যাপার ভাল মনে হচ্ছে না হে। জার্মানরা যদি অল্পদিনের মধ্যে সাবাড় না হয়, তাহলে আমাদের সরে পড়তে হবে ইয়েকাতেরিনস্লাভ কিংবা রস্তভ-এর দিকে। নইলে ধরা পড়ে যাব হয়তো, আর কিছু জানবার আগেই ঝুলতে থাকব শূন্যে স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে।'

'কথাটা বলেছ ঠিক,' অস্পষ্টভাবে বলল আরতিওম।

'ওখানে আমাদের লোকজন কী করছে জানতে পারলে হত। সৈনিকেরা ওদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কি-না তাই ভাবছি।'

'হ্যাঁ, আমাদের অবস্থাটা বড়ো বিশ্রী, খুড়ো। বাড়ি ফেরার চিন্তাটা আমাদের ছাড়তে হবে।'

চুল্লি থেকে নীল হয়ে আসা গনগনে উত্তপ্ত লোহাটা বের করে ইঞ্জিনচালক কুশলী হাতে টান দিয়ে এনে রাখল সেটাকে নেহাইটার ওপরে, 'পেটাও হে!'

ভারি হাতুড়িটা মাথার ওপরে তুলে আরতিওম সেটাকে সজোরে নামিয়ে আনল নেহাইটার বুকে। উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের একটা ফোয়ারা ছিটিয়ে পড়ল চতুর্দিকে হিস্‌হিস্‌ শব্দে, কামারশালার সবচেয়ে অন্ধকার কোণগুলো একমুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল।

জোবালো হাতুড়ি-পেটার ফাঁকে ফাঁকে পলেন্তভ্‌স্কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে থাকল লোহাটাকে আর একদলা নরম মোমের মতোই অবাধে চেপ্টে চেপ্টে যেতে লাগল লোহাটা।

কামারশালার খোলা দরজাটা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির উষ্ণ নিঃশ্বাস ভেসে এল।

নিচেই অন্ধকার হ্রদটা বিরাট। চারধারে সেটাকে ঘিরে পাইনগাছগুলো উঁচু মাথা দোলাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে তনিয়া ভাবল, 'ঠিক যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো।' তীরে গ্র্যানিট-পাথরের মধ্যে ঘাসে-নরম একটা নিচু জায়গায় শুয়েছিল সে। তার মাথার অনেক ওপরে খোঁদলটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ওধারে বনের আরম্ভ, নিচে উঁচু পাড়ের পায়ের কাছেই হ্রদ। চারধারে পাথরের খাড়া তীরের ছায়া চেপে এসে হ্রদের কালো জলে আরও কালো একটা বেড় দিয়েছে।

স্টেশনের একমাইল দূরে এই পুরন পাথরখনিটা তনিয়ার প্রিয় জায়গা। পাথর খুঁড়ে নেবার পরে পরিত্যক্ত গভীর খাদ থেকে জলের উৎস বেরিয়ে তিনটে হ্রদ জেগেছে এখানে। পাড়টা যেখানে জলে মিশেছে, সেইখানে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুনে তনিয়া মাথাটা তুলে সামনের ডালপালাগুলো সরিয়ে সেদিকে তাকাল। রোদে-পোড়া নমনীয় একটা দেহ বলিষ্ঠ বাহুবিক্ষেপে সাঁতার কেটে সরে যাচ্ছে তীরের দিক থেকে। সাঁতারুর বাদামী রঙের পিঠ আর কালো মাথাটা তনিয়ার চোখে পড়ল—বিরাট একটা জলজন্তুর মতো হাওয়া ছাড়ছে মুখ দিয়ে, জল কেটে চলেছে দ্রুতগতিতে, উল্টে যাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, ডুবে গিয়ে ভেসে উঠছে। তারপরে চিৎ হয়ে, হাত দুটো ছড়িয়ে, দেহটাকে একটু বেঁকিয়ে, উজ্জ্বল রোদে চোখ কুঁচকে ভেসে রইল। ফাঁক করে ধরা ডালপালাগুলো ছেড়ে দিয়ে তনিয়া মুখ নামিয়ে নিল। মনে মনে হেসে বলল, 'আর দেখাটা উচিত নয়।' বইটা ফের পড়া আরম্ভ করল সে।

লেশ্চিনস্কির দেওয়া এই বইটার মধ্যে সে একেবারে ডুবে গিয়েছিল, দেখতেই পায় নি যে পাইন-বন আর খোঁদলটার মাঝখানে গ্র্যানিট পাথরের খাড়াই বেয়ে কখন একজন উঠে এসেছে! আগন্তুকের অজান্তে একটা নুড়ি ঠেলা খেয়ে গড়িয়ে এসে যখন তনিয়ার বইটার ওপরে পড়ল, শুধু তখনই সে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল পাভেল করচাগিন তার সামনে দাঁড়িয়ে। পাভেলও একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল এই হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায়, কী করবে বুঝতে না পেরে সে চলে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

তার ভিজে চুল লক্ষ্য করে তনিয়া ভাবল, 'জলে ওকেই দেখেছি, নিশ্চয়।'

'চম্‌কে দিয়েছি নাকি? আমি জানতাম না তুমি এখানে রয়েছ।' পাথুরে তাকে হাত রাখল পাভেল, চিনতে পেরেছে সে তনিয়াকে।

'না, না, আমার কোন অসুবিধে হয় নি তোমার আসাতে। যদি আপত্তি না থাকে তো থাকো, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যাক।'

পাভেল অবাক হয়ে তাকাল তনিয়ার দিকে, 'কী কথা বলব?'

হাসল তনিয়া, 'বোসো না—এইখানটায়।' একটা পাথরের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম তোমার?'

'পাভ্‌কা করচাগিন।'

'আমার নাম তনিয়া। এই তো, আমাদের পরিচয় হয়ে গেল।'

অস্বস্তিতে পড়ে পাভেল তার টুপিটা দুমড়াতে লাগল।

'তোমাকে বুঝি বলে পাভ্‌কা?' নীরবতা ভেঙে বলল তনিয়া, 'পাভকা কেন? ভাল শোনাচ্ছে না ওটা, পাভেল তার চেয়ে ঢের ভালো। আমি তোমাকে তাই বলব—পাভেল। এখানে প্রায়ই এসে থাকো বুঝি...' বলতে যাচ্ছিল 'সাঁতার

কাটতে'—কিন্তু সে যে পাভেলকে জলে দেখেছে, সেটা চেপে যাওয়ার জন্যে তনিয়া বলল, 'বেড়াতে?'

'না, প্রায়ই না। ছুটির সময় আসি।' বলল পাভেল।

'ও, কাজ করো বুঝি কোথাও?' তনিয়া আর একটা প্রশ্ন করল।

'বিদ্যুৎ-স্টেশনে কয়লা-জোগানদারের কাজ।'

'আচ্ছা, অমন চমৎকার লড়তে শিখলে কোথায় বলো তো?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল তনিয়া।

'আমি মারামারি করি তাতে তোমার কী?' নিজের অনিচ্ছাতেই খেঁকিয়ে উঠল পাভেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, চটে যেও না,' তার প্রশ্নে পাভেল বিরক্ত হয়েছে দেখে সে বলল তাড়াতাড়ি, 'এমনি জানতে ইচ্ছে হল তাই। কী ঘুষিটাই ঝেড়েছিলে! অতোটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত হয় নি তোমার।' খিলখিল করে হেসে উঠল তনিয়া।

'ওর জন্যে দুঃখ হয়েছে বুঝি, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল পাভেল।

'মোটেই না। বরং ঠিকই হয়েছে সুখারকোর মার খাওয়াটা। খুব খুশি হয়েছিলাম আমি। শুনেছি, তুমি নাকি প্রায়ই মারামারি বাধাও।'

'কে বলেছে?' কান খাড়া করল পাভেল।

'এই তো, ভিক্তর লেশ্চিনস্কি বলছিল, তুমি নাকি পেশাদার মারকুটে।'

মুখ-চোখ আঁধার হয়ে এল পাভেলের, 'ভিক্তরটা একটা নাদুসনুদুস শুয়োর। কপাল ভালো ওর যে সেদিন ও আমার হাতে মার খায় নি। আমার সম্বন্ধে ও যা বলেছিল সেটা শুনেছিলাম, কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করতে চাই নি আমি।'

'ও রকম ভাষায় কথা বোলো না পাভেল, ওটা ভাল নয়,' তাকে বাধা দিল তনিয়া।

চটে উঠল পাভেল। মনে মনে ভাবল, 'এই বড়লোকের অদ্ভুত মেয়েটার সঙ্গে কেন যে কথা বললাম! দিব্যি হুকুম চালাচ্ছে: প্রথমে ওর 'পাভকা' পছন্দ হল না, এখন আবার আমার ভাষার দোষ ধরছে।'

'লেশ্চিনস্কির ওপরে তুমি এত চটা কেন?' জিজ্ঞেস করল তনিয়া।

'ও একটা খুকি, আদুরে গোপাল, এতটুকু হিম্মৎ নেই। এ ধরনের ছেলে দেখলেই আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করে। চালচলনটা সবসময় তোমার ওপরওয়ালার মতো। ভাবখানা, যেন বড়লোক বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। পয়সা আছে, তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। হাত দিয়ে দেখুক একবার আমার গায়ে, উচিত মতো শিক্ষা পেয়ে যাবে একচোট। এ ধরনের ছেলে দেখলেই ঝাড়তে ইচ্ছে করে একটা ঘুষি চোয়ালের ওপর,' ক্ষেপে গিয়ে বলেই চলল পাভেল।

লেশ্চিনস্কির প্রসঙ্গ তুলেছে বলে আপসোস হল তনিয়ার। বুঝতে পারল সে, ওই কেতাদুরস্ত শৌখিন স্কুলের ছেলেটার সঙ্গে এই তরুণটির অনেকদিনের পুরনো ঝগড়া ফয়সালা করবার আছে। কথাবার্তা আরও সহজ খাদে চালাবার জন্যে সে পাভেলকে তার পরিবার আর কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

নিজের অজান্তেই পাভেল মেয়েটার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে থাকল অত্যন্ত বিশদভাবে। ভুলেই গেছে যে সে চলে যেতে চাচ্ছিল।

'পড়াশোনা চালিয়ে গেলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল তনিয়া।

'ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল যে।'

'কেন?'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল পাভেল, 'পাদ্রীটার কেক তৈরির ময়দায় তামাকের গ‍ুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম বলে। ভারি পাজি লোক ওই পাদ্রীটা। জ্বালিয়ে মারে লোকটা সবাইকে।' পাভেল পুরো ঘটনাটা বলে গেল।

আগ্রহের সঙ্গে শুনল তনিয়া। প্রাথমিক লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে পাভেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এমনভাবে কথাবার্তা চালাল যেন তনিয়া তার পুরনো পরিচিত কেউ। নানা কথার মধ্যে সে তার দাদার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা বলল। খোঁদলটার মধ্যে বসে অন্তরঙ্গ গল্পে জমে গিয়ে দু'জনের কেউই লক্ষ্য করে নি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যাচ্ছে। শেষে পাভেল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

'কাজে যাবার সময় বয়ে গেছে। এখানে বসে গল্প না করে আমার এতক্ষণে বয়লারে আগুন দেওয়া উচিত ছিল। দানিলো ওদিকে নিশ্চয়ই চেঁচামেচি আরম্ভ করবে।' আবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে সে বলল, 'আচ্ছা, চলি তাহলে। আমাকে এবার দৌড়াতে হবে শহরের দিকে।'

তনিয়াও লাফিয়ে উঠে জ্যাকেটটা পরে নিল, 'আমাকেও যেতে হবে। চলো, একসঙ্গে যাই।'

'না, তা কী করে হবে? আমাকে দৌড়ে যেতে হবে যে।'

'আচ্ছা বেশ, আমিও দৌড়ে পাল্লা দেবো তোমার সঙ্গে। দেখা যাক, কে আগে পেঁছিতে পারে।'

অবজ্ঞার চোখে তার দিকে তাকাল পাভেল, 'আমার সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেবে? মোটেই পেরে উঠবে না।'

'দেখা যাক। চলো এখান থেকে বেরুই আগে।'

পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল পাভেল, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল তনিয়ার দিকে। দু'জনে দৌড়ে বন পেরিয়ে এসে

পড়ল স্টেশনের দিকে যাবার চওড়া আর সমতল ফাঁকা জায়গাটায়।

তনিয়া থেমে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

'এসো, এবার দৌড়ানো যাক। এক, দুই, তিন! পারো তো ধরো দিকি আমাকে!' ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে গেল তনিয়া রাস্তা বেয়ে তার জুতোর শুকতালায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়ে। নীল জ্যাকেটের প্রান্তটা তার উড়তে লাগল হাওয়ায়।

পাভেল ছুটে চলল তার পেছনে।

উড়ন্ত জ্যাকেটটার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ভেবেছিল পাভেল, 'দুই ঝাড়া দিয়েই ধরে ফেলব ওকে,' কিন্তু রাস্তাটার একেবারে শেষে স্টেশনের কাছ পর্যন্ত এসে তবে সে তনিয়াকে ধরতে পারল। শেষের ঝোঁকটায় এগিয়ে এসে সে শক্ত দুই হাতে তনিয়ার কাঁধটা চেপে ধরল।

'এইবার! ধরে ফেলেছি!' খুশির চিৎকারে বলে উঠল পাভেল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'উঃ, লাগছে।' বাধা দিল তনিয়া।

দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'জনে হাঁপাতে হাঁপাতে, নাড়ির গতি বেড়ে গেছে তাদের। বেদম দৌড়িয়ে ক্লান্ত তনিয়া সেই মধুর সান্নিধ্যের মুহূর্তে এতো হাল্‌কাভাবে পাভেলের দেহে ভর দিয়েছিল যে পাভেল বহুদিন পর্যন্ত সেটা ভুলতে পারে নি।

'এর আগে আমাকে কেউ ধরতে পারে নি।' পাভেলের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বলল তনিয়া।

এইভাবে আলাদা হয়ে গেল তারা। হাতের টুপিটা বিদায়ের ভঙ্গিতে নেড়ে পাভেল দৌড় দিল শহরের দিকে।

বয়লার-ঘরের দরজাটা যখন সে ঠেলে খুলল, তার আগে থেকেই স্টোকার দানিলো লেগে গিয়েছিল।

'আরও দেরি করে আসতে পারলে না?' খেঁকিয়ে উঠল

সে, 'তোমার কাজটাজ সব আমাকেই করে দিতে হবে না-কি?'

পাভেল তার পিঠ চাপড়ে দিল তাকে শান্ত করবার জন্যে। খুশির সঙ্গে বলল, 'এক্ষুণি এক ফুঁয়ে গন্‌গনে আঁচ বের করে দিচ্ছি, দেখো না!' জালানি কাঠ জড়ো করতে লেগে গেল সে।

মাঝরাত্রের দিকে দানিলো যখন কাঠের স্তূপের ওপর আরামে নাক ডাকাচ্ছে, পাভেল তখন ইঞ্জিনটায় তেল দিয়ে, ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটুলিটায় হাত মুছে, টুলবাক্সটার ভেতর থেকে বের করে নিল 'জুসেপে গ্যারিবল্ডি' বইটির বাষট্টি নম্বর কিস্তি। ইতালির নেপল্‌স্‌ শহরের 'লাল-কোর্তা'দের এই নেতার সম্বন্ধে লোকমুখে প্রচলিত নানান্‌ বিচিত্র দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ-কাহিনীর মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডুবে গেল সে।

'সুন্দর নীল তার চোখ দুটি তুলে সে তাকাল ডিউকের দিকে...'

'তনিয়ারও চোখ দুটি নীল,' ভাবল পাভেল, 'আর ও একটু আলাদা ধরনেরও বটে, মোটেই বড়লোকের মেয়ের মতো নয়। আর, কি দারুণ দৌড়তে পারে!'

তনিয়ার সঙ্গে তার সারাদিনের আলাপ-পরিচয়-কথাবার্তার কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল পাভেল, সে লক্ষ্যই করে নি যে ওদিকে বাড়্‌তি বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনটার গোঙানির শব্দ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বড়ো চাকাটা ততক্ষণে ঘুরতে লেগেছে প্রচণ্ড বেগে, ইঞ্জিনটা যার ওপরে বসানো আছে সেই কংক্রিটের গাঁথুনিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

চাপ-মাপার যন্ত্রটার দিকে এক-চোখ তাকিয়েই পাভেল দেখতে পেল---সাবধান-সংকেতের লাল রেখাটার কয়েক বিন্দু ওপরে উঠে গেছে কাঁটাটা।

'ধুত্তোরি ছাই!' একলাফে পাভেল এগিয়ে এল বাড়্‌তি বাষ্প বের করে দেবার বাইল্‌টার দিকে। হাতলটায় তাড়াতাড়ি

দুটো পাক দিয়ে দিল, বাষ্পটা নল বেয়ে সবেগে হিস্‌হিস্‌ শব্দে বেরিয়ে এসে পড়ল বয়লার-ঘরের বাইরে নদীর বুকে। লিভারটায় এক টান দিয়ে চামড়ার পট্টিটা পরিয়ে দিল পাম্পের চাকায়।

দানিলোর দিকে একবার তাকাল পাভেল, কিন্তু সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, নাক ডাকছে ভীষণ শব্দে। আধ মিনিটের মধ্যেই চাপ-মাপার যন্ত্রের কাঁটাটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেল।

পাভেল ভিন্ন পথে চলে যাবার পর, কালো-চোখ এই তরুণটির সঙ্গে আজকের আলাপের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে তনিয়া চলল তার বাড়িমুখো। পাভেলের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে নিজের অজানতেই খুশি হয়ে উঠেছে তনিয়ার মন। 'কী উচ্ছল প্রাণশক্তি ছেলেটার! আর, আমি যা ভেবেছিলাম সেরকম গোঁয়ার-গোবিন্দ ও তো মোটেই নয়! আর যাই হোক, ওই সব ইস্কুলে-পড়া চ্যাংড়া ছেলেগুলোর মতো নয় একেবারেই...'

পাভেলের মনের গড়নটা অন্য রকম, এমন একটা পরিবেশ থেকে সে এসেছে যেটা তনিয়ার কাছে একেবারেই অপরিচিত।

'কিন্তু বাগ মানিয়ে নিতে পারা যাবে ওকে,' মনে মনে ভাবল তনিয়া, 'বেশ হবে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা হলে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে তনিয়া দেখতে পেল—বাগানে বসে আছে লিজা সুখারকো, নেলি আর ভিক্তর লেশ্চিনস্কি। ভিক্তর কী একটা পড়ছিল। ওরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছে বোঝা গেল।

সম্ভাষণ-বিনিময়ের পর তনিয়া একটা বেঞ্চির ওপরে বসল। এদের অন্তঃসারশূন্য গালগল্পের মাঝখানে একসময় ভিক্তর

তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যে উপন্যাসটা দিয়েছিলাম, সেটা পড়েছ?'

'উপন্যাস?' হঠাৎ মনে পড়ল তনিয়া, 'ও, বইটা আমি...' প্রায় বলে ফেলেছিল আর-কি যে সে বইটা ভুলে ফেলে এসেছে হ্রদের ধারে।

প্রশ্নভরা চোখে ভিক্তর তাকাল তার দিকে, 'প্রেমের গল্পটা ভাল লেগেছে তোমার?'

এক মুহূর্তের জন্যে ভাবনায় ডুবে গেল তনিয়া, তারপর জুতোর মাথাটা দিয়ে রাস্তাটার ধুলোর বুকে একটা জটিল রেখার আঁচড় কাটতে কাটতে মাথা তুলে তাকাল সে ভিক্তরের দিকে, 'না, আমি ওর চেয়েও ঢের ভালো একটা প্রেমের গল্প আরম্ভ করেছি।'

'তাই নাকি?' টেনে টেনে বলল ভিক্তর বিরক্ত হয়ে, 'কার লেখা বইটা?'

উজ্জ্বল উপহাসভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে তনিয়া বলল, 'কারুর লেখা নয়...'

বারান্দা থেকে তনিয়ার মা ডাকলেন, 'তনিয়া, তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়, চা দেওয়া হয়েছে।'

নেলি আর লিজার হাত ধরে তনিয়া ওদের নিয়ে এল বাড়ির ভেতরে। তনিয়ার কথাগুলোর মানে বুঝতে না পেরে ওদের পেছনে পেছনে আসবার সময় ভারি ধোঁকায় পড়ল ভিক্তর।

এই নতুন আর অদ্ভুত অনুভূতিটা পাভেলকে তার অজানতেই পেয়ে বসেছে, তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই তার বিদ্রোহী স্বভাব বেশ কিছুটা নাড়া খেয়েছে।

তনিয়ার বাবা প্রধান বনপরিদর্শক। পাভেলের দিক থেকে এটার মানে—তনিয়ার বাবা আর উকিল লেশ্চিন্স্কি বলতে গেলে সমশ্রেণীর মানুষ।

পাভেল মানুষ হয়ে উঠেছে দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে। কাউকে বড়লোক বলে মনে হলেই তার প্রতি পাভেলের মনে একটা বিরুদ্ধতা জাগে। সুতরাং তনিয়ার প্রতি তার মনোভাবটা হল সংশয় আর সাবধানতা মেশানো। তনিয়া তাদের নিজেদের একজন নয়—যেমন, ধরা যাক, রাজমিস্ত্রীর মেয়ে ওই গালোচ্‌কার মতো তনিয়া সরল আর সহজবোধ্য নয়। তনিয়ার সান্নিধ্যে পাভেলকে সব সময় সচেতন থাকতে হয়—ওর মতো সুন্দরী আর সুশিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে পাভেলের মতো একজন সামান্য কয়লা-জোগানদার মজুরকে বিদ্রূপ করে কিংবা অনুগ্রহ করে কিছু বলে বসাটা আশ্চর্য নয় বলেই পাভেলও তনিয়ার ওই ধরনের কোন কথার উপযুক্ত পাল্টা জবাব দেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে মনে মনে।

পুরো একটা সপ্তাহ তনিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। তাই আজ পাভেল হ্রদের দিকে যাবে বলে ঠিক করল। ইচ্ছে করেই সে তনিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরল, যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই আশায়। বেড়াটার ধার ঘেঁষে সে যখন আস্তে আস্তে চলেছে, তখন বাগানের শেষ প্রান্তে সেই পরিচিত নাবিক-ধাঁচের ব্লাউজটা দেখতে পেল। পথের ওপর থেকে একটা পাইন-কুঁড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সাদা ব্লাউজটা লক্ষ্য করে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে ছুটে এল তনিয়া বেড়ার কাছে, উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে হাতটা বাড়িয়ে দিল বেড়ার ওপারে।

‘এসেছ তাহলে শেষ পর্যন্ত,’ খুশিভরা গলায় বলল সে, ‘কোথায় ছিলে এতদিন? হ্রদের ওদিকে গিয়েছিলাম ফেলে-

আসা বইটা নিয়ে আসবার জন্যে। ভেবেছিলাম হয়তো তোমার দেখা পাব ওখানে। ভেতরে এসো না।'

মাথা নাড়ল পাভেল, 'না।'

'কেন?' বিস্ময়ে ভুরু তুলল তনিয়া।

'তোমার বাবা পছন্দ করবেন না নিশ্চয়। আমার মতো একটা গরিব ওঁচা লোককে বাগানে ঢুকতে দেবার জন্যে তিনি নিশ্চয় তোমার ওপরে ভীষণ বকাঝকা করবেন।'

'কি বাজে বক্‌ছ, পাভেল,' চটে গিয়ে বলল তনিয়া, 'এক্ষুণি এসো ভেতরে, আমার বাবা ওসব কিছুই বলবেন না। দেখতেই পাবে। এসো, ভেতরে এসো।'

দেউড়িটা খুলে দেবার জন্যে ছুটে এল তনিয়া। অনিশ্চিতভাবে বাগানে ঢুকল পাভেল।

বাগানের মধ্যে একটা গোল টেবিলের ধারে দু'জনে বসার পর তনিয়া জিজ্ঞেস করল, 'বই ভালোবাসো তুমি?'

সাগ্রহে বলল পাভেল, 'খুব।'

'কী বই তোমার সবচেয়ে পছন্দ?'

দু'-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে উত্তর দিল পাভেল, 'জীজেপ্প গারিবল্‌ডি।'

'জুসেপে গ্যারিবল্ডি,' সংশোধন করে দিল তনিয়া, 'ওই বইটা তোমার খুব ভালো লাগে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি বইটার আটষট্টিটা কিস্তির সবগুলো পড়েছি। আমি প্রত্যেক হপ্তা মজুরি পাবার দিনে পাঁচটা করে কিস্তি কিনি। গ্যারিবল্ডি—হ্যাঁ, একটা মানুষের মতো মানুষ!' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল পাভেল, 'সত্যিকারের বীর! একেই তো বলি সাচ্চা মানুষ একটা! কতগুলো লড়াই করতে হয়েছে লোকটাকে—আর প্রত্যেকটায় জিতেছে। দুনিয়ার সব দেশ ঘুরেছে! গ্যারিবল্ডি আজ বেঁচে থাকলে আমি ওঁর

দলে গিয়ে ঢুকতাম, সত্যি বলছি। গ্যারিবল্ডি তো যতসব মজুরদের তাঁর দলে নিতেন, আর তারা সবাই মিলে লড়াই করত গরিব মানুষদের জন্যে।'

'চলো, আমাদের লাইব্রেরিটা দেখাব তোমায়?' পাভেলের হাত ধরে বলল তনিয়া।

আপত্তি করল পাভেল, 'না, না। বাড়ির ভেতরে যাব না আমি।'

'এত গোঁয়ার্তুমি করো কেন? সংকোচের কী আছে?'

পাভেল তার খালি নোংরা পা দুটোর দিকে তাকিয়ে মাথাটা চুল্‌কোতে লাগল।

'তোমার বাবা কিংবা মা আমাকে বের করে দেবেন না তো?'

চটে গেল তনিয়া, 'এ রকম কথাবার্তা বললে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব আমি তোমার ওপর।'

'লেশ্চিনস্কিরা কিন্তু কক্ষণও আমাদের মতো লোকজনদের ঢুকতে দেয় না ওদের বাড়িতে। সবসময়ে খিড়্‌কির দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। আমি একবার কি-একটা কাজে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি, নেলি তো ঘরেই ঢুকতে দিল না—গালিচা নোংরা করে দেব কিংবা ওইরকম কিছু একটা করব ভেবে ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়ই,' হেসে বলল পাভেল।

'এসো, এসো,' তাগিদ দিল তনিয়া, পাভেলের কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল বারান্দাটার দিকে।

খাবার-ঘরটার মধ্যে দিয়ে ওকে নিয়ে এল আরেকটা ঘরে, সেখানে বিরাট একটা ওক-কাঠের আলমারি। তার পাল্লা দুটো খুলে ফেলতেই পাভেল দেখল তার সামনে পরিপাটি করে সাজানো সারি সারি অজস্র বই। এমন সম্পদ সে জীবনে কোনদিন দেখে নি।

'আচ্ছা, তোমার জন্যে একটা ভাল বই বেছে দিচ্ছি। কিন্তু কথা দাও — আরও বই নেবার জন্যে নিয়মিত আসবে তুমি, কেমন?'

সানন্দে মাথা নাড়ল পাভেল। বলল, 'বই আমি খুব ভালোবাসি।'

খুশিভরা কয়েকটি ঘণ্টা একসঙ্গে সেদিন কাটাল তারা। তনিয়া তার মায়ের সঙ্গে পাভেলের আলাপ করিয়ে দিল। পাভেল যে রকমটি ভেবে নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেরকম ভীষণ কিছু ব্যাপার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তনিয়ার মাকে তার ভালই লাগল বেশ।

তনিয়া তার নিজের ঘরে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে নিজের বইগুলো দেখাল।

প্রসাধনের টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটা আয়না। সেটার সামনে পাভেলকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটু হেসে উঠে বলল, 'মাথার চুলগুলো এমন বুনো ঝাড়ের মতো বাড়তে দিয়েছ কেন? চুলটা কি কখনো ছাঁটো না বা আঁচড়াও না?'

একটু অস্বস্তির সঙ্গে পাভেল বলল, 'বেশি বড়ো হয়ে গেলে স্রেফ্ কামিয়ে ফেলি। চুল নিয়ে আর কী করব?'

শুনে হাসল তনিয়া, টেবিলের ওপর থেকে একটা চিরুনি নিয়ে তাড়াতাড়ি বার কয়েক আঁচড়ে দিল উষ্কখুষ্ক লম্বা চুলগুলো। তারপরে নিজের কাজটা পরখ করে বলল, 'এইবার ঠিক হয়েছে। চুলটা ভালো করে ছাঁটবে, অমন ন্যালাখ্যাপার মতো ঝাঁকড়া-চুলো হয়ে বেড়াও কেন?'

পাভেলের বিবর্ণ খয়েরি রঙের জামা আর ময়লা প্যাণ্টের দিকে এক-নজর খুঁটিয়ে দেখে নিল তনিয়া, কিন্তু আর কোন মন্তব্য করল না।

তনিয়ার নজরটা লক্ষ্য করে পাভেল লজ্জা পেল তার জামাকাপড়ের কথা ভেবে।

বিদায় নেবার সময় তনিয়া তাকে আবার আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। পাভেলের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল যে সে আবার দু'দিন বাদে এসে তনিয়ার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে।

সরাসরি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে খুব সহজ উপায়েই পাভেল বেরিয়ে এল তনিয়ার বাড়ি থেকে। অন্য সব ঘরগুলো পার হয়ে তনিয়ার মার সঙ্গে দেখা করে আসার কথাটা তার মনেই হয় নি।

আরতিওম চলে যাবার পর থেকে করচাগিন-পরিবারে কষ্ট শুরু হয়েছে। পাভেলের মজুরি যথেষ্ট নয়।

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা পাভেলকে বলল, সে যদি আবার আগেকার মতো কাজে লাগে তাহলে কেমন হয়—বিশেষ করে যখন লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে একজন রাঁধুনির দরকার। কিন্তু পাভেলের তাতে মত নেই।

'না, মা। আমি একটা বাড়তি কাজ জোগাড় করে নেব। করাত-কলে ওরা লোক চায় কাঠের গুঁড়ি জড়ো করার জন্যে। আমি ওখানে আধা-রোজ করে কাজ করব, তাহলেই আমাদের চলে যাবার মতো যথেষ্ট রোজগার হবে এখন। তুমি কিছুতেই কাজে যেতে পাবে না, তাহলে তোমাকে না খাটিয়ে নিজে চালাতে পারি নি বলে আরতিওম রাগ করবে আমার ওপর।'

মা পীড়াপীড়ি করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাভেল গোঁ ধরে রইল।

পরের দিনই পাভেল করাত-কলে কাজে লেগে গেল—সদ্য-কাটা কাঠের তক্তাগুলো শুকোতে দেবার জন্যে জড়ো করা তার কাজ। চেনা কতকগুলো ছেলের সঙ্গে সেখানে তার দেখা—তার স্কুলের পুরনো সহপাঠী মিশা লেভচুকভ আর

ভানিয়া কুলেশভ। মিশা আর সে জুটি বেঁধে কাজ করতে শুরু করল, ঠিকে হিসেবে কাজ করে তাদের রোজগারও মন্দ দাঁড়াল না। করাত-কলে পাভেলের দিনটা কাটে, রাত্রিবেলায় সে যায় বিদ্যুৎ-স্টেশনের কাজে।

দশ দিনের দিন বিকেলে পাভেল তার রোজগার নিয়ে এল মায়ের কাছে। টাকাটা মায়ের হাতে দিয়ে একটু অস্বস্তির সঙ্গে ইতস্তত করে লজ্জায় মুখ রাঙা করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'ইয়ে, এই বলছিলাম কি, আমাকে একটা সাটিনের জামা কিনে দাও না, মা--নীল রঙের--গেল বছরে যেমনটি দিয়েছিলে, মনে আছে তো? প্রায় অর্ধেকটা টাকাই লেগে যাবে অবশ্য--কিন্তু তুমি ভেব না, আমি আরও কিছু রোজগার করব। আমার এই জামাটা একেবারে পচে গেছে।' তাড়াতাড়ি বলল সে, যেন এই অনুরোধ করার জন্যে মাপ চাইছে।

'সে কি রে, নিশ্চয়, কিনব বৈকি,' বলল মা, 'আজই কাপড়টা কিনে আনব, বুঝলি পাভ্লুশা, কাল দেব সেলাই করে। সত্যিই তোর একটা নতুন জামার বড়ো দরকার।' সস্নেহে সে তাকাল ছেলের দিকে।

চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানটার সামনে একটু থেমে পকেটের ভেতরে রুবলটা নাড়াচাড়া করতে করতে পাভেল দাঁড়াল দরজাটার মুখে।

নাপিত বেশ চৌকষ-চেহারার এক তরুণ। পাভেলকে ঢুকতে দেখে তাকে খালি চেয়ারটা মাথা নেড়ে দেখিয়ে বলল, 'এর পরে যিনি আছেন, আসুন।'

নরম উঁচু চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসে পাভেল তার সামনের আয়নায় একটা অপ্রতিভ রাঙা মুখ দেখতে পেল।

নাপিত জিজ্ঞেস করল, 'ছোট করে ছেঁটে দেব?'

'হ্যাঁ... মানে, না—এই কি বলে গিয়ে—আমি চুলটা ছাঁটতে চাই আর কি—যাকে বলে গিয়ে...' থতমত খেয়ে চুপ করে গেল পাভেল, হাত নেড়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করল।

হাসল নাপিত, 'বুঝেছি।'

পনের মিনিট পরে দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত পাভেল বেরিয়ে এল—চুলটা তার পরিপাটি করে ছাঁটা আর আঁচড়ানো। অবাধ্য চুলগুলোকে বাগ মানাতে গিয়ে বেশ খাটতে হয়েছে নাপিতকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল আর চিরুনির জয় হয়েছে, খোঁচা খোঁচা চুলের গোছটা এখন দিব্যি বসে গেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল তার টুপিটা ঠেলে নামিয়ে দিল চোখের ওপর। 'কি জানি, মা আমাকে দেখে কি বলবে,' মনে মনে ভাবল সে।

একসঙ্গে মাছ ধরতে যাবার কথা পাভেল না রাখাতে তনিয়া বিরক্ত হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, 'ওই কয়লা-জোগানদার ছেলেটার অপরের সম্বন্ধে তেমন বিবেচনা নেই।' কিন্তু আরও কয়েকটা দিন কেটে যাবার পরেও যখন পাভেল এল না, তখন তনিয়া তার সঙ্গ পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

একদিন যখন সে বেড়াতে বেরুচ্ছে, এমন সময়ে তার মা তার ঘরে এসে বললেন, 'তোর সঙ্গে একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে তনিয়া, আসতে বলব না-কি?'

দরজার কাছে দেখা গেল পাভেলকে, চেহারা এত বদ্‌লে গেছে যে তনিয়া প্রথমে তাকে প্রায় চিনতেই পারে নি।

পরনে তার আন্‌কোরা নতুন সাটিনের জামা আর কালো প্যাণ্ট্, চক্‌চকে করে পালিশ করা তার বুট-জোড়া। তনিয়া

এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখে নিয়েছে, তার খোঁচা খোঁচা চুল পরিপাটিভাবে ছাঁটাই করা। ময়লা-নোংরা তরুণ মজুরটি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে একেবারে।

বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেকে সময়মতো সামলে নিল তনিয়া, কারণ পাভেল যে এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে সেটা বুঝতে পেরে সে আর তাকে বেশি লজ্জা দিতে চাইল না। পাভেলের চেহারায় পরিবর্তনটা লক্ষ্য না করার ভান করে সে তাকে বকতে শুরু করে দিল, 'মাছ ধরতে যাবার জন্যে এলে না কেন? এই বুঝি তোমার কথা রাখা? ছিঃ ছিঃ!'

'আমি একদিন করাত-কলে কাজ করছি, একেবারে আসবার সুযোগ পাই নি।'

এই জামা আর প্যাণ্টটা কিনবার জন্যে সে যে এই ক'দিন বেদম কাজ করেছে, সে কথা পাভেল তনিয়াকে বলতে পারল না।

তনিয়া অবশ্য ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল, পাভেলের ওপরে তার রাগ উবে গেল।

'চলো, পুকুরের ধারে বেড়াতে যাই,' বলল তনিয়া। বাগান ছাড়িয়ে তারা এসে পড়ল রাস্তার ওপরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাভেল তনিয়াকে বলতে শুরু করে দিয়েছে লেফ্‌টেন্যাণ্টের ঘর থেকে সেই পিস্তল-চুরির ঘটনাটা। তার এই মস্তবড়ো গোপনীয় কথাটা বন্ধুর মতো তনিয়ার কাছে সমস্ত বলল সে। শিগ্‌গিরই পাভেল একদিন তনিয়াকে নিয়ে বনের গভীর অঞ্চলে গিয়ে গুলি ছুঁড়ে শিকার-টিকার করবে এমন কথাও দিল।

তারপরে হঠাৎ বলে উঠল পাভেল, 'কিন্তু দেখো, কারুর কাছে আমাকে ফাঁস করে দিও না যেন।'

'আমি কক্ষণো কারুর কাছে তোমাকে ফাঁস করব না,' প্রতিজ্ঞা করল তনিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

গোটা ইউক্রেন জুড়ে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড, নির্মম শ্রেণীসংগ্রাম। ক্রমশই আরও বেশি বেশি করে লোক এগিয়ে আসছে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে, প্রত্যেকটি সংঘাত নতুন নতুন অংশীদারদের টেনে আনে।

নাগরিকদের সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন আর নেই।

কামানের গোলা ফাটার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছোট ছোট জীর্ণ বাড়িগুলো। নাগরিকরা জড়োসড়ো হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের মাটির নিচের ভাঁড়ারঘরে কিংবা পেছনের আঙিনায় খোঁড়া গর্তের মধ্যে।

নানান ছোপ আর নানান ছাঁদের পেৎলিউরা-দস্যুবাহিনী সমস্ত অঞ্চলটা ছেয়ে ফেলেছে। ছোট-বড়ো দলের নেতা, স্থানীয় গোষ্ঠী-সর্দার, গোলুব, আর্কেঞ্জেল, এঞ্জেল, গর্দিউস্ ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বোম্বেটের নেতৃত্বে যতোসব লুটেরা-দল বন্যার মতো নেমে এসেছে।

জারের সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসার, ইউক্রেনের দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, কিংবা যে-কোনো বেপরোয়া লোকই কিছু খুনী-ডাকাতকে জড়ো করামাত্র নিজেকে 'আতামান' বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে; কেউ কেউ তাদের নিজের নিজের সাধ্য, শক্তি আর সুযোগ অনুসারে যতোটা পারছে জায়গা দখল করে পেৎলিউরা-দলের হলদে-নীল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে নিচ্ছে।

হরেক রকমের এই দঙ্গলগুলিতে আরও জুটেছে কুলাকরা আর আতামান কোনোভালেৎসের ফৌজের গ্যালিসীয় সৈন্যরা। আর, এই সব বিভিন্ন দলের মধ্যে থেকে 'প্রধান আতামান'

পেৎলিউরা গড়ে তুলেছে তার সৈন্যবাহিনী। লাল পার্টিজান সৈন্যদলগুলি যখন এইসব 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের' আর কুলাক্‌দের দলবলের ওপর আক্রমণ চালাল, তখন হাজার হাজার ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে আর মেশিনগান, কামান ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যাওয়া গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

অস্থির, উত্তাল সেই ১৯১৯-এর এপ্রিল মাসে আতঙ্কে বুদ্ধিভ্রষ্ট কোনো ভদ্দরনাগরিক হয়তো সকালবেলায় ঘরের জানালার খড়খড়িটা খুলে ঘুমে ভারি চোখে চেয়ে মুখ বাড়িয়ে তার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করছে, 'আভ্‌তোনম পেত্রভিচ, বলতে পারেন আজ শহরের কর্তা কে?'

এবং আভ্‌তোনম পেত্রভিচ হয়তো তখন তার প্যাণ্ট আঁটসাঁট করে বাঁধতে বাঁধতে এদিকে-ওদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলে জবাব দিচ্ছে, 'জানি নে, আফানাস্‌ কিরিলোভিচ। রাত্রে কারা যেন ঢুকেছে শহরে—কারা, সেটা শিগগিরই জানতে পারব: যদি ওরা ইহুদিদের ধরে লুঠপাট শুরু করে, তাহলে বুঝব, ওরা পেৎলিউরার, আর, যদি ওই 'কমরেডদের' কেউ্ হয়, তাহলে ওদের কথাবার্তা ধরন-ধারণেই সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারব। আমি তো কার ছবি ঘরে টাঙাতে হবে সব সময় সেই দিকে লক্ষ্য রাখছি—আমাদের ওই পাশের বাড়ির গেরাসিম লেওন্তিয়েভিচের মতো যাতে আবার বিপদে পড়তে না হয়। জানেন তো, ভালো করে না দেখেশুনেই সে গিয়ে দিব্যি লেনিনের ছবি টাঙিয়ে বসে আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক এসে তাকে ধরেছে চেপে: দেখা গেল তারা পেৎলিউরার লোক। ছবিটার দিকে একনজর দেখেই ওরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল বেশ ঘা-কতক—তা প্রায় গোটা

কুড়ি চাবুক-আঘাত হবে; ওরা খেঁকিয়ে উঠল, 'জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব তোর, শুয়োরের বাচ্চা কমিউনিস্ট কোথাকার!' গেরাসিম যতোই চেঁচায় আর যতোই প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্যে, কিছুতেই কিছু হবার নয়।'

দলে দলে সশস্ত্র লোকজনদের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখলে জানলা বন্ধ করে লুকিয়ে পড়ে ভদ্দরনাগরিকরা। মনে মনে ভাবে, সাবধানের মার নেই...

শ্রমিকরা একটা চাপা ঘৃণার সঙ্গে দেখে পেৎলিউরা-ঠগীদের হলদে আর নীল ঝাণ্ডাটাকে। ইউক্রেনের এইসব উগ্র জাতীয়তাবাদী পোঁটি বুর্জোয়া স্রোতের সামনে তারা অসহায় বোধ করে। তাদের মনোবল ফিরে আসে আর উৎসাহ জাগে শুধু যখন কোনো লাল সৈন্যদল চারিদিক থেকে ঘিরে-আসা ওই পেৎলিউরা বাহিনীকে প্রচণ্ড লড়াই করে হঠিয়ে দিয়ে পথ কেটে এসে শহরের মধ্যে ঢোকে। দু'-এক দিনের জন্যে শ্রমিকের অতিপ্রিয় লাল ঝাণ্ডাটা ওড়ে টাউন-হলের মাথায়, কিন্তু তার পরেই দলটা এগিয়ে যায় আর আবার নিরানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সব কিছু।

ইদানীং শহরটা আছে কর্নেল গোলুব-এর হাতে — নীপার-পারের ডিভিশনের 'আশা আর গর্ব' কর্নেল গোলুব্।

আগের দিন তার হাজার দুয়েক খুনী-ডাকাতের একটা বাহিনী বিজয়-অভিযান করে শহরে ঢুকেছে। অতি সুন্দর একটা কালো ঘোড়ায় চেপে সৈন্যসারির আগে আগে এল পান্ গোলুব। এপ্রিল মাসের চন্চনে রোদ সত্ত্বেও তার পরনে ছিল একটা ককেশীয় বুর্কা, চুড়োয় উজ্জ্বল লাল রঙের ঘেড় দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কসাক-টুপি, কালো 'চের্কেস্কা' আর এই পোশাকের সঙ্গে মানানসই

নানারকম অস্ত্রশস্ত্র: ছোরা আর রুপোর পাতে মোড়া হাতলওয়ালা বাঁকানো লম্বা তলোয়ার। তার দাঁতে চেপে ধরা ছিল একটা বাঁকা ডাঁটিওয়ালা পাইপ। সুন্দর চেহারা পান্ কর্নেল গোলুব-এর: চোখের ভুরু দুটি কালো, বিবর্ণ ফর্সা মুখে নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপানজনিত হাল্কা সবুজের আভাস।

বিপ্লবের আগে এই পান্ কর্নেল ছিল একটা চিনি-কলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিট-উৎপাদন-খামারের উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। কিন্তু তার সে-জীবনটা ছিল নিতান্তই ভোঁতা, 'আতামান'এর পদ-পদবির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। এতএব, গোটা দেশ জুড়ে যে ঘোলা-জলের ঢেউ বয়ে চলেছে, তারই চূড়ায় এই উদ্ভিদতত্ত্ববিদটি পান্ কর্নেল গোলুব হিসেবে অবির্ভূত হল।

শহরের একমাত্র থিয়েটার-গৃহে এই আগন্তুকদের সম্মানে একটা আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হল। পেৎলিউরা-সমর্থক বিশিষ্ট নাগরিকদের 'শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ'রা সবাই উপস্থিত: ইউক্রেনীয় শিক্ষকের দল, পাদ্রীমশাইয়ের দুই কন্যা—সুন্দরী আনিয়া আর তার ছোট বোন দিনা, অপেক্ষাকৃত সাধারণ শ্রেণীর জনকতক মহিলা, কাউণ্ট পতোৎস্কির পরিবারের কয়েকজন ভূতপূর্ব সদস্য আর কিছুসংখ্যক সাধারণ মধ্যবিত্ত নাগরিক, ইউক্রেনীয় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি দলের অবশিষ্ট কিছু লোক, যারা নিজেদের 'স্বাধীন কসাক' বলে থাকে।

জমজমাট থিয়েটার-গৃহ। পাদ্রীকন্যা, মধ্যবিত্ত মহিলা আর শিক্ষকদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে ঘোড়ায়-চড়া বুটের খট্‌খটে আওয়াজ তুলে অফিসাররা, যাদের বেশভূষা দেখে মনে হয় যেন তারা 'জাপোরোঝিয়ে-কসাকদের' পুরনো ছবি থেকে উঠে এল। আর, উজ্জ্বল রঙের ফুলের নক্সা-তোলা ইউক্রেনের জাতীয় পোশাকে রঙচঙে পুঁতির মালা আর ফিতেয় সেজেগুজে এসেছে ঐ মহিলারা।

সামরিক বাজনাদাররা বাজনা শুরু করে দিল। আজ সন্ধ্যায় যে 'নাজার স্তদোলিয়া' নামে নাটকটির অভিনয় হবার কথা আছে তার জন্যে মঞ্চের ওপর উর্ধ্বশ্বাস প্রস্তুতি চলেছে।

কিন্তু বিজলি-সরবরাহ বন্ধ। ঘটনাটা যথাসময়ে সদর ঘাঁটিতে পান্ গোলুবের কর্ণগোচর করল তার অ্যাড্‌জুট্যাণ্ট সাব-লেফ্‌টেন্যাণ্ট পলিয়ান্ত্‌সেভ, সে নিজের নাম আর পদবি ইউক্রেনীয় ধাঁচে করে নিয়ে নিজেকে ইদানীং 'খোরুঞ্জি' পালিয়ানিৎসা বলে অভিহিত করে থাকে। কর্নেলটি আজকের সান্ধ্য-উৎসবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলতে ইচ্ছুক ছিল। পালিয়ানিৎসার কথাটা শুনে সে রাজসিক ভঙ্গিতে বলল, 'আলোর ব্যবস্থাটা করো। একজন ইলেকট্রিশিয়ান জোগাড় করে বিদ্যুৎ-স্টেশনটা চালু করো—মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও এটা করা চাই।'

'যে-আজ্ঞে, পান্ কর্নেল?'

খোরুঞ্জি পালিয়ানিৎসা মাথা না খুঁড়েই বিজলি-মিস্ত্রিদের জোগাড় করল।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই পাভেল এবং আর দু'জন মিস্ত্রিকে সশস্ত্র প্রহরায় নিয়ে আসা হল বিদ্যুৎ-স্টেশনে।

'সাতটার মধ্যে যদি আলো না জ্বলে, তাহলে তোমাদের তিনজনকেই ঝুলিয়ে দেব,' কথাটা বলে পালিয়ানিৎসা ওদের মাথার ওপরে একটা লোহার কড়িকাঠের দিকে দেখিয়ে দিল।

অবস্থাটার এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় কাজ হল—নির্দিষ্ট সময়েই আলো জ্বলে উঠল।

পুরোদমে যখন সান্ধ্য উৎসব চলেছে, তখন পান্ কর্নেল এল তার সঙ্গিনীকে নিয়ে—গোলুব যে শুঁড়ির বাড়িতে তার ডেরা নিয়েছে, তারই নাদুসনুদুস সোনালি-চুল মেয়েটি তার সঙ্গিনী।

তার বাপের পয়সা আছে, তাই সে সদর শহরের হাই ইস্কুলে লেখাপড়া শিখেছে।

সামনের সারিতে এই দু'জন মাননীয় প্রধান-অতিথি পূর্বনির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তার পরেই পান্ কর্নেল ইশারা করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই এমন আকস্মিকভাবে পর্দাটা উঠে গেল যে মঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাবার সময়ে পরিচালকের পেছন দিকটা একনজর দেখতে পেল দর্শকরা।

নাটকের অভিনয় চলতে থাকার সময়ে অফিসাররা আর তাদের সঙ্গিনীরা সময় কাটাল যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। সর্বকর্মপটু পালিয়ানিৎসা আয়োজন করে রেখেছিল—হুকুমের জোরে সরবরাহ করা নানারকম সুখাদ্য আর ঘরে তৈরি নির্জলা মদে ভরাট হয়ে উঠল সবাই। নাটকের অভিনয়ের শেষ নাগাদ সবারই অবস্থা বেশ টইটম্বুর গোছের।

যবনিকা-পতনের পর মঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠল পালিয়ানিৎসা। বাহু দুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে বিক্ষিপ্ত করে সে ঘোষণা করল, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! এখুনই নাচের আসর শুরু হবে।'

হাততালি দিল সবাই। তারপরে সবাই বাইরের আঙিনায় বেরিয়ে এল যাতে পেৎলিউরা পাহারাদার সৈন্যরা চেয়ারগুলো বের করে দিয়ে অতিথিদের নাচের জন্যে থিয়েটার-ঘরের মেঝেটা খালি করে দিতে পারে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই থিয়েটার-ঘরে একটা উদ্দাম হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল।

উত্তাপে রাঙা-মুখ স্থানীয় সুন্দরীদের নিয়ে সমস্ত সংযম জলাঞ্জলি দিয়ে পেৎলিউরা-অফিসাররা উদ্দাম 'হোপাক' নৃত্য শুরু করে দিল। ভারি ভারি বুটের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে

কেঁপে উঠল জীর্ণ-শীর্ণ থিয়েটার-বাড়ির দেওয়ালগুলো।

ইতিমধ্যে, সশস্ত্র একটা অশ্বারোহী-বাহিনী শহরের দিকে আসছিল ময়দা-কলের দিক থেকে।

শহরের প্রান্তে যে পেৎলিউরা সান্ত্রীদের বসানো আছে পাহারাদারি করার জন্যে, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল তাদের মেশিনগানগুলোর দিকে, গুলি ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত বন্দুকগুলোর ঘোড়া-নামানোর খটাখট আওয়াজ শোনা গেল, রাত্রির অন্ধকারে একটা তীক্ষ্ন আহ্বান ভেসে এল:

'থামো! কে যায়?'

দুটো কালো মূর্তি স্পষ্ট হয়ে এল অন্ধকারের মধ্যে থেকে। একজন এগিয়ে এসে কর্কশ আর ভারি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আতামান পাভ্লিউক আর তাঁর সৈন্যদল। তোমরা কারা? গোলুবের লোক?'

'হ্যাঁ,' বলল একজন অফিসার—সেও এগিয়ে এসেছিল।

পাভ্লিউক জিজ্ঞেস করল, 'আমার লোকজনদের থাকার জায়গা দেব কোথায়?'

'আমি এখুনি সদর ঘাঁটিতে টেলিফোন করছি,' বলেই অফিসারটি অদৃশ্য হয়ে গেল পথের ধারে একটা ছোট কুটিরের মধ্যে।

মিনিটখানেক বাদে সে ফিরে এসে হুকুম দিতে থাকল, 'মেশিনগানটা রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে নাও! পান্ আতামানকে পথ ছেড়ে দাও!'

আলোয় উজ্জ্বল থিয়েটার-বাড়ির সামনে খোলা হাওয়ায় বহু লোক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, পাভ্লিউক বাড়িটার সামনে এসে তার ঘোড়ার রাশ টানল।

পাশের ক্যাপ্টেন-সঙ্গীটির দিকে ফিরে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে খুব ফুর্তি জমেছে এখানে। এসো হে গুক্মাচ, নেমে

পড়ো, একটু আমোদ-টামোদ করা যাক। এক-জোড়া মেয়ে ধরে নেওয়া যাবে—মেয়েমানুষে তো ভর্তি দেখছি জায়গাটা। ওহে স্তালেঝ্‌কো,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তুমি দেখো, শহরের বাড়িতে বাড়িতে আমাদের লোকজনের একটা থাকার ব্যবস্থা করো গে। আমরা একটু এখানে হয়ে যাচ্ছি। কই, আমার দেহরক্ষীরা এসো।' ক্লান্ত ঘোড়াটার ওপর থেকে সে ভারি দেহটা নামিয়ে নিল।

থিয়েটারের প্রবেশ-দরজায় পাভ্‌লিউককে থামাল দু'জন সশস্ত্র পেৎলিউরা-সান্ত্রী, 'টিকেট?'

তাদের দিকে অবজ্ঞার চোখে এক-নজর দেখে একজনকে কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পাভ্‌লিউক। তার সঙ্গের অন্য বারো জনও তাকে অনুসরণ করল। তাদের ঘোড়াগুলো বাইরে বেড়ায় বাঁধা রইল।

আগন্তুকদের তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করল সবাই। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল পাভ্‌লিউক-এর বিরাট দেহটা। ভাল কাপড়ে তৈরি অফিসারের কোট তার পরনে, গার্ডবাহিনীতে যেরকম পরে সেই রকম নীল ব্রিজেস, আর মাথায় ঝাঁক্‌ড়া পশমের টুপি। কাঁধের ওপর দিয়ে টানা চামড়ার ফিতেটায় ঝুলছে একটা মোজার-পিস্তল, পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা হাত-বোমা।

'কে ইনি?' ফিসফিস প্রশ্নটা ভিড়ের মধ্যে সর্বত্র চারিয়ে গেল নাচের আসরে যেখানে গোলুবের সহকারী উদ্দাম নাচ নাচছে।

পাদ্রীর ছোট মেয়েটা তার নৃত্যসঙ্গিনী, এমন বেপরোয়া হয়ে সে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে যে তার ঘাগ্‌রাটা বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে রেশমী অন্তর্বাসগুলো রীতিমত দেখা যাচ্ছে আর সৈন্যরা তো তাই দেখে ভারি খুশি।

ভিড় ঠেলে সরিয়ে পাভ্‌লিউক সোজা নাচের জায়গাটায় চলে এল।

চক্‌চকে চোখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাদ্রীকন্যার পায়ের দিকে, তারপরে জিভ দিয়ে শুক্‌নো ঠোঁট চেটে নিয়ে নাচের আসরটা পার হয়ে অর্কেস্ট্রা মঞ্চের কাছে এসে একটু থেমে আঁকশি-আঁটা ঘোড়ার চাবুকটা নেড়ে বলল, 'ওহে, 'হোপাক' নাচের সুরটা বাজাও!'

ঐকতান-বাদন যে পরিচালনা করছিল, সে কান দিল না তার কথায়। তারপর পাভ্‌লিউকের হাতের একটা তীব্র বিক্ষেপে সঙ্গীত-পরিচালকের পিঠের ওপর কেটে বসে গেল চাবুকটা। প্রচণ্ড এক আকস্মিক যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল সঙ্গীত-পরিচালক, বাজনা থেমে গেল, হলঘর নিস্তব্ধ।

'এ কি অসহ্য বেয়াদপি!' প্রচণ্ড রাগে ক্ষেপে গেছে শুঁড়ীর মেয়েটি। পাশের আসনে বসা গোলুবের কনুই চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তোমার চোখের সামনে এমন ব্যাপার ঘটতে দেবে!'

টেনে দাঁড় করাল নিজেকে গোলুব, একটা চেয়ার লাথি মেরে সরিয়ে দিল, তিন পা এগিয়ে এসে পাভ্‌লিউকের মুখোমুখি দাঁড়াল। সে সঙ্গে সঙ্গেই এই আগন্তুকটিকে চিনতে পেরেছে। স্থানীয় ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বীটির সঙ্গে তার বেশ কিছুটা বোঝাপড়া করার ছিল।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে পান্‌ কর্নেলের সঙ্গে একটা জঘন্য রকমের প্রতারণা করেছে এই পাভ্‌লিউক। লাল সৈনিকদের একটা দল গোলুবের বাহিনীকে একাধিকবার ক্ষতবিক্ষত করেছে—তাদের সঙ্গে যখন পুরোদমে একটা লড়াই চলছিল, তখন পাভলিউক ওই বলশেভিকদের পেছন থেকে আক্রমণ না করে একটা ছোট শহরে ঢুকে সেখানকার অলপসংখ্যক লাল

পাহারাদারদের হঠিয়ে দিয়ে, আত্মরক্ষার জন্যে চারধারে সৈন্যঘেরাও করে রেখে শহরটাকে একেবারে নিঃশেষে লুঠপাট করে নিয়ে যায়। অবশ্য, পেৎলিউরার লোক হিসেবে সে বিশেষ নজর রেখেছিল যাতে শহরের ইহুদী বাসিন্দারাই তার লুটের প্রধান শিকার হয়।

ইতিমধ্যে লাল সৈন্যদলটি গোলুবের বাহিনীর ডান-দিকটাকে চুরমার করে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

আর এখন কিনা ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর এই উদ্ধত ক্যাপ্টেনটি এখানে গায়ের জোরে ঢুকে পড়ে পান্ কর্নেল গোলুবের চোখের সামনেই তার নিজস্ব সামরিক বাজনদার-দলের পরিচালককে মেরে বসতে সাহস করেছে! না, বড্ড বাড়াবাড়ি এটা। গোলুব বুঝতে পারল যে সে যদি এই অহংকারীকে ঢিট না করে, তাহলে সৈন্যবাহিনীতে তার ইজ্জত বলে কিছু থাকবে না।

কয়েক মুহূর্ত এই দু'জন লোক পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর একহাতে তলোয়ারের হাতলটা চেপে আর অন্য হাতে পকেটের পিস্তলটা নাড়াচাড়া করতে করতে গোলুব খেঁকিয়ে উঠল, 'কোন্ সাহসে আমার লোকের গায়ে হাত দিয়েছ, শয়তান?'

পাভ্লিউকের হাতখানা এগিয়ে গেল তার মোজার-পিস্তলের হাতলটার দিকে, 'একটু সামলে, পান্ গোলুব! দেখো, পা ফস্কে না যায়। আমাকে ঘা দিও না, আমিও তো মেজাজ খারাপ করে বসতে পারি।'

এটা গোলুবের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বের করে দাও এদের, আর প্রত্যেককে পঁচিশ ঘা করে চাবুক মারো!'

গোলুবের অফিসাররা পাভ্‌লিউক আর তার লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল ডালকুত্তার মতো।

একটা গুলি বেরিয়ে গেল—শব্দটা যেন মেঝের ওপর একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবার মতো শোনাল। দুইদল লড়াকু কুকুরের মতো লোকগুলো মারামারি, জাপ্‌টা-জাপ্‌টি, গড়াগড়ি করতে থাকল হল-ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে লোকগুলো সাঁই-সাঁই তলোয়ার চালাল পরস্পরের উদ্দেশে, একে অন্যের চুল টেনে ধরল, নখ বসিয়ে দিল গলায়, আর মেয়েরা সব খোঁচা-খাওয়া শুয়োরের মতো আর্তস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে লড়্‌নেওয়ালাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকল চারদিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাভ্‌লিউক আর তার লোকজনকে হলের বাইরে টেনে-হিঁচ্‌ড়ে এনে বের করে দেওয়া হল রাস্তায় -- বেদম মার খেয়েছে তারা, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মারামারির মধ্যে পাভ্‌লিউক নিজে হারিয়েছে তার পশমী টুপী, মুখটা ছড়ে গেছে তার, হাতিয়ারগুলো বেহাত হয়ে গেছে — প্রচণ্ড রাগে সে আত্মহারা! জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে সে আর তার দলবল ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তা বেয়ে।

মাটি হয়ে গেছে সন্ধ্যেটা। এই ঘটনার পরে আর কারুরই আমোদ-প্রমোদে মত্ত হবার বাসনা নেই। মেয়েরা আর নাচে যোগ দিতে চাইল না, তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু গোলুব তা শুনবে না। সে হুকুম দিল, 'সান্ত্রী মোতায়েন করে দাও চারধারে, কেউ যেন চলে যেতে না পারে।'

পালিয়ানিৎসা ছুটে গেল হুকুম তামিল করার জন্যে।

তুমুল প্রতিবাদ উঠল, কিন্তু কড়া গলায় বলল গোলুব, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়েরা! সারা রাত নাচ চলবে, আমি স্বয়ং প্রথম 'ওয়াল্‌স' নাচটা নাচব।'

ঐকতান-বাদন আবার শুরু হল, কিন্তু দেখা গেল সে রাত্রের মতো আর ফুর্তিটা জমবার নয়।

পাদ্রীকন্যাকে নিয়ে নাচার সময়ে কর্নেলের এক পাক ঘোরা হতে না হতেই সান্ত্রীরা চেঁচামেচি করতে করতে হল-ঘরে ঢুকল, 'পাভ্‌লিউক থিয়েটারটা ঘিরে ফেলছে!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার দিকের একটা জানলার কাচ ভেঙে পড়ল, আর তার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা মেশিনগানের ভোঁতা-নাক নল। নির্বোধ একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো নলটা এদিক থেকে ওদিক ঘুরে গেল যেন ভেতরের এই লোকজনদের তাক্ করার উদ্দেশ্যে, আর মানুষগুলো তার থেকে হলের মাঝখানের দিকে পাগলের মতো ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল, যেন সাক্ষাৎ শয়তানকে সামনে দেখছে তারা।

পালিয়ানিৎসা মাথার ওপরে ঝুলন্ত হাজার-পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌টার দিকে গুলি ছুঁড়ল। বোমার মতো ফেটে গেল সেটা, কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল হলের সবার গায়ে।

অন্ধকার হয়ে গেল হল-ঘর। কে চত্বর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাইরে বেরিয়ে পড়ো সবাই!' তারপর প্রচণ্ড গালাগালির একটা রোল উঠল।

মেয়েদের উন্মত্ত আর্তনাদ, হকচকিয়ে যাওয়া অফিসারদের জড়ো করার চেষ্টায় গোলুবের ছুটোছুটি আর হুকুম-হুঙ্কার, বাইরে আঙিনায় গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি আর চিৎকার — এই সবকিছু মিলেমিশে গিয়ে একটা অবর্ণনীয় নরক-কুণ্ডের

সৃষ্টি হল। আর্ত অবস্থার মধ্যে কেউ লক্ষ্য করে নি -- পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ে একটা নির্জন পাশের রাস্তায় বেরিয়ে এসে পালিয়ানিৎসা প্রাণপণে দৌড়ে চলে গেল গোলুবের সদর ঘাঁটিতে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা রীতিমত যুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলল শহরটাকে। রাইফেলের নিরবচ্ছিন্ন গুলি ছোঁড়ার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগানের খট্‌খট্‌ আওয়াজ ভেঙেচুরে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। নিতান্তই বিমূঢ় অবস্থায় শহরবাসীরা তাদের উষ্ণ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত গুলি-চালাচালি বন্ধ হল। শুধু শহরের প্রান্তে কোন এক জায়গায় একটা মাত্র মেশিনগান মাঝে মাঝে হঠাৎ গুলি চালাবার আওয়াজ করে উঠতে লাগল কুকুরের ঘেউঘেউ আওয়াজের মতো।

দিগন্তে ভোরের আলোর আভা ফুটতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে এল...

শহরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামার একটা প্রস্তুতি চলেছে -- এরকম একটা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত খবরটা পেঁছে গেল ইহুদী-পাড়ায় -- নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে কাদায় নোংরা খাড়ির গায়ে গায়ে কোনরকমে জড়াজড়ি করে খাড়া হয়ে আছে তাদের নিচু চালা আর ছোট ছোট জানলাওয়ালা ঘরগুলো। বাড়ির নামে এই সব খোঁদলগুলোর মধ্যে কল্পনাতীত অবস্থার মধ্যে বাস করে গরিব ইহুদীরা।

সের্গেই ব্রুঝাক আজ বছরখানেকের বেশি হল যে ছাপাখানাটায় কাজ করছে, সেখানকার কম্পোজিটররা আর অন্যান্য কর্মীরা সবাই ইহুদী। সের্গেই আর তাদের মধ্যে

একটা নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওদের মালিক ব্লুমস্টাইনের নিখুঁত পোশাক-আশাক, সে ভালো খায়দায়। তার বিরুদ্ধে এরা সবাই একটা ঘনিষ্ঠ পরিবারের লোকজনের মতোই ঐক্যবদ্ধ। মালিক আর কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামটা ছিল নিরবচ্ছিন্ন। ব্লুমস্টাইনের প্রাণপণ চেষ্টা যাতে সে তার কর্মীদের সবচেয়ে বেশি কাজ করিয়ে নিয়ে সবচেয়ে কম মাইনে দিতে পারে। কয়েকবার কর্মীরা ধর্মঘট করেছে, ছাপাখানার কাজ এক-নাগাড়ে দু'-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ থেকেছে। কর্মীরা সবশুদ্ধ চোদ্দ জন। সবচেয়ে অল্পবয়সী সের্গেই — তাকে দৈনিক বারো ঘণ্টা একটা হাতে-চালানো ছাপাযন্ত্রের চাকা ঘোরাতে হয়।

সের্গেই আজ ছাপাখানার শ্রমিকদের মধ্যে একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করছে। গত কয়েক মাস ধরে দিনকাল বড়ো খারাপ গিয়েছে, মাঝে মাঝে প্রধান আতামানের হুকুমনামা ছাপা ছাড়া আর কোন কাজ করার বিশেষ কিছু ছিল না।

মেণ্ডেল নামে ক্ষয়কাশের রুগী একজন কম্পোজিটর সের্গেইকে এক কোণে ডাকল। বিষণ্ণ চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ইহুদীনিধন আসছে, জানো তো?'

অবাক হয়ে তাকাল সের্গেই, 'কই না, আমি তো কিছুই জানি না।'

মেণ্ডেল তার গিঁঠে-পড়া হল্‌দে হাতখানা রাখল সের্গেইয়ের কাঁধে। বাবা যেমন ছেলেকে কোন গোপনীয় কথা বলে সেইভাবে সে বলল, 'হাঁ, হবে। আমরা খাঁটি খবর পেয়েছি। ইহুদীদের সব ধরে ধরে মার লাগাবে। এখন আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম — তুমি তোমার সহকর্মীদের এই বিপদে সাহায্য করবে কি-না?'

'নিশ্চয়, পারলে করব বৈকি। কি করতে পারি বলো, মেণ্ডেল ?'

কম্পোজিটররা সবাই এতক্ষণে তাদের কথাবার্তা শুনছে।

'তুমি ভালো ছেলে, সেরিওঝা। তোমাকে বিশ্বাস করি আমরা। তোমার বাবাও তো আমাদের মতোই মজুর। আচ্ছা, তাহলে তুমি একবার ছুটে বাড়ি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমাদের জনকতক বুড়োবুড়িকে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে দিতে রাজী আছে কি-না। তারপরে আমরা ঠিক করব কে কে যাবে ওখানে। তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আর কেউ এরকম করতে রাজী কি-না সেটাও জিজ্ঞেস করে এসো। রাশিয়ানরা এইসব ডাকাতদের হাত থেকে আপাতত নিরাপদ। ছুটে যাও, সেরিওঝা, সময় খুব কম।'

'আমার উপর নির্ভর করতে পারো, মেণ্ডেল। আমি পাভকা আর ক্লিমকার সঙ্গেও এখুনি দেখা করছি—ওদের পরিবারও নিশ্চয়ই কয়েকজনকে রাখতে পারবে।'

'শোন, এক মিনিট,' সের্গেই বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় উদ্বিগ্নভাবে তাকে থামাল মেণ্ডেল, 'পাভকা আর ক্লিমকা কারা? ভালরকম চেনো তো ওদের?'

নিশ্চিন্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল সের্গেই, 'নিশ্চয়! ওরা আমার বন্ধু। পাভকা করচাগিনের ভাই একজন মিস্ত্রি।'

'ও, করচাগিন,' নিশ্চিন্ত হল মেণ্ডেল, 'আমি চিনি তাকে—একই বাড়িতে ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, করচাগিনদের ওখানে খোঁজ নিতে পারো। যাও, সেরিওঝা, আর যতো তাড়াতাড়ি পারো খবর নিয়ে এসো।'

সের্গেই ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

পাভলিউকের ফৌজ আর গোলুবের লোকজনদের মধ্যে সেই প্রচণ্ড লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় দিনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু হল।

শহর থেকে মার খেয়ে বিতাড়িত হবার পর পাভলিউক এই অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে কাছাকাছি একটা ছোট শহর দখল করে নিয়েছে। শেপেতোভ্‌কায় সেই রাতের ঘটনায় তার বিশজন লোক মারা গেছে। গোলুবের দলেরও সমান ক্ষতি হয়েছে।

নিহতদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলে গাড়ি করে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে সেই দিনই মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। সৎকারের অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশেষ কিছু করা হয় নি — কারণ, গোটা ঘটনাটার মধ্যে সত্যিই জাঁক করার কিছু ছিল না। রাস্তার দুটো খেঁকি কুকুরের মতো দু'জন আতামান পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরেছিল — এর পরে মৃতদের সৎকারের ব্যাপারে বেশি সোরগোল তোলাটা খারাপ দেখায়। পালিয়ানিৎসা অবশ্য চেয়েছিল নিহতদের বেশ একটু ঘটা করে কবর দিয়ে পাভলিউককে লাল-ডাকাত বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু পাদ্রী ভাসিলির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কমিটি আপত্তি তুলল।

গোলুবের সেনাবাহিনীর মধ্যে সেই রাত্রের ঘটনাটা বেশ একটু অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে — বিশেষ করে যারা তার দেহরক্ষী তাদের মধ্যে, কারণ, তাদের লোকজনই মারা গেছে সবচেয়ে বেশি। অসন্তোষটা দূর করার জন্যে আর খানিকটা উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনার জন্যে পালিয়ানিৎসা এই ইহুদীবিরোধী দাঙ্গার প্রস্তাবটা দিয়েছে। অত্যন্ত হৃদয়হীনের মতোই সে ফৌজী লোকদের 'একটু অন্যরকম আমোদের' ব্যবস্থা করার কথাটা পেড়েছিল গোলুবের কাছে। তার যুক্তিটা ছিল — সৈন্যদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার

পরিপ্রেক্ষিতে এটা নিতান্তই দরকার। কর্নেলের অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল না—কারণ, শুঁড়ীর ওই মেয়েটির সঙ্গে তার দু-চারদিনের মধ্যেই বিয়ে হবে, তার আগে শহরের শান্তি ভঙ্গ হতে দিতে সে চায় নি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল তাকে।

আরও একটা কারণে পান্ কর্নেল এই ব্যাপারটা ঘটতে দিতে সত্যিই গররাজী ছিল: সম্প্রতি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে। তার শত্রুরা ফের তার নামে নিন্দে রটাতে পারে, ইহুদীবিদ্বেষী ঠ্যাঙাড়ে বলতে পারে এবং প্রধান আতামানের কাছে তারা নানা কথা গিয়ে লাগাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোলুব অবশ্য এপর্যন্ত প্রধান আতামানের ওপর তেমন নির্ভরশীল নয় — কারণ সে নিজের ফৌজের রসদ আর লোকজন নিজেই জোগাড় করে এসেছে। তাছাড়া প্রধান আতামান খুব ভালো করেই জানে অধীনস্থ লোকজন কত ওঁচা। সে নিজেই তো বহুবার শাসন-পরিচালনার প্রয়োজনে তথাকথিত 'হুকুম-দখল' থেকে টাকার দাবি তুলেছে। আর, ইহুদীবিদ্বেষী ঠ্যাঙাড়ে হিসেবে খ্যাতির দিক থেকে গোলুবের ভূতপূর্ব কীর্তিকলাপ বড়ো কম নয়। সুতরাং, ওরকম আরেকটা ঘটনায় আর তার এমন কী এসে যাবে।

ভোর-সকালে ইহুদীদের পাড়ায় লুঠপাট হাঙ্গামা আরম্ভ হল।

দিন শুরু হবার আগে ধূসর কুয়াশায় তখনও শহরটা আচ্ছন্ন। ভিজে ন্যাকড়ার ফালির মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় এদিকে-সেদিকে এলোমেলোভাবে জড়ানো ইহুদীদের বাড়িগুলো। সে-রাস্তাগুলো জনশূন্য, নিষ্প্রাণ। আঁটসাঁট পর্দা-টানা খড়খড়ি-তোলা জানলাগুলো।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুঝি গোটা পাড়াটা শেষরাত্রির গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু, কোন বাড়ির ভেতরে কারুর চোখে ঘুম নেই। গোটা একেকটা পরিবার জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে একেকটা ঘরে জড়োসড়ো হয়ে আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষা করে আছে। শুধু ঘটনাটা বোঝার পক্ষে যাদের বয়েস নিতান্ত কম, সেই শিশুরা শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে তাদের মায়েদের কোলে।

গোলুবের প্রধান দেহরক্ষী সালোমিগা—রোদে-পোড়া গায়ের রঙ তার জিপ্সিদের মতো কালচিটে পড়া, গালের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা তলোয়ারের ক্ষতচিহ্নের নীলচে দাগ — গোলুবের অ্যাড্জুটাণ্ট পালিয়ানিৎসাকে ঘুম থেকে তুলবার জন্যে সেদিন সকালে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

বড়ো কষ্টে চোখ মেলে তাকাল পালিয়ানিৎসা—সারারাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে, কিছুতেই আর নিজেকে সেই ঘোর থেকে মুক্ত করে আনতে পারছে না—সেই ভেংচিকাটা কুঁজো-পিঠ বীভৎস চেহারার শয়তানটা তখনও যেন তার গলাটা চেপে ধরে আছে। শেষ পর্যন্ত সে মাথা তুলে দেখল সালোমিগা ঝুঁকে রয়েছে তার উপর। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সালোমিগা বলল, 'উঠে পড়ো হে, অতো নেতিয়ে গেলে কেন? কাজে রওনা হতে হবে, সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।'

এতক্ষণে পুরোপুরি জেগে উঠেছে পালিয়ানিৎসা, এক-গলা তেতো জল-ঢেঁকুর উঠে এসেছে, মুখ বেঁকিয়ে সেটাকে থুতুর মতো বের করে দিয়ে সালোমিগার দিকে অর্থহীন চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজ?'

'ইহুদী হতভাগাদের গুঁড়োবার কাজ, আবার কী কাজ! ভুলে গেছ, নাকি?'

এতক্ষণে সবটা মনে পড়ল পালিয়ানিৎসার। সত্যি একেবারে

ভুলে বসেছিল সে। পান্ কর্নেল যে খামারবাড়িটায় তাঁর ভাবী বধূকে নিয়ে আছেন, সেখানে আগের সন্ধ্যায় জনকতক ঘনিষ্ঠ ইয়ারের সঙ্গে পান বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা চলতে থাকার সময়টুকুর জন্যে শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসাটাই গোলুব সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে স্থির করেছে। কারণ, সেক্ষেত্রে পরে সে ব্যাপারটাকে তার অনুপস্থিতির জন্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল বলে চালাতে পারবে এবং ইতিমধ্যে পালিয়ানিৎসাও বেশ নিখুঁতভাবে কাজটা নিষ্পন্ন করতে পারবে। হ্যাঁ, 'আমোদের' ব্যাপারে পালিয়ানিৎসা সত্যিই ওস্তাদ লোক!

মাথায় এক বালতি জল ঢেলে বুদ্ধিটাকে গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ানিৎসা অল্পক্ষণের মধ্যেই সদর ঘাঁটির চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে হুকুম দিতে থাকল।

একশো জন দেহরক্ষী ইতিমধ্যেই ঘোড়ায় চেপে বসেছে। গোলযোগের সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্যে দূরদর্শী পালিয়ানিৎসা শহরকেন্দ্র এবং মজুরদের এলাকা আর স্টেশনের মাঝে মাঝে পাহারা বসাবার হুকুম দিল। কোনরকম বাধা সৃষ্টি করার চিন্তাটা যদি মজুরদের মাথায় ঢোকে তাহলে এক-ঝাঁক গুলির মুখোমুখি হতে হবে তাদের—তারই ব্যবস্থা হিসেবে লেশ্চিনস্কিদের বাগানে রাস্তার দিকে মুখ করে একটা মেশিনগান বসানো হল।

পুরো বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর, অ্যাড্জুটাণ্ট আর সালোমিগা লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে।

যখন তারা রওনা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ বলে উঠল পালিয়ানিৎসা, 'থামো! প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। দুটো গাড়ি সঙ্গে নাও গোলুবের বিয়ের যৌতুক বয়ে আনবার জন্যে।

হাঃ হাঃ! লুটের প্রথম কিস্তিটা যথারীতি সেনাপতির প্রাপ্য, আর প্রথম মেয়েটা প্রাপ্য তাঁর অ্যাড্জুটাণ্টের—অর্থাৎ আমার। বুঝেছ হে, আহাম্মক?'—এই শেষের সম্বোধনটা সালোমিগার উদ্দেশে।

সালোমিগা তার হলদে চোখের তীব্র দৃষ্টিতে পালিয়ানিৎসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবার জন্যেই যথেষ্ট পাওয়া যাবে!'

বড়ো রাস্তা বেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল সবাই, এলোমেলো এই ঘোড়সওয়ারদলটির আগে আগে চলেছে পালিয়ানিৎসা আর সালোমিগা।

দোতলা একটা বাড়ির সামনে এসে রাশ টানল পালিয়ানিৎসা। ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গেছে। বাড়িটার সামনে একটা মর্চে-ধরা তক্তির গায়ে লেখা আছে—'ফুক্স্, বস্ত্রব্যবসায়ী'।

ধূসর রঙের তার মাদী ঘোড়াটা পথের খোয়ার ওপরে অস্বস্তির সঙ্গে পা ঠুকল।

মাটিতে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ানিৎসা বলল, 'তাহলে এখন থেকেই শুরু করা যাক, ভগবান সহায় হোন! তোমরা সব নেমে পড়ো,' নিজের চারপাশে জড়ো লোকজনদের বলল সে, 'এইবার খেল্ শুরু। আচ্ছা শোনো, খুনটুন করে বোসো না যেন—ওসব করবার সুযোগ পরে ঢের পাবে। আর, মেয়েদের সম্বন্ধে—যদি পারো তো সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজেদের একটু সামলে রেখো।'

দলের একজন তার শক্ত দাঁত বের করে আপত্তি জানাল, 'কিন্তু পান্ খোরুঞ্জি, যদি উভয় পক্ষের মত নিয়েই হয়, তাহলে?'

হা-হা করে হেসে উঠল সবাই। যে লোকটা কথাটা বলেছিল, তার দিকে প্রশংসাসূচক প্রশ্রয়ের চোখে তাকাল পালিয়ানিৎসা, 'সেটা হলে অবশ্য আলাদা কথা—যদি ওরা গররাজী না হয় তাহলে চালিয়ে যাবে—তাতে কোন বাধা নেই।'

দোকানঘরটার বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জোরে একটা লাথি মারল পালিয়ানিৎসা, কিন্তু ওক-কাঠের ভারি আর মজবুত পাল্লা দুটো একটু কাঁপল না পর্যন্ত।

স্পষ্টই বোঝা গেল, কাজটা ভুল জায়গা থেকে শুরু করা হয়েছে। তলোয়ারটা হাতে চেপে ধরে বাড়িটার পাশ ঘুরে পালিয়ানিৎসা এগিয়ে গেল ফুক্‌স্‌ যেদিকে থাকে সেই দিকটায়। পেছন পেছন চলল সালোমিগা।

বাড়ির লোকেরা ভেতর থেকেই শুনেছে রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। দোকানের সামনেই যখন আওয়াজটা এসে থামল আর দেওয়ালের আড়াল পেরিয়ে শোনা গেল মানুষগুলোর গলার স্বর, তখন তাদের হৃদস্পন্দন যেন থেমে গিয়ে গোটা শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এই ফুক্‌স্‌ লোকটা পয়সাওয়ালা, আগের দিন সে তার বউ আর মেয়েদের নিয়ে শহর ছেড়ে গেছে। জিনিসপত্তরগুলো পাহারা দেবার জন্যে রেখে গেছে তার চাকরানী রিভাকে— উনিশ বছর বয়েসী শান্ত আর নিরীহ মেয়েটা। খালি বাড়িটায় একলা থাকতে রিভা ভয় পাচ্ছে দেখে সে বলেছিল যে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত রিভা যেন তার বুড়ো বাবা আর মাকে নিয়ে এসে এই বাড়িতে থাকে।

রিভা খুব নরমভাবে এ কথার প্রতিবাদ করাতে ধূর্ত ব্যবসাদারটি তাকে ভরসা দিয়েছিল যে খুব সম্ভবত ইহুদী-ঠ্যাঙানোর ব্যাপারটা হবেই না—কারণ, ইহুদীদের মতো গরিব ভিখিরিদের কাছ থেকে আর কী পাবার আশা ওরা করে? তারপরে সে রিভাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে ফিরে এসে তাকে পোশাক বানাবার জন্যে ভাল খানিকটা কাপড়ের ছিট দেবে।

তিনজনে তারা ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল

আতঙ্কে, নিরাশার মধ্যেও তারা আশা করছে যদি লোকগুলো ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যায়। হয়তো তাদের ভুল হয়েছে, হয়তো তারা ভুল করে ভেবেছে যে তাদের বাড়ির সামনেই ওদের ঘোড়া থেমেছে। কিন্তু দোকানঘরের দরজায় একটা ভোঁতা আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনে ওদের সমস্ত আশা চুরমার হয়ে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ পেইসাখ্—সমস্ত চুল তার সাদা, নীল চোখ দুটো তার ভয়-পাওয়া শিশুর চোখের মতো বিস্ফারিত। উৎকট ধর্মোন্মত্তের সমস্ত বিশ্বাসের জোর নিয়ে সে সর্বশক্তিমান জিহোভার উদ্দেশে ফিসফিসিয়ে প্রার্থনা করছে যাতে ভগবান এই বাড়িটাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা স্ত্রী তার প্রার্থনার উচ্চারণের মধ্যে প্রথমটায় শুনতেই পায় নি মানুষগুলোর পায়ের শব্দ।

সবচেয়ে দূরের ঘরটায় পালিয়ে গিয়ে রিভা লুকিয়ে আছে ওক-কাঠের বিরাট আলমারিটার পেছনে।

দরজাটার ওপরে একটা প্রচণ্ড ঘা পড়তেই এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চমকে কেঁপে উঠল।

'দরজা খোলো!' আগেব চেয়ে প্রচণ্ড আরেকটা ধাক্কা আর ক্রুদ্ধ গালাগালি।

কিন্তু আতঙ্কে আড়ষ্ট এই দুটি প্রাণী দরজাটা খোলার জন্যে হাত তুলতে পারল না।

আগলটা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত বাইরে দরজার গায়ে বন্দুকের কুঁদোর ধাক্কা এসে পড়তে লাগল অনবরত আর শেষ পর্যন্ত খুলে গেল দরজাটা।

সশস্ত্র লোকে ভর্তি হয়ে গেল বাড়িটা, সর্বত্র চলল খানাতল্লাশি। ভেতর দিয়ে দোকানঘরে ঢোকার দরজাটা ভেঙে

গেল বন্দুকের কুঁদোর এক ধাক্কায়, সামনের দিকের দরজাটার আগল এদিক থেকেই খুলে ফেলা হল।

লুটপাট শুরু হল।

কাপড়ের গাঁট, জুতো আর অন্যান্য জিনিসে গাড়িগুলো বোঝাই করার পর সেই লুটের মাল গোলুবের বাড়ি পেঁছে দিতে গেল সালোমিগা। ফিরে এসে সে একটা আর্ত চিৎকার শুনল বাড়ির ভেতরে।

পালিয়ানিৎসা তার লোকজনের ওপর দোকানটা লুট করার ভার ছেড়ে দিয়ে মালিকের ঘরে গিয়ে দেখল সেখানে বুড়োবুড়ি আর তাদের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনবিড়ালের মতো তার সবুজ চোখে ওদের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে বুড়োবুড়ির দিকে হুংকার ছাড়ল, 'বেরোও এখান থেকে!'

বাপ-মায়ের একজনও নড়ে নি।

পালিয়ানিৎসা এক পা এগিয়ে একটু করে তার তলোয়ারটা খুলল খাপ থেকে।

'মা গো!' একটা হৃদয়বিদারী চিৎকার করে উঠেছিল মেয়েটা।

এই চিৎকারটাই শুনতে পেয়েছিল সালোমিগা।

চিৎকার শুনে পালিয়ানিৎসার যে সব লোক ছুটে এসেছিল ঘরে, তাদের দিকে ফিরে বুড়োবুড়িকে দেখিয়ে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'বের করে দাও এদের!' হুকুম তামিল হতেই সালোমিগা ঘরে ফিরে এলে তাকে বলল, 'তুমি এই দরজাটায় পাহারা থাকো, আমি এই ছুঁড়িটার সঙ্গে একটু কথাটথা বলে নিই ততক্ষণ।'

আর একবার চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ছুটে এল বুড়ো পেইসাখ্ ঘরে ঢোকার দরজাটার দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর একটা প্রচন্ড ঘুষি খেয়ে সে উল্টে গড়িয়ে

গেল দেয়ালের গায়ে, যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। বুড়ি মা তোইবা—আজীবন যে অতি শান্ত আর নিরীহ—সে সালোমিগার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তানকে রক্ষা করার সময়ে বাঘিনীর মতো হিংস্রতা নিয়ে।

'যেতে দাও আমায়! ছেড়ে দাও আমার মেয়েকে!'

দরজাটার দিকে এগুবার চেষ্টা করতে লাগল তোইবা, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সালোমিগা তার কোটের ওপর তোইবার জীর্ণ আঙুলের শক্ত মুঠি ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

ইতিমধ্যে আঘাত আর যন্ত্রণা থেকে খানিকটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পেইসাখ্—সে এগিয়ে গেল তোইবাকে সাহায্য করার জন্যে।

'যেতে দাও আমাদের! ছেড়ে দাও আমাদের মেয়েকে!'

দুই বুড়োবুড়ি মিলে কোনরকমে দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল সালোমিগাকে। ফলে ভয়ানক রেগে গিয়ে সে কোমরবন্ধনী থেকে একটানে পিস্তলটা বের করে নিয়ে বৃদ্ধের সাদা-চুল মাথাটার ওপর জোরে এক ঘা বসাল ইস্পাতের কুঁদোটা দিয়ে। মেঝের ওপর নেতিয়ে পড়ল পেইসাখ্।

ঘরের ভেতরে সমানে আর্ত চিৎকার করে চলেছে রিভা।

তোইবাকে যখন টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় বের করে দিল ওরা, তখন সে বেদনায় উন্মাদ হয়ে গেছে। তার নিদারুণ চিৎকারে আর সাহায্যের আবেদনে মুখরিত হয়ে উঠল রাস্তাটা।

বাড়ির ভেতরটা তখন নিস্তব্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পালিয়ানিৎসা। দরজার হাতলের ওপর ইতিমধ্যেই সালোমিগার হাতটা এগিয়ে এসেছে, তার দিকে না তাকিয়েই পালিয়ানিৎসা বলল, 'ভেতরে ঢুকে আর লাভ নেই। বালিশ চাপা দিয়ে ওর চিৎকার বন্ধ করতে গিয়ে

দম আটকে মারা গেছে।' পেইসাখের দেহটা ডিঙিয়ে চলে যাবার সময় তার পা পড়ল জমাট একতাল রক্তের ওপর।

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে সে বিড়বিড়িয়ে বলল, 'আরম্ভটা খুব সুবিধের হল না হে!'

বাড়িটার সিঁড়ির ওপরে আর মেঝের বুকে রক্তাক্ত পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে আর সবাই তার পেছনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

শহরে পুরোদমে চলেছে লুঠতরাজ। লুঠের বখরা নিয়ে মাঝে মাঝে লুটেরাদের মধ্যে ঝগড়া বাধতে লাগল আর মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারামারি হয়ে গেল তাদের মধ্যে, তলোয়ার ঝলসে উঠতে লাগল এখানে-ওখানে। আর, প্রায় সর্বত্রই চলল অবাধ ঘুষোঘুষি।

মদের দোকানটা থেকে পঁচিশ-গ্যালন পিপেগুলো গড়িয়ে নামিয়ে আনা হল পাশের গলিতে।

তারপর ইহুদীদের বাড়িতে হানা দিতে শুরু করল ঠেঙাড়ের দল।

কোনরকম বাধা পেল না তারা। ঘরে ঘরে ঢুকে অল্পক্ষণের মধ্যে সব কিছু তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে লুটের মাল বোঝাই করে নিয়ে ফিরে গেল, পেছনে ফেলে গেল কাপড়ের স্তূপ, ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা আর বালিশের ছড়িয়ে-পড়া পালক। প্রথম দিনে নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই—রিভা আর তার বাবা। কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুর তাণ্ডব শুরু হবে রাত্রি আসন্ন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধ্যের দিকে পৈশাচিক চণ্ডালদের এই দলটা মাতাল হয়ে উঠল। রাত্রির অপেক্ষায় আছে উন্মত্ত পেৎলিউরা-বাহিনী।

অন্ধকার তাদের মুক্তি দিল সংযমের শেষ বাঁধন থেকে। রাত্রির আঁধারে মানুষকে হত্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এমন

কি শেয়ালেও অপেক্ষা করে থাকে অন্ধকারের অশুভ সন্ধিক্ষণের জন্যে।

ভয়ঙ্কর এই তিনটি দিন আর দু'টি রাত্রির কথা খুব কম লোকেই ভুলতে পারবে। সেই রক্তাক্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো জীবনকে যে এরা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল, কতগুলো প্রাণকে গলা টিপে মারল, কী নিদারুণ আতঙ্কে কতগুলো তরুণের মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেল রাতারাতি, আর কী মর্মান্তিক কান্নার স্রোত বয়ে গেল, তার কোন হিসেব নেই। বুক-ভরা শূন্যতা নিয়ে, লজ্জা আর অপমানের অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে যারা চিরতরে চলে-যাওয়া প্রিয়জনের জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে বেঁচে রইল, তারা নিহতদের চেয়ে ভাগ্যবান কিনা, সেটা বলা কঠিন। আর, সরু সরু গলিঘুঁজির মধ্যে পড়ে রইল তরুণী মেয়েদের যন্ত্রণাবিদ্ধ বেঁকে-যাওয়া দেহগুলি--অসহ্য যন্ত্রণার ভঙ্গিতে তাদের বাহু পেছনের দিকে উৎক্ষিপ্ত।

শুধু নদীর ধারে যেখানে কামার নাউম্-এর বাড়ি, সেইখানে একটা প্রচণ্ড প্রতিরোধের ধাক্কা খেল ডালকুত্তারা, যারা তার সুন্দরী স্ত্রী সারার দিকে এগিয়েছিল। চব্বিশ বছরের পূর্ণ-যৌবন এই কামারটির বলিষ্ঠ জোয়ান দেহ আর ইস্পাতের মতো পেশী, বিরাট হাতুড়িটা ঠুকে ঠুকে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। সে তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে দিল না ওদের হাতে।

ছোট্ট তার কুটিরে সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড একটা সংঘাতের মধ্যে দু'জন পেৎলিউরা-ডাকাতের মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেল পচা কুমড়োর খোলের মতো। নাউম মরীয়া মানুষের চরম হিংস্রতা নিয়ে তাদের দু'জনের জীবনের জন্যে প্রচণ্ড লড়াই চালাল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার কর্কশ খটাখট আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল নদীর ধারে,

যেখানে বিপদ বুঝে ছুটে গেছে বোম্বেটের দল। যখন আর মাত্র এক রাউন্ড গুলি বাকি রইল, তখন নাউম তার স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে বেয়নেট হাতে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি বেরিয়ে এল। এক ঝাঁক গুলি এসে বিঁধল তার সর্বাঙ্গে আর বাড়ির সামনের দরজায় তার জোয়ান দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়িয়ে গেল।

কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে অবস্থাপন্ন চাষীরা তাদের গাড়ি-টানা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে এল, খুশি মতো জিনিসপত্রে বোঝাই করে নিল গাড়িগুলো। তারপরে গোলুবের বাহিনীতে তাদের যেসব ছেলেরা কিংবা আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল, যাতে আরও দু'-একবার শহরে এসে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে।

সেরিওঝা ব্রুঝাক আর তার বাবা ছাপাখানার সহযোগী কর্মীদের অর্ধেক লোকজনকে লুকিয়ে রেখেছিল তাদের বাড়ির ছাদ-সিঁড়ির ঘরে আর মাটির নিচে ভাঁড়ার-ঘরে। বাড়ি যাবার পথে বাগানটা পার হবার সময় সে দেখতে পেল—রাস্তা বেয়ে একটা লোক ভীষণভাবে দুই হাত দোলাতে দোলাতে ছুটে আসছে, তার পরনে একটা লম্বা তালিমারা কোট।

লোকটা একজন বুড়ো ইহুদী। খালি মাথা, প্রাণপণে হাঁফাচ্ছে, মৃত্যুর আতঙ্কে আড়ষ্ট এই মানুষটার পেছনে পেছনে একটা ধূসর রঙের ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে একজন পেৎলিউরা-র লোক। এদের দু'জনের মধ্যে দূরত্বটা দ্রুত কমে আসছে। ঘোড়সওয়ারটা তার জিনের ওপর থেকে নুয়ে পড়ল বৃদ্ধ ইহুদীকে কেটে ফেলবার জন্যে। পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে বুড়ো মানুষটা দুই হাত তুলল, যেন সে আঘাতটাকে রুখতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সেরিওঝা রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে দাঁড়াল ঘোড়ার সামনে

বৃদ্ধকে রক্ষা করবার জন্যে, 'ছেড়ে দাও ওকে, ডাকাত কুত্তা কোথাকার!'

নেমে-আসা তলোয়ারের গতিটাকে থামাবার কোন চেষ্টা না করে ঘোড়সওয়ারটি তার ফলাটা ভোঁতাভাবে সরাসরি নামিয়ে আনল শণ রঙে চুলওয়ালা কচি মাথাটার ওপর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান আতামান পেৎলিউরার সৈন্যদলের ওপরে লাল সৈন্যদলের চাপ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গোলুবের বাহিনীর তলব পড়ল সীমান্তে। শহরে শুধু রেখে যাওয়া হল পেছনের সারির একটা ছোট সৈন্যদল আর শহরের সামরিক শাসনকর্তৃপক্ষের লোকদের।

শহরবাসীরা একটু নড়াচড়া করার সুযোগ পেল। ইহুদী অধিবাসীরা এই সাময়িক বিরতির সুযোগটুকুতে মৃতদের কবর দিতে লাগল, ইহুদীপাড়ার ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরগুলোয় জীবন আবার ফিরে এল।

শুধু মাঝে মাঝে শান্ত সন্ধ্যায় দূর থেকে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ ভেসে আসে। খুব বেশি দূরে নয় কোথাও লড়াই চলেছে।

স্টেশনের রেলকর্মীরা কাজ ছেড়ে গ্রামের দিকে ঘুরতে লেগেছে কাজের সন্ধানে।

ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে।

সামরিক আইন জারি হয়েছে গোটা শহরে।

নিবিড় অন্ধকার আর কুৎসিত এই রাত্রিটা—এমন একটা রাত্রি যে যতোই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকানো যাক না কেন,

অন্ধকার ভেদ করা যাবে না কিছুতেই, আর অন্ধচোখে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হবে মানুষকে—যে-কোন মুহূর্তে খানায়-গর্তে মুখ থুবড়ে ঘাড় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা।

ভদ্দর লোকেরা জানে যে এহেন সময়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকাই ভাল। তারা আলোও জ্বালবে না, কারণ, অবাঞ্ছনীয় অতিথিরা আলো দেখে আকৃষ্ট হতে পারে। অন্ধকারই ভাল আর ঢের নিরাপদ। এমন কেউ কেউ অবশ্য আছে যারা সর্বদাই অস্থির—তারা যদি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে চায় তো যাক, ভদ্দর নাগরিকের তাতে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। সে নিজে কিন্তু কিছুতেই বাইরে বেরুবার ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

এই রকম একটা রাত্রি, কিন্তু তবু এহেন রাত্রিতেও একজন লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে।

করচাগিনদের বাড়ির সামনে এসে সে সাবধানে টোকা মারল জানলাটার ওপর। কোন সাড়া না পেয়ে সে আবার আরও জোরে আর আরও ঘনঘন টোকা দিতে থাকল।

পাভেল স্বপ্ন দেখছিল—একটা অমানুষিক চেহারার অদ্ভুত প্রাণী তার দিকে একটা মেশিনগান বাগিয়ে আছে আর সে পালিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই, এমন সময়ে মেশিনগানটা ভয়ানক রকম খটাখট শব্দে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

ঘুম ভেঙে যেতেই শুনতে পেল জানলায় খটাখট আওয়াজ। কে যেন টোকা দিচ্ছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে এল—লোকটা কে দেখবার জন্যে, কিন্তু দেখতে পেল শুধু একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

বাড়িতে পাভেল একা। মা গেছে পাভেলের বড়ো বোনকে

দেখতে। তার স্বামী চিনিকলের একজন মিস্ত্রি। আর আরতিওম তো কাছাকাছি একটা গাঁয়ে কামারের কাজ করছে, হাতুড়ি পিটে চালিয়ে নিচ্ছে নিজেরটা।

তবু, লোকটা তো একমাত্র আরতিওমই হতে পারে।

পাভেল জানলাটা খুলবে ঠিক করল। অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বলল, 'কে?'

জানলার বাইরের মূর্তিটা একটু নড়াচড়া করে চাপা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ঝুখ্‌রাই।'

জানলার তাকের ওপর হাত দুটো রেখে ঝুখ্‌রাই মাথাটা তুলে ধরল পাভেলের মুখোমুখি সমান উচ্চতায়। ফিসফিসিয়ে বলল, 'রাতটা তোমার এখানে কাটাব বলে এলাম। কোনো আপত্তি আছে, ভাই?'

'নিশ্চয় না,' সাগ্রহে বলল পাভেল, 'কাটাবে বইকি। জানলা দিয়ে গলে ভেতরে এস।'

জানলাটার ফাঁকে কোন গতিকে তার বিরাট দেহটাকে টেনে ভেতরে আনল ফিওদর।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সে কিন্তু তখনই সরে এল না। কান খাড়া করে সে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর, মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা সরে গিয়ে যখন রাস্তাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে খুব ভাল করে দেখে নিল রাস্তাটা। তারপরে পাভেলের দিকে ফিরল সে, 'তোমার মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দেবো না তো, কি বলো?'

পাভেল জানাল যে বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। নাবিকটি আরও আশ্বস্ত হল কথাটা শুনে। সে আরেকটু জোর গলায় কথা বলতে লাগল, 'খুনী-ডাকাতগুলো ইদানীং আমার পেছনে বেশ তোড়জোড় করেই লেগেছে, ভাই। স্টেশনে যা হয়ে গেছে, তার জন্যেই আমার খোঁজে ঘুরছে ওরা।

আমাদের লোকজন যদি আরেকটু একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারত তাহলে আমরা ওই ইহুদী-ঠেঙানোর সময় সেই কুত্তাদের উপর বেশ এক হাত নিতে পারতাম। কিন্তু দেখছই তো, এখনও আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় না লোকে। আর সেইজন্যেই তো কিছু হল না। এদিকে ওরা আমার খোঁজে ফিরছে, দু'-দু'বার জাল ফেলেছে—আজ তো এক চুলের জন্যে পার পেয়ে গেছি। বাড়ি ফিরছিলাম, বুঝলে, পেছনের রাস্তা দিয়ে অবশ্য। একবার চারদিকে দেখে নেবার জন্যে চালাটার কাছে যেই থেমেছি দেখি একটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে একটা বেয়নেটের ডগা বেরিয়ে রয়েছে। তক্ষুণি তো ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে এলাম তোমার এখানে। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানেই দিনকতকের জন্যে ঘাঁটি গাড়ব, কি বলো? বেশ।'

ঝুখ্‌রাই কাদামাখা বুটজোড়া টেনে খুলতে লাগল।

সে আসাতে খুশি হয়েছে পাভেল। বিদ্যুৎ-স্টেশনে ইদানীং কাজ চলছে না, নির্জন বাড়িতে পাভেলের ভারি ফাঁকা ঠেকছিল।

শুয়ে পড়ল তারা। পাভেল তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ঝুখ্‌রাই সিগারেট টানতে টানতে জেগে রইল অনেকক্ষণ। একটু পরেই উঠে পড়ল সে, খালি পায়ে নিঃশব্দে জানলাটার কাছে এসে রাস্তাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সমস্তক্ষণ তার হাতটা রইল বালিশের নিচে গোঁজা ভারি পিস্তলটার হাতলের ওপর।

সেই রাত্রে ঝুখ্‌রাইয়ের অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়া আর তার সঙ্গে আট দিন কাটানোর ফলে পাভেলের জীবনের

সমস্ত গতিটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। অনেক কিছু নতুন ব্যাপার সম্বন্ধে পাভেল জানতে পারল এই নাবিকটির কাছে—সেটা নাড়া দিল তার সত্তার গভীরে।

আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হচ্ছে ঝুখ্‌রাইকে। তাই সে উৎসুক পাভেলের কাছে নানান কথা বলে এই সময়টুকু কাটাচ্ছে: এই অঞ্চলটার টুঁটি টিপে রয়েছে ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীরা—তাদের উদ্দেশে প্রচণ্ড ক্রোধ আর জ্বলন্ত ঘৃণা ঢেলে দিয়ে নানা কথা বলে চলে সে পাভেলের কাছে।

ঝুখ্‌রাইয়ের ভাষাটা স্পষ্ট, ঝরঝরে আর সহজ। কোন দ্বিধা নেই তার মনে, তার সামনে পথটা পরিষ্কার এবং পাভেল ক্রমশই দেখতে পেল যে, 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি', 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট', 'পোলিশ সোশ্যালিস্ট' ইত্যাদি গালভরা নামওয়ালা বিভিন্ন রাজনীতিক দল আসলে সবাই শ্রমিকদের নিদারুণ শত্রু--একমাত্র সত্যিকারের বিপ্লবী দল, যেটা ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে একান্তভাবে লড়াই করে চলেছে, সেটা হচ্ছে বলশেভিক পার্টি।

এর আগে পর্যন্ত এ সব ব্যাপারে পাভেলের ধারণাটা ছিল নিতান্তই এলোমেলো।

সমুদ্রের ঝড়ে পোড় খাওয়া এই দৃঢ় আর বলিষ্ঠ-মন বল্টিক অঞ্চলের নাবিকটি বহুদিনের পুরনো আর বিশ্বস্ত বলশেভিক, ১৯১৫ সাল থেকে সে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক (বলশেভিক) পার্টির সভ্য। পাভেলের কাছে সে জীবনের নির্মম সত্যগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে যায় আর তরুণ এই স্টোকার মুগ্ধ হয়ে তাই শোনে।

ঝুখ্‌রাই বলছিল, 'অল্প বয়সে আমিও তোমার মতোই ছিলাম, ভাই। শরীর-মনের এতটা উদ্যম নিয়ে কী করব ভেবেই

পেতাম না, সব সময়ে শাসন না-মানার দিকে ঝোঁকটা গিয়ে পড়ত। দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলাম, মাঝে মাঝে শহরের ভদ্দরলোকদের হৃষ্টপুষ্ট ছেলেদের দেখেই রাগে জ্বলে উঠতাম। প্রায়ই ওদের ধরে বেদম মার দিতাম, কিন্তু তার জন্যে আমাকে আবার বাবার কাছে পাল্টা মার খেতে হয়েছে। একা একা লড়াই করে অবস্থাটা বদলানো যায় না। মজুরদের আদর্শের জন্যে ভালো একজন লড়নেওয়ালা হবার মতো সব কিছু গুণ তোমাব মধ্যে আছে, পাভ্লুশা। শুধু তোমার বয়েসটা এখনও বড়ো কম আর শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানো না। আমি তোমাকে ঠিক রাস্তাটা বাতলে দেব, কারণ আমি জানি তুমি একজন ভালো কর্মী হয়ে উঠবে। আমি এই নিরীহ মিনমিনে গোছের ছেলেদের সহ্য করতে পারি না। গোটা দুনিয়াটায় আগুন জ্বলে উঠেছে আজ। এতদিন যারা গোলাম ছিল আজ তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, পুরনো ধরনের জীবনের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু সেটা করবার জন্যে আমাদের শক্তসমর্থ লোক চাই; লড়াই শুরু হলে যারা তেলাপোকার মতো সুড়সুড় করে গর্তে গিয়ে ঢুকবে, সে ধরনের মেয়েলি স্বভাবের ছেলেদের নিয়ে আমাদের চলবে না। নির্মম হয়ে যারা আঘাত হানতে পারবে, তেমন মানুষই আমাদের দরকার।'

টেবিলের ওপরে সশব্দে একটা ঘুষি বসাল সে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে হাত দুটো পকেটে গুঁজে পায়চারি করতে লাগল ঘরের এদিক থেকে ওদিক।

এই ক'দিনের নিষ্ক্রিয়তা তাকে একটু দমিয়ে দিয়েছে। আর-সবাই চলে যাবার পরে সে এই শহরে থেকে গিয়েছিল বলে তার মনে দারুণ আক্ষেপ এসেছে। এখানে আর পড়ে থাকাটা নিরর্থক হবে মনে করে সে যুদ্ধসীমান্ত পার হয়ে

গিয়ে লাল সৈন্যদলগুলির সঙ্গে যোগ দেবে বলে ঠিক করে ফেলেছে।

শহরে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে ন'জন পার্টি সভ্যের একটা দল থাকবে এখানে।

একটু বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবল ঝুখ্‌রাই, 'আমাকে ছাড়াই ওরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এভাবে কিছু না করে আমি তো আর বসে থাকতে পারি না। বলতে গেলে দশটা মাস নষ্ট করেছি আমি।'

পাভেল একবার জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, 'আচ্ছা, ফিওদর, তুমি ঠিক কে বলো তো?'

ঝুখ্‌রাই দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে দিয়েছিল, সে প্রথমে কথাটার মানে বুঝতে পারে নি, 'জানো না?'

নিচু গলায় বলেছিল পাভেল, 'আমার তো মনে হয় তুমি বলশেভিক কিংবা কমিউনিস্ট।'

হেসে ফেটে পড়ল ঝুখ্‌রাই। ডোরা-কাটা আঁটসাঁট গেঞ্জি-পরা চওড়া তার বুকের ওপরে চাপড় মেরে বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই! বলশেভিক আর কমিউনিস্টরা যে এক, এ কথা যেমন ঠিক, তোমার কথাটাও তেমনি ঠিক।' হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে উঠল, 'কিন্তু এতোটা যখন বুঝে গেছ, তখন মনে রাখা চাই— তুমি তো চাও না যে ওদের হাতে আমি ধরা পড়ি, সুতরাং কক্ষণো কারুর কাছে বলবে না কথাটা। বুঝলে তো?'

'বুঝেছি,' দৃঢ়স্বরে বলল পাভেল।

আঙিনার দিকে গলার স্বর শোনা গেল আর কোনো জানান না দিয়েই দরজাটা খুলে গেল। ঝুখ্‌রাইয়ের হাতটা সঙ্গে সঙ্গে সেঁধিয়ে গেল পকেটের মধ্যে, কিন্তু ভালিয়া আর ক্লিম্‌কার সঙ্গে সের্গেই ব্রুঝাক্‌কে ঢুকতে দেখে সে আবার

বের করে আনল হাতটা। রোগা আর বিবর্ণ সের্গেই-এর মাথায় পট্টি বাঁধা।

পাভেলের করমর্দন করে হাসিমুখে বলল সের্গেই, 'কিরে, পাভেল। আমরা তিনজনেই এলাম তোর এখানে একটু গল্পটল্প করব বলে। ভালিয়া আমাকে একা বেরুতে দেবে না, আর ক্লিম্‌কা আবার ভালিয়াকে একা কোথাও যেতে শুনলে ঘাবড়ে যায়। লাল-চুলো হলে হবে কি, ক্লিম্‌কাটা এদিকে দিব্যি সেয়ানা।'

হাসতে হাসতে ভালিয়া হাত দিয়ে চেপে ধরল সের্গেই-এর মুখটা, 'ফাজিল একটা। আজ সারাদিন ক্লিম্‌কার পেছনে লেগে থাকবে, দেখছি।'

এক-পাটি সাদা দাঁত বের করে ক্লিম্‌কা তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হাসল, 'ঘেয়ো-মাথা রুগীকে নিয়ে আর কী করা যাবে বলো? ঘিলুটা একটু ঘুলিয়ে গেছে --দেখতেই তো পাচ্ছ।'

হেসে উঠল সবাই।

মাথায় তলোয়ারের সেই চোটটা থেকে সের্গেই এখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারে নি। পাভেলের বিছানার ওপরে আরাম করে বসল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোরালো গল্পে জমে গেল এরা ক'জন। সের্গেই সাধারণত ফূর্তিবাজ আর হাসিখুশি। কিন্তু পেৎলিউরা-সৈনিকের সঙ্গে তার সেদিনের ঘটনাটার পর সে গম্ভীর আর মন-মরা হয়ে উঠল। ঘটনাটার কথা সে বলল ঝুখ্‌রাইকে।

ঝুখ্‌রাই এই তিনটি ছেলেমেয়েকে চেনে, কারণ সে বারকয়েক গেছে ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি। এই তরুণদের তার ভাল লাগে, একেবারে সংগ্রামের মধ্যে এরা এখনও সরাসরি আসে নি, কিন্তু শ্রমিকদের শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ওদের মধ্যে সুস্পষ্ট

রূপ পেয়ে গেছে। আগ্রহের সঙ্গে ঝুখ্‌রাই শুনে গেল কীভাবে ওরা ওদের বাড়িতে ইহুদী পরিবারগুলিকে আশ্রয় দিতে সাহায্য করেছিল তাদের বাঁচাবার জন্যে। সেদিন বিকেলে সে এই ছেলেমেয়েদের অনেক কিছু বলল—বলশেভিকদের সম্বন্ধে, লেনিনের সম্বন্ধে। কী ঘটছে না ঘটছে সে সব এদের বুঝিয়ে বলল ঝুখ্‌রাই।

পাভেলের বন্ধুরা যখন বাড়ি গেল, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

ঝুখ্‌রাই প্রতি সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় আর গভীর রাত্রে ফিরে আসে। শহর ছেড়ে যাবার আগে তাকে তার কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হচ্ছে কাকে কোন্ কাজটা করার জন্যে থাকতে হবে।

কিন্তু আজকের এই রাত্তিরটায় আর ফিরল না সে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে পাভেল একনজর দেখেই বুঝল, ঝুখ্‌রাই বিছানাটায় শোয় নি রাত্রে।

একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় ভরে গেল পাভেলের মন, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা বন্ধ করে যথাস্থানে চাবিটা রেখে ক্লিম্‌কার বাড়ি এল যদি সেখানে ফিওদরের কোন খবর পাওয়া যায় সেই আশায়। জামা-কাপড় কাচাকাচি করছিল ক্লিম্‌কার মা—মোটাসোটা দেহ, বসন্তের দাগওলা চ্যাপ্টা মুখ। ফিওদর কোথায় জানে কিনা পাভেল জিজ্ঞেস করলে কাটা কাটা কথায় জবাব দিল ক্লিম্‌কার মা, 'তোদের ওই ফিওদরের ওপর নজর রাখা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই, না? ওই হতভাগা লোকটার জন্যেই তো জোজুলিখার সংসারটা তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেল। ওর সঙ্গে তোদের কি এত কাজ? অদ্ভুত একটা দল হয়েছিস তোরা, সত্যি। ক্লিম্‌কা, তুই, আর ওই যতসব...' রাগে সে সজোরে চাপ দিল জামা-কাপড়ে।

ক্লিম্‌কার মা রাগী মানুষ, ভীষণ কাটা কাটা তার কথা।

ক্লিম্‌কার বাড়ি থেকে পাভেল এল সের্গেইয়ের বাড়ি। সেখানে সে তার আশঙ্কার কথাটা বলল। ভালিয়া বলল, ‘এত ভাবছোই বা কেন? হয়তো ঝুখ্‌রাই কোন বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছে।’ কিন্তু তার কথায় নিশ্চিন্ততার অভাব ফুটে উঠল।

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে পাভেলের, ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি বেশিক্ষণ থাকল না সে। ওরা তাকে খেয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও চলে এল পাভেল।

বাড়ি ফিরে এল পাভেল যদি ঝুখ্‌রাই ফিরে থাকে এই আশায়।

দরজাটা তেমনিই তালাবন্ধ। ভারি মন নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল পাভেল কিছুক্ষণ, ফাঁকা বাড়িটায় ঢুকতে তার মন চাইল না কিছুতেই।

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কিছুক্ষণ আঙিনাটায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হঠাৎ যেন কিসের টানে সে এসে ঢুকল চালাঘরটায়। চালের নিচে বেয়ে উঠে মাকড়সার জাল সরিয়ে গোপন জায়গাটা থেকে লুকিয়ে-রাখা ভারি ন্যাকড়া-জড়ানো সেই মান্‌লিশের পিস্তলটা বের করে নিল।

তারপর চালাটা থেকে বেরিয়ে এসে পাভেল রওনা হল স্টেশনের দিকে। পকেটে ঝুলন্ত পিস্তলটার ভার অনুভব করে সে অদ্ভুত রকমের একটা উল্লাস বোধ করল।

কিন্তু স্টেশনে ঝুখ্‌রাইয়ের কোন খবর পাওয়া গেল না। ফিরে আসার পথে প্রধান বনপরিদর্শকের সেই চেনা বাগান-বাড়িটার কাছে তার গতি কমে এল। একটা ক্ষীণ আশায় সে বাড়িটার জানলাগুলোর দিকে একবার তাকাল, কিন্তু বাগানটার মতোই বাড়িটাও যেন প্রাণহীন। বাগানটা পেরিয়ে যেতে

যেতে সে পেছন ফিরে এক নজর তাকাল গত হেমন্তের ঝরাপাতায় আচ্ছন্ন বাগানের পথটার দিকে। জায়গাটাকে মনে হল জনমানবশূন্য আর নিতান্তই উপেক্ষিত। কোন উদ্যোগী হাতের স্পর্শ পেয়েছে বলে দেখে মনে হয় না—বিরাট পুরনো বাড়িটার প্রাণহীন নিস্তব্ধতা পাভেলকে আরও বিষণ্ণ করে তুলল।

তনিয়াব সঙ্গে তার শেষ ঝগড়াটা খুব গুরুতর রকমের হয়ে গেছে। মাসখানেক আগে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল।

পকেটে হাত দুটো গুঁজে ধীরে ধীরে শহরে ফিরে আসার পথে সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল পাভেলের।

হঠাৎ রাস্তায় তনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, আর তনিয়া তাকে তাদের বাড়ি আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, 'বাবা আর মা বল্‌শান্‌স্কিদের বাড়ি যাচ্ছেন জন্মদিনের নেমন্তন্নে। আমি একা থাকব বাড়িতে। তুমি এসো না, পাভলুশা? একটা খুব ভাল বই আছে—লেওনিদ আন্দ্রেয়েভের 'সাশ্‌কা ঝিগুলিওভ'—দু'জনে মিলে পড়া যাবে। আমার অবশ্য পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু আরেকবার পড়ার ইচ্ছে আছে তোমার সঙ্গে। বেশ কাটাব বিকেলটা, কেমন? আসবে তো?'

তনিয়ার ঘন বাদামী চুলের ওপর সাদা টুপিটার নিচ থেকে তার বড়ো বড়ো বিস্ফারিত চোখ দুটো আশান্বিতভাবে তাকিয়েছিল পাভেলের দিকে।

'আসব আমি।'

তারপরে যে যার পথে চলে গিয়েছিল তারা।

পাভেল তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল তার যন্ত্রগুলোর কাছে: সন্ধ্যাটা তনিয়ার সঙ্গে কাটাতে পারবে—যেন এই চিন্তাতেই চুল্লিটায় আগুনটা জ্বলছে অন্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে,

জালানির কাঠগুলো যেন আরও বেশি খুশি হয়ে পট্‌পট্‌ আওয়াজ তুলছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন সামনের চওড়া দরজাটায় এসে টোকা মারল, তনিয়া বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল তার যেন কেমন একটা ইতস্তত ভাব। তনিয়া বলল, 'আমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে--ওদের আসার কথা ছিল না অবশ্য। কিন্তু পাভ্‌লুশা, তুমি এসো।'

ফিরে যাবার জন্য পিছন ফিরে দরজাটার দিকে পাভেল এগিয়ে যেতেই তনিয়া এসে তার হাত ধরল, 'চলো ভেতরে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে ওদেরই লাভ হবে।' পাভেলের কাঁধ জড়িয়ে ধরে তনিয়া তাকে খাবার ঘরটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে।

ঘরে বসেছিল কয়েকজন তরুণ-তরুণী। তাদের দিকে ফিরে তনিয়া হেসে বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই তোমাদের সঙ্গে, এই আমার বন্ধু পাভেল করচাগিন।'

ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলটা ঘিরে বসেছিল ওরা তিনজন: লিজা সুখারকো—সুন্দরী, গাঢ় রঙ, ঠোঁট-ফোলানো ছোট মুখ, বেণী পাকিয়ে খোপা বাঁধা--স্কুলের ছাত্রী সে; কালো রঙের একটা কেতাদুরস্ত জামা গায়ে লম্বাটে একটি ছেলে, মাথার পাতলা চুলগুলো তার তেলে চক্‌চক্‌ করছে, ধূসর চোখের দৃষ্টিতে একটা শূন্য চাউনি; আর এদের দু'জনের মাঝখানে বাবুয়ানা একটা স্কুলের উর্দি পরে বসে আছে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি। তনিয়ার ঘরে ঢোকার সময়ে তাকেই পাভেল প্রথম দেখেছিল।

লেশ্চিনস্কিও দেখেই চিনেছে পাভেলকে, বিস্ময়ে তার সরু বাঁকা ভুরু দুটো তুলল সে।

কয়েক মুহূর্ত পাভেল একটা সুস্পষ্ট শত্রুতার চোখে

ভিক্তরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজাটায়। এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙবার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তনিয়া, পাভেলকে ভেতরে আসতে বলে লিজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে এল।

আগন্তুকটিকে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল লিজা সুখার্‌কো, দাঁড়িয়ে উঠল সে চেয়ার ছেড়ে।

পাভেল কিন্তু বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আধা-অন্ধকার খাবারঘরটা পেরিয়ে হনহন করে চলে এল সামনের দরজাটার দিকে। তনিয়া এসে যখন তাকে ধরে ফেলে তার কাঁধে হাত রাখল, ততক্ষণে পাভেল অলিন্দে চলে এসেছে।

'ছুটে চলেছ কোথায়? তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হোক তাই আমি বিশেষ করে চেয়েছিলাম।'

পাভেল কাঁধের ওপর থেকে তার হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে তীব্র স্বরে বলল, 'ওই শালার সামনে আমি নিজেকে একটা দেখবার জিনিস হিসেবে খাড়া করতে রাজী নই। আমি ওই দলের লোক নই—তুমি ওদের পছন্দ করতে পারো, কিন্তু আমার ঘেন্না হয় ওদের দেখে। যদি জানতাম যে ওরা তোমার বন্ধু, তাহলে আমি কক্ষণো আসতাম না।'

জমে ওঠা রাগ চেপে তাকে বাধা দিয়ে বলল তনিয়া, 'এরকম কথা বলার কি অধিকার আছে তোমার? আমি তো কখনো জানতে যাই না তোমার বন্ধু কারা, কারা আসে তোমার বাড়িতে।'

'তোমার এখানে কারা আসে না আসে তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। কিন্তু আমি আর তোমার এখানে আসব না—শুধু এইটে বলে যাচ্ছি।' সামনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পাভেল পাল্টা জবাব দিয়েছিল তনিয়ার কথার। ছুটে গিয়েছিল সে বাগানের দেউড়িটার দিকে।

তারপর থেকে আর তনিয়ার সঙ্গে দেখা হয় নি। ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার সময়ে সে আর ইলেকট্রিশিয়ান দু'জনে মিলে যখন বিদ্যুৎ-স্টেশনে ইহুদী-পরিবারগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল, তখন পাভেল ভুলে গিয়েছিল ঝগড়ার ঘটনাটা। আজ আবার তনিয়ার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল তার।

ঝুখ্‌রাইয়ের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা আর ফাঁকা বাড়ির কথা ভেবে মনটা দমে গেল পাভেলের। ধূসর লম্বা রাস্তাটা ঘুরে গেছে ডাইনে। বসন্তের কাদা এখনও শুকোয় নি, তামাটে কাদা-জলের ছোট ছোট গর্ত রাস্তাটার বুক-জুড়ে আছে।

সামনের একটা বাড়ির দেয়ালটার প্লাস্টার খসে গেছে। কদাকার বাড়িটা এসে ঢুকেছে রাস্তার মধ্যে আর তারই পাশ দিয়ে রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

রাস্তার মোড়ে যেখানে একটা ভাঙাচোরা দরজাওয়ালা দোকান-ঘরের মতো জায়গার মাথার ওপরে 'সোডা-লেমোনেড' লেখা একটা তক্তি উল্টো হয়ে ঝুলছে, সেইখানে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি লিজা সুখারকোর কাছে বিদায় নিচ্ছিল।

ভিক্তর অনুনয়ের দৃষ্টিতে লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করছিল, 'আসবে তো ঠিক? ঠকাবে না তো শেষ পর্যন্ত?'

লিজা চতুরমুখে উত্তর দিল, 'আসব বৈকি। তুমি অপেক্ষা করতে পারো আমার জন্যে।'

চলে যাবার সময় সে ভিক্তরের দিকে তার বাদামী চোখের ভরসা-জাগানো গূঢ় চাউনিতে তাকিয়ে হাসল।

রাস্তা বেয়ে কয়েক গজ আসতেই লিজা দু'জন লোককে একটা বাঁক ঘুরে রাস্তার ওপরে বেরিয়ে আসতে দেখল। প্রথম জন বলিষ্ঠ দেহ, চওড়া-বুক, মজুরের পোশাক পরা—

তার বোতাম-খোলা কোর্তাটার নিচে ডোরাকাটা গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে, কপালের ওপরে মাথার কালো টুপিটা নামানো, পায়ে বাদামী নিচু বুটজোড়া, চোখের নিচে একটা কালচে-নীল আঘাতের চিহ্ন।

দৃঢ় পায়ে কিন্তু একটু টলে টলে চলেছে লোকটি।

তার তিন-পা পেছনে বন্দুক বাগিয়ে ধূসর কোট-পরা একজন পেৎলিউরা-সৈন্য — তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝুলছে দুটো কার্তুজের থলি, তার বেয়নেটটা প্রথম জনের প্রায় পিঠটা ছুঁয়ে আছে। লোমশ ভেড়ার চামড়ার টুপিটার নিচ থেকে তার ছোট ছোট সাবধানী চোখ দুটো বন্দীর মাথার পেছন দিকটায় লক্ষ্য রেখেছে, তার গালের দু'ধারে তামাকের ধোঁয়ায় হলদে খোঁচা খোঁচা গোঁফ।

একটু গতিটা কমিয়ে লিজা রাস্তাটা পার হয়ে অন্য দিকে এল আর ঠিক সেই সময় তার পেছনে পাভেল এসে পড়ল বড়ো রাস্তাটার ওপরে।

পুরনো বাড়িটা পার হয়ে রাস্তাটার বাঁকে পাভেল ডান দিকে যেই ঘুরেছে, অমনি সেও ওই দু'জন মানুষকে তার দিকে আসতে দেখল।

চমকে উঠে থেমে গেল পাভেল, যেন তার পা আটকে গেছে মাটির সঙ্গে। যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে ঝুখ্‌রাই।

'এইজন্যেই কাল রাত্রে ফেরে নি ঝুখ্‌রাই!'

ক্রমশই এগিয়ে আসছে ঝুখ্‌রাই। পাভেলের বুকে হাতুড়ি পিট্‌তে লাগল, যেন হৃৎপিন্ডটা ফেটে পড়বে এখনই। অবস্থাটা ঠিক মতো বুঝে নেবার বৃথা চেষ্টায় তার মাথায় অতি দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে যেতে লাগল: খুব বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। শুধু একটা জিনিস স্পষ্ট: ঝুখ্‌রাই ধরা পড়েছে।

বিভ্রান্ত আর হতচকিত পাভেল ওদের দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবতে লাগল, কী করা যায়?

শেষ মুহূর্তে তার মনে পড়ল পকেটে পিস্তলটার কথা। ওরা দু'জন তাকে পার হয়ে এগিয়ে গেলেই সে রাইফেলধারীটাকে পেছন থেকে গুলি করবে আর তাহলেই ফিওদরের মুক্তি। মুহূর্তের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। ফিওদর তো কালই বলেছিল, 'এই সব কাজের জন্যে আমাদের চাই শক্তসমর্থ লোকের...'

দ্রুত একনজর পেছন দিকটা দেখে নিল পাভেল। শহরমুখো রাস্তাটা একেবারে জনহীন, জন-প্রাণীও চোখে পড়ে না। সামনের দিকে একটা বসন্তের খাটো কোট-পরা স্ত্রীলোক রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে—ও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে মাথা ঢোকাবে না। মোড়ের ওখান থেকে যে অন্য রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু স্টেশনের দিকে বহুদূরে রাস্তাটার ওপর কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে।

রাস্তাটার ধার ঘেঁষে সরে এল পাভেল। মাত্র আর কয়েক পা যখন ব্যবধান, তখন ঝুখ্‌রাই তাকে দেখতে পেল।

আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখে ঝুখ্‌রাইয়ের ঘন ভুরুজোড়া নেচে উঠল। পাভেলের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার গতি কমে এল, আর, বেয়নেটটা এসে স্পর্শ করল তার পিঠ।

খ্যানখেনে ভাঙা গলায় প্রহরীটা বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি—পা বাড়িয়ে চলো, নইলে দেব এক বাড়ি এই কুঁদোর!'

তাড়াতাড়ি পা চালাল ঝুখ্‌রাই। পাভেলের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। শুধু যেন অভিবাদনের ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ল একবার।

পাছে হলদে-গোঁফ সৈনিকটার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাই পাভেল নিতান্তই উদাসীনের ভঙ্গিতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু তার মাথায় উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা বারবার চাড়া খেতে লাগল: 'যদি গুলিটা ফস্‌কে গিয়ে ওই লোকটার গায়ে না লেগে ঝুখ্‌রাইয়ের গায়ে লাগে, তাহলে...'

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই।

হলদে-গোঁফ সৈন্যটা পাভেলের পাশাপাশি এসে পড়তেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—রাইফেলটা চেপে ধরে নলটা নিচে মাটির দিকে নামিয়ে আনল।

বেয়নেটটা একটা পাথরের ওপর ঘষে গিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলল।

এরকম আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যটা হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ার পর ভীষণ একটা হেঁচ্‌কা টানে রাইফেলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেহের সমস্ত ভার দিয়ে কোনরকমে রাইফেলটা চেপে ধরে রইল পাভেল। ধস্তাধস্তির মধ্যে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পাথরের গায়ে লেগে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল খানাটার মধ্যে।

শব্দটা শুনেই ঝুখ্‌রাই পাশে লাফিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল। পাভেলের হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ভীষণভাবে ধস্তাধস্তি করছে সৈন্যটা—পাভেলের হাতটা মুচ্‌ড়ে গেছে, কিন্তু যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে তার মুঠির বাঁধন আলগা করে নি। তারপরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্রুদ্ধ পেৎলিউরা-সৈনিকটি পাভেলকে পেড়ে ফেলল মাটিতে—কিন্তু তবুও সে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিতে পারল না। পাভেল পড়ে গেল, কিন্তু পাভেলের টানে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যটিও হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাভেলের ওপর—এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই

যা পাভেলের হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিতে পারে।

তখন দুই লাফে ঝুখ্‌রাই এসে পড়ল ওদের পাশে—লোহার মতো শক্ত তার মুঠি শূন্যে একপাক ঘুরে নেমে এল সৈন্যটার মাথার ওপর। এক সেকেন্ডের মধ্যেই সৈন্যটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেল পাভেল। মুখের ওপর দুটো প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল সৈনিকের দেহ পথের ধারে খানার মধ্যে।

যে-হাতে ঘুষি চলেছিল, সেই বলিষ্ঠ দুটি হাতই পাভেলকে মাটি থেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে ভিক্তর রাস্তার মোড়টা থেকে শ'খানেক পা এগিয়ে গিয়েছিল। লিজার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে আর পরের দিন আবার লিজা তার সঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানাটার পেছনে দেখা করতে আসবে বলে কথা দেওয়ায় ভিক্তর মনের স্ফূর্তিতে চলেছে শিস দিয়ে 'চপল-হৃদয়া নারী' গানটির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শোনা যায় যে লিজা সুখারকো প্রেমের ব্যাপারে বেশ একটু বেপরোয়া গোছের।

উদ্ধত আর বড়াই করতে অভ্যস্ত সেমিওন জালিভানভ একবার বলেছিল যে লিজা নাকি তার কাছে আত্মদান করেছে। ভিক্তর যদিও ঠিক বিশ্বাস করে নি কথাটা তবু লিজাকে তার বড়ো আকর্ষণীয় আর বাঞ্ছিত বলে মনে হয়। কাল সে জানতে পারবে জালিভানভের কথাটা সত্যি না মিথ্যে।

'কাল যদি আসে ও, তাহলে আমি ইতস্তত করব না। যাই হোক, লিজা চুমো তো খেতে দেয়। আর, সেমিওনটা যদি সত্যি কথাই বলে থাকে...' দু'জন পথ-চলতি পেৎলিউরা-

সৈন্যকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে রাস্তাটার পাশে সরে যেতে গিয়ে ভিক্তরের চিন্তায় এইখানে বাধা পড়ল। সৈন্য দু'জনের মধ্যে একজন হাতে একটা ক্যাম্বিসের বাল্‌তি ঝুলিয়ে চলেছে খাটো-লেজ একটা ঘোড়ায় চেপে—বোঝা যাচ্ছে যে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াতে নিয়ে চলেছে সে। খাটো কোর্তা আর ঢিলেঢালা নীল প্যাণ্ট পরা অন্যজন চলেছে ঘোড়সওয়ারের পাশে পাশে তার হাঁটুর ওপর হাতটা রেখে একটা মজার গল্প বলতে বলতে।

এদের যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে ভিক্তর যখন ফের চলতে শুরু করেছে, তখন বড়ো রাস্তাটার ওপরে রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে থেমে গেল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সওয়ারটি আওয়াজটার দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিয়েছে আর তার পেছন পেছন অন্য লোকটি ছুটে চলেছে তার তলোয়ারটা চেপে ধরে।

ভিক্তর ছুটল ওদের পেছনে। বড়ো রাস্তাটার ওপরে যখন সে প্রায় পেঁছে গেছে, তখন আরেকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল, আর পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে মোড়ে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল ঘোড়সওয়ার-সৈন্যটি। ঘোড়াটাকে আরও জোরে দৌড়ানোর জন্যে পা দিয়ে খোঁচা মেরে আর বালতি দিয়ে আঘাত করে সে প্রথম দেউড়িটার কাছে এসে ভিতরে ঢুকেই আঙিনায় লোকগুলোর দিকে হাঁক পাড়ল, 'শিগগির, হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসো! আমাদের একজনকে মেরে ফেলেছে ওরা!'

এক মিনিটের মধ্যে জনকতক লোক তাদের রাইফেলের বল্টুর ভাঁজ খোলার খটাখট্ আওয়াজ তুলে ছুটে বেরিয়ে এল আঙিনাটা থেকে।

ভিক্তরকে গ্রেপ্তার করা হল।

ততক্ষণে কিছু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপরে—

তাদের মধ্যে ছিল লিজাও। লিজাকে আটকানো হয়েছিল সাক্ষ্য দেবার জন্যে।

ভয়ে লিজার পা দুটো যেন আটকে গিয়েছিল ঘটনার জায়গাটায়। ঝুখ্‌রাই আর করচাগিন তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে লিজা দেখল যে-ছেলেটি পেৎলিউরা-সৈন্যটাকে আক্রমণ করেছিল, তাকেই যে তনিয়া সেদিন তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

ঝুখ্‌রাই আর পাভেল এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে একটা বাগানের মধ্যে ঢুকেছে, এমন সময়ে সওয়ার-সৈন্যটি এসে পড়ল সেখানে ঘোড়া হাঁকিয়ে। ঝুখ্‌রাইকে রাইফেলটা নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে আর মার খেয়ে বেসামাল সৈন্যটাকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে দেখে সওয়ারটি তার ঘোড়া হাঁকাল বেড়াটার দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুখ্‌রাই রাইফেলটা তুলে গুলি ছুঁড়ল ধাওয়া-করে-আসা সওয়ারটার দিকে। ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি হঠে এল লোকটা।

পেৎলিউরা-সৈন্যটার এমন ভীষণভাবে ঠোঁট কেটে গেছে যে প্রায় কথা বলতে পারছে না সে। কোনক্রমে সে এতক্ষণে ঘটনাটার বিবরণ দিল।

'নিরেট আহম্মক কোথাকার! গ্রেপ্তার-করা একটা লোক কি-না নাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর তুমি দিব্যি সেটা হতে দিলে? যাও এখন পিঠের ওপর পঁচিশ ঘা খাওগে।'

ক্রুদ্ধ সৈন্যটি খিঁচিয়ে উঠল, 'খুব যে ওস্তাদি মারছ দেখছি। নাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না? ওই যে আরেকটা বেজন্মা আমার ঘাড়ের ওপর উন্মাদের মতো লাফিয়ে পড়ল—সেটা আমি আগে থেকে জানব কি করে?'

লিজাকেও জেরা করা হল। পেৎলিউরা-সৈন্যটি যা বলেছিল

সেও তাই বলল; কিন্তু যে-ছেলেটি তাকে আক্রমণ করেছিল সেই ছেলেটিকে যে সে চেনে, সে কথাটা লিজা চেপে গেল। তারপরে তাদের সবাইকে কম্যাণ্ড্যাণ্টের দপ্তরে নিয়ে আসা হল এবং সন্ধ্যের আগে কাউকে ছাড়া হল না।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট নিজে সঙ্গে গিয়ে লিজাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু রাজী হল না লিজা—লোকটার মুখে ভদ্‌কার গন্ধ এবং তার এই প্রস্তাবটার উদ্দেশ্য মোটেই ভালো বলে ঠেকল না।

ভিক্তর চলল লিজার সঙ্গে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে।

স্টেশনের পথটা বেশ দূর এবং দু'জনে হাত ধরাধরি করে যাবার সময় ওই ঘটনাটা ঘটার জন্যে ভিক্তর মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে লিজা জিজ্ঞেস করল, 'গ্রেপ্তার-করা লোকটাকে খালাস করে দিল কে, সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ না, না?'

'মোটেই না, কী ক'রে আন্দাজ করব?'

'সেদিন সন্ধ্যেয় তনিয়া একটি ছেলেকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল, মনে আছে?'

থেমে গেল ভিক্তর, বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'পাভেল করচাগিন?'

'হাঁ, নামটা করচাগিন বলেই তো মনে হচ্ছে। কী রকম অদ্ভুত ঢঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, মনে আছে? সেই ছেলেটা।'

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল ভিক্তর।

'ঠিক দেখেছ তুমি?'

'নিশ্চয়, ঠিক মনে আছে আমার ওর মুখখানা।'

'কম্যাণ্ড্যাণ্টকে কথাটা বললে না কেন?'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল লিজা, 'এমন জঘন্য কাজ আমি করব ভেবেছ নাকি?'

'জঘন্য? সৈন্যটার ওপর কে হামলা চালিয়েছিল সেটা বলা কি জঘন্য কাজ হল?'

'তা নয় তো কী, সেটাকে তুমি মনে করো খুব একটা সম্মানের কাজ? ওরা যে কী অত্যাচারটা চালাচ্ছে সেটা যেন ভুলে যাচ্ছ? ইস্কুল-বাড়িতে কতগুলো অনাথ ইহুদী বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে, তার কোন ধারণা আছে তোমার? আর তুমি চাও আমি কি-না করচাগিনকে ধরিয়ে দেব ওদের কাছে? সত্যি, তুমি এরকম কথা বলবে বলে আমি ভাবতে পারি নি।'

লিজার উত্তর শুনে লেশ্চিনস্কি অত্যন্ত অবাক হল। কিন্তু লিজার সঙ্গে ঝগড়া বাধালে তার চলবে না, তাই সে আলোচনাটা পালটে নেবার চেষ্টা করল, 'চট্‌ছো কেন, লিজা, আমি এই একটু ঠাট্টা করছিলাম আর-কি। তুমি যে এত তেজী মেয়ে তা জানতাম না।'

'ঠাট্টাটা তোমার বড়ো বিশ্রী,' শুকনো গলায় পালটা জবাব দিল লিজা।

সুখারকোদের বাড়ির সামনে লিজার কাছে বিদায় নেবার সময় ভিক্তর জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কাল আসবে তো, লিজা?'

অনির্দিষ্টভাবে লিজা বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না, দেখি...'

শহরমুখো ফিরে যেতে যেতে ভিক্তর সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার ভেবে দেখল, 'তা বেশ তো, সুন্দরী, তুমি হয়তো কাজটাকে জঘন্য মনে করতে পার, কিন্তু আমার ধারণাটা একটু অন্যরকম। অবশ্য, কে কাকে কার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল — তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

লেশ্চিনস্কিরা পোল্যাণ্ডের প্রাচীন বনেদী পরিবার। সুতরাং সেই হিসেবে ভিক্তরের কাছে উভয় পক্ষই সমান ঘৃণ্য। একমাত্র

যে-সরকারকে সে স্বীকার করে, সেটা পোলিশ অভিজাতদের সরকার—'রাজকীয় পোলিশ সরকার'—এবং সেটা শিগগিরই এদেশে কায়েম হবে পোলিশ বাহিনী এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ওই হারামজাদা করচাগিনটাকে শেষ করে দেবার এই একটা সুযোগ। ওরা নির্ঘাত ওর ঘাড়টা ধরে মটকে দেবে।

তার পরিবারের লোকজনের মধ্যে একমাত্র ভিক্তরই শহরে থেকে গেছে। চিনি-কারখানার সহকারী-পরিচালকের সঙ্গে তার এক পিসিমার বিয়ে হয়েছে, তার সঙ্গেই সে আছে। তার পরিবারের আর-সবাই আছে ওয়ারসয়ে—সেখানে তার বাবা সিগিজমুন্ড লেশ্চিনস্কি একজন পদস্থ কর্মকর্তা।

কম্যান্ড্যান্টের দপ্তরে এসে ভিক্তর খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সে চারজন পেৎলিউরা-সৈন্যের সঙ্গে চলেছে করচাগিনদের বাড়িমুখো।

ভেতরে আলো-জ্বলা একটা ঘরের জানলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিচু গলায় বলল ভিক্তর, 'ওই বাড়িটা। আমি এবার যেতে পারি তাহলে?' খোরুঞ্জিকে জিজ্ঞেস করল সে।

'নিশ্চয়। বাকিটা আমরাই ব্যবস্থা করব। খবরটা দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

ফুটপাথ বেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল ভিক্তর।

পিঠের ওপর শেষ আঘাতটা পড়তেই পাভেল হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্ধকার ঘরটার মধ্যে যেখানে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ছড়িয়ে-পড়া হাত দুটো তার সামনের দেয়ালের গায়ে ঠুকে গেল। হাতড়াতে হাতড়াতে সে দেয়ালের সঙ্গে আটকানো তক্তাটা পেয়ে তার ওপর উঠে বসল। সর্বাঙ্গ তার ক্ষতবিক্ষত, ব্যথায় টনটন করছে সমস্ত শরীর, মনটাও দমে গেছে।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে গ্রেপ্তার হয়েছে। পেৎলিউরার লোকে তার কথা জানল কী করে? কেউ যে তাকে দেখে নি, এ সম্বন্ধে তার কোন সংশয় ছিল না। কী হবে এর পর? ঝুখ্‌রাই-ই বা কোথায়?

ঝুখ্‌রাই ক্লিম্‌কাদের বাড়ি গিয়ে ওঠার পর পাভেল সেখান থেকে চলে আসে সের্গেইদের বাড়ি। শহর ছেড়ে সরে পড়বার জন্যে ঝুখ্‌রাই ক্লিম্‌কাদের ওখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকল।

'কাকের বাসায় পিস্তলটা লুকিয়ে রেখে ভালোই করেছিলাম,' ভাবল পাভেল, 'ওটা এদের হাতে পড়লে আর কোন আশাই ছিল না। কিন্তু আমাকে ধরতে পারল কী করে এরা?' উত্তর না পাওয়ায় প্রশ্নটা যেন যন্ত্রণা দিতে থাকল তাকে।

পেৎলিউরার লোকজন খুঁটিয়ে খানাতল্লাশি করা সত্ত্বেও করচাগিনদের বাড়িতে বিশেষ কিছু পায় নি। আরতিওম তার পোশাক আর অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনাটা নিয়ে গেছে গ্রামে যেখানে সে থাকে। মা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তার বাক্স। সুতরাং এদের লুঠ করে নিয়ে আসার মতো ছিল না কিছুই।

কিন্তু বাড়ি থেকে এই থানায় আসার অভিজ্ঞতাটা পাভেল জীবনে ভুলবে না: নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, মেঘে ঢাকা আকাশ, তারই মধ্যে দিয়ে চারদিক থেকে প্রচণ্ড ঘুষি আর লাথি খেতে খেতে অন্ধভাবে আধা-মূর্ছিত পাভেল হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলেছে।

দরজাটার ওপাশের ঘরে যেখানে কম্যাণ্ড্যাণ্টের সান্ত্রীরা রয়েছে, সেখান থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজাটার নিচের ফাঁকে একটা উজ্জ্বল আলোর রেখা। পাভেল দাঁড়িয়ে উঠে দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরটার চারিদিকে একবার হেঁটে এল। দেওয়ালে আটকানো তক্তাটার উলটো দিকে

ভারি গরাদ বসানো একটা জানলা আবিষ্কার করল পাভেল। হাতে ধরে সেগ্নলোকে পরখ করল সে, শক্তভাবে আটকানো গরাদগ্নলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আগে এটা একটা ভাঁড়ারঘর ছিল।

দরজাটার কাছে এগিয়ে এসে পাভেল এক ম্নহ্নর্ত কান পেতে শ্ননল, তারপর হাতলটায় আস্তে একটু চাপ দিল। দরজাটা তীব্র একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে উঠতেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেটার উদ্দেশে একটা গাল পাড়ল সে।

দরজাটা সামান্য খ্নললে সামনের সর্ন ফাঁকটা দিয়ে দেখতে পেল এক-জোড়া কড়া-পড়া পায়ের বাঁকা বাঁকা আঙ্নলগ্নলো বেরিয়ে আছে দেয়ালে আটকানো তক্তাটার প্রান্ত থেকে। আরেকবার হালকাভাবে ঠেলা দিতেই দরজাটা আরও জোরে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল। সঙ্গে সঙ্গে তক্তাটায় উঠে বসল আল্নথাল্ন চেহারার ঘ্নমে ভারি-ম্নখ একটা লোক— উকুনে-ভরা মাথাটা তার পাঁচ আঙ্নলে ভীষণ জোরে চুলকোতে চুলকোতে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা এক চোট গালাগালিতে ফেটে পড়ল লোকটা। অশ্লীল গালাগালিটা শেষ হবার পর বসার জায়গাটার পাশ থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে নিরস গলায় সেই জীবটা বলল, 'বন্ধ করে দে দরজাটা, ফের যদি এদিকে উঁকি মারতে দেখি, তাহলে থেঁত্লে দেব তোর ওই...'

দরজাটা বন্ধ করে দিল পাভেল। পাশের ঘরে একদমক হাসির হল্লা উঠল।

সারারাত্রি ধরে প্রচুর ভাবল পাভেল। প্রথমবারে লড়াইয়ে পড়ার ফলটা তার বির্নদ্ধেই গেল। পয়লা চোটেই ধরা পড়ে গেছে সে, ইঁদ্নরের মতো সে এখন ফাঁদে আটকা।

বসে থাকতে থাকতেই একটা অস্থির আধা-ঘ্নমের ভাব

তাকে আচ্ছন্ন করল—বারে বারে ভেঙে যাচ্ছে ঘুমটা—তারই মধ্যে ভেসে ভেসে উঠছে মায়ের রোগা, চামড়া কুঁচ্‌কে-যাওয়া মুখখানা, আর সেই চোখ দুটি যা সে এত ভালবাসে। 'মা যে এখানে নেই, সেটা ভালোই হয়েছে—থাকলে আরও বেশি দুঃখ পেত।'

জানলা দিয়ে একটা ধূসর চৌকোণা আলো এসে পড়ল মেঝের ওপর।

অন্ধকার ক্রমশই কেটে যাচ্ছে। ভোর হয়ে আসছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরনো বাড়িটার শুধু একটা জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। পর্দাগুলো টানা। হঠাৎ বাইরে শিকলে বেঁধে দেওয়া ট্রেসরের গম্ভীরগলার ঘেউঘেউ ডাক প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

একটা ঝিমন্ত ভাবের মধ্যে দিয়ে তনিয়া শুনতে পেল মা নিচু গলায় বলছেন, 'না, ও ঘুমোয় নি এখনও। ভেতরে এসো, লিজা।'

বান্ধবীর হালকা পায়ের শব্দে আর তার হঠাৎ উষ্ণ আলিঙ্গনে তনিয়ার ঝিমন্ত ভাবটা শেষ পর্যন্ত কেটে গেল।

ম্লান হাসি হাসল সে, 'ভারি খুশি হলাম লিজা তোর আসাতে। বাবার অসুখের সংকটটা কাল কেটে গেছে, আজ তিনি সারাদিন দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। মা আর আমিও পর পর কয়েক রাত্রি জাগার পর খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি। কী খবর-টবর সব বল্‌।' কৌচটার ওপর তার পাশে তনিয়া তার বান্ধবীকে টেনে নিল।

'খবর তো অনেক আছে। তবে, কতকগুলো খবর শুধু

তোকেই বলার মতো।' দুষ্টুমিভরা চাউনিতে লিজা তাকাল তনিয়ার মা ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনার দিকে।

তিনি হাসলেন। ছত্রিশ বছর বয়সী গিন্নিবান্নি মানুষ তিনি—তরুণীর মতো চঞ্চল তাঁর চলা-ফেরা, বুদ্ধিভরা ধূসর চোখ, সুন্দরী না হলেও মুখে একটা মিষ্টি ভাব আছে।

কৌচটার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি কৌতুক করে বললেন, 'বেশ তো, এক্ষুণি চলে যাচ্ছি আমি, কিন্তু তার আগে সবাইকে বলার মতো খবরগুলো একটু শুনে নিই।'

'আচ্ছা। এক নম্বর খবর: আমাদের ইস্কুলের পড়া তো শেষ হল এবার। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করে বেরনোর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে ইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলী ঠিক করেছেন। ভারি ভাল লাগছে আমার। এই সব বীজগণিত আর জ্যামিতি দেখলেই গায়ে জ্বর আসে! ওসব পড়ে কার যে কী লাভ হয়? ছেলেদের হয়তো আরও বেশি দূর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব—যদিও চারিদিকে এই যে লড়াই-টড়াই চলছে এর মধ্যে ওরাও জানে না যে কোথায় সেটা করা যেতে পারে। সত্যি, বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার... আমাদের কথা ধরতে গেলে—আমাদের তো বিয়েই হয়ে যাবে, বউ-মানুষদের আর বীজগণিতের দরকারটা কি,' হেসে উঠল লিজা।

এদের সঙ্গে একটুক্ষণ বসার পর ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

লিজা এবার তনিয়ার আরও কাছে ঘেঁষে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে চৌরাস্তার ঘটনাটার কথাটা ফিসফিসিয়ে বলল, 'তনিয়া, ওই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে চিনতে পেরে কী আশ্চর্য যে হয়েছিলাম! কে, আন্দাজ কর্ তো?'

আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল তনিয়া, কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল সে।

কিছুক্ষণ নিশ্বাস চেপে রেখে এক দমকে বলে ফেলল লিজা, 'করচাগিন!'

চমকে উঠে ভ্রূকুটি করল তনিয়া, 'করচাগিন?'

তনিয়াকে আশ্চর্য করে দিতে পেরেছে দেখে খুশি হয়ে লিজা তার সঙ্গে ভিক্তরের ঝগড়ার প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

গল্প বলায় মশগুল লিজা লক্ষ্যই করে নি যে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তনিয়ার মুখ আর তার আঙুলগুলো স্নায়বিক উত্তেজনায় নীল ব্লাউজের কাপড়টা দলা পাকিয়ে পাকিয়ে ধরছে। লিজা জানে না কী গভীর উদ্বেগ জমে উঠেছে তনিয়ার মনে, তার সুন্দর চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলো অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে তাও সে লক্ষ্য করল না।

মাতাল খোরুঞ্জিটা সম্বন্ধে গল্পটা বলে চলেছে লিজা—কিন্তু তনিয়ার সেদিকে মোটেই কান নেই। একটা ভাবনায় সে অস্থির: 'তাহলে ভিক্তর লেশ্চিনস্কি জানে কে ওই পেৎলিউরা-সৈন্যটাকে আক্রমণ করেছিল। উঃ, কেন লিজা কথাটা বলতে গেল তাকে!?' এবং নিজের অজানতেই কথাটা বেরিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে।

লিজা হঠাৎ তার কথার মানেটা ধরতে না পেরে বলল, 'কী বলছিলি?'

'ভিক্তরকে বলতে গেলি কেন তুই পাভ্লুশার... এই, মানে, করচাগিনের কথাটা? ও নিশ্চয় ধরিয়ে দেবে তাকে...'

'কক্ষণো না!' প্রতিবাদ করল লিজা, 'ভিক্তর এরকম কাজ করবে বলে আমার মনে হয় না। কেনই বা করতে যাবে সে এমন কাজ?'

তনিয়া হঠাৎ উঠে বসে উত্তেজনায় সজোরে হাঁটু দুটো চেপে ধরল, 'তুই বুঝতে পারছিস না লিজা! ভিক্তর আর পাভেলের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া, তাছাড়া, আরও কারণ আছে... ভিক্তরকে

পাভ্‌লুশার কথা বলে তুই মস্ত বড়ো ভুল করেছিস।'

এতক্ষণে তনিয়ার উত্তেজনাটা লক্ষ্য করল লিজা। তনিয়া যে করচাগিনকে 'পাভ্‌লুশা' বলে উল্লেখ করেছে এটা লক্ষ্য করে এতদিন পর্যন্ত লিজা যে কথাটা আবছা ভাবে আন্দাজ করেছিল, সেটার দিকে হঠাৎ তার চোখ খুলে গেল যেন।

নিজেকে খানিকটা অপরাধী না মনে করে সে পারল না। একটু অস্বস্তি বোধ করে চুপ করে গেল। মনে মনে ভাবল, 'তাহলে যা ভেবেছি তাই। আশ্চর্য! তনিয়া কিনা প্রেমে পড়েছে একটা... একজন সাধারণ মজুর-ছেলের সঙ্গে।' কথাটা নিয়ে তনিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার ভারি ইচ্ছে হল লিজার, কিন্তু সৌজন্যের জন্যে সে সামলে নিল নিজেকে। অন্যায়ের চেতনাটা খানিকটা হালকা করার জন্যে সে তনিয়ার হাত দুটো চেপে ধরল, 'ভয়ানক ভাবনা হচ্ছে তোর, তনিয়া?'

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল তনিয়া, 'না... হয়তো ভিক্তর সম্বন্ধে আমি যতোটা ভেবেছি, ততটা বেইমান সে হয়ত নয়।'

একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল—সেটা ভেঙে গেল ওদের ইস্কুলের দেমিয়ানভ নামে লাজুক আর আনাড়ী ধরনের একজন সহপাঠী এসে পড়াতে।

বিদায়ী বন্ধুদের এগিয়ে দেবার পর তনিয়া বাগানের ফটকটায় ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শহরমুখো অন্ধকার রাস্তাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। বসন্তকালের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা বাতাস ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে গেল তনিয়ার মুখে। দূরে শহরের বাড়িগুলোর জানলায় আবছা লাল আলো মিটমিট করছে। ওখানে ওই শহরের জীবন তার জীবনযাত্রা থেকে ভিন্ন রকমের। ওখানকার কোথাও কোনো একটা বাড়িতে রয়েছে তার বিদ্রোহী বন্ধু পাভেল, যে তার আসন্ন বিপদের কথাটা কিছুমাত্র জানে না। বোধহয় সে ভুলে গেছে তনিয়াকে—

তাদের শেষ দেখা হবার পর কতদিন কেটে গেছে? সেবারে পাভেলই অন্যায় করেছিল, কিন্তু সে সব অনেকদিন আগেই ভুলে গেছে তনিয়া। আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করবে তনিয়া, তাহলেই আবার তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে—সুদৃঢ়, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। তাদের মধ্যে যে আবার নিশ্চয় বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তনিয়ার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু যদি আজকের এই রাতটার মধ্যেই পাভেলের কোন বিপদ না ঘটে! যেন অশুভ সংকেতে ভরা এই রাত্রিটা বুঝি পাভেলের জন্যে ওৎ পেতে আছে...

তনিয়া একবার শিউরে উঠল; রাস্তাটার দিকে শেষবারের মতো একবার তাকিয়ে সে ভেতরে এল। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার সময়েও তার মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঘোরাফেরা করতে লাগল, 'শুধু যদি আজকের এই রাত্তিরটা পাভেলের ভালোয় ভালোয় কেটে যায়!'

আর কেউ জেগে ওঠার আগেই ভোরে ঘুম ভাঙল তনিয়ার, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল সে। বাড়ির আর কেউ যাতে জেগে না যায় তার জন্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল তনিয়া, বিরাট লোমশ ট্রেসরকে শিকল থেকে খুলে নিয়ে শহরমুখো রওনা দিল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে। করচাগিনদের বাড়ির সামনেটায় এসে সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপরে বেড়ার দরজাটা ঠেলে খুলে ভেতরে আঙিনায় এসে পড়ল। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এগুল ট্রেসর...

সেইদিন ভোরেই আরতিওম ফিরে এসেছে গ্রাম থেকে। যে কামারটির হয়ে সে কাজ করছিল, সেই তাকে তার ঘোড়ার গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেছে শহরে। বাড়ি পৌঁছিয়ে রোজগার করা ময়দার বস্তাটা কাঁধে ফেলে সে আঙিনায় ঢুকেছে — পেছনে তার অন্য জিনিসপত্তর বয়ে নিয়ে আসছে

কামারটি। খোলা দরজাটার সামনে বস্তাটা নামিয়ে রেখে আরতিওম ডাক দিল, 'পাভ্‌কা!'

কোনো উত্তর নেই।

এগিয়ে আসতে আসতে কামারটি বলল, 'ব্যাপারখানা কী? ভেতরে ঢোকোই না?'

রান্নাঘরে তার জিনিসপত্রগুলো রেখে আরতিওম ঢুকল পাশের ঘরটায়। এ ঘরের দৃশ্য যেটা তার চোখে পড়ল, তাতে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল: সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে আছে জায়গাটা, পুরোনো কাপড়-চোপড় ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর।

কিছুই মাথায় ঢুকছে না আরতিওমের। বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'ব্যাপারখানা কী?'

তার সঙ্গে সায় দিয়ে কামারটি বলল, 'হ্যাঁ, গণ্ডগোলের ব্যাপারই বটে।'

'ছেলেটা গেল কোথায়?' চটে উঠছিল আরতিওম।

কিন্তু ফাঁকা বাড়িটায় কেউ নেই তার কথার জবাব দেবার।

বিদায় নিয়ে চলে গেল কামারটি।

আঙিনায় এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল আরতিওম, 'মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না! দরজাগুলো সব হাঁ করে খোলা, এদিকে পাভ্‌কা নেই।'

তারপরে আরতিওম তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে বিরাট একটা কুকুর তার সামনে কান দুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে। ফটকের দিক থেকে একটি মেয়ে বাড়িটার দিকে আসছে। আরতিওমকে আপাদমস্তক দেখে সে বলল, 'আমি একবার পাভেল করচাগিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমিও তো তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু কোথায় যে সে গেছে শয়তানই জানে! বাড়িতে পৌঁছে দেখি ঘরদোর সব

খোলা, পাভ্‌কার দেখা নেই কোথাও। আপনিও তাহলে ওর খোঁজেই এসেছেন?'

উত্তরে একটা প্রশ্ন করল মেয়েটি, 'আপনি কি তার ভাই আরতিওম?'

'হ্যাঁ, কেন?'

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল খোলা দরজাটার দিকে। মনে মনে ভাবল সে, 'কেন আমি কাল রাত্রেই এলাম না? না, এ হতে পারে না, হতেই পারে না...' বুকখানা আরও ভারি হয়ে উঠল তার।

আরতিওম তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, মেয়েটা জিজ্ঞেস করল তাকে, 'আপনি এসে দেখেছেন দরজা খোলা আর পাভেল নেই?'

'কিন্তু পাভেলের সঙ্গে আপনার কী দরকার সেটা জানতে পারি?'

তনিয়া তার কাছে এসে চারিদিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না, তবে পাভেলকে যদি আপনি বাড়িতে না দেখে থাকেন, তাহলে ও নিশ্চয় গ্রেপ্তার হয়েছে।'

চমকে উঠল আরতিওম, 'গ্রেপ্তার হয়েছে? কেন?'

'চলুন ভেতরে যাই,' বলল তনিয়া।

সে যা জানে সব বলল, নিঃশব্দে শুনে গেল আরতিওম। সব শোনার পর হতাশায় ভরে উঠল তার মন। বিষণ্ণভাবে বিড়বিড়িয়ে বলল, 'ধুত্তোরি ছাই! এত বিপদের পরেও যেন এই গণ্ডগোলটা আর না বাধালে চলছিল না। এখন বুঝতে পারছি, বাড়িটা কেন তছনছ হয়ে আছে। ছেলেটা আবার এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে গেল কেন?.. কোথায় এখন খুঁজতে যাব ওকে? আচ্ছা, আপনি কে?'

'আমার বাবা প্রধান বনপরিদর্শক তুমানভ। আমি পাভেলের একজন বন্ধু।'

'ও,' অন্যমনস্কভাবে বলল আরতিওম, 'আমি এদিকে ছেলেটাকে খাওয়াবার জন্যে ময়দা-টয়দা নিয়ে এলাম, আর এসে দেখি এই...'

তনিয়া আর আরতিওম দু'জনা দু'জনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

'আমি এবার যাই,' আস্তে বলল তনিয়া, 'আপনি বোধহয় খুঁজে পাবেন ওকে। আমি পরে আসব।'

আরতিওম তার দিকে একবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

শীতকালের দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে-ওঠা একটা রোগা মাছি জানলাটার এক কোণে গুন্‌গুন্‌ করছিল। পুরনো ছেঁড়া-খোঁড়া কৌচটার এক ধারে বসে আছে অল্পবয়সী একটি চাষী-মেয়ে — কনুই দুটো তার হাঁটুর ওপর রাখা, নোংরা মেঝেটার দিকে স্থির শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মুখের এক কোণে আটকানো একটা সিগারেট চেপে ধরে কম্যান্ড্যান্ট কাগজের ওপর একটা টান দিয়ে লেখাটা শেষ করল। স্পষ্টই বোঝা গেল সে এটা লিখে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠেছে। কাগজটার যেখানে লেখা আছে 'শেপেতোভ্‌কা শহরের কম্যান্ড্যান্ট, খোরুঞ্জি' তার নিচে জাঁকালো রকমের একটা সই বসাল সে নামের শেষে একটা প্যাঁচালো টান দিয়ে। দরজার দিক থেকে জুতোর নালের শব্দ শুনে কম্যান্ড্যান্ট তাকিয়ে দেখল।

সামনে দাঁড়িয়ে সালোমিগা — হাতে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা।

কম্যান্ড্যান্ট তাকে অভ্যর্থনা জানাল, 'কি হে! কোত্থেকে উড়ে এলে হে?'

'দখিনা বাতাসে নয় তো বটেই। হাড় পর্যন্ত হাতটা কেটে দিয়েছে একটা বোগুনেৎস্।'* মেয়েটা যে বসে আছে, সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সালোমিগা অশ্লীল গাল পাড়ল।

'তাহলে এখানে কি করতে এসেছ? চোটের বেদনা সারাতে?'

'বেদনা সারাবার সময় পাব পরলোকে। যুদ্ধসীমান্তে ওদিকে আমাদের দারুণ চেপে আসছে ওরা।'

মাথা নেড়ে মেয়েটাকে ইসারায় দেখিয়ে সালোমিগাকে বাধা দিল কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'ওসব কথা পরে হবে এখন।'

একটা টুলের ওপর ধুপ করে বসে পড়ল সালোমিগা. 'ইউক্রেনীয় জাতীয় প্রজাতন্ত্রের' চিহ্ন এনামেলের ত্রিশূলের চূড়া লাগানো টুপিটা খুলে ফেলল সে। খাটো গলায় বলল, 'গোলুব পাঠিয়েছেন আমাকে। সৈন্যদের একটা বাহিনী এখানে আসবে শিগগিরই। সাধারণভাবে শহরে বেশ একটু কাণ্ডকারখানা হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে অবস্থাটা গোছগাছ করে আনা। প্রধান আতামান স্বয়ং আসতে পারেন বিদেশী হোম্‌রা-চোম্‌রাদের নিয়ে -- সুতরাং ওই সব ইহুদী-ঠ্যাঙানো 'আমোদ-প্রমোদের' কথাটথা যেন কেউ না তোলে। কী লিখছিলে তুমি?'

কম্যাণ্ড্যাণ্ট তার মুখের অন্য কোণে সরিয়ে নিল সিগারেটটা, 'অতি বেয়াড়া এক ছোঁড়ার পাল্লায় পড়েছি এদিকে। সেই ঝুখ্‌রাই লোকটাকে মনে আছে? সেই যে, রেলওয়ের লোকজনদের উস্‌কে তুলেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। লোকটাকে ধরা হয়েছিল স্টেশনে।'

---

* বোগুনেৎস্ — লাল ফৌজের বোগুন-সেনাবাহিনীর সৈন্য। সপ্তদশ শতকে ইউক্রেনের জনসাধারণ যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেমেছিল, সেই সংগ্রামের নেতা বোগুন-এর নামেই লাল ফৌজের একটা বাহিনীর এই নামকরণ। -- সম্পাঃ

'ধরা হয়েছিল, আচ্ছা? তারপর?' গভীর আগ্রহের সঙ্গে সালোমিগা তার টুলটা আরও কাছাকাছি টেনে নিল।

'তারপরে, স্টেশন কম্যাণ্ড্যাণ্ট ওই নিরেট মূখ্যু ওমেল্‌-চেঙ্কোটা তাকে একটা কসাকের পাহারায় পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদের কাছে। মাঝপথে এখানে আমার হাতে সেই ছোঁড়াটা পরিষ্কার দিনের আলোয় কিনা ছিনিয়ে নিল গ্রেপ্তার করা মানুষটাকে। হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে দাঁত ভেঙে দিয়েছিল কসাকটার, তারপর পালিয়ে গেছে। ঝুখ্‌রাই তো পালিয়েছে, কিন্তু এই ছেলেটাকে আমরা ধরতে পেরেছি। এই যে, এই কাগজটায় সব লেখা আছে,' বলে সে একতাড়া লেখায় ভাঁজ কাগজ সালোমিগার দিকে ঠেলে দিল।

বাঁ হাতে কাগজগুলো উল্‌টে উল্‌টে সে পড়ে গেল রিপোর্টটা। পড়া শেষ করে কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে তাকাল সে, 'তাহলে, কিছুই বের করতে পার নি ওর পেট থেকে?'

অস্বস্তির সঙ্গে কম্যাণ্ড্যাণ্ট তার টুপির কানাটা ধরে টান দিল, 'আজ পাঁচ দিন ওর পেছনে লেগে আছি আমি। শুধুই বলে, 'আমি কিচ্ছু জানি না, আমি লোকটিকে ছাড়াই নি।' শয়তানের বাচ্চা! পাহারাওলাটা ওকে চিনতে পেরেছে, বুঝলে? — প্রায় গলা টিপে মেরে ফেলেছিল আর-কি ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। কসাকটাকে তো টেনে ছাড়াতেই পারি নি প্রায় — লোকটার রাগ তো হতেই পারে, কারণ ওমেল্‌চেঙ্কো ওদিকে স্টেশনে তাকে কয়েদী হাত-ছাড়া করার জন্যে পঁচিশ ঘা কষিয়েছে। ছেলেটাকে আর রাখার কোন মানে হয় না — তাই, আমি ওকে খতম করে দেবার অনুমতি চেয়ে এই রিপোর্টটা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সালোমিগা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে থুতু ফেলল, 'আমার পাল্লায় পড়লে কথা বলত নিশ্চয়। জেরা করার ব্যাপারে তুমি কোন

কর্মের নও। ধর্মতত্ত্বের ছাত্রকে আবার কম্যাণ্ড্যাণ্ট হতে কে কবে শুনেছে? তুমি ডাণ্ডার ব্যবস্থাটা চেষ্টা করেছিলে?'

রাগে ক্ষেপে গেল কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার। ওসব নাক-সিঁটকিনি রেখে দাও। আমি এখানকার কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে বলছি আমার কাজে নাক গলাতে এসো না।'

সালোমিগা ক্রুদ্ধ কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে চেয়ে চিৎকার করে হেসে উঠল, 'হাঃ হাঃ হাঃ... অতো ফুলে উঠো না হে পুরুতের পো! শেষে আবার ফেটে যাবে, দেখো! তা, চুলোয় যাও তুমি আর তোমার যতো সব সমস্যা। তার চেয়ে বরং বাৎলাও কয়েক বোতল 'সামোগন' এনে দিতে পারবে কে।'

হাসল কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'তা পারা যাবে এখন।'

'আর এই ব্যাপারটায়,' সালোমিগা কাগজের তাড়াটার ওপর আঙুল ঠুকে ঠুকে বলল, 'ছেলেটার সম্বন্ধে ঠিকমতো ব্যবস্থা যদি করতে চাও, তাহলে ওর বয়েসটা ষোলো বছরের বদলে আঠারো বছর বলে লেখো। ছ'য়ের মাথাটা এইভাবে ঘুরিয়ে আট করে দাও। তা নইলে ওরা তোমায় অনুমতি না দিতেও পারে।'

ভাঁড়ারঘরটায় ওরা তিনজন। দাড়িওয়ালা এক বুড়ো, গায়ে পুরনো কোট, দেয়ালে আটকানো কাঠের তক্তাটার ওপর শুয়ে আছে পাশ ফিরে, কাঠির মতো তার পা দুটো চওড়া ছিটের কাপড়ের প্যাণ্টের মধ্যে শরীরের নিচে গুটোনো। তাকে গ্রেপ্তার করার কারণ — যে-পেৎলিউরার লোকটি তার ওখানে বাসা নিয়েছিল, তার ঘোড়াটা চালা থেকে হারিয়ে গেছে। মেঝের ওপর বসে আছে এক বুড়ি, চঞ্চল ছোট ছোট তার চোখ দুটো, সরু থুতনি। চোরাই 'সামোগন' মদ বেচে

পেট চালায় ও, একটা ঘড়ি আর অন্য কয়েকটা দামী জিনিস চুরি করার অভিযোগে ওকে এখানে এনে পোরা হয়েছে। জানলার নিচে একটা কোণে চেপ্টে যাওয়া টুপিটার ওপর মাথা রেখে পাভেল পড়ে আছে আধা-অচেতন অবস্থায়।

একটি অলপবয়সী মেয়েকে এনে ঢোকানো হল এই ভাঁড়ারঘরে — মেয়েটির মাথায় জড়ানো রঙিন রুমাল, আতঙ্কে বিস্ফারিত তার চোখ দুটো। দু'-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে 'সামোগন'-বেচা বুড়ির পাশে বসে পড়ল।

আগন্তুক মেয়েটিকে অদ্ভুত চোখে দেখে নিয়ে বুড়ি দ্রুত উচ্চারণে বলে উঠল, 'কি রে ছুঁড়ি, ধরা পড়েছিস, অ্যাঁ?'

কোনো উত্তর দিল না মেয়েটা, কিন্তু 'সামোগন'-বুড়িটা ছাড়বার পাত্র নয়, 'ধরল কেন তোকে, অ্যাঁ? 'সামোগনের' কোনো ব্যাপার নাকি, অ্যাঁ?'

দাঁড়িয়ে উঠে চাষী-মেয়েটা তাকাল এই নাছোড়বান্দা বুড়িটার দিকে। শান্ত স্বরে বলল সে, 'না, আমাকে ধরেছে আমার ভাইয়ের জন্যে।'

'সেটি কে?' বুড়িটা ছাড়বে না কিছুতেই।

বুড়ো মানুষটি বলে উঠল, 'ওকে ছেড়ে দাও না বাপু। এমনিতেই ওর ভয়-ভাবনার অন্ত নেই — তার ওপরে আবার তুমি বকবক করে জ্বালাও কেন ওকে?'

বোঁ করে বুড়িটা ঘাড় ফেরাল দেয়ালে আটকানো তক্তাটার দিকে, 'তা তুমি বলবার কে? তোমার সঙ্গে তো কথা বলি নি, না কি, বলেছি?'

থুতু ফেলল বুড়ো, 'ওর পেছনে লেগো না বলছি।'

আরেকবার নৈঃশব্দ নেমে এল ভাঁড়ারঘরটায়, চাষী-মেয়েটা

একটা বড়ো রুমাল বিছিয়ে বাহুর ওপর মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ল।

খেতে শুরু করল 'সামোগন'-বুড়ি। বুড়ো উঠে বসল, মেঝের ওপর পা দুটো রেখে ধীরে ধীরে একটা সিগারেট তৈরি করে নিয়ে ধরিয়ে নিল সেটা। ঝাঁজালো ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

'এই দুর্গন্ধের জন্যে শান্তিতে বসে একটু খাবারও জো নেই,' ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল বুড়ি, আর তার চোয়াল দুটো নড়েই চলল সমস্তক্ষণ ব্যস্তভাবে, 'গোটা ঘরটাই ফুঁকে দেবে দেখছি।'

নাক সিঁটকে পালটা জবাব দিল বুড়ো, 'রোগা হয়ে যাবার ভয়, অ্যাঁ? এ দরজা দিয়ে আর চট করে বেরুতে হবে না জেনে রেখো। নিজের পেটে সবটা না ঠেসে ওই ছেলেটাকে একটু কিছু দাও-না খেতে।'

বুড়ি একটা বিরক্তির ভঙ্গি করল, 'দিতে গিয়েছিলাম তো। কিছু খেতে চায় না যে। আর, দ্যাখো বাপু, খাবার ব্যাপারে মুখটি বুজে থেকো বলে দিচ্ছি — তোমার খাবার তো খাচ্ছি নে।'

মেয়েটি 'সামোগন'-বুড়ির দিকে ফিরে করচাগিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে এখানে এনেছে কেন, জানো?'

মেয়েটি কথা বলাতে খুশি হয়ে উঠল বুড়ি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'এখানকার ছেলে ও — করচাগিনার ছোট ছেলে। ওর মা রাঁধনী।'

তারপর মেয়েটার দিকে ঝুঁকে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'একজন কয়েদী বলশেভিককে ছাড়িয়ে নিয়েছিল ও — লোকটা একজন জাহাজী, আমাদের পড়শী জোজুলিখার বাড়িতে ছিল।'

অল্পবয়সী মেয়েটার মনে পড়ল তার শোনা কথাগুলো, 'ওকে খতম করে দেবার অনুমতি চেয়ে এই রিপোর্টটা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সৈন্য-ভর্তি ট্রেনগুলো একে একে এসে থামতে লাগল জংশনে আর তার থেকে দলে দলে এলোমেলোভাবে নামতে নাগল সৈন্যদলভুক্ত লোকেরা। পাশের একটা লাইন বেয়ে এসে দাঁড়াল সাঁজোয়া-রেলগাড়ি 'জাপোরোজেৎস' — চারটে কামরা তার, ইস্পাতে মোড়া তার চতুর্দিকে বড়ো বড়ো নাচি বসানো। ছাদ-খোলা গাড়িগুলো থেকে নামিয়ে আনা হল কামানগুলো, ছাদ-ওয়ালা মাল-গাড়ির কামরাগুলো থেকে বের করে আনা হল ঘোড়াগুলোকে। সেইখানেই ঘোড়াগুলোয় জিন এঁটে তাদের পিঠে চেপে ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর লোকেরা পদাতিক-বাহিনীর লোকদের ভীড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এল স্টেশনের আঙিনার দিকে যেখানে সারবন্দি হচ্ছে তারা।

অফিসাররা তাদের নিজেদের ইউনিটের নম্বর হেঁকে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

গোটা স্টেশনটায় ভিমরুলের চাকের মতো কর্মতৎপরতা। আকারহীন একটা বিরাট জনসমষ্টি সোরগোল তুলে পাক খেয়ে যাচ্ছিল—ক্রমশ সেটাকে কতকগুলো সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যদলের রূপ দিয়ে নেওয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারবন্দি বিরাট একটা সশস্ত্র বাহিনী ঢুকতে থাকল শহরে। রাত্রি পর্যন্ত শহরের পথে পথে ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ উঠল ঘোড়ার গাড়ি আর পশ্চাদবর্তী রাইফেল-বাহিনীর লোকজন বড়ো রাস্তা বেয়ে চলল। সব শেষে এগিয়ে গেল সদর ঘাঁটির ফৌজীদলটা— এই একশো-কুড়িজন লোক গলা মিলিয়ে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে:

হৈ-হল্লা কেন এত, কিসের হাঁকাহাঁকি?
পেৎলিউরার দল যে এল—সন্দ' আছে না-কি!..

জানলা দিয়ে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াল পাভেল। গোধূলির আলো-আঁধারির মধ্যে সে শুনতে পাচ্ছিল রাস্তায় চাকার ঘড়ঘড়ানি, অসংখ্য পায়ের শব্দ আর অনেকগুলি গলায় গেয়ে ওঠা গান।

পেছনে একটা মৃদু গলার স্বর শোনা গেল, 'ফৌজ এসেছে শহরে।'

ঘুরে দাঁড়াল করচাগিন।

যে-মেয়েটিকে আগের দিন এখানে আনা হয়েছে, সেই বলেছিল কথাটা।

ইতিমধ্যে পাভেল সব শুনেছে তার সম্বন্ধে—'সামোগন'-বুড়ি তাকে বাধ্য করেছে সব কথা বলতে। শহর থেকে সাত মাইল দূরে একটা গ্রামে তার বাড়ি। সোভিয়েত যখন ক্ষমতা দখল করে ছিল, তখন সেখানে তার বড় ভাই গ্রিৎস্কো গরিব চাষীদের একটা কমিটির নেতৃস্থানীয় ছিল—এখন সে একজন লাল পার্টিজান সৈনিক।

লাল সৈনিকেরা চলে যাবার সময় গ্রিৎস্কোও তাদের সঙ্গে চলে গেছে মেশিনগানের একটা কোমরবন্ধনী পরে। তারপর থেকে তার পরিবারের পেছনে ডালকুত্তার মতো অনবরত লেগে আছে পেৎলিউরার লোকজন। এদের একমাত্র ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাপকে কিছুদিন কয়েদ করে রেখেছিল—ভয়ানক কষ্ট হল তার। গ্রিৎস্কো যাদের জব্দ করেছিল, তাদের একজন হচ্ছে গাঁয়ের মাতব্বর। সে লোকটা এখন এদের ওপর নেহাত প্রতিশোধ তুলবার জন্যেই যতোসব আগন্তুকদের এদের বাড়ি জায়গা নেবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। গোটা পরিবারটাই নিঃস্ব। আগের দিন কম্যান্ড্যান্ট গ্রামে এসেছিল খানাতল্লাশি চালাবার

জন্যে, গাঁয়ের মাতব্বর তাকে নিয়ে গিয়েছিল এই মেয়েটির বাড়ি। মেয়েটার ওপর নজর পড়ে তার, পরের দিন সে ওকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে আসে 'জেরা করার জন্যে'।

করচাগিনের ঘুম আসে নি, প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার চোখে একটু বিশ্রামের ঘুম নামে নি। একটা চিন্তা অবিরাম তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, 'এর পরে কী?' কিছুতেই তাড়াতে পারছে না প্রশ্নটা মন থেকে।

থেঁৎলে যাওয়া তার দেহের সর্বাঙ্গে একটা দারুণ যন্ত্রণার অনুভূতি। সেই পাহারাওলাটা পাশবিক একটা নির্মমতার সঙ্গে তাকে ধরে মেরেছে।

মনের মধ্যে ভিড় জমিয়ে তোলা সেই নিদারুণ চিন্তাগুলোকে ভুলে থাকার জন্যে সে এই মেয়ে দু'জনের ফিসফিসিয়ে কথা বলা শুনতে লাগল।

অস্পষ্ট নিচু গলায় অল্পবয়সী মেয়েটি বলছিল কীভাবে কম্যান্ড্যাণ্ট তার পেছনে লেগেছে, শাসিয়েছে, ফুসলিয়েছে এবং তার কাছ থেকে পালটা জবাব পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভীষণ রাগে বলে উঠেছে, 'মাটির নিচের ঘরে তালাবন্ধ করে রাখব তোমাকে, দেখি কী করে আমার হাত থেকে ছাড়া পাও!'

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে ঘরটার আনাচে-কানাচে। আরেকটা রাত্রি আসছে—দম-আটকানো অস্থিরতায় ভরা রাত্রি। কাল সকালে কী হবে? বন্দী অবস্থায় এই তার সপ্তম রাত্রি, কিন্তু পাভেলের মনে হচ্ছে যেন সে এখানে মাসের পর মাস ধরে কয়েদ হয়ে আছে। শক্ত মেঝেটার ওপর পড়ে আছে পাভেল আর যন্ত্রণা মোচড় দিচ্ছে সর্বাঙ্গে। এখন ওরা তিনজন এই ভাঁড়ারঘরটায়। 'সামোগন'-বুড়িকে খোরাঞ্জি ছেড়ে দিয়েছে 'ভোদ্‌কা' সংগ্রহ করে আনার জন্যে। বুড়ো দাদুটি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তক্তাটার ওপর--যেন বাড়িতে শুয়ে আছে

সে তার রুশী উনুনের উপর। দার্শনিক-সুলভ একটা বৈরাগ্যের সঙ্গে লোকটা তার মন্দ-ভাগ্যকে শান্তভাবে মেনে নিয়েছে, সারারাত্রি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোয় সে। খৃস্তিনা আর পাভেল প্রায় পাশাপাশি মেঝের ওপর শুয়ে আছে। গতকাল পাভেল জানলা দিয়ে সের্গেইকে দেখতে পেয়েছিল—অনেকক্ষণ ধরে সে বিষণ্ণ চোখে বাড়িগুলোর জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপরে।

পাভেল মনে মনে ভেবেছিল, 'ও জানে আমি এখানে আছি।'

তিন দিন ধরে রোজ কে যেন পাভেলের জন্য কালো টক রুটি এনে দিয়ে গেছে—কে তা সান্ত্রীরা কিছুতেই বলে নি। দু'দিন ধরে কম্যান্ড্যান্ট তাকে বারবার জেরা করেছে।

এ সবের মানে কী?

জেরার সময়ে সে কিছুই ফাঁস করে নি, বরং সবকিছু অস্বীকারই করেছে। কেন যে সে মুখ বুঁজে ছিল, তা সে নিজেই জানে না। বইয়ে পড়া বীর-নায়কদের মতো সে নিজেকে সাহসী আর বলিষ্ঠহৃদয় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু, সেই রাত্রে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবার সময় একজন সান্ত্রী বলেছিল, 'এটাকে আর টানাটানি করে কী হবে, পান্ খোরুঞ্জি? পিঠে একটি গুলি চালিয়ে দিলেই তো চুকে যায়,'—তখন ভয় পেয়েছিল পাভেল। হ্যাঁ, ষোল বছর বয়সে মৃত্যুর চিন্তাটা বড়ো সাংঘাতিক! মৃত্যু—অর্থাৎ সবকিছুর শেষ।

খৃস্তিনাও ভাবছে। এই তরুণটি যা জানে না, সে তা জানে। খুব সম্ভবত ও জানে না ওর কপালে কী আছে... যা খৃস্তিনা শুনে ফেলেছিল।

পাভেল সারারাত্রি ঘুমোতে না পেরে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করেছে। পাভেলের প্রতি নিবিড় মমতায় ভরে উঠেছে

খ্রিস্তিনার মন—যদিও তার নিজের জন্যে দুর্ভাবনাটাও কম নয়: কম্যান্ড্যান্টের কথাগুলির নিদারুণ শাসানি সে ভুলতে পারে না, 'কালই তোমার একটা ব্যবস্থা করে ফেলব—আমাকে যদি না চাও, তাহলে সেপাইদের ঘরে পাঠিয়ে দেব তোমায়। কসাকগুলো তোমাকে পেয়ে খুশি হবে। যা হয় বেছে নাও।'

বড়ো কঠিন, বড়ো নির্মম এই পৃথিবী, কোথাও এতটুকু দয়ামায়া নেই! গ্রিৎস্কো যে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছে, সেটা কি তার দোষ? জীবন বড়ো নিষ্ঠুর!

একটা বুক-চাপা বেদনার অনুভূতিতে দম বন্ধ হয়ে এল খ্রিস্তিনার, অসহায় হতাশায় আর ভয়ের যন্ত্রণায় তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল একটা নিদারুণ কান্নায়।

দেয়ালের কোণে একটা ছায়া নড়ে উঠল, 'কাঁদছ কেন?'

খ্রিস্তিনা তার এই কয়েদখানার নির্বাক সঙ্গীটির কাছে এক নিঃশ্বাসে সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার কথা দারুণ আবেগের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলে গেল। কোনো কথা বলল না পাভেল, শুধু খ্রিস্তিনার হাতের ওপর হাত রাখল হালকাভাবে।

ঢোঁক গিলে গিলে চোখের জল চেপে আতঙ্কভরা গলায় বলল খ্রিস্তিনা, 'আমার ওপর অত্যাচার করে ওই শয়তানগুলো মেরে ফেলবে আমায়, বাঁচার উপায় নেই!'

কী ওকে বলার আছে পাভেলের? কিছু বলার নেই। ওদের দু'জনকেই জীবন যেন একটা লোহার জাঁতাকলে পিষে মারছে।

কাল যখন ওকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে, তখন পাভেল কি বাধা দেবার চেষ্টা করবে? সে ক্ষেত্রে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলবে তাকে, কিংবা মাথার ওপরে একটা তলোয়ারের চোট নেমে এলেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। ভাবনায় অস্থির এই মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পাভেল তার হাতে আদর

করে হাত বুলিয়ে দেয়। কান্নাটা থেমে এল ওর। কিছুক্ষণ পর পর পথ-চলতি লোকের উদ্দেশে দেউড়ির সান্ত্রীটার হাঁক শোনা যাচ্ছে, 'কে যায়?' আর, তারপরেই আবার সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বুড়ো দাদু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে—যেন শেষ নেই। তারপর একসময়, কখন তা পাভেল টের পায় নি—মেয়েটি দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে।

'শোনো,' দুটি উষ্ণ ঠোঁট ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আমার তো আর পার নেই: হয় ওই অফিসারটা, আর না হয় ওই সেপাইগুলো। তার চেয়ে, প্রিয়, তুমিই আমাকে নাও—ওই কুত্তাগুলোই যেন সবপ্রথম আমাকে উপভোগ করতে না পারে।'

'এ কী বলছ খৃস্তিনা!'

কিন্তু বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধন থেকে সে মুক্তি পেল না। জ্বলন্ত, পরিপূর্ণ দুটি ঠোঁট চেপে বসল তার ঠোঁটের ওপর—এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। সহজ আর কোমল মেয়েটির কথাগুলি—পাভেল জানে কেন ও বলছে এই কথাগুলো।

মুহূর্তের জন্যে সে তার পরিবেশ সম্বন্ধে অচেতন হয়ে গেল। তালাবন্ধ দরজা, লাল-চুল-ওয়ালা সেই কসাক্, কম্যাণ্ড্যাণ্ট, নির্মম প্রহার, সাতটি রুদ্ধশ্বাস বিনিদ্র রাত্রি—সবকিছু ভুলে গেল সে। সেই মুহূর্তের জন্যে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রইল শুধু সেই জ্বলন্ত ঠোঁট দুটি আর চোখের জলে ভেজা সেই মুখখানি।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তনিয়াকে।

'কী করে সে ভুলে যেতে পারল তনিয়াকে, তার আশ্চর্য সুন্দর সেই চোখ দুটোকে?'

দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নিজেকে ছিনিয়ে নিল

সে খ্রিস্তিনার বাহুবন্ধন থেকে। দাঁড়িয়ে উঠে মাতালের মতো টলতে টলতে এসে চেপে ধরল জানলার শিকগুলো।

খ্রিস্তিনা হাতড়ে হাতড়ে এসে ধরল তাকে, 'কেন, কী হল?'

তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই একটি প্রশ্নে! তার দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠল পাভেল, 'তা হয় না খ্রিস্তিনা। তুমি এতো... এতো ভালো।' এ ছাড়া আরও যে কী সব পাভেল বলেছিল, তা সে নিজেও জানে না।

অসহ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে আটকানো তক্তাটার দিকে এল—একধারে বসে সে জাগিয়ে তুলল বুড়োকে, 'একটা সিগারেট দাও আমাকে, দাদু!'

সর্বাঙ্গ শালে জড়িয়ে মেয়েটা কোণে বসে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন কয়েক জন কসাকের সঙ্গে এসে কম্যাণ্ড্যাণ্ট খ্রিস্তিনাকে নিয়ে গেল। বিদায়ের দৃষ্টিতে সে তাকাল পাভেলের দিকে, অভিযোগ-ভরা তার চাউনি। ও চলে যাবার পর যখন দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেল, তখন পাভেলের সমস্ত মন আরও নিবিড় একটা বেদনায় আর নিঃসঙ্গতায় ভরে উঠল।

সারা দিনে বুড়ো দাদু পাভেলের মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারল না। কম্যাণ্ড্যাণ্টের পাহারাওলা আর সান্ত্রী বদল হল। সন্ধ্যার দিকে একজন নতুন বন্দীকে এনে ঢোকানো হল এই ঘরে। পাভেল তাকে চিনতে পেরেছে: চিনি-কারখানার ছুতোর দোলিন্নিক। একটু খাটো, বলিষ্ঠ চেহারা, দেহের গড়নটা চৌকষ, পুরানো একটা জ্যাকেটের নিচে ফিকে হয়ে আসা হলদে একটা শার্ট তার পরনে। তীক্ষ্ম চোখে সে খুঁটিয়ে দেখল ভাঁড়ারঘরটা।

পাভেল তাকে দেখেছিল ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে যখন বিপ্লবের ঢেউ তাদের শহরেও এসে পৌঁছেছে। সেই সময়ের

সোরগোলের সভা-মিছিলে পাভেল মাত্র একজন বলশেভিককেই বক্তৃতা দিতে শুনেছে এবং সেই বলশেভিকটি হচ্ছে দোলিন্নিক। রাস্তার ধারে একটা বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সে সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিল। তার শেষ কথাগুলো মনে আছে পাভেলের, 'বলশেভিকদের পথে চলো সৈনিক ভাইসব, তারা কখনও তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না!'

তারপর থেকে সে আর ছুতোরটিকে দেখে নি।

কয়েদখানায় এই নতুন সঙ্গীটিকে পেয়ে বুড়ো দাদু খুশি হয়ে উঠেছে—সারাদিন নিশ্চুপ বসে কাটানোটা যে তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল সেটা বোঝা যায়। দোলিন্নিক তার পাশে তক্তাটার ধারে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর সিগারেট খেতে খেতে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল।

তারপরে এই আগন্তুকটি এল করচাগিনের কাছে। পাভেলকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমাকে এখানে আসতে হল কেন?'

পাভেল 'হাঁ', 'না' করে জবাব দিচ্ছে দেখে দোলিন্নিক বুঝল যে সাবধানতার খাতিরেই তরুণটি বিশেষ কথা বলতে চাচ্ছে না। পাভেলের বিরুদ্ধে অভিযোগটা শোনার পর তার বুদ্ধিভরা চোখ দুটি বিস্ময়ে বড়ো হয়ে উঠল। ছেলেটার পাশে এসে বসল সে, 'ও, তুমিই তাহলে ঝুখ্‌রাইকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলে বলছ? ভারি আশ্চর্য তো। এরা যে তোমায় পাকড়েছে, সেটা জানতাম না আমি।'

এই জানাজানি হয়েছে বুঝে কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসে পাভেল বলল, 'আমি কোন ঝুখরাই-টুখ্‌রাইকে চিনি না। এরা তো এখানে যে-কোন অভিযোগই আনতে পারে।'

দোলিন্নিক হেসে সরে এল তার দিকে, 'ঠিক আছে, ভাই।

আমার কাছে তোমার অতো সাবধান হবার দরকার নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।'

বুড়ো দাদুটি যাতে শুনতে না পায়, সেইভাবে নিচুগলায় সে বলে গেল, 'ঝুখ্‌রাইকে আমি নিজেই রওনা করে দিয়েছি, এতক্ষণে সে বোধহয় যেখানে যাবার সেখানে পেঁৗছে গেছে। সে আমাকে ঘটনাটা সবই বলেছে।'

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন একটু ভেবে দোলিন্নিক বলল, 'তুমি দেখছি খাঁটি জিনিসে তৈরি—তবে এরা তোমাকে ধরে ফেলেছে আর সব কিছু জানে, সেটা ভারি খারাপ ঠেকছে বটে।'

কোর্তাটা খুলে ফেলে দোলিন্নিক সেটাকে বিছিয়ে নিল মেঝের ওপর, দেয়ালে হেলান দিয়ে সেটার ওপর বসে সে আরেকটা সিগারেট বানাতে লাগল।

তার শেষ কথাটায় পাভেলের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। দোলিন্নিক যে খাঁটি লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, সে ঝুখ্‌রাইকে রওনা করে দিয়েছে, তার মানেই...

সেই সন্ধ্যায় পাভেল জানতে পারল—পেৎলিউরার কসাক-সৈন্যদের মধ্যে আন্দোলন চালাবার জন্যে দোলিন্নিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া, সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করে লাল সৈনিকদের পক্ষে যোগ দেবার জন্যে আবেদন জানিয়ে জেলার বিপ্লবী কমিটি যে ইশতেহার বের করেছিল, সেটা বিলি করার সময়ে তাকে ধরা হয়েছে।

দোলিন্নিক সাবধান ছিল, পাভেলকে সে বেশি কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল সে, 'কে জানে, হয় তো ওরা ছেলেটার ওপর ডাণ্ডা চালাতে পারে—ও এখনও নেহাত ছেলেমানুষ।'

রাত্রি গড়িয়ে গেলে যখন ওরা ঘুমোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন সে তার আশঙ্কার কথাটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করল, 'আমরা বড়ো বেকায়দায় পড়ে গেছি, বুঝলে করচাগিন। দেখা যাক, কদ্দুর কি হয়।'

পরের দিন একজন নতুন কয়েদীকে এনে পোরা হল—বড় কানওয়ালা গলার হাড় বের করা নাপিত শ্লিওমা জেলৎসার। মহা উত্তেজনার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে সে বলছিল দোলিন্নিককে, 'ফুক্‌স্‌, ব্লুভস্তেইন্‌ আর গ্রাখ্‌তেন্‌বের্গ্‌ তো লোকটাকে নুন আর রুটি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে বলে ঠিক করেছে। আমি বললাম, ওরা যদি তা করতে চায় তো করুক, কিন্তু ইহুদীদের আর-সবাই কি ওদের সমর্থন করবে? মোটেই করবে না—এই আমি বলে রাখলাম তোমায়। এদের তিনজনের অবশ্য নিজেদের ঘর সামলাতে হবে: ফুক্‌স্‌-এর দোকান আছে, গ্রাখ্‌তেন্‌বের্গের ময়দা-কল আছে—কিন্তু আমার আছে কী? আর-সবাই যারা উপোস করে মরছে, তাদের আছে কী? কিচ্ছু নেই। নিঃস্ব আমরা সব্বাই। আমার আবার জিভটা তো একটু আলগা। আজ একজন অফিসারের দাড়ি কামাচ্ছিলাম—ওই নতুন যারা দু'-একদিনের মধ্যে শহরে এসেছে, তাদেরই একজন—জিজ্ঞেস করলাম, 'আত্তামান পেৎলিউরা এই ইহুদী-ঠেঙানোর ব্যাপারটা জানেন না-কি? আপনার কি মনে হয় তিনি দেখা করবেন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে?' হায়, হায়—আমার এই আলগা জিভের জন্যে কতবার যে বিপদে পড়তে হয়েছে! এতো কায়দা আর তরিবত করে অফিসারটার দাড়ি কামিয়ে মুখে পাউডার ঘষে দেবার পর সে কী করলে জানো? উঠে দাঁড়িয়ে পয়সা দেবার বদলে লোকটা আমায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে গ্রেপ্তার করল!'

বুকে একটা চাপড় মারল জেলৎসার, 'আন্দোলনটা কী করলাম বলো দেখি? কী বলেছি কথাটা? শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছি লোকটাকে আর তারই জন্যে কি-না জেলে পুরে তালবন্ধ?..'

উত্তেজনার চোটে জেলৎসার দোলিন্নিকের শার্টের একটা বোতাম টেনে ধরে তার বাহুতে টান দিতে থাকল।

ক্রুদ্ধ শ্লিওমার কথা শুনতে শুনতে দোলিন্নিক অজানতেই হেসে ফেলল। নাপিতের কথা শেষ হবার পর সে গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মতো এরকম একজন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কাজটা একটু বোকার মতোই হয়ে গেছে বটে। ওই অবস্থায় জিভটাকে আলগা হতে দিয়ে একটা বেমক্কা কাজ করে ফেলেছ। আমি হলে তোমাকে ওইভাবে এখানে এসে পড়ার পরামর্শ দিতাম না।'

জেলৎসার সমর্থনসূচক মাথা নেড়ে হাত ছড়িয়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করল। ঠিক সেই সময়ে দরজাটা খুলে গেল আর বাইরে থেকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল 'সামোগন'-বুড়িকে। কসাক-সেপাইটার দিকে ইতর গাল পাড়তে পাড়তে বুড়ি টলতে টলতে ভেতরে এসে পড়ল, 'আগুনে পুড়ে মর্ তোরা আর তোদের ওই কম্যান্ড্যাণ্ট! আমার এনে দেওয়া ওই মদ খেয়ে ও যেন কুঁকড়ে গিয়ে ফেটে মরে!'

দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল পাহারাওলাটা, বাইরে তালাবন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল ওরা।

বুড়ি তক্তাটার এক পাশে বসার পর বুড়ো তাকে কৌতুক করে বলল, 'এই যে বক্‌বক্-কর্‌নেওয়ালী বুড়ি, আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছ দেখতে পাচ্ছি, এ্যাঁ? আচ্ছা, বোসো তাহলে আরাম করে।'

শত্রুতাভরা চোখে তার দিকে একনজর তাকিয়ে বুড়ি তার পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপর দোলিন্নিকের পাশে বসল। দেখা গেল, অফিসারদের জন্যে কয়েক বোতল 'সামোগন' জোগাড় করতে যতক্ষণ লাগে, শুধু ততক্ষণের জন্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হঠাৎ পাশে সেপাইদের ঘরটা থেকে চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ির শব্দ ভেসে এল। কে যেন খেঁকানির স্বরে হুকুম দিচ্ছে। কয়েদীরা ব্যাপারটা শোনার জন্যে কথাবার্তা বন্ধ করে দিল।

প্রাচীন ঘণ্টা-ঘরের দেখতে-বিশ্রী গির্জাটার সামনের মাঠে ইতিমধ্যে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। মাঠটার তিনদিকে আয়তক্ষেত্রের আকারে সারি বাঁধা ফৌজের বহর—পুরোদস্তুর সামরিক পোশাকে আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী।

সামনে, গির্জার প্রবেশপথের মুখে বর্গক্ষেত্রের আকারে সারি-বাঁধা চৌখুপীর ছকে তিনটে পদাতিক পল্টন পাশের ইস্কুলের বেড়াটা অবধি পর পর সাজানো।

রাইফেল ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর আর নোংরা পেৎলিউরার পল্টন—মাথায় তাদের আজব রাশিয়ান হেল্‌মেট্, অনেকটা আধাআধি কাটা কুমড়োর মতো দেখতে। বুকে কার্তুজের বেল্ট আড়াআড়ি লাগানো। এরাই পেৎলিউরার সেরা ডিভিশনের সৈন্য।

ভূতপূর্ব জারের সৈন্যবাহিনীর গুদাম থেকে হাতিয়ে নেওয়া এদের উর্দিগুলো আর বুট বেশ ভালো। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যারা সচেতনভাবে লড়াই করছে, এদের লোকজন প্রধানত সেই কুলাক্‌দের মধ্যে থেকেই নেওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ

রেল-জংশনটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ডিভিশনটাকে এখানে বদলি করা হয়েছে।

শেপেতোভ্কা শহরে এসে মিশেছে পাঁচটা রেলপথ— পেৎলিউরার পক্ষে এই জংশনটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানেই সর্বনাশ। বাস্তবিকপক্ষে, 'ডিরেক্টরেটের' হাতে ইদানীং খুব সামান্য জায়গাই আছে, ছোট্ট ভিনিৎসা শহরটা এখন পেৎলিউরার রাজধানী।

প্রধান আতামান নিজে তার সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করবে বলে স্থির করেছে। সবকিছু প্রস্তুত হয়ে আছে তার আসার অপেক্ষায়।

মাঠটার দূরের এক কোণে যেখানে তাদের দেখতে পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, সেইখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন রঙ্রুটের একটা দল—বিভিন্ন রকমের ঢিলেঢালা বেসামরিক পোশাক-পরা, খালি-পা একদল তরুণ। এরা সব খামারে কাজ-করা ছেলের দল—মাঝরাত্রে গিয়ে হামলা চালিয়ে এদের ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে কিংবা রাস্তা থেকে ধরে আনা হয়েছে। লড়াই করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে এদের কারুর নেই।

নিজেদের মধ্যে এরা বলাবলি করছে, 'আমরা তো আর পাগল নই।'

পাহারাওয়ালা দিয়ে এদের শহরে আনিয়ে বিভিন্ন পল্টনে ভাগ করে দিয়ে হাতিয়ার হাতে দেওয়া ছাড়া এদের নিয়ে পেৎলিউরার অফিসাররা আর কিছুই করে উঠতে পারে নি।

পরের দিনই অবশ্য এইভাবে জড়ো করা এই রঙ্রুটদের এক-তৃতীয়াংশ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এবং প্রতিদিনই এদের সংখ্যা কমে আসছে।

এদের বুটজুতো দেওয়াটা হবে বোকামিরও বাড়া বিশেষ

করে যখন বুটজুতোর সংখ্যা নিতান্তই কম। অবশ্য সবাইকেই সৈন্যদলভুক্ত হবার জন্যে উপযুক্ত রকম 'পাদুকা' পরে আসবার জন্যে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তার ফলটা হয় আশ্চর্যরকম: পাদুকা বলতে কতকগুলো ছেঁড়া, পচা চামড়ার সঙ্গে সুতো আর তারের একটা বিচিত্র সংগ্রহ!

অতএব, এদের খালি পায়েই কুচকাওয়াজের জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

পদাতিক পল্টনের পেছনেই গোলুবের ঘোড়সওয়ার-বাহিনী।

কুচকাওয়াজ দেখবার জন্যে কৌতূহলী শহরবাসীদের জমাট ভীড় ঠেকিয়ে রাখছে ঘোড়সওয়ারেরা।

কম কথা নয়, স্বয়ং প্রধান আতামান উপস্থিত থাকবেন! এ-ধরনের ঘটনা শহরে বড়ো একটা ঘটে না, সুতরাং কেউই বিনা পয়সায় মজা দেখার এই সুযোগ নষ্ট করতে চায় না।

গির্জার সিঁড়ির ওপর জড়ো হয়েছে কর্নেল আর ক্যাপ্টেনরা, পাদ্রীর দুই মেয়ে, জনকতক ইউক্রেনীয় শিক্ষক, একদল 'স্বাধীন' কসাক, আর স্থানীয় পৌরপ্রধান, যার পিঠটা অল্প একটু কুঁজো—এককথায় বলতে গেলে শহরের 'সমাজের' প্রতিনিধি—স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই, এদের মধ্যে ককেসীয় চেরকেস্‌কা-পরা পদাতিক পল্টনের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল। সে-ই আজকের এই কুচকাওয়াজের পরিচালক।

গির্জার ভেতরে পাদ্রী ভাসিলি ইস্টার পরবের পোশাক-আশাক পরছেন।

পেৎলিউরাকে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সংবর্ধনা জানানো হবে। বিশেষ করে এই নতুন রঙ্‌রুটের দলকে আজ আনুগত্যের শপথ েওয়ানো হবে বলে একটা হলদে-আর-নীল পতাকা আনা হয়েছে।

একটা ঝরঝরে পুরনো 'ফোর্ড' মোটরগাড়িতে চেপে

ডিভিশনটার সেনাপতি স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল পেৎলিউরাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে।

সে চলে যাবার পর, লম্বা, মজবুত গড়ন, পাকানো-গোঁফ্‌ওয়ালা কর্নেল চের্‌নিয়াককে ডেকে পদাতিক বাহিনীর ইনস্পেক্টর বলল, 'আপনার সঙ্গে একজন কাউকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখে আসুন কম্যাণ্ড্যাণ্টের অফিসটা ঠিক কেতাদুরস্ত আছে কি-না আর সেখানকার সব কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে কি-না। যদি সেখানে কোনো কয়েদী দেখেন, তাহলে দেখে-শুনে আজেবাজে লোকদের ছেড়ে দেবেন।'

চের্‌নিয়াক পায়ে পায়ে খট্‌ করে জুতো ঠুকল, তারপর প্রথমেই যে কসাক ক্যাপ্টেনটি তার চোখে পড়ল তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ইনস্পেক্টরমশাই তারপর পাদ্রীর মেয়েটার দিকে ফিরে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ভোজসভার খবর কি? সব ঠিক আছে তো?'

সুপুরুষ ইনস্পেক্টরমশাইয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কম্যাণ্ড্যাণ্ট যতদূর করবার সব করছে।'

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল: একজন সওয়ার ঘোড়াটার কাঁধের ওপর নুয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। হাতটা নেড়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'আসছেন ওঁরা!'

'সামিল হো!' খেঁকিয়ে উঠল ইনস্পেক্টর।

অফিসাররা ছুটল নিজের নিজের জায়গায়।

গির্জার কাছে এসে 'ফোর্ড' গাড়িটা থামতেই, 'ইউক্রেন এখনও মরে নি' গানের সুরে ব্যাণ্ড বেজে উঠল।

ডিভিশন-সেনাপতির পরেই গাড়িটা থেকে প্রধান আতামান

তার ভারি দেহটা টেনে নামল কষ্টেসৃষ্টে। পেৎলিউরার দেহের উচ্চতা মাঝারি গোছের, লাল ঘাড়ের ওপরে ত্রিকোণ মাথাটা দৃঢ়ভাবে বসানো। মিহি পশমের একটা নীল জোব্বা তার পরনে, কোমরের কাছে হলদে রঙের বন্ধনী আঁট করে জড়ানো, বন্ধনীটায় বাঁধা একটা শ্যামোয়া চামড়ার খাপের মধ্যে ছোট ব্রাউনিং-পিস্তলটা ঝুলছে। মাথার ওপরে চুড়োওয়ালা একটা খাকি উর্দি-টুপি, তার সামনের দিকটায় এনামেলের ত্রিশূল-চিহ্ন বসানো।

সিমন পেৎলিউরার চেহারায় এমন কিছু একটা জঙ্গী ভাব নেই। বাস্তবিক পক্ষে, তাকে দেখে মোটেই সামরিক লোক বলে মনে হয় না।

মুখে একটা অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে সে ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট শুনল। তারপরে পৌরপ্রধান তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিল।

পৌরপ্রধানের মাথার ওপর দিয়ে সারি-বাঁধা ফৌজের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে শুনে গেল পেৎলিউরা।

তারপরে ইনস্পেক্টরের দিকে মাথা নাড়ল সে, 'এবার শুরু করা যাক!'

নিশানটার পাশে ছোট মঞ্চটার ওপরে উঠে পেৎলিউরা ফৌজের উদ্দেশে দশ মিনিট বক্তৃতা দিল।

বক্তৃতাটা বিশেষ প্রত্যয় জাগাবার মতো কিছু হল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, আতামান এতখানি রাস্তা এসে ক্লান্ত, তাই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা করতে পারল না। সৈন্যদের নিয়মমাফিক 'জয়তু! জয়তু!' চিৎকারের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করে সে মঞ্চ থেকে নেমে এল রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে। তারপরে ইনস্পেক্টর আর সেনাপতির সঙ্গে সে ফৌজ পরিদর্শনে এল।

নতুন রঙ্‌রুটদের সারির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাচ্ছিল্যে ভরে উঠল তার চোখ দুটো, বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়াল সে।

সারি সারি নতুন রঙ্‌রুটের দল অসমান পা ফেলে ফেলে নিশানটার দিকে এগিয়ে এল। নিশানটার কাছে পাদ্রী ভাসিলি বাইবেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রথমে তিনি বাইবেলটার ওপরে আর তারপরে নিশানের মুড়িতে চুমো খেতে দিলেন তাদের। তারপর পরিদর্শনের শেষের দিকে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল।

কি এক অজ্ঞাত উপায়ে মাঠে ঢুকে প'ড়ে একটা প্রতিনিধিদল পেৎলিউরার দিকে এগিয়ে এল। দলের সামনে চলেছে কাঠের ব্যবসাদার ধনী ব্লুভস্তেইন নুন আর রুটি উপহার নিয়ে, তার পেছনে বস্ত্রব্যবসায়ী ফুক্‌স্‌ আর অন্য তিনজন বড়লোক ব্যবসাদার।

মাথা নিচু করে একটা দাসোচিত সেলাম ঠুকে ব্লুভস্তেইন থালাটা দিল পেৎলিউরার দিকে। পাশের একজন অফিসার সেটা হাত বাড়িয়ে নিল।

'রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আপনার প্রতি স্থানীয় ইহুদী বাসিন্দারা তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। দয়া করে এই মানপত্রটি গ্রহণ করুন।'

'বেশ,' বিড়বিড় করে বলে পেৎলিউরা তাড়াতাড়ি কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেল।

ফুক্‌স্‌ এগিয়ে এল, 'আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের উদ্যোগ আবার খুলবার অনুমতি দিন। ইহুদীদের উপর লুটপাটের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' আমতা-আমতা করে ফুক্‌স্‌ বলে ফেলল 'লুটপাট' শব্দটা।

একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে অন্ধকার হয়ে উঠল পেৎলিউরার মুখ,

'আমার সৈন্যরা ইহুদীদের উপর লুটপাট করে বেড়ায় না, মনে রাখবেন।'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বাহু বিক্ষেপ করল ফুক্‌স্‌।

পেৎলিউরার কাঁধটা একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় সংকুচিত হল — অসময়ে এই প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি তাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে গোলুব তার কালো গোঁফ কামড়াচ্ছিল। তার দিকে ফিরে পেৎলিউরা বলল, 'পান্‌ কর্নেল, আপনার কসাকদের বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগ এসেছে। ব্যাপারটা তদন্ত করে যা ব্যবস্থা করতে হয় করুন।' তারপর ইনস্পেক্টরের দিকে ফিরে শুকনো গলায় বলল, 'কুচকাওয়াজ আরম্ভ করতে পারেন এবার।'

মন্দভাগ্য প্রতিনিধিদল এখানে এসে গোলুবকে দেখতে পাবে বলে আশা করে নি, তাই এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়ার চেষ্টা করল।

এতক্ষণে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি দর্শকদের সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছে। উচ্চকিত গলায় নির্দেশ জারি হতে শুরু হয়েছে।

গোলুব বাইরে একটা শান্ত ভাব নিয়ে ব্লুভস্তেইনের দিকে এগিয়ে এসে বেশ জোরে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বেরো এখান থেকে, হতভাগা কাফের। নইলে কিমা বানিয়ে ছাড়ব তোদের!'

ব্যাণ্ড বাজতে শুরু করল, সামনের দলগুলো কুচকাওয়াজ করে গেল মাঠের মাঝখান দিয়ে। পেৎলিউরার সামনে দিয়ে পরপর যাবার সময় তারা যান্ত্রিকভাবে হেঁকে উঠল 'জয়তু!' তারপর বড়ো সড়কে নেমে পড়ে একে একে পাশের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এক-একটা সৈন্যদলের সামনে আনকোরা নতুন খাকি রঙের উর্দি-পরা অফিসাররা তাদের হাতের ছড়িগুলো দুলিয়ে হালকা চালে হেঁটে চলেছে — ভাবখানা

যেন তারা এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। সৈন্যদের বন্দুকে শিক ব্যবস্থাটার মতোই এই কায়দা করে ছড়ি দুলিয়ে চলার চালটাও ডিভিশনে সবে চালু হয়েছে।

কুচকাওয়াজের শেষের দিকটায় রাখা হয়েছে নতুন রঙ্‌রুটদের দলটাকে। এলোমেলোভাবে সারি বেঁধে, অসমানভাবে পা ফেলে, পরস্পরের গায়ে ধাক্কা মেরে এগিয়ে আসছে তারা।

সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের খালি-পা ফেলার একটা মৃদু আওয়াজ উঠল—এদের চলার মধ্যে কোনমতে একটা শৃঙ্খলার ভাব আনবার জন্যে অফিসাররা বৃথাই প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে। এদের দ্বিতীয় দলটা কুচকাওয়াজ করে যাবার সময় মঞ্চটার কাছাকাছি একটা সারিতে শাদা কাপড়ের শার্ট পরা একটি চাষী-ছেলে প্রধান আতামানের দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে এতোই আশ্চর্য হয়ে গেল যে পথের ওপর একটা গর্তে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পাথরে ঠুকে গিয়ে একটা জোরালো আওয়াজ তুলে ছিটকে পড়ল তার রাইফেলটা। উঠবার চেষ্টা করতেই সে তার পেছনের লোকদের ধাক্কায় আবার পড়ে গেল।

দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপরে সারি ভেঙে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে রঙ্‌রুটদের এই দলটা মাঠ পার হয়ে গেল। হতভাগ্য ছেলেটা তার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল নিজের দলের পিছু ধরতে।

পেৎলিউরা আর এই কিম্ভুত দৃশ্যটা না দেখে মুখ ঘুরিয়ে কুচকাওয়াজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই চলে এল মোটরগাড়ির দিকে। পেছন পেছন এসে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করল, 'পান্ আতামান কি ভোজে উপস্থিত হবেন না?'

সংক্ষেপে তীক্ষ্ন উত্তর দিল পেৎলিউরা, 'না!'

গির্জাটাকে ঘেরাও করা উঁচু বেড়াটার গায়ে চেপে গিয়ে সের্গেই ব্রুঝাক, ভালিয়া আর ক্লিমকা ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ দেখছিল।

বেড়াটার শিকগুলো চেপে ধরে মাঠের মধ্যে লোকদের দিকে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সের্গেই।

ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উদ্ধত স্বরে বলল সে, 'চল্‌রে ভালিয়া, দোকান-পাট গুটিয়ে নিয়েছে।'

বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল বেড়াটার কাছ থেকে। অবাক হয়ে কিছু লোক তার দিকে তাকিয়ে রইল। সবাইকে উপেক্ষা করে সে তার বোন আর ক্লিমকার সঙ্গে চলে গেল দেউড়ির দিকে।

কর্নেল চের্‌নিয়াক আর সেই ক্যাপ্টেনটি ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে কম্যাণ্ড্যাণ্টের অফিসে নামল। একজন পেয়াদার তদ্বিরে ঘোড়া দুটো রেখে দ্রুতপায়ে তারা এসে ঢুকল সান্ত্রীদের ঘরে।

পেয়াদাটিকে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল চের্‌নিয়াক, 'কম্যাণ্ড্যাণ্ট কোথায়?'

থতোমতো খেয়ে বলল লোকটি, 'জানি না, কোথায় যেন গেছেন।'

নোংরা অগোছালো ঘরটার চারিদিকে তাকাল চের্‌নিয়াক— ছড়ানো-ছিটানো বিছানাগুলোর ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে কম্যাণ্ড্যাণ্টের কসাক-সান্ত্রীগুলো, অফিসারদের ঢুকতে দেখে তারা কেউ ওঠার চেষ্টাও করল না।

গর্জন করে উঠল চের্‌নিয়াক, 'শুয়োরের খোঁয়াড় এটা, না কি? আর, এভাবে শুয়োরের মতো গড়াগড়ি দেবার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাদের?' চিৎপাত হয়ে গা এলিয়ে দেওয়া লোকদের দিকে খেঁকিয়ে উঠল চের্‌নিয়াক।

একজন কসাক উঠে বসে একটা ঢেঁকুর তুলে ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল, 'তুমি আবার এসে চেঁচামেচি শুরু করলে কেন? চেঁচামেচি করার লোক তো আমাদের এখানেই আছে।'

'কি বল্‌লি!' লাফিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল চের্‌নিয়াক, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে বেজম্মা? আমি কর্নেল চের্‌নিয়াক, বুঝলি রে শুয়োর? ওঠ্‌, উঠে পড়্‌, সবাই, নইলে চাবুক খাওয়াব তোদের!' ক্রুদ্ধ কর্নেল সান্ত্রীদের ঘরময় ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল, 'এক মিনিট সময় দিলাম—এর মধ্যে নোংরা ঝাড়ু দিয়ে, বিছানাপত্র গুছিয়ে নিয়ে নোংরা চোপাগুলো মানুষের সামনে দাড় করাবার মতো করে তোল্‌। এক দল লুটেরা-ডাকাত বলে মনে হচ্ছে দেখে তোদের, কসাক নয়!'

রাগে আত্মহারা হয়ে কর্নেল তার পথের ওপরে পড়ে থাকা একটা ময়লা জলের পাত্রে প্রচণ্ড লাথি মারল।

ক্যাপ্টেনটাও কিছু কম যায় না—গালাগালগুলোকে আরও জোরালো করে তুলবার জন্যে সে তার তিন-ফালি চাবুকটাকে চালিয়ে লোকগুলোকে তাদের বিছানা থেকে তুলে দিল, 'প্রধান আতামান কুচকাওয়াজ দেখছেন। যে-কোন মুহূর্তে তিনি এখানে এসে পড়তে পারেন। তৈরি হয়ে নাও সব জলদি!'

ব্যাপারটা গুরুতর বুঝে কসাকরা সবাই লাফিয়ে উঠে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল—সত্যিই তাদের চাবুক খেতে হতে পারে, এ ব্যাপারে চের্‌নিয়াকের খ্যাতির কথাটা তারা জানে।

মুহূর্তের মধ্যে দারুণ কাজের সাড়া পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন বলল, 'কয়েদীগুলোকে একবার দেখে নিলে ভালো হয়। কাদের যে ধরে বন্ধ করে রেখেছে কিছুই বলা যায় না। প্রধান আতামান যদি দেখতে আসেন তাহলে ফ্যাসাদ হতে পারে।'

'চাবিটা কার কাছে?' চের্নিয়াক জিজ্ঞেস করল সান্ত্রীটাকে, 'এক্ষুণি খুলে দাও দরজাটা।'

একজন সার্জেণ্ট তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তালাটা খুলে দিল।

'কম্যাণ্ড্যাণ্ট কোথায়? কতক্ষণ আর আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব? এক্ষুণি তাঁকে খুঁজে বের করে এখানে পাঠিয়ে দাও।'— হুকুম দিল চের্নিয়াক, 'দেউড়ির সামনে সান্ত্রীদের সারবন্দি করে দাও! রাইফেলগুলোয় বেয়নেট লাগানো নেই কেন?'

'আমরা তো সবেমাত্র কাল এখানে এসেছি,' তাড়াতাড়ি কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে সার্জেণ্টটি কম্যাণ্ড্যাণ্টের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

ভাঁড়ারঘরের দরজাটা লাথি মেরে খুলে ফেলল ক্যাপ্টেন। ভেতরের কয়েকজন কয়েদী মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল, বাকি ক'জন স্থির হয়ে শুয়ে রইল।

'দরজাটা আরও ভালো করে খুলে দাও,' হুকুম দিল চের্নিয়াক, 'যথেষ্ট আলো নেই এখানে।'

তারপরে কয়েদীদের মুখগুলো ভালো করে দেখল সে। তক্তাটার ধারে বসা বুড়ো মানুষটার দিকে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?'

আধা দাঁড়িয়ে উঠে ঢিলে প্যাণ্ট আঁট করতে করতে চের্নিয়াকের কড়া হুকুমে ঘাবড়ে গিয়ে বুড়ো থতোমতো খেয়ে বলল, 'আমি নিজেই সেটা জানি না। স্রেফ ধরে এনে পুরে দিয়েছে। উঠোন থেকে একটা ঘোড়া হারিয়ে যায়, কিন্তু আমি তার কিছু জানি না।'

'কার ঘোড়া?' তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'ফৌজের ঘোড়া। আমার বাড়িতে যে সেপাইগুলো আছে তারাই সেটাকে বিক্রি করে দিয়ে সেই পয়সায় মদ-টদ খেয়েছে আর এখন আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছে।'

চের্‌নিয়াক বুড়োর সর্বাঙ্গে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে একবার কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' তারপরে সে 'সামোগন'-বুড়ির দিকে ফিরল।

বুড়ো তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না—ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো পিটপিট করে সে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে, আমি যেতে পারি?'

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ল, যার অর্থ: যতো তাড়াতাড়ি পারো ততোই ভালো।

তক্তাটার একপাশে তার পুঁটলিটা ঝুলছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়েই বুড়ো ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

'তারপর, তুমি গ্রেপ্তার হলে কেন?' চের্‌নিয়াক প্রশ্ন করল 'সামোগন'-বুড়িকে।

একমুখ খাবার চিবুচ্ছিল বুড়ি, সেটাকে গিলে ফেলে সে গড়গড় করে উত্তর দিয়ে গেল, 'অন্যায়রকমভাবে—অত্যন্ত অন্যায়রকমভাবে আমাকে এনে এখানে পুরেছে ওরা, পান্‌ কর্তা। ভেবে দেখুন একবার—গরিব বিধবার 'সামোগন' খেয়ে, শেষে কি-না তাকেই এনে তালাবন্ধ করে রাখা!'

চের্‌নিয়াক জিজ্ঞেস করল, ''সামোগনের' কারবার করো না তো তুমি?'

আহত ভঙ্গিতে বলল বুড়ি, 'কারবার? মোটেই না। কম্যান্ড্যান্ট এসেই চার-চারটে বোতল তুলে নিল, একটা পয়সাও ঠেকাল না। ব্যাপারটা কি রকম বলি শুনুন: অন্যের তৈরি মদ খাবে, কিন্তু দাম দেবে না কক্ষণো। এটাকে কি আপনি কারবার করা বলবেন?'

'খুব হয়েছে, যা ভাগ্‌ এখান থেকে!'

আর দ্বিতীয় বার হুকুমটা শোনার জন্যে দাঁড়াল না বুড়ি।

ঝুড়িটা তুলে নিয়ে, কৃতজ্ঞতার সেলাম ঠুকতে ঠুকতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে বলল, 'ভগবান মঙ্গল করুন কর্তামশাইদের!'

অবাক হয়ে বড়ো বড়ো চোখে মজাটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিল দোলিন্নিক। কয়েদীদের কেউ বুঝতে পারছিল না ব্যাপারখানা কী। এইটুকুই শুধু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই আগন্তুকরা নিশ্চয়ই কোনকিছু কর্তাব্যক্তি গোছের হবে, যারা ইচ্ছে করলেই কয়েদীদের ছেড়ে দিতে পারে।

'আর, তুমি?' চের্নিয়াক দোলিন্নিককে প্রশ্ন করল।

ক্যাপ্টেনটা খেঁকিয়ে উঠল, 'পান্ কর্নেল যখন কথা কইবেন তখন উঠে দাঁড়াবে!'

ধীরে ধীরে দোলিন্নিক মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল।

চের্নিয়াক আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেন?'

দোলিন্নিক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কর্নেলের নিখুঁতভাবে পাকানো গোঁফের দিকে, তার পরিষ্কার করে কামানো মুখের দিকে, তারপরে কর্নেলের নতুন টুপি আর তাতে আটকানো এনামেলের ত্রিশূলের দিকে। একটা বেপরোয়া চিন্তার ঝিলিক খেলে গেল তার মাথায়: 'হয়তো এতে কার্যসিদ্ধি হবে!'

'রাত্রি আটটার পর বাইরে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম বলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' মাথায় প্রথমেই যা এল সেইটেই বলে ফেলল সে।

একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

'রাত্রিবেলা বাইরে কী করছিলে?'

'ঠিক রাত্রি হয় নি তখনও, শুধু এগারোটা হবে তখন।' এটা বলার সময় তার আর বিশ্বাস ছিল না যে অন্ধকারে

এই ঢিল ছোঁড়াটা ঠিক লেগে যাবে। 'চলে যাও!' এই সংক্ষিপ্ত হুকুমটা শোনার সময় তার হাঁটু দুটো কেঁপে গেল।

জ্যাকেটটা ভুলে ফেলে রেখেই দোলিন্নিক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল; ক্যাপ্টেন ততক্ষণে আরেকজন কয়েদীকে জেরা করতে লেগেছে।

করচাগিনকে জিজ্ঞেস করা হল সব শেষে। ঘটনাটা দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে সে মেঝের ওপর বসেছিল। প্রথমটায় সে বিশ্বাসই করতে পারে নি যে দোলিন্নিককে ছেড়ে দেওয়া হল। এভাবে এরা সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন? কিন্তু দোলিন্নিক... ও যে বলল, সাঁঝবাতি-আইন ভাঙার জন্যে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল... ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা এইবার বুঝে ফেলল সে।

কর্নেল ততক্ষণে হাড়জিরজিরে জেলৎসারকে জেরা করতে শুরু করেছে যথারীতি, 'তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?'

ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে নাপিতের মুখটা, বেমক্কা বলে ফেলল সে, 'ওরা তো বলে আমি নাকি আন্দোলন করছিলাম, আন্দোলনটা যে কী করলাম, তা তো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছি না।'

কান খাড়া হয়ে উঠল চের্নিয়াকের, 'কী বললে? আন্দোলন? কিসের আন্দোলন করছিলে তুমি?'

বিমূঢ়ের মতো হাত দুটো ছড়িয়ে দিল জেলৎসার, 'আমি নিজেই তা জানি না। শুধু বলেছিলাম, প্রধান আতামানের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করার জন্যে, ওরা তাতে ইহুদীদের সই জোগাড় করছিল।'

'কিসের দরখাস্ত?' চের্নিয়াক আর ক্যাপ্টেন দু'জনেই তার দিকে রীতিমত ভয়-জাগানো ভঙ্গিতে এগিয়ে এল।

'ইহুদী-ঠেঙানো বন্ধ করার জন্যে দরখাস্ত। জানেন, সাংঘাতিক

ঠেঙানি হয়ে গেছে আমাদের ওপর। লোকজন সকলেরই দারুণ আতঙ্ক।'

'হয়েছে, থাক্।' তাকে বাধা দিল চের্নিয়াক, 'আমরা তোদের কাছে এমন একখানা দরখাস্ত পেশ করব যা জীবনে ভুলবে না—নোংরা ইহুদী কোথাকার!' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে সে দ্রুত উচ্চারণে বলে গেল, 'এটাকে কোথাও রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করো। সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দাও—সেখানে আমি নিজে এর সঙ্গে কথা বলব। এই দরখাস্তের ব্যাপারটার পেছনে কে আছে সেটা দেখতে হবে।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল জেলৎসার, ক্যাপ্টেনটা তার পিঠে এক ঘা কষাল ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে, 'থাম্ ব্যাটা বেজন্মা!'

যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল জেলৎসারের মুখ, টলে পড়ল সে এক কোণে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল তার, গলার কাছে ঠেলে-ওঠা কান্না সে চাপল কোনক্রমে।

এ ব্যাপারটা চলতে থাকার সময়ে পাভেল উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাঁড়ারঘরে তখন জেলৎসার ছাড়া সে একমাত্র কয়েদী।

ছেলেটার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখল চেরনিয়াক তার কালো চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে, 'তুই কেন এখানে?'

পাভেলের জবাব তৈরি ছিল, 'জুতোর তলার জন্যে একটা জিনের চামড়া কেটে নিয়েছিলাম বলে।'

'কার ঘোড়ার জিন?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'আমাদের বাড়িতে দু'জন কসাক জায়গা নিয়েছে। আমি তাদের একজনের ঘোড়ার পুরনো একটা জিনের একটুকরো চামড়া কেটে নিয়েছিলাম জুতোর তলার জন্যে। কসাকরা

তাই এখানে এনে পুরেছে আমাকে।' ছাড়া পাবার একটা উদ্দাম আশায় সে আরও বলল, 'আমি জানতাম না যে এটা করা নিষেধ...'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্নেল তাকাল পাভেলের দিকে, বলল, 'এই কম্যান্ড্যাণ্টটা কি আর কয়েদ করার লোক পায় নি? পাক্কা আহাম্মক একটা! কাদের ধরে এনেছে দ্যাখো একবার!' দরজার দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যা, বাড়ি যা, তোর বাপকে বলগে তোকে ধরে যেন দু'-ঘা লাগায় বেশ করে। শিগগির বেরো!'

ছোঁ মেরে দোলিন্নিকের জ্যাকেটটা তুলে নিয়েই পাভেল ছুট মারল দরজা দিয়ে—তখনও সে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বুকে হাতুড়ি পিটছে, যেন এখুনি ফেটে যাবে। কর্নেলটা যখন আঙিনায় বেরিয়ে আসছে তখন তার পেছন দিয়ে পাভেল সান্ত্রীদের ঘরটা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বেড়াটার বাইরে রাস্তায় এসে পড়েছে সে মুহূর্তের মধ্যে।

হতভাগ্য জেলৎসার একা পড়ে রইল ভাঁড়ারঘরটায়। বিপন্ন-চোখে সে একবার চারিদিকে তাকাল, অনিচ্ছায় দরজাটার দিকে একবার এগিয়ে এল কয়েক পা, কিন্তু ঠিক তখনই একজন সান্ত্রী এসে দরজাটা বন্ধ করে তালাটা ঝুলিয়ে দিয়ে দরজার পাশে টুলটায় বসল।

বাইরে বারান্দাটায় বেরিয়ে এসে চের্নিয়াক নিজের ওপরে বেশ খুশি হয়ে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'কয়েদীদের একবার দেখে নিয়ে ভালোই করেছি আমরা। কী সব আজেবাজে লোককে এনে পুরেছিল ভাবো একবার! এই কম্যান্ড্যাণ্টটিকে দু'-এক সপ্তাহ কয়েদ করে রাখতে হবে দেখছি। আচ্ছা, তাহলে এবার যাওয়া যাক।'

সার্জেণ্টটা সমস্ত সান্ত্রীদের আঙিনায় এনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়েছে। কর্নেলকে দেখেই সে ছুটে এসে জানাল, 'সব ঠিকঠাক করে ফেলা হয়েছে পান্ কর্নেল।'

রেকাবটায় পা রেখে জিনের ওপর হালকাভাবে লাফিয়ে উঠল চের্নিয়াক। ক্যাপ্টেন তার গোঁয়ার ঘোড়াটাকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছে। রাশ টেনে চের্নিয়াক সার্জেণ্টকে বলল, 'কম্যাণ্ড্যাণ্টকে বোলো, যতো বাজে লোকদের এনে সে ওখানে পুরেছিল, আমি তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। আর বলবে, এখানকার কাজকর্ম সে যেভাবে চালিয়ে এসেছে তার জন্যে আমি তাকে দু'-সপ্তাহ কয়েদখানায় রাখব। আর ওই যে লোকটা এখন আছে ওখানে, ওকে এখুনই সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দাও। সান্ত্রীদের তৈরি থাকতে বলো।'

'যে আজ্ঞে, পান্ কর্নেল।' সার্জেণ্ট সেলাম ঠুকল।

জুতোর নাল দিয়ে ঘোড়ার তলপেট ঠুকে কর্নেল আর ক্যাপ্টেন রওনা হয়ে গেল গির্জার মাঠের দিকে। সেখানে ততক্ষণে কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে আসছে।

পর পর সাতটা বেড়া টপ্‌কে পার হবার পর পাভেল নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ল। আর চলতে পারছে না সে। দম-আটকানো ওই ভাঁড়ারঘরের খাঁচায় এই ক'দিন না খেয়ে বন্দী হয়ে থাকার ফলে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কোথায় যাবে সে? বাড়ি যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি গেলে যদি সেখানে কেউ তাকে দেখে ফেলে তাহলে তাদের গোটা পরিবারটার ওপরেই সর্বনাশ নেমে আসবে।

কী করবে না জেনেই পাভেল আরেকবার অন্ধভাবে ছুট লাগাল শহরের বাইরের দিকে তরিতরকারির জমিগুলো আর

বাগানগুলো পেছনে ফেলে। একটা বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠে হুঁশ ফিরে পেয়ে সে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল: লম্বা বেড়াটার ওপারে প্রধান বনপরিদর্শকের বাগান। নিঃশেষে ক্লান্ত তার পা দুটো এইখানে এনে ফেলেছে তাকে! এদিকে আসার কোন চিন্তাই যে তার ছিল না।

তাহলে এখানে কী করে এল সে?

প্রশ্নটার কোন উত্তর পাভেল পেল না।

তবু, বিশ্রাম তাকে নিতেই হবে কিছুক্ষণের জন্যে—অবস্থাটা ভালো করে বুঝে নিয়ে তাকে ঠিক করতে হবে এর পরে কী করবে না-করবে। মনে পড়ল তার—বাগানটার শেষের দিকে একটা কুঞ্জ আছে, সেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

লাফ দিয়ে বেড়াটার গা বেয়ে উঠে টপ্‌কে এধারে এসে সে পড়ল বাগানের মধ্যে। গাছের ফাঁকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে সে এগোল কুঞ্জের দিকে। হতাশ হয়ে পাভেল লক্ষ্য করল, কুঞ্জের প্রায় চারিদিকই খোলা। গ্রীষ্মের সময় যে বুনো আঙুর-লতার ঝাড় কুঞ্জটাকে চারধারে ঘিরে দেয়াল তুলেছিল সেটা শুকিয়ে ঝরে গেছে।

ফিরে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল পাভেল, কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। পেছনে প্রচণ্ড ঘেউঘেউ আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে—পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাভেল দেখতে পেল বাড়িটার দিক থেকে শুকনো পাতা-ছড়ানো রাস্তাটা বেয়ে একটা বিরাট কুকুর সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে। কুকুরটার হিংস্র চিৎকারে বাগানের নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে।

আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হল পাভেল।

প্রথম আক্রমণটা সে ঠেকাল জোরে পা মেরে। কিন্তু কুকুরটা

আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ওঁৎ পাতছে। এমন সময় একটা পরিচিত গলায় ডাক ভেসে এল, 'এদিকে আয় ট্রেসর! এদিকে আয়!'

এই ডাকটা না এলে পাভেলের সঙ্গে কুকুরটার এই সংঘর্ষের ফলাফল কী দাঁড়াত বলা যায় না।

তনিয়া ছুটে আসছিল পথটা বেয়ে। গলা-বন্ধনী ধরে ট্রেসরকে পেছনে টেনে তনিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়ানো তরুণটির দিকে তাকাল, 'এখানে কী কাজ আপনার? কুকুরটা আর একটু হলেই ভীষণভাবে কামড়ে দিত আপনাকে, ভাগ্য ভালো যে আমি...'

হঠাৎ থেমে গেল তনিয়া, তার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাদের বাগানে ঢুকে পড়েছে এই যে ছেলেটা, এর চেহারার সঙ্গে করচাগিনের চেহারার কী আশ্চর্য মিল!

বেড়ার পাশে মূর্তিটা নড়ে উঠল।

'তনিয়া!' কোমল গলায় বলল তরুণটি, 'চিনতে পারছ না?'

চেঁচিয়ে উঠে তনিয়া হঠাৎ-উত্তেজনায় ছুটে এল তার কাছে, 'পাভেল, তুমি?'

ট্রেসর এই চিৎকারটাকে আক্রমণের ইঙ্গিত মনে করে একলাফে এগিয়ে এল।

'থাম্, ট্রেসর, থাম্!'

তনিয়া তাকে পা মেরে দিতেই ট্রেসর মর্মাহত হয়ে তার পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে মাথা নিচু করে চলে গেল বাড়ির দিকে।

পাভেলের দুই হাত চেপে ধরে তনিয়া বলল, 'ছাড়া পেয়ে গেছ তুমি তাহলে?'

'তুমি জানতে তাহলে?'

'সব জানি আমি,' একনিঃশ্বাসে বলে গেল তনিয়া, 'লিজা

বলেছে আমাকে। কিন্তু এখানে এলে কী করে? ওরা ছেড়ে দিল নাকি তোমায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ভুল করে,' ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিল পাভেল, 'আমি পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণে বোধহয় ওরা আমাকে খুঁজতে লেগেছে। কী করে যে এখানে এলাম তা সত্যিই জানি না। তোমাদের বাগানের এই লতাঘরটায় একটু বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল।

দু'-এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল তনিয়া। একটা নিবিড় করুণা আর স্নেহের আবেগে ছেয়ে গেল তার মন।

'পাভেল, আমার পাভেল,' তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে জোরে চেপে ধরে তনিয়া মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ভালোবাসি তোমায়... শুনছ? গোঁয়ার ছেলে, সেবারে তুমি অমন করে চলে গেলে কেন? আচ্ছা, এবারে তাহলে তুমি থাকছ আমাদের কাছে, আমার কাছে। কিছুতেই আর আমি যেতে দিচ্ছি না তোমায়। আমাদের বাড়ি নিশ্চিন্তে থাকবে যতদিন খুশি---কোন গোলমাল নেই এখানে।'

মাথা নাড়ল পাভেল, 'এখানে আমাকে ওরা যদি খুঁজে পায়, তাহলে? না, তোমার বাড়িতে থাকা চলবে না আমার।'

তনিয়ার হাত মুচড়ে ধরল পাভেলের আঙুলগুলো, তার চোখের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল।

'যদি রাজী না হও, তাহলে আমি আর কক্ষণো তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আরতিওম নেই এখানে, তাকে পাহারাওয়ালা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রেল-স্টেশনে। সমস্ত রেলের লোকজনকে জোর করে কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোথায় যাবে তুমি?'

তনিয়ার এই উদ্বেগ যে কেন তা পাভেল জানে। তবে এই

যে মেয়েটি তার বড় প্রিয় তারই বিপদ ডেকে আনার ভয়েই সে ইতস্তত করছে। কিন্তু খিদেয়, ক্লান্তিতে, এই ক'দিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার অবসন্নতার ফলে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে গেল।

তনিয়ার ঘরে সোফাটায় যখন সে বসে আছে তখন রান্নাঘরে মা আর মেয়ের মধ্যে এই কথাবার্তা চলছিল, 'শোনো মা, করচাগিন বসে আছে আমার ঘরে। ও আমার কাছে পড়তে আসত, তোমার মনে আছে তো? আমি তোমার কাছে কিছু লুকোতে চাই না। একজন বলশেভিক জাহাজীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। ও আজ জেল থেকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই ওর।' গলাটা কেঁপে গেল তনিয়ার, 'মা, লক্ষ্মীটি, কয়েকদিনের জন্যে ওকে এখানে থাকার অনুমতি দাও।'

মা তাঁর মেয়ের অনুনয়-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওকে থাকতে দিবি কোন্ ঘরে?'

হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল তনিয়ার মুখ। বলে ফেলল সে, 'আমার ঘরে সোফাটার ওপরে ও ঘুমোতে পারবে। আপাতত বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।'

মা সোজাসুজি মেয়ের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এরই জন্যে বুঝি তুমি কেঁদেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ও তো এখনও নেহাত ছেলেমানুষ।'

'তা জানি,' বিব্রতভাবে ব্লাউজের হাতাটা আঙুল দিয়ে দলা পাকাতে পাকাতে তনিয়া বলল, 'কিন্তু ও না পালিয়ে এলে ওকে ওরা গুলি করে মারত বয়স্কের মতো।'

করচাগিন তাঁর বাড়িতে থাকায় ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছিল এই ছেলেটা, যাকে তিনি চেনেন না বললেই হয়, তার প্রতি মেয়ের এই টান দেখে তিনি মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

এদিকে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে ধরে নিয়ে তনিয়া তার অতিথির আরাম-বিরামের ব্যাপারটা ভাবতে লেগেছে, 'আগে ওর চান করা দরকার, মা। আমি এখ্নুনি সেটার ব্যবস্থা করছি। ভয়ানক নোংরা হয়ে আছে ও—কয়লাওয়ালারই মতো। বহ্নুদিন ওর চান-টান হয় নি।'

ব্যস্ত হয়ে তনিয়া চলে এল পাভেলের স্নানের জন্যে জল গরমের আর কিছ্নু ধোয়া জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে। সব করার পর সে ছ্নুটে এসে ঘরে ঢুকে পাভেলের হাত ধরে তুলে অনাবশ্যক বাক্যব্যয় না করে তাকে স্নান-ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'আগাগোড়া বদলাতে হবে তোমার। এই এক-প্রস্থ পোশাক তোমার পরার জন্যে। তোমার জামা-কাপড়গ্নুলো ধোয়াতে হবে। ইতিমধ্যে ওইগ্নুলো পরবে।' একটা চেয়ারের ওপরে স্নুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা নীল রঙের আর গলার কাছে সাদা ডোরা-কাটা একটা জাহাজী কোর্তা, আর পায়ের-দিকে-চওড়া একটা পাৎলন্নুন আঙ্নুল দিয়ে দেখাল সে।

অবাক-চোখে তাকাল পাভেল। তনিয়া হেসে তাকে বন্নুঝিয়ে দিল, 'আমি একবার একটা শখের পোশাকের নাচের আসরে পরেছিলাম ওটা। তোমার গায়ে ঠিক হবে। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করো এবার। তোমার চান হতে হতে আমি এদিকে কিছ্নু খাবার ব্যবস্থা করছি।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। কাপড়-চোপড় খ্নুলে টবের জলে নেমে পড়া ছাড়া পাভেলের আর গত্যন্তর রইল না।

ঘণ্টাখানেক পরে মা, মেয়ে আর পাভেল তিনজনে রান্নাঘরে খেতে বসল।

ভয়ানক খিদে পেয়েছিল পাভেলের, তিন প্লেট খেয়ে ফেলার পর সে নিজের খাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। প্রথমটায় সে ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনার সামনে কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু তিনি এত বন্ধুর মতো ব্যবহার করছেন দেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সে ভাবটা কেটে গেল।

খাওয়ার পর তারা তনিয়ার ঘরে এসে বসল। ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনার অনুরোধে পাভেল যা যা ঘটেছিল সব বলল। শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপরে, এখন তুমি কী করবে বলে ভেবেছ?'

প্রশ্নটা শুনে পাভেল দু'-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'আগে একবার আরতিওমের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তারপরে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু যাবে কোথায়?'

'ভাবছি উমান কিংবা কিয়েভে চলে যেতে পারব বোধহয়। নিজেই সেটা এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু এখান থেকে যতো শিগগির পারি চলে যেতেই হবে।'

এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে তার পরিবেশটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে সেটা যেন পাভেলের বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র আজ সকালেই সে ছিল নোংরা একটা গারদের মধ্যে, আর এখন কিনা সে বসে আছে তনিয়ার পাশে ফর্সা জামাকাপড় পরে -আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সে এখন মুক্ত।

জীবনে কত অদ্ভুত পরিবর্তন না আসতে পারে! কোনো মুহূর্তে আকাশটা রাত্রির মতো কালো মনে হয়, তারপরেই আবার সূর্যের দীপ্তি ফোটে। ফের ধরা পড়বার বিপদ যদি

না থাকত, তাহলে এই মুহূর্তে তাকেই বলা যেতে পারত সবচেয়ে সুখী ছেলে।

কিন্তু সে জানে, এই বিরাট নিস্তব্ধ বাড়িটায়ও সে মোটেই নিরাপদ নয়।

তাকে চলে যেতেই হবে এখান থেকে, তা সে যেখানেই হোক না কেন।

কিন্তু চলে যাবার কথাটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছে না। বীর গ্যারিবল্ডির জীবনী পড়তে পড়তে কী উন্মাদনায় ছেয়ে গেছে তার মন! গ্যারিবল্ডির ওপরে ভারি হিংসা হত পাভেলের! অথচ গ্যারিবল্ডির জীবন কেটেছে নানান্ কষ্টের মধ্যে দিয়ে---সব সময় তাঁর পেছন পেছন তাড়া করে ফিরেছে আর তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। আর পাভেলের তো মোটে সাতদিন কেটেছে কষ্ট আর নির্যাতনের মধ্যে, তাতেই তার কাছে এই সাতদিন যেন পুরো একটি বছর বলে মনে হয়েছে।

না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সে ঠিক বীরের গড়নটা পায় নি।

তনিয়া তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?' তার দুই চোখের নীলিমা যেন অগাধ।

'তনিয়া, খৃস্তিনার কথা বলব, শুনবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়,' আগ্রহের সঙ্গে বলল তনিয়া।

পাভেল তার কারা-সঙ্গিনীর সেই দুঃখের কাহিনী বলে গেল, '...আর সেই শেষ তার সঙ্গে দেখা।' শেষের কথাগুলো অতি কষ্টে উচ্চারণ করল পাভেল।

তারপর নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টিক্-টিক্ আওয়াজটা জোরালো হয়ে উঠল। মাথাটা নিচু হয়ে গেল তনিয়ার, গলায় ঠেলে-ওঠা কান্নাটাকে আটকাবার জন্যে সে জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

তার দিকে তাকিয়ে পাভেল মনস্থির করে বলল, 'আজ রাত্রেই আমাকে যেতে হবে।'

'না, না, আজ রাত্রে আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না।' পাভেলের এলোমেলো চুলগুলোর ফাঁকে সে সস্নেহে তার পেলব উষ্ণ আঙুল বুলিয়ে দিল...

'তনিয়া, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। একজন কাউকে ডিপোয় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে আরতিওমের কী হয়েছে আর সেরিওঝাকে গিয়ে একটা চিঠি দিয়ে আসতে হবে। একটা কাকের বাসায় আমার একটা পিস্তল লুকানো আছে। সেটা আনবার জন্যে আমি যেতে পারি না। কিন্তু সেরিওঝা সেটা আমাকে এনে দিতে পারবে। তুমি পারবে আমার জন্যে এই কাজটা করতে?'

উঠে দাঁড়াল তনিয়া, 'আমি এক্ষুণি লিজা সুখারকোর কাছে যাচ্ছি। ও আর আমি দু'জনে একসঙ্গে ডিপোয় যাব। চিঠিটা লিখে দাও, সেরিওঝাকে দিয়ে দেব আমি। কোথায় থাকে সে? সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে কি তাকে বলব তুমি কোথায় আছ?'

একটু ভেবে পাভেল বলল, 'আজ সন্ধ্যেয় তোমাদের বাগানে তাকে পিস্তলটা নিয়ে আসতে বোলো।'

অনেক দেরিতে তনিয়া ফিরল। পাভেল তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠল পাভেল, চোখ মেলে দেখে তনিয়া দাঁড়িয়ে আছে সামনে, খুশির হাসি তার মুখে।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আরতিওম আসছে এখানে। সবেমাত্র ফিরেছে সে। লিজার বাবা তার জামিন হয়েছেন, এক ঘণ্টার জন্যে তাকে ওরা আসতে দিতে রাজী হয়েছে। ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়েই আছে ডিপোয়। তুমি যে এখানে রয়েছ, সেটা আমি আরতিওমকে বলে উঠতে পারি নি। শুধু বলেছি, আমার

তাকে খুব জরুরী কিছু কথা বলার আছে। এই যে, এসে গেছে সে!'

ছুটে গেল তনিয়া দরজাটা খুলে দেবার জন্যে। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আরতিওম দাঁড়িয়ে রইল দরজাটার কাছে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আরতিওম ঢোকার পর তনিয়া দরজাটা বন্ধ করে দিল যাতে পড়বার ঘরটায় টাইফাসে অসুস্থ তার বাবার কানে কথাবার্তা না যায়।

আর এক মুহূর্তের মধ্যেই আরতিওম ছুটে এসে এমন দারুণ জোরে চেপে জড়িয়ে ধরল পাভেলকে যে তার হাড় মটকে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল আরতিওম, 'পাভেল! ভাইটি আমার!'

তারপর সব কথাবার্তার শেষে ঠিক হল: পাভেল পরের দিন চলে যাবে এখান থেকে; কাজাতিনগামী একটা ট্রেনে ব্রুঝাক্ তাকে তুলে নেবে, সে-ব্যবস্থা আরতিওম করে দেবে।

আরতিওম সাধারণত গম্ভীর আর স্বল্পভাষী, কিন্তু এখন সে তার ভাইকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা- পাভেলের কী হল না-হল জানতে না পেরে তার এই ক'টা উদ্বিগ্ন দিন কেটেছে গভীর দুশ্চিন্তায়।

'তাহলে তাই ঠিক হল। কাল ভোর পাঁচটায় তুই মালগুদামে আসবি। ওরা যখন ইঞ্জিনে কাঠ নিতে থাকবে, তুই তখন সেঁধিয়ে যাবি। আমার ইচ্ছে করছে আরও কিছুক্ষণ বসে তোর সঙ্গে গল্প করি, কিন্তু ফিরে যেতে হবে আমাকে। কাল তোর রওনা হবার সময় দেখা করব। ওরা রেলের লোকজনদের নিয়ে একটা পল্টন গড়ে তুলবার জোগাড়ে আছে। জার্মানরা এখানে থাকার সময়ে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি এখনও আমরা রাইফেলধারী সান্ত্রীদের পাহারায় চলাফেরা করি।'

ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল আরতিওম।

দ্রুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সের্গেই এক্ষুণি এসে পড়বে পিস্তলটা নিয়ে। সের্গেইয়ের অপেক্ষায় পাভেল উত্তেজনায় অন্ধকার ঘরটায় পায়চারি করতে থাকল। তনিয়া তার বাবার ঘরে, সেখানে তার মাও আছেন।

বাগানে বেড়াটার ধারে অন্ধকারে সের্গেইয়ের সঙ্গে দেখা হল তার, নিবিড় আবেগে পরস্পরের করমর্দন করল দুই বন্ধু। সের্গেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভালিয়াকে। নিচু গলায় কথাবার্তা চালাল তারা।

সের্গেই বলল, 'আমি পিস্তলটা আনতে পারি নি। তোদের উঠোনটায় গিজ্‌গিজ্ করছে পেৎলিউরার লোক। চারিদিকে গাড়িগুলোকে জড়ো করে রেখেছে ওরা, আগুন জ্বালিয়ে হৈ-হল্লা করছে। তাই গাছে চড়ে আর পিস্তলটা আনতে পারি নি ভারি বেইজ্জত হলাম তোর কাছে!' খুব দমে গেছে সের্গেই। তাকে সান্ত্বনা দিল পাভেল, 'যাক্‌গে। এই হয়তো ভাল হল· পিস্তলটা সমেত যদি পথে ধরা পড়ি তাহলে বরং আরও খারাপ। কিন্তু ওটা জোগাড় করে তোর কাছে রাখিস নিশ্চয়।'

পাভেলের কাছে সরে এল ভালিয়া, 'কখন যাচ্ছ?'

'কাল ভোরে।'

'কি করে সরে পড়লে ওখান থেকে? বলো, শুনি।'

তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে পাভেল ঘটনাটা বলে গেল।

তারপরে সে তার সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিল। সের্গেই সাধারণত বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ তার কোনো ঠাট্টা নেই সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

রুদ্ধ-কণ্ঠে ভালিয়া বলল, 'আমাদের শুভেচ্ছা রইল, পাভেল। ভুলে যেও না আমাদের।'

তারপরে তারা চলে গেল, মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা।

বাড়ির ভেতরে সব কিছু নিস্তব্ধ, শুধু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দটা শোনা যাচ্ছে। এই বাড়ির দু'জন বাসিন্দার চোখে সে রাত্রের মতো আর ঘুম নেই। ছ'ঘণ্টা পরেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবে, বোধহয় আর তাদের মধ্যে দেখাই হবে না— সুতরাং কী করে ঘুমোবে তারা? মনের মধ্যে তাদের অজস্র না-বলা ভাবনা-চিন্তা পাক খেয়ে উঠছে—এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে কি আর সেই সব ভাবনা-চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব?

আশ্চর্য মধুর আর পবিত্র সেই যৌবনের প্রারম্ভে, প্রেমের মাদকতা যখন অজ্ঞাত, তখন সেটা শুধু অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় হৃদয়ের দ্রুতগতি-স্পন্দনের মধ্যে দিয়ে; প্রিয়তমার বুকের হঠাৎ স্পর্শ পেয়ে তখন হাতটা যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে আর শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রহরীর মতো বাধা দেয় প্রথম যৌবনের পবিত্র বন্ধুত্ব! প্রিয়তমার বাহুবন্ধনের অনুভূতি আর অগ্নিময় চুম্বন-স্পর্শের চেয়ে মধুর আর কী আছে!

তাদের এতদিনের বন্ধুত্বের মধ্যে এই হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় চুম্বন। পাভেলের মার খাবার অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে, কিন্তু আদর সে মায়ের কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে পায় নি। তাই আজ তার হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল পর্যন্ত নিবিড় আবেগে আলোড়িত হয়ে উঠছে।

এ পর্যন্ত জীবনের নির্মম দিকটাই সে দেখে এসেছে, সে জানত না যে জীবন এত আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে— এতদিনে তনিয়ার কাছ থেকেই সে বুঝল আনন্দ কাকে বলে।

তনিয়ার চুলের সুগন্ধ-ভরা বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে

তার মনে হল যেন সে অন্ধকারে তার চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছে।

'তনিয়া, তোমাকে যে কতো ভালোবাসি কী করে বোঝাব, কী করে বলতে হয় তা তো আমার জানা নেই।'

পাভেলের মাথার মধ্যে যেন কি রকম করে উঠেছে। তনিয়ার কোমল পেলব দেহটা কি আশ্চর্যরকম সংবেদনশীল!.. কিন্তু প্রথম যৌবনের বন্ধুত্ব পরম নির্ভরে পবিত্র!

'তনিয়া, এই সমস্ত গোলমাল যখন কেটে যাবে, আমি নিশ্চয়ই মিস্ত্রি হিসেবে কাজ পেয়ে যাব একটা। তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, যদি সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমাকে নিয়ে এটা যদি তোমার একটা খেলা না হয়, আমি তোমার খুব ভালো স্বামী হয়ে থাকব। কক্ষণো মারধোর করব না তোমায়, তোমার মনে একটুও আঘাত দেব না কখনও -- প্রতিজ্ঞা করছি।'

পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে আলাদা হয়ে গেল তারা -- পাছে তনিয়ার মা তাদের দেখে ফেলে কিছু খারাপ ভেবে বসেন।

পরস্পরকে কখনও ভুলবে না -- এই প্রতিজ্ঞা করার পর যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা পাভেলকে ভোর-ভোর ডেকে তুললেন।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল সে বিছানা ছেড়ে।

স্নানের ঘরে গিয়ে যতক্ষণে সে তার নিজের পোশাক আর জুতো পরে দোলিন্নিকের জ্যাকেটটা ওপরে চাপিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণে ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভনা তনিয়াকে জাগিয়ে তুললেন।

ভোরের ধূসর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তারা দু'জনে দ্রুত

পায়ে এগুল স্টেশনমুখো। পেছনের পথটা দিয়ে কাঠের গুদামে পৌঁছে দেখে আরতিওম কাঠ-বোঝাই একটা ইঞ্জিনের পাশে তাদের জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে।

হিস্ হিস্ শব্দে বাষ্প বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটা বিরাট ইঞ্জিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে — ব্রুঝাক্ জানলার মধ্যে থেকে মাথা বের করল।

তনিয়া আর আরতিওমের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে পাভেল লোহার শিকটা চেপে ধরে উঠে পড়ল ইঞ্জিনটার ভেতরে। পেছনে তাকিয়ে দেখল লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে দুটো পরিচিত চেহারা: আরতিওমের লম্বা আকৃতিটা আর তার পাশে তনিয়ার ছোট্ট পেলব দেহখানি।

এক ঝলক বাতাস তার ব্লাউজের গলাবন্ধনীটা উড়িয়ে দিয়ে আর তার বাদামী চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। পাভেলের দিকে হাত নাড়ছে তনিয়া।

তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আরতিওম দেখল, তনিয়ার চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবল আরতিওম, 'এরা দু'জনে নিশ্চয় পাগলা হয়ে উঠেছে। আর আমি কিনা এদিকে ভাবছি যে পাভেল আজ আমাদেরও সেই নেহাত ছেলেমানুষটিই আছে!'

ট্রেনটা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সে তনিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আমরা তাহলে বন্ধু হলাম এখন থেকে, কেমন?' তনিয়ার ছোট্ট হাতখানা তার বিরাট থাবাটার মধ্যে হারিয়ে গেল।

ট্রেনটা গতি সঞ্চয় করছে -- দূর থেকে তার গুম্‌গুম্ আওয়াজ ভেসে এল।

সপ্তম অধ্যায়

পুরো এক সপ্তাহ ধরে শহরের বাসিন্দারা রাত্রে ঘুমোতে যায় আর সকালে জেগে ওঠে কামানের গুম্‌গুম্‌ শব্দ আর রাইফেলের খট্‌খট্‌ আওয়াজের মধ্যে। সর্বত্র ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে, গোটা শহরটাকে যেন কাঁটাতারের বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে। শুধু মাঝরাত্রির পরে কয়েক ঘণ্টার জন্যে গণ্ডগোলটা কমে আসে, কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে নিঃশব্দতাটুকু ভেঙে ভেঙে যায় ফৌজী ফাঁড়িগুলোর থেকে দু'পক্ষের অস্তিত্ব জানবার জন্যে গুলি চালানোর শব্দে। ভোরবেলায় রেল-স্টেশনের গোলন্দাজ-বাহিনী তাদের কামানের সারির পাশে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক একটা কামানের লম্বা নল তার কালো নাক দিয়ে হিংস্র উদ্‌গিরণ করে আর লোকগুলো দফায় দফায় তার ভেতরে গুঁজে দেয় আরও গোলা আর বিস্ফোরক। যতবার একজন গোলন্দাজ কামানের রশিটা ধরে টান মারছে, ততবারই পায়ের নিচে মাটিটা উঠছে কেঁপে কেঁপে। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে লাল বাহিনী একটা গ্রাম অধিকার করে ঘাঁটি গেড়ে আছে — গোলাগুলো সেই গ্রামের ওপর দিয়ে সাঁসাঁ শব্দে অন্যসব আওয়াজকে ছাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির ফোয়ারা ছুটছে যেন।

গ্রামের মাঝখানে একটা উঁচু টিলার ওপরে পুরনো পোলিশ মঠটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে তার সামনের জমিতে লাল বাহিনীর কামানগুলো।

এই কামানশ্রেণীর সামরিক কমিশার কমরেড জামোস্তিন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। সে এতক্ষণ একটা কামানের পেছন দিকের ওপরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। ভারি একটা মোজার-

পিস্তল ঝোলানো তার কোমরবন্ধনীটা আঁট করে বাঁধতে বাঁধতে জামোস্তিন উড়ন্ত একটা গোলার সাঁইসাঁই শব্দ শুনতে শুনতে সেটার ফেটে-পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল। তারপর তার জোরালো গলার আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সারা জায়গাটা, 'উঠে পড়ার সময় হয়েছে, কমরেডসব!'

গোলন্দাজরা সবাই তাদের নিজের নিজের কামানের পাশে ঘুমুচ্ছিল। কমিশার জামোস্তিনের মতোই তারা সবাই চটপট উঠে দাঁড়াল — শুধু সিদোর্চুক্ ছাড়া। অনিচ্ছাভরে মাথাটা তুলে সে চারিদিকে তাকাল ঘুমে ভারি তার চোখ দুটো তুলে, 'শুয়োরগুলো — দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই আরম্ভ করে দিয়েছে। স্রেফ বদমাইশ—যতোসব বেজম্মা!'

জামোস্তিন হেসে উঠল, 'সব অবুঝ লোক, বুঝলে সিদোর্চুক, ওরা হচ্ছে তাই। তুমি যে একটু ঘুমোতে চাও, সেটাও ওরা গ্রাহ্যই করে না।'

গোলন্দাজটি ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে টেনে তুলল নিজেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মঠের সামনের কামানগুলো থেকে গোলা ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল — শহরের মধ্যে ফেটে পড়তে লাগল গোলাগুলো। চিনি-কলের লম্বা চিমনিটার মাথার ওপরে কাঠের তক্তা জুড়ে একটা মাচার মতো ক'রে নিয়ে সেখানে পাহারায় বসে রয়েছে একজন পেৎলিউরা-অফিসার আর একজন টেলিফোন-করার লোক।

. চিমনিটার ভেতরের দিককার লোহার মই বেয়ে তারা সেখানে উঠেছে।

এই সুবিধাজনক জায়গাটা থেকে তারা গোলন্দাজবাহিনীকে গোলা ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। শহর অবরোধ করে রয়েছে যে লাল সৈন্যদল তাদের সমস্ত গতিবিধি এরা দূরবীন দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। বলশেভিকরা আজ বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে

উঠেছে। অনবরত গুলি চালাতে চালাতে একটা সাঁজোয়া ট্রেন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে পদোল্‌স্ক স্টেশনের দিকে। তার ওদিকটায় হামলাদার পদাতিক ফৌজের অবস্থান দেখা যায়। হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শহরটাকে অধিকার করে নেবার জন্যে কয়েকবার চেষ্টা করেছে লাল বাহিনী। কিন্তু শহরে ঢোকার মুখগুলোয় দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে পেৎলিউরা-বাহিনীর সৈন্যেরা। ট্রেঞ্চ্‌গুলো এক এক ঝলক বারুদের আগুন উদ্‌গিরণ করেছে, একটা কানে-তালা-ধরা আওয়াজে ভরে গেছে চারিদিক। তারপরে সেটা একটা নিরবচ্ছিন্ন গর্জনের রূপ নিয়ে আক্রমণগুলো চালাবার সময়ে চরমে উঠেছে। জ্বলন্ত সীসের সেই শিলাবৃষ্টির ঝাপটায় অমানুষিক একটা প্রয়াসের চাপ সইতে না পেরে বলশেভিক বাহিনীর সারিটা পিছিয়ে গেছে, সামনে মাঠের ওপরে তারা ফেলে এসেছে কতকগুলো অসাড় দেহ।

আজ শহরের ওপরে আঘাতগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃঢ় আর ঢের বেশি ঘন ঘন। কামানের গোলা-ছোঁড়ার প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠছে চারিদিক। চিমনির মাথায় বাঁধা মাচাটার ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে -- বলশেভিক সৈন্যসারি ক্রমশই ধীরে ধীরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে মাটির ওপরে শুয়ে পড়ছে মানুষগুলো, আবার উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে তারা স্টেশনটা প্রায় দখল করে নিয়েছে। পেৎলিউরা-বাহিনীর ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ সৈন্যদল যে-ক'টা ছিল, সেগুলিকেও লড়াইয়ে লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাদের অবস্থানের বিভিন্ন জায়গায় যে ভাঙন ধরেছে, সেটাকে রুখতে পারল না। একটা বেপরোয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলশেভিক বাহিনীর আক্রমণকারী দলটা ঠেলে এসে স্টেশন-সংলগ্ন রাস্তাগুলোর

ওপরে ছড়িয়ে পড়ল। স্টেশনের ওপরে আক্রমণটাকে রুখছিল যারা, সেই পেৎলিউরা-বাহিনীর তৃতীয় রেজিমেণ্ট শহরের প্রান্তে বাগান আর ঝোপঝাড়গুলোয় তাদের শেষ অবস্থানগুলি থেকে লাল সৈনিকদের একটা সংক্ষিপ্ত আর সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে উৎখাত হয়ে শহরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। নতুন করে তাদের ঘাঁটি গাড়বার আগেই লাল ফৌজের সৈন্যরা শহরের রাস্তায় দলে দলে নেমে এল। পশ্চাদ্‌রক্ষী কিছু পেৎলিউরা-সৈন্য তাদের আক্রমণ রুখতে চেষ্টা করছিল — লাল ফৌজের সৈন্যেরা বেয়নেট চালিয়ে তাদের হঠিয়ে দিল প্রচণ্ড বেগে।

সের্গেই ব্রুঝাকের পরিবার আর তাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীরা আশ্রয় নিয়েছে মাটির তলার কুঠরিতে— সের্গেইকে সেখানে কিছুতেই আটকে রাখা গেল না। মায়ের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও সে মাটির নিচের ঠাণ্ডা ঘরটা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। 'সাগাইদাচ্‌নি' নাম লেখা একটা সাঁজোয়া গাড়ি বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে ঘড়ঘড় শব্দে বেরিয়ে গেল বাড়িটার পাশ দিয়ে। তার পেছন পেছন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে ছুটে পালাচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত পেৎলিউরার লোকজন। ওদের একজন সের্গেইদের আঙিনায় ঢুকে পড়ে পাগলের মতো কোনরকমে তাড়াতাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলল তার কার্তুজের কোমরবন্ধনী, শিরস্ত্রাণ আর রাইফেলটা; তারপরে বেড়াটা টপকে ওদিককার সবজি-বাগানের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাস্তাটা দেখে নিল সের্গেই। রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে পেৎলিউরা-সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিমের স্টেশনের দিকে; তারা যাতে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়, তার জন্যে একটা সাঁজোয়া গাড়ি পেছন পেছন চলেছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। শহরমুখো বড়ো রাস্তাটা একেবারে জনহীন। তারপরে একজন লাল ফৌজের লোককে

ছুটে আসতে দেখা গেল। রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে সে গুলি চালাতে লাগল। তার পেছনে একে একে আরও দু'জন লাল ফৌজের লোক এসে পড়ল... সের্গেই দেখতে পেল — গুড়ি মেরে মেরে গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে আসছে তারা। রোদে-পোড়া তামাটে রঙ একজন চীনা শরীরটাকে টান করে সোজা দৌড়ে আসছে—তার চোখ দুটো রক্তাক্ত, গায়ে তার একটা গেঞ্জি, মেশিনগানের কার্তুজ-বন্ধনী পরা, দুই হাতে দুটো হাত-বোমা। ওদের সবার আগে আগে আসছে একজন নিতান্ত অল্পবয়সী লাল ফৌজের লোক, তার হাতে একটা হালকা মেশিনগান। লাল ফৌজের এই অগ্রগামী দলটাকে শহরে ঢুকতে দেখে সের্গেইয়ের মন আনন্দে ভরে উঠল। রাস্তার ওপরে ছুটে বেরিয়ে এসে সে যতো জোরে পারে চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেডসব জিন্দাবাদ!'

এমন আকস্মিকভাবে সে ছুটে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায় যে চীনাটি তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আর কি। লাল ফৌজের লোকটির প্রথম প্রতিক্রিয়া হল ছেলেটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা ইচ্ছে। কিন্তু সের্গেইয়ের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে সে সামলে নিল নিজেকে। ভয়ানক রকম হাঁফাতে হাঁফাতে চীনাটি তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেৎলিউরা কোথায়?'

কিন্তু তার কথা শুনতে পায় নি সের্গেই। বাড়ির আঙিনায় ছুটে ফিরে এসে সে ইতিমধ্যে পেৎলিউরা-সৈন্যটির ফেলে-যাওয়া কার্তুজ-বন্ধনী আর রাইফেলটা তুলে নিয়ে লাল ফৌজের লোকদের পেছনে পেছনে ছুটেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের স্টেশনটা দখল করে না নেওয়া পর্যন্ত তারা সের্গেইকে লক্ষ্যই করে নি। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র-গোলা-বারুদ আর রসদে বোঝাই কতকগুলো ট্রেন বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শত্রুপক্ষকে বনের মধ্যে

তাড়িয়ে দেবার পর তারা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন করে দল সাজাবার জন্যে কিছুক্ষণের মতো থামল।

সের্গেইয়ের কাছে এগিয়ে এসে তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোত্থেকে এলে কমরেড?'

'আমি এই শহরের ছেলে। আমি তোমাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম।'

লাল ফৌজের লোকেরা ঘিরে ধরল সের্গেইকে।

চীনাটি ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় বলল, 'আমি জানি ওকে, 'কমরেডসব জিন্দাবাদ!' বলে ও চেঁচিয়ে উঠেছিল। ও বলশেভিক, আমাদের লোক, বেশ ভালো ছেলে!' সের্গেইয়ের কাঁধে একটা সমর্থনের চাপড় মেরে একগাল হেসে সে বলল।

আনন্দে নেচে উঠল সের্গেইয়ের মন। সঙ্গে সঙ্গেই এরা তাকে আপন করে নিয়েছে নিজেদের একজন হিসেবে। ওদের সঙ্গে সেও বেয়নেট-চার্জ করে স্টেশনটার দখল নিয়েছে।

নড়েচড়ে উঠেছে শহরটা। এই ক'দিনের কষ্টের অভিজ্ঞতার পর শহরের লোকজন তাদের মাটির নিচের কুঠরিগুলো থেকে বেরিয়ে ফটকে এসে দাঁড়াল লাল ফৌজের দলগুলোর শহরে ঢোকা দেখবার জন্যে। এইভাবেই সের্গেইয়ের মা আর বোন ভালিয়া তাকে লাল ফৌজের সৈন্যসারির মধ্যে কদম ফেলে যেতে দেখল। তার মাথায় টুপি নেই, কিন্তু একটা কার্তুজ-বন্ধনী পরে আছে সে আর কাঁধে ঝুলছে একটা রাইফেল।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাত দুটো নাড়ল আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা।

তার ছেলেটা শেষ পর্যন্ত এই সব লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এর ফল পেতে হবে ওকে! দ্যাখো একবার কাণ্ডখানা — গোটা শহরের লোকজনের সামনে দিয়ে কিনা

সেরিওঝা কুচকাওয়াজ করে চলেছে রাইফেল নিয়ে! পরে ফ্যাসাদে পড়বে নিশ্চয়।

আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা আর সামলাতে পারল না নিজেকে। চেঁচিয়ে উঠল, 'সেরিওঝা, এক্ষুণি বাড়ি আয়! হতভাগা, দেখাচ্ছি দাঁড়া! শিখিয়ে দেব কী করে লড়াই করতে হয়!' এই বলে সে তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে এগিয়ে এল।

মায়ের হাতে কত কানমলা খেয়েছে সের্গেই, কিন্তু এবার সে তার মায়ের দিকে দুই চোখের কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকাল, অপমানে আর লজ্জায় লাল হয়ে সে পালটা জবাব দিল, 'চেঁচিও না অতো! আমি যাব না।' বলতে বলতে সে না থেমেই কদম কদম এগিয়ে গেল।

রাগে আত্মহারা হয়ে উঠেছে আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা, 'এই বুঝি তোর মায়ের সঙ্গে ব্যবহার! আচ্ছা, এর পরে বাড়ি ফিরবি নে!'

'ফিরব না বাড়ি!' মুখ না ফিরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সের্গেই।

নিতান্ত বিমূঢ় হয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা। তার পাশ দিয়ে রোদে-পোড়া ধুলোয় ভরা লাল ফৌজের সৈন্যের সারি পা ফেলে এগিয়ে গেল।

হাসিখুশিভরা একটা জোরালো গলায় কে-একজন বলে উঠল, 'কেঁদো না, মা! তোমার ছেলেকে আমরা কমিশার করে দেব।'

হালকা খুশিভরা হাসির একটা দমক ছড়িয়ে গেল গোটা পল্টনটার মধ্যে। সৈন্যসারির সামনের দিকে লোকেরা গলা মিলিয়ে গান ধরল:

কমরেড, শোনো ওই বেজে ওঠে ভেরী—
চলো সংগ্রামে, তুলে নাও হাতিয়ার।

মুক্তির রাজ্যকে জয় করে নিতে
যতো বাধা কেটে চলি, গতি দুর্বার।

দৃপ্ত সেই ঐকতানে যোগ দিল সৈন্যরা সবাই, আর সের্গেইয়ের কচি তাজা গলা মিশে গেল সেই গানের জোয়ারে। একটা নতুন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সের্গেই। সেখানে তার হাতেও ধরা আছে একটা বন্দুক।

লেশ্চিনস্কিদের বাড়ির ফটকে এক টুকরো সাদা কার্ডবোর্ড আটকানো আছে। তার গায়ে সংক্ষেপে লেখা: 'বিপ্লবী কমিটি'।

তার পাশেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো আরেকটা পোস্টার: লাল ফৌজের একজন লোক দর্শকের চোখের দিকে তাকিয়ে তার দিকে সোজা আঙুল দেখিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার নিচে লেখা -- 'তুমি কি লাল ফৌজে ভর্তি হয়েছ?'

ডিভিশনের রাজনীতিক বিভাগের লোকেরা সারারাত্রি ধরে শহরের সর্বত্র এই পোস্টারগুলো লাগিয়ে ফিরেছে। পোস্টারের কাছেই ঝুলছে শেপেতোভকা শহরের মেহনতীদের উদ্দেশে বিপ্লবী কমিটির প্রথম ঘোষণাপত্র:

'কমরেডসব! প্রলেতারিয়ান ফৌজ এই শহরের দখল লইয়াছে। সোভিয়েত শাসনক্ষমতা আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আপনাদের আহ্বান জানাইতেছি -- শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। রক্তপিপাসু খুনীদের হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, তাহাদের আর কখনও ফিরিয়া আসা যদি না চাহেন, তাহারা নিঃশেষে ধ্বংস হউক -- ইহাই যদি আপনাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে লাল ফৌজে সৈন্যদলভুক্ত হউন। মেহনতীদের হাতে যাহাতে ক্ষমতা বজায় থাকে, তাহার জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন। এই শহরের সামরিক কর্তৃত্ব এখানে মোতায়েন

সেনাবাহিনীর অধিনায়কের হাতে থাকিবে। বেসামরিক কাজকর্মের পরিচালনা করিবেন বিপ্লবী কমিটি।

দোলিন্নিক, সভাপতি, বিপ্লবী কমিটি।'

নতুন এক ধরনের লোকজন দেখা দিয়েছে লেশ্চিনস্কিদের বাড়িতে। যে 'কমরেড' কথাটির জন্যে লোকের কাল পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়েছে, আজ সেই কথাটাই শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। 'কমরেড!' -- কী অনির্বচনীয় আবেগে ভরা কথাটি!

দোলিন্নিকের আর এই ক'দিন ধরে ঘুম বা বিশ্রাম নেই। বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কাজে সে আজকাল বড় ব্যস্ত। ছোট্ট একটা কামরার দরজায় একটা কাগজের টুকরো ঝুলছে— কাগজটার ওপরে পেন্সিলে লেখা: 'পার্টি কমিটি।' এই ঘরে কমরেড ইগ্নাতিয়েভা তার চিরাচরিত শান্ত আর সুস্থির ভঙ্গিতে বসে আছে। ইগ্নাতিয়েভা আর দোলিন্নিকের ওপরেই সোভিয়েত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা স্থাপনের ভার দিয়েছে রাজনীতিক বিভাগ।

একদিনের মধ্যেই ডেস্কে ডেস্কে বসে গেছে অফিসের কর্মীরা, টাইপ-রাইটারে উঠেছে ব্যস্ত খটাখট আওয়াজ। একটা সরবরাহ কমিশারিয়েট সংগঠিত হয়েছে তিজিস্কির নেতৃত্বে — অত্যন্ত চটপটে আর কর্মতৎপর লোক সে, আগে ছিল স্থানীয় চিনি-কলের একজন সহকারী মিস্ত্রি। শহরে সোভিয়েত সরকার কায়েম হবার পরে সে কোমর বেঁধে নেমেছে চিনি-কলের কর্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। এই কর্তাদের ইদানীং সময় খারাপ যাচ্ছে, বলশেভিকদের ওপরে নিদারুণ ঘৃণা মনে চেপে রেখে তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কলের শ্রমিকদের এক সভায় সে রুক্ষ আর কঠোর কথা ছুড়ে দিয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে, 'আগের অবস্থা আর ফিরে আসতে দেব না আমরা,' কথাটার অর্থের উপরে জোর দিয়ে, মঞ্চের

ধারটায় একটা ঘুষি মেরে সে পোলিশ ভাষায় ঘোষণা করল, 'আমাদের বাপ-দাদারা আর আমরা জীবনভোর পতোৎস্কিদের কাছে ঢের গোলামি করেছি। ওদের জন্যে আমরা প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছি, আর মহামান্য কাউণ্টমশাই তার বদলে আমাদের পেট-ভাতা দিয়েছে যাতে আমরা একেবারে না খেয়ে মারা না পড়ি।

'কতোকাল ধরে এই সব পতোৎস্কি-কাউণ্ট আর সাঙুশ্কা-রাজপুত্তুরেরা আমাদের ঘাড়ে চেপে বেড়িয়েছে? রাশিয়ান আর ইউক্রেনীয় মজুরদের মতোই পোলিশ মজুরদের রক্তও এই কাউণ্ট পতোৎস্কি শুষেছে। আর এখন কিনা এই পতোৎস্কির দালালরা সেই শ্রমিকদের মধ্যেই গুজব ছড়াচ্ছে যে সোভিয়েত সরকার তাদের শক্ত মুঠোয় বেঁধে জবরদস্তি শাসন চালাবে।

'কমরেডসব, এটা একটা জঘন্য মিথ্যে কথা! বিভিন্ন জাতির খেটে-খাওয়া মানুষরা এর আগে আর কখনও এতখানি আজাদি পায় নি।

'প্রলেতারিয়ানরা সব ভাই-ভাই। আর ওই অভিজাতগুলোকে আমরা শিগগিরই ঠান্ডা করে দেব, ঠিক জেনো।' বক্তৃতা-মঞ্চের বেড়াটার ওপরে আবার সজোরে নেমে এল তার হাতটা, 'ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্তারক্তিটা বাধিয়েছে কারা? শত শত বছর ধরে রাজা-রাজড়ারা পোলিশ চাষীদের পাঠিয়েছে তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। ওরাই বরাবর এক জাতির মানুষের বিরুদ্ধে আরেক জাতির মানুষকে উস্কিয়ে এসেছে। সেই নিদারুণ খুনোখুনি আর দুঃখদুর্দশার কথাটা ভেবে দেখো একবার! আর তাতে লাভের কড়ি পেয়েছে কারা? কিন্তু এ সবই বন্ধ হয়ে যাবে শিগগিরই। ছুঁচোগুলোর দিন ফুরিয়েছে। বলশেভিকরা এমন একটা আওয়াজ তুলেছে যা শুনে ভয়ে

আঁতকে উঠছে বুর্জোয়াদের দিল্: 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!' এই ধ্বনিই আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখী ভবিষ্যতের সেই সুদিনের আশা, যেদিন তামাম মেহনতী মানুষ ভাই-ভাই হবে। কমরেডসব, সবাই এসে যোগ দাও কমিউনিস্ট পার্টিতে!

'পোলিশ প্রজাতন্ত্রও গড়ে উঠবে একদিন — সেটা হবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, যেখানে পতোৎস্কিদের কোনো ঠাঁই থাকবে না। ওদের তখন নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমরাই হব সেই সোভিয়েত পোল্যাণ্ডের মালিক। তোমরা তো সবাই ব্রোনিক প্‌তাশিন্‌স্কিকে জানো? বিপ্লবী কমিটি তাকেই আমাদের কারখানার কমিশার নিযুক্ত করেছে। 'আমরা কিছুই ছিলাম না, এবার আমরাই হব সব।' কমরেডসব, আমাদের আনন্দের দিন আসছে। শুধু সাবধান থাকতে হবে — চোরাগোপ্তা সাপগুলোর হিসহিসানিতে কান দিও না যেন! শ্রমিকদের বিশ্বাস অটুট থাকলে আমরা দুনিয়ার তামাম মানুষের ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারব!"

সহজ-সরল একজন মেহনতী মানুষের অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবেগ আর আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হল কথাগুলি। শ্রোতাদের মধ্যে তরুণ যারা তাদের সোৎসাহ কথার মধ্যে সে নেমে এল বক্তৃতার জায়গাটা থেকে। প্রবীণ শ্রমিকরা কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল। কে জানে — কালই হয়তো বলশেভিকরা এই শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে, আর তারপরে যারা রয়ে যাবে তাদেরই শেষে এইসব গরম গরম কথাবার্তার প্রত্যেকটির জন্যে চড়া দাম দিতে হবে। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচা গেলেও, চাকরিটি যাবে নিশ্চয়।

শিক্ষা বিভাগের কমিশার ছিমছিমে সুঠাম চের্‌নোপিজস্কি এ অঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত একমাত্র লোক যে বলশেভিকদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

বিপ্লবী কমিটির বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকেই বিশেষ কাজের জন্যে তৈরি একটি দলের ঘাঁটি। এর সৈনিকেরা বিপ্লবী কমিটির বাড়িতে ডিউটি দিচ্ছিল। রোজ রাত্রে বাড়িটাতে ঢোকার মুখে বাগানে একটা 'ম্যাক্সিম' মেশিনগান খাড়া থাকে — তার পেছনটায় আটকে থেকে ঝোলে একটা এবড়োখেবড়ো টোটার পাত। রাইফেলধারী দু'জন সান্ত্রী তার দু'পাশে পাহারা দেয়।

বিপ্লবী কমিটিতে যাবার পথে কমরেড ইগ্নাতিয়েভা ওই দু'জনের মধ্যে একজন তরুণ লাল ফৌজী সৈনিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কতো বয়েস তোমার, কমরেড?'

'সতেরো চলছে।'

'এইখানেই থাকো?'

লাল ফৌজের ছেলেটা হাসল, 'হ্যাঁ, আমি সবে পরশুদিন লড়াইয়ের সময়ে লাল ফৌজে ঢুকেছি।'

তার মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করল ইগ্নাতিয়েভা, 'তোমার বাবা কী করেন?'

'ইঞ্জিন-চালকের সহকারী।'

এমন সময়ে আরেকজন সামরিক পোশাক-পরা লোকের সঙ্গে দোলিন্নিক এসে পড়ল সেখানে। ইগ্নাতিয়েভা দোলিন্নিকের দিকে ফিরে বলল, 'এই যে। যুব কমিউনিস্ট লীগের* জেলা কমিটির ভার নেবার মতো ঠিক ছেলেটিকে খুঁজে বের করেছি। এখানকারই ছেলে ও।'

দোলিন্নিক তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল সের্গেইয়ের দিকে — এই ছেলেটিই সের্গেই।

'ও, আচ্ছা। তুমি তো জাখারের ছেলে, না? ঠিক আছে,

* রুশ ভাষায় সংক্ষিপ্ত নাম — কমসোমল। — সম্পাঃ

যাও দেখি, ছোটদের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে তোলো।'

বিস্ময়ের চোখে সের্গেই তাকাল তাদের দিকে, 'কিন্তু আমাদের ফৌজী দলের কী হবে?'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে দোলিন্নিক বলল, 'ও ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা আমরা করব'খন।'

দু'দিন পরেই বিকেলের দিকে ইউক্রেনীয় যুব কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় কমিটি স্থাপিত হল।

নতুন জীবনের স্পন্দন জেগে উঠল একেবারে অকস্মাৎ, সেটা সের্গেইকে পেয়ে বসল সম্পূর্ণভাবে, তাকে টেনে নিল তার ঘূর্ণিপাকে। তার সমগ্র অস্তিত্বকে এটা এমনভাবে আচ্ছন্ন করল যে সে এতো কাছে থেকেও নিজের পরিবারকে ভুলে গেল।

সের্গেই ব্রুঝাক এখন একজন বলশেভিক। এই নিয়ে বোধহয় দশবার সে ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি কমিটির দেওয়া পরিচয়পত্রখানা পকেট থেকে বের করে দেখেছে, তাতে তাকে কমসোমলের সভ্য আর কমসোমল কমিটির সম্পাদক হিসেবে মনোনয়নের কথা লেখা। এতেও যদি কেউ কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে তার রয়েছে প্রিয় বন্ধু পাভেলের উপহার দেওয়া সেই ভারি আর জবরদস্ত মানলিশের পিস্তলটা — হাতে তৈরি ক্যাম্বিসের খাপের মধ্যে তার কোর্তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো। এটা নিশ্চয়ই রীতিমতো নির্ভরযোগ্য একটা পরিচয়পত্র! আহা, পাভলুশ্কা এখন এখানে নেই!

বিপ্লবী কমিটির দেওয়া নানান কাজে সের্গেইয়ের দিনগুলো কাটছে। আজও ইগ্নাতিয়েভা তার অপেক্ষায় ছিল। রেল-স্টেশনে ডিভিশনের রাজনীতিক বিভাগে গিয়ে বিপ্লবী কমিটির জন্যে খবরের কাগজ আর বইপত্র নিয়ে আসার কথা তাদের। বাড়িটার বাইরে রাস্তায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সের্গেই —

রাজনীতিক বিভাগের একজন লোক একটা মোটরগাড়ি নিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ইউক্রেনের প্রথম সোভিয়েত ডিভিশনের সদর দপ্তর আর রাজনীতিক বিভাগ বসেছে স্টেশনের রেল-কামরাগুলি জুড়ে। সেখানে যাবার পথে ইগ্নাতিয়েভা সের্গেইকে অনবরত প্রশ্ন করে চলল, 'কী রকম চলছে তোমার কাজকর্ম? সংগঠনটা ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছ নাকি? তোমার বন্ধু মজুরদের ছেলেমেয়েদের কমসোমলে যোগ দেবার জন্যে রীতিমতো উৎসাহ দিতে থাকবে। শিগগিরই তরুণ কমিউনিস্টদের একটা দল গড়ে তোলা দরকার আমাদের। কালই আমরা একটা খসড়া তৈরি করে কমসোমলে যোগ দেবার জন্যে প্রচারপত্র ছাপব। তারপর ওই থিয়েটার-ঘরটায় এখানকার তরুণদের নিয়ে বড়ো রকম একটা সমাবেশের ব্যবস্থা করা যাবে। রাজনীতিক বিভাগে গিয়ে আমি উস্তিনোভিচের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি চলো। যতদূর জানি, ও এখন তরুণদের মধ্যে কাজ করছে।'

দেখা গেল, উস্তিনোভিচ আঠারো-বছরবয়সী একটি মেয়ে — ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, সরু চামড়ার কোমরবন্ধনী আঁটা, খাকি কাপড়ের নতুন কোর্তা পরা। সের্গেইকে সে তার কাজের অনেকগুলো রীতিনীতি বাতলে দিল, তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিল। সের্গেইয়ের চলে আসার সময় সে তাকে বই আর কাগজপত্তরের মস্তবড়ো একটা বাণ্ডিল দিল. এগুলির মধ্যে একটা বই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: কমসোমলের কার্যক্রম আর নিয়মকানুন ছাপা আছে তাতে।

বিপ্লবী কমিটিতে সেদিন একটু বেশি রাতে ফিরে এসে সের্গেই দেখে ভালিয়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সের্গেইকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এভাবে বাড়ি-ছাড়া হয়ে থাকার

মানে কী? লজ্জা করে না তোর? কেঁদে কেঁদে মার চোখ গেল। বাবা তো ভীষণ চটে আছে তোর ওপর। ভয়ানক একটা বকাবকি হবে কিন্তু।'

'না, তা হবে না।' সের্গেই তাকে আশ্বাস দিল, 'বাড়ি যাবার সময়ই পাচ্ছি না মোটে, সত্যি। আজও যেতে পারব না। তুই এসেছিস ভালোই হয়েছে -- কথা আছে তোর সঙ্গে। চল্ ভেতরে যাই।'

ভালিয়া যেন চিনতেই পারছে না তার ভাইকে -- রীতিমত বদলে গেছে সের্গেই। উৎসাহে-উদ্দীপনায় ফেটে পড়ছে সে। ভালিয়া বসতে না বসতেই সের্গেই সরাসরি কথাটা পাড়ল, 'শোন্ ভালিয়া, ব্যাপারটা হচ্ছে -- তোকে কমসোমলে যোগ দিতে হবে। সেটা কী জানিস না বুঝি? যুব কমিউনিস্ট লীগ। এখানে ওটার কাজকর্ম আমিই চালাচ্ছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা! দেখ্ তাহলে এটা।'

কাগজটা পড়ার পর ভালিয়া অবাক চোখে তাকালে ভাইয়ের দিকে, 'কমসোমলে এসে আমি কী করব?'

দু'হাত ছড়িয়ে সের্গেই বলল, 'বিস্তর কাজ করবার আছে, ভাই। এই আমাকেই দেখ না -- এতো কাজ করতে হয় যে রাতের পর রাত জাগতে হচ্ছে। প্রচার চালাতে হবে আমাদের। ইগ্নাতিয়েভা বলছেন, শিগগিরই থিয়েটার-ঘরটায় আমাদের এক সভার ব্যবস্থা করে সোভিয়েত রাজ সম্বন্ধে বলতে হবে। আমাকে বক্তৃতা দিতে বলছেন তিনি। এটা কিন্তু ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না -- বক্তৃতা কী করে দিতে হয়, কিছুই জানি না আমি। নির্ঘাত সব ঘুলিয়ে-টুলিয়ে ফেলব। আচ্ছা, তাহলে, তোর কমসোমলে আসার কী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কী জবাব দেব। মা তো একেবারে ক্ষেপে যাবে তাহলে।'

'মার জন্যে ভাবতে হবে না।' পীড়াপীড়ি করতে লাগল সের্গেই, 'মা তো এসব বোঝে না, শুধু ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে আগলে রাখতে পারলেই হল। কিন্তু সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তো মার কিছু বলার নেই। বরং মা তার পক্ষেই। কিন্তু মা চায় লড়াইটা করুক অন্য লোকের ছেলেরা। এটা কি ঠিক? ঝুখ্‌রাই কী বলেছিল আমাদের, মনে আছে তো? আর পাভেলকে দেখ্—সে তো তার মায়ের কথা ভেবে ইতস্তত করে নি। এখন সময় এসে গেছে আমাদের উচিত মতো বেঁচে থাকবার জন্য। তুই নিশ্চয়ই নারাজ হবি না, ভালিয়া! কী চমৎকার হবে ভেবে দেখ্। তুই মেয়েদের মধ্যে কাজ করবি আর আমি কাজ চালাব ছেলেদের নিয়ে। ভালো কথা মনে পড়ল—আমি আজই ওই লাল-চুলো ক্লিমকা শয়তানটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব। কী বলিস, ভালিয়া? তুই তাহলে আসছিস আমাদের দলে, না কি? এই ছোট্ট বইটা আছে আমার কাছে—এর মধ্যেই সব বলা আছে।'

কমসোমলের নিয়ম-কানুন ছাপা সেই পুস্তিকাটি পকেট থেকে বের করে সের্গেই ভালিয়াকে দিল।

ভাইয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে ভালিয়া নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পেৎলিউরা যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে?'

এই প্রশ্নটা এ পর্যন্ত সের্গেইয়ের মনে আসে নি। দু'-এক মুহূর্ত সে কথাটা ভেবে নিল। তারপর বলল, 'আর সবার সঙ্গে তাহলে আমাকেও অবশ্য শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু তোর কী হবে? হ্যাঁ, তাহলে মা ভয়ানক কষ্ট পাবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে।

'আচ্ছা সেরিওঝা, মাকে বা আর-কাউকে কিছু না জানিয়ে তুই আমাকে কমসোমলের সভ্য করে নিতে পারিস না? শুধু

তুই জানবি আর আমি জানব? আমি সব কাজে সাহায্য করব। সেইটেই সবচেয়ে ভাল হবে।'

'হ্যাঁ, তোর কথাটা ঠিক মনে হচ্ছে, ভালিয়া।'

এমন সময়ে ইগ্নাতিয়েভা ঘরে ঢুকল।

'কমরেড ইগ্নাতিয়েভা, এ আমার বোন ভালিয়া। আমি এইমাত্র ওকে কমসোমলে যোগ দেবার কথা বলছিলাম। কমসোমলের সভ্য হিসেবে ও বেশ ভালোই হবে, কিন্তু আমাদের মা গন্ডগোল বাধাতে পারে। কাউকে না জানিয়ে কি ওকে সভ্য করে নেওয়া যেতে পারে? আমাদের শহর ছেড়ে দিতে হতেও পারে, জানেনই তো। আমি অবশ্য ফৌজের সঙ্গে চলে যাব, কিন্তু ভালিয়ার তখন ভয়—মা বড় মুশকিলে পড়বে।'

টেবিলের এক ধারে বসে ইগ্নাতিয়েভা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল কথাটা। সের্গেইয়ের সঙ্গে সে একমত হল, 'হ্যাঁ, সেইটেই সবচেয়ে ভালো হবে।'

সারা শহর জুড়ে যে পোস্টার লাগানো হয়েছে, তারই আহ্বানে কিশোর-কিশোরীরা এসে ভর্তি করে তুলেছে থিয়েটার-ঘরটা, তাদের উত্তেজিত কলরবে জায়গাটা মুখর। চিনি-কলের শ্রমিকদের ঐকতান-বাদন চলেছে। সমবেত শ্রোতার দলে আছে প্রধানত স্থানীয় ইস্কুল তিনটির ছাত্র-ছাত্রীরা—সভায় বক্তৃতা শোনার চেয়ে শেষের দিকে যে অভিনয় হবে, সেইটার প্রতিই তাদের বেশি আগ্রহ।

শেষ পর্যন্ত পর্দা উঠল। উয়েজ্‌দ্‌ পার্টি কমিটির সম্পাদক কমরেড রাজিন এইমাত্র শেপেতোভ্‌কায় এসে পেঁছেছে। সে মঞ্চের ওপরে আসতেই সকলের চোখ গিয়ে পড়ল এই খাটো ছিপছিপে গড়নের ছোট তীক্ষ্ম নাকওয়ালা মানুষটির

দিকে। সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার বক্তৃতা শুনল। গোটা দেশ জুড়ে যে সংগ্রামের জোয়ার জেগেছে তার কথা বলে সে দেশের তরুণদের আহ্বান জানাল কমিউনিস্ট পার্টির চারদিকে সমবেত হবার জন্যে। অভিজ্ঞ বক্তার মতোই সে বক্তৃতা দিয়ে গেল, 'গোঁড়া মার্কসবাদী', 'সোশ্যাল-শোভিনিস্ট' ইত্যাদি কতকগুলো কথা সে একটু বেশি বলল, এ সব কথা শ্রোতারা ঠিক বুঝে উঠছিল না। তবু, তার বক্তৃতার শেষে সবাই তাকে উচ্ছ্বসিত হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। তারপর, তার পরবর্তী বক্তা সেগেইকে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল।

সেগেই যা ভয় করেছিল, ঠিক তাই হল: শ্রোতাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে ভেবে পেল না কী বলবে। থতমত খেয়ে গেল প্রথমটায়।

এমন সময়ে ইগ্নাতিয়েভা তাকে উদ্ধার করল: টেবিলের সামনে নিজের আসন থেকে সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কমসোমলের একটা 'সেল্' গড়ে তোলার কথা এদের বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে সেগেই তার বক্তব্যটা সরাসরি পাড়ল।

'কমরেডসব, যা বলার তা তোমরা সবই শুনেছ। আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা 'সেল্' গড়ে তোলা। প্রস্তাবের পক্ষে কারা?'

একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল শ্রোতাদের মধ্যে। উস্তিনোভিচ এগিয়ে এল সাহায্য দেবার জন্য: দাঁড়িয়ে উঠে সে বলে গেল মস্কোর তরুণরা কীভাবে সংগঠিত হয়ে উঠছে। সেগেই সসংকোচে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

'সেল্' গড়ে তোলার প্রস্তাবটায় শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে রাগ জমে উঠছিল তার। ভ্রূকুটি করে সে তাকিয়ে ছিল সভার দিকে। উস্তিনোভিচের কথায় শ্রোতারা বিশেষ

কান দিচ্ছে বলে মনে হয় নি। সের্গেই দেখতে পেল—বক্তৃতামঞ্চে উস্তিনোভিচের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে জালিভানভ কী যেন ফিসফিসিয়ে বলল লিজা সুখারকোকে। হাই ইস্কুলের ওপরের শ্রেণীর মেয়েরা পাউডার-মাখা মুখে সামনের সারিতে বসে আশেপাশে তির্যক চোখে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। এক কোণে মঞ্চে উঠবার সিঁড়ির কাছে একদল লাল ফৌজের ছেলে বসে আছে—তাদের মধ্যে সেই তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটিকে সের্গেই দেখতে পেল। মঞ্চের প্রান্তটার ওপরে বসে সে অস্বস্তির সঙ্গে উসখুস করছে আর খোলাখুলি ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে দেখছে জাঁকালো পোশাক-পরা লিজা সুখার্কো আর আন্না আদ্মোভস্কায়াকে—এরা দু'জনে তখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে তাদের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে দিব্যি গলপ জমিয়ে তুলেছে।

কেউ তার কথায় কান দিচ্ছে না বুঝতে পেরে উস্তিনোভিচ তাড়াতাড়ি তার বক্তব্য শেষ করে নিয়ে বসে পড়ল। এর পর বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল ইগ্নাতিয়েভা। তার ধীর-স্থির বক্তৃতার প্রভাবে অস্থির শ্রোতারা এবার মনোযোগী হয়ে উঠল।

ইগ্নাতিয়েভা বলল, 'কমরেডসব, আজ এখানে যেসব কথা তোমাদের বলা হল, সেগুলো তোমাদের প্রত্যেককে আমি ভেবে দেখতে বলছি। আমি নিশ্চয় জানি, তোমাদের মধ্যে বেশ কিছুজন শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় না থেকে বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। তোমাদের জন্যে দরজা সব সময়েই খোলা—যা হয় তোমরাই ঠিক করো। তোমাদের মতামত কী তাও আমরা জানতে চাই। কারুর কিছু বলার থাকলে, তাকে মঞ্চের ওপরে এসে বলার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

আরেকবার নিস্তব্ধতা নেমে এল হল-ঘরে। তারপর পেছনের

দিক থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'আমি কিছু বলতে চাই!'

অল্প ট্যারা-চোখ আর বাচ্চা ভালুকের মতো চেহারার মিশা লেভচুকভ নামে একটি ছেলে মঞ্চের ওপর উঠে এসে বলল, 'ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে বলশেভিকদের সাহায্য করাই আমাদের উচিত। আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। সেরিওঝ্‌কা আমাকে জানে। আমি কমসোমলের সভ্য হব।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সের্গেইয়ের মুখ।

হট্‌ করে মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখলে তো কমরেডরা! আমি বরাবর বলে এসেছি—মিশা আমাদের একজন। ওর বাবা ছিলেন রেল-লাইনের পয়েণ্টস্‌ম্যান, গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেলেন, আর তাই মিশার আর লেখাপড়া শেখা হয়ে উঠল না। কিন্তু এই রকমের সময়ে কী করা দরকার সেটা বুঝবার জন্যে মিশার হাই ইস্কুলে পড়তে যাবার প্রয়োজন হয় নি।'

দারুণ একটা হৈ-হল্লা উঠল হলের মধ্যে। সযত্নে বুরুশ-করা চুল-ওয়ালা একটি তরুণ কিছু বলতে চাইল। ওকুশেভ্‌ তার নাম—স্থানীয় এক ওষুধের দোকানওয়ালার ছেলে, হাই ইস্কুলের ছাত্র। কোর্তাটা টেনে ধরে সে শুরু করল, 'মাপ করবেন, কমরেডরা। আমাদের কী করতে বলা হচ্ছে সেইটেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। আমাদের কি রাজনীতি করতে বলা হচ্ছে? তা যদি হয়, তাহলে পড়াশোনা করব কখন? ইস্কুলটা তো ডিঙোতে হবে আমাদের। এটা যদি কোনো খেলাধুলোর সমিতি বা ক্লাব গড়ে তোলার ব্যাপার হত, যেখানে জড়ো হয়ে আমরা পড়াশোনা করতে পারতাম, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে ঢোকা মানে, পরে ফাঁসকাঠে ঝোলার ঝুঁকি নেওয়া। মাপ করবেন, কিন্তু এতে কেউ রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না।'

একটা হাসির রোল উঠল হলঘরে। ওকুশেভ্ মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে আবার তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। পরবর্তী বক্তা সেই তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটি। সক্রোধে কপালের ওপর টুপিটা টেনে নামিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এতো হাসি কিসের, জানোয়ার যতো-সব?'

চোখ দুটো তার দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লা, রাগে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। সজোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে সে বলে চলল, 'ইভান ঝার্কি আমার নাম। বাপ-মা কেউ নেই আমার, বাড়িঘর বলতেও কিছু ছিল না কখনও। রাস্তার ধারে বড়ো হয়ে উঠেছি, রুটির টুকরো ভিক্ষে মেগে ফিরেছি আর বেশির ভাগ দিন কেটেছে উপোস দিয়ে। কুকুরের জীবন কেটেছে আমার—সে জীবন সম্বন্ধে তোমরা, মায়ের আদুরে গোপালরা, কিছুই জানো না। তারপরে, সোভিয়েত রাজ কায়েম হল—লাল ফৌজের লোকেরা আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে দেখাশোনা করতে লাগল। পুরো একটা পল্টন আমাকে তাদের পোষ্য হিসেবে নিয়েছে—জামাকাপড় দিয়েছে, লিখতে পড়তে শিখিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা: আমি যে একজন মানুষ—সেই শিক্ষা তারা আমায় দিয়েছে। তাদের জন্যেই আমি আজ বলশেভিক হয়ে উঠেছি এবং মরবার দিনটি পর্যন্ত আমি বলশেভিক থাকব। আমি হাড়ে হাড়ে জানি আমরা লড়াই করছি কিসের জন্যে—আমাদের লড়াই আমাদের মতো এইসব গরিব মানুষদের জন্যে, মজুরদের রাজের জন্যে। তোমরা তো এখানে বসে বসে দাঁত বের করে হাসছ, আর ওদিকে যে এই শহরের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে দু'শো জন কমরেড মারা পড়েছে সেটা তোমরা জানো না...' বলতে বলতে ঝার্কির গলা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল টানটান করে বাঁধা বেহালার

তারের মতো, 'প্রাণ দিয়েছে তারা আমাদের সুখের জন্যে, আমাদের আদর্শের জন্যে... দেশের সর্বত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে—প্রত্যেকটি লড়াইয়ের মোর্চায়, আর তোমরা এদিকে নাগরদোলায় চেপে ফুর্তির খেলায় মেতে আছো। কমরেডসব!'—হঠাৎ সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের দিকে ফিরে বলে উঠল সে, 'আপনারা এদের এসব কথা শুনিয়ে বৃথাই সময় নষ্ট করছেন,' হল-ঘরের দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দেখাল সে, 'এরা সব আপনাদের কথা বুঝবে ভেবেছেন? মোটেই না! খালিপেটের সঙ্গে ভরপেটের মিতালি নেই। মাত্র একজন আজ এখান থেকে এগিয়ে এসেছে, তার কারণ সেও অনাথ, গরিবদেরই একজন।' সভার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠল সে, 'মরুক গে যাক্! তোমাদের না হলেও আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার জন্যে আমরা হাতজোড় করব না তোমাদের কাছে—জাহান্নমে যাও তোমরা সবশুদ্ধ! একমাত্র মেশিনগানের মারফতই তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যেতে পারে!' হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ কথা চেঁচিয়ে বলে সে মঞ্চ থেকে নেমেই কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল বেরিয়ে যাবার দরজাটার দিকে।

সভাপতিমণ্ডলীর কেউ অভিনয়ের জন্যে রইল না।

বিপ্লবী কমিটিতে ফেরার পথে সের্গেই ক্লোভের সঙ্গে বলল, 'সব ভণ্ডুল হয়ে গেল! ঝার্কি ঠিকই বলেছে। ওই হাই ইস্কুলের ছেলেমেয়ের পাল নিয়ে আমরা কিছু করে উঠতে পারব না। শুধু হয়রানির চোটে রাগে পাগল হওয়াই সার হবে!'

ইগ্নাতিয়েভা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখানে প্রলেতারিয়ান তরুণরা আসেই নি বলতে গেলে। বেশির ভাগই এসেছে এখানকার মধ্যবিত্ত ঘরের কিংবা

বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েরা—যতো সব চালিয়াত চ্যাংড়া ফিলিস্টাইন। তোমাকে ওই চিনি-কল আর করাত-কলের মজুরদের মধ্যে কাজ চালাতে হবে। তবে, এ সভাটা যে একেবারেই কোনো কাজের হয় নি, তা নয়। ছাত্রদের মধ্যে কিছু খুব ভালো কমরেড যে আছে সেটা দেখতে পাবে।'

উস্তিনোভিচ ইগ্নাতিয়েভার সঙ্গে একমত হল। সে বলল, দেখো সেরিওঝা, আমাদের আদর্শটাকে, আমাদের স্লোগানগুলোকে প্রত্যেকের মনে ঢোকানো আমাদের কাজ। প্রত্যেকটি নতুন ঘটনার তাৎপর্যের দিকে পার্টি সমস্ত মেহনতী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের বহু সভা, সম্মেলন, কংগ্রেস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনীতিক বিভাগ রেল-স্টেশনে একটা গ্রীষ্মকালীন থিয়েটার খুলবে। দু'চার দিনের মধ্যেই একটা প্রচারের ট্রেন এখানে এসে পড়ার কথা—তখন আমাদের উঠে-পড়ে লাগতে হবে কাজে। লেনিনের কথাটা মনে করে দেখো: জনগণকে, কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষকে সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে না পারলে আমরা জয়ী হতে পারব না।'

সেদিন রাত্রে সের্গেই উস্তিনোভিচকে স্টেশনে পেঁছে দিতে গেল। বিদায় নেবার সময় সে দৃঢ় মুঠোয় উস্তিনোভিচের হাতখানা একটু বেশিক্ষণের জন্যেই চেপে ধরে রইল। উস্তিনোভিচের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেশ খেলে গেল।

ফেরবার পথে সের্গেই নিজের বাড়িতে এল সবার সঙ্গে দেখা করতে। নিঃশব্দে সে মায়ের তিরস্কার শুনে গেল, কিন্তু তার বাবাও যখন বকাবকিতে যোগ দিলেন, তখন সের্গেই এমনভাবে প্রতি-আক্রমণ শুরু করল যে বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেল জাখার ভাসিলিয়েভিচ্।

'আচ্ছা, শোনো বাবা, এই শহর জার্মানদের হাতে থাকার

সময়ে তুমি যখন ধর্মঘট করেছিলে আর রেল-ইঞ্জিনের সেই সান্ত্রীটাকে মেরে ফেলেছিলে, তখন তুমি তোমার পরিবারের কথা ভেবেছিলে, না, ভাবো নি? নিশ্চয় ভেবেছিলে—কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি যে পিছপাও হও নি, তার কারণ তোমার শ্রমিকের বিবেক তোমাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গেছে। আমিও পরিবারের কথা ভেবেছি। খুব ভালোভাবেই আমি জানি যদি আমাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাহলে আমার জন্যে তোমাদের ওপরে অত্যাচার চলবে। এদিকে আমরা জিতলে আমরাই শাসন চালাব। কিন্তু তবু, বাড়িতে বসে থাকতে তো পারি না। তুমি নিজেই সব বোঝো, বাবা। তবে আর এতো ঝামেলা কিসের? আমি একটা ভালো কাজে নেমেছি—বকাঝকা না করে তোমার তো আমাকে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। এসো বাবা, আমরা একটা বোঝাপড়া করে নিই, তাহলে মা-ও আর আমাকে বকুনি দিতে আসবে না।' বাবার দিকে স্বচ্ছ নীল চোখে তাকিয়ে থেকে সের্গেই স্নেহের হাসি হাসল, সে যে ঠিক কথাই বলছে এ সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

অস্বস্তির সঙ্গে বেঞ্চিটার ওপরে নড়েচড়ে বসল জাখার ভাসিলিয়েভিচ, তারপরে তার ঝাঁকড়া গোঁফ আর খোঁচা দাড়ির আড়ালে মৃদু হাসির ফাঁকে বেরিয়ে এল হলদে দাঁতগুলো।

'শ্রেণী-চেতনার কথাটথা এর মধ্যে টেনে আনছিস, অ্যাঁ, হতভাগা ছোঁড়া। ওই পিস্তলটা বাগিয়ে বেড়াস বলে ভেবেছিস বুঝি আমি তোকে একচোট ধোলাই না দিয়েই ছেড়ে দেব, অ্যাঁ?'

কিন্তু তার গলার স্বরে বিন্দুমাত্র রাগের চিহ্ন নেই। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে তার গিঁঠে-পড়া হাতখানা ছেলের দিকে

বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে রে সেরিওঝা, তোর কাজ তুই চালিয়ে যা। একবার চাবুক হাঁকিয়েছিস যখন, তখন আমি আর রাশ টেনে ধরব না। কিন্তু দেখিস, আমাদের একেবারেই ভুলে যাস না, মাঝে মধ্যে এসে দেখাটেখা করে যাস।'

রাত্রি। বিপ্লবী কমিটির একটা আলোচনা-সভা বসেছে। দরজাটার একটা ফাটল দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির ওপরে। মখমলের গদি-আঁটা দামী চেয়ার আর আসবাবপত্রে সাজানো বড়ো ঘরটার মধ্যে উকিল লেশ্চিনস্কির বিরাট টেবিলের ধারে বসেছে পাঁচ জন: দোলিন্নিক, ইগ্নাতিয়েভা, 'চেকা'র কর্তা তিমোশেঙ্কো—পশমের কসাক-টুপি মাথায় তাকে দেখাচ্ছে কির্‌গিজের মতো, রেলকর্মী শুদিক্—দৈত্যের মতো দেহখানা তার, আর, ডিপোর শ্রমিক, ভোঁতা-নাক ওস্তাপ্‌চুক।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইগ্নাতিয়েভার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলে চলল দোলিন্নিক, 'যুদ্ধসীমান্তে সরবরাহ দিতেই হবে। শ্রমিকদের খেতে হবে তো। আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানদাররা আর চোরাবাজারিরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে জিনিসপত্রের। সোভিয়েত মুদ্রা ওরা নিতে চায় না। এখানে চালু শুধু পুরোনো জার-আমলের মুদ্রা, আর না হয় কেরেনস্কি সরকারের কাগজের নোট। আজ আমাদের বসে সব জিনিসের দাম বেঁধে ফেলতে হবে। এটা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে মুনাফাখোররা কেউই ওই বাঁধা দামে জিনিস বেচবে না। যা আছে সব লুকিয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আমরাও খানাতল্লাশি চালিয়ে রক্তচোষাদের মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত করে নেব। এখন আর

ভালোমানুষি চলবে না। শ্রমিকদের আমরা আর উপোস করিয়ে রাখতে পারি না। কমরেড ইগ্নাতিয়েভা আমাদের সাবধান করছেন যাতে বাড়াবাড়ি না করে ফেলি। এটা বুদ্ধিজীবীদের দুর্বলচিত্তের পরিচয় বলেই আমার মনে হয়। রাগ কোরো না, জোয়া, আমি বুঝেই কথা বলছি। যাই হোক, এটা খুদে-ব্যাপারীদের ব্যাপার নয় --আজ খবর পেলাম, সরাইখানাওয়ালা বরিস জোন্-এর বাড়িতে একটা চোরাই গুদাম আছে—পেৎলিউরার দলবল আসার আগে থেকেই বড়ো বড়ো দোকানদাররা প্রচুর মাল সেখানে লুকিয়ে রেখেছে।' একটু থেমে দোলিন্নিক তিমোশেঙ্কোর দিকে একটা তির্যক বিদ্রুপভরা চাউনি হানল।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তিমোশেঙ্কো জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানলে?' এ খবরটা আসলে তিমোশেঙ্কোরই রাখার কথা, কিন্তু দোলিন্নিক যে তার চেয়ে বেশি খবরাখবর রাখে— এটা জেনে সে একটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

চাপা হেসে বলল দোলিন্নিক, 'সব খবরই রাখি, ভাই। এই গুদামের কথাটা ছাড়াও, এও আমি জানি যে কাল তুমি আর ডিভিশন-কম্যান্ডারের মোটরচালক দু'জনে মিলে আধ-বোতল 'সামোগন' উড়িয়েছ।'

তিমোশেঙ্কো নড়েচড়ে বসল তার চেয়ারে, একঝলক রক্ত উঠে এল তার ফ্যাকাসে মুখে।

নিজের অজানতেই দোলিন্নিককে তারিফ জানাল সে, 'দারুণ লোক দেখছি!' কিন্তু ইগ্নাতিয়েভার মুখেচোখে ব্যাপারটাকে অনুমোদন-না-করার ভ্রূকুটি দেখে সে থেমে গেল। বিপ্লবী কমিটির সভাপতি দোলিন্নিকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, 'এই ছুতোর-মিস্ত্রি হতভাগাটার দেখছি নিজেরই একটা 'চেকা' আছে!'

দোলিন্নিক বলে চলল, ‘সের্গেই ব্রুঝাক বলেছে আমায়। স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কাজ করত এমন একটি ছেলেকে সে জানে। সেই ছেলেটাই রেস্তোরাঁর রাঁধুনিদের কাছে শুনেছিল যে ওদের যখন যা দরকার হয় সবই প্রচুর পরিমাণে বরিস জোন্ আগে তাদের জোগান দিত। গতকাল সের্গেই ওই গুদামটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পেরেছে। এখন শুধু সেটা ঠিক কোন্ জায়গায় সেইটেই বের করার ওয়াস্তা। ছেলেদের এখুনি কাজে লাগিয়ে দাও, তিমোশেঙ্কো, সের্গেইকে-ও। যদি ভাগ্যক্রমে মিলে যায়, তাহলে শ্রমিকদের আর গোটা ডিভিশনটাকে খাবার জিনিসপত্র সবই সরবরাহ করতে পারা যাবে।’

আধঘণ্টা বাদে আটজন সশস্ত্র মানুষ সরাইখানাওয়ালার বাড়িতে ঢুকল। সদর দরজায় পাহারায় থাকল দু'জন।

বেঁটে-খাটো, তাগড়া পিপের মতো গোল শরীর মালিকের, একটা পা কাঠের, খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি-ভর্তি মুখ। বিনয়ের অবতার সেজে সে এগিয়ে এল আগন্তুকদের কাছে। ভাঙা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, ‘কী খবর, কমরেডরা? আসাটা একটু দেরিতে হয়ে গেল না?’

জোন্-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়েরা, তারা তাড়াতাড়ি কোনোক্রমে ড্রেসিং-গাউন পরে নিয়েছে, তিমোশেঙ্কোর টর্চের উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করছে। পাশের ঘরটা থেকে ভেসে আসছে জোন্-এর মুটকী বউয়ের ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ, তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরছে সে।

‘আমরা বাড়িটা খানাতল্লাশি করতে এসেছি।’ সংক্ষেপে বলল তিমোশেঙ্কো।

তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হল গোটা বাড়ির মেঝেটা। চ্যালা কাঠের উঁচু স্তূপে বোঝাই একটা বিরাট গোলাঘর,

গোটা কতক ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর আর একটা বড়ো তলের ভাঁড়ার — সবই সযত্নে খুঁজে দেখা হল। কিন্তু কোথাও চোরা গুদামের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে একজন ঝি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা যে সে এদের ঘরে ঢোকাটা টের পায় নি। সের্গেই আস্তে করে তাকে জাগাল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাজ করো এখানে?'

ঘুমভরা চোখে হকচকিয়ে গিয়ে মেয়েটা তার কাঁধের ওপর কম্বলটা টেনে দিয়ে আলো থেকে হাত দিয়ে আড়াল করল তার চোখ দুটো। বলল, 'হ্যাঁ। তোমরা কারা?'

তার কথার উত্তর দিয়ে সের্গেই তাকে জামা-কাপড় পরে নিতে বলে বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে।

তিমোশেঙ্কো এদিকে প্রশস্ত খাবার-ঘরটায় জেরা করছে সরাইখানার মালিকটাকে।

থুতু ছিটিয়ে দারুণ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে লোকটা, 'কী চান আপনারা? আমার আর-কোনো ভাঁড়ার-গুদাম নেই। আমি বলছি, বৃথাই সময় নষ্ট করছেন আপনারা। হ্যাঁ, এক সময়ে আমার একটা সরাইখানা ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং আমি একেবারে গরিব। পেৎলিউরার দলবল আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে, প্রায় মেরেই ফেলেছিল আর একটু হলে। সোভিয়েত রাজ কায়েম হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু এই আমার সম্পত্তি বলতে যা-কিছু, সবই আপনাদের চোখের সামনে।' মোটা খাটো হাত দুটো ছড়িয়ে ধরল সে আর সমস্তক্ষণ তার লাল চোখ দুটো 'চেকা'র কর্তার মুখ থেকে সের্গেইয়ের মুখের দিকে আর সেখান থেকে এক কোণে আর ছাদের দিকে ঘুরে ফিরে যেতে লাগল।

ঠোঁট কামড়ে ধরল তিমোশেঙ্কো।

'বলবেন না তাহলে? এই শেষবারের মতো হুকুম দিচ্ছি আপনাকে, কোথায় সেই গুদামটা দেখিয়ে দিন।'

সরাইখানা-মালিকের বউটা এবার আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমাদের নিজেদেরই কিছু খাবার নেই, কমরেড অফিসার। যা ছিল সব ওই পেৎলিউরার লোকজন নিয়ে গেছে।' কান্নার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পেরে উঠল না কাঁদতে।

সের্গেই বলে উঠল, 'খেতে পান না বলছেন, এদিকে তো ঝি রেখেছেন দেখছি।'

'ও তো ঝি নয়—গরিব মেয়ে একটা, কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই থাকে। খৃস্তিনার নিজের মুখেই শোনো।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তিমোশেঙ্কোর। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আচ্ছা, বেশ, এবার তাহলে আমাদের উঠেপড়ে লাগতেই হচ্ছে!'

দিনের আলো ফুটল। তল্লাশি চলেছে তখনও। তেরো ঘণ্টা ধরে বৃথা খোঁজাখুঁজির পর ক্লান্ত হতাশ তিমোশেঙ্কো যখন চলে যাবে বলে মনস্থ করেছে, ঠিক সেই সময়ে ঝি-মেয়েটির ঘরটা খোঁজা শেষ করে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে সের্গেই তার পেছনে মেয়েটির ক্ষীণ ফিসফিসানি শুনল, 'রান্নাঘরে উনুনটার ভেতরে একবার দেখো গে।'

দশ মিনিট বাদেই সেই ভেঙে-ফেলা রুশ চুল্লীটার ফাঁকে একটা লোহার চোরা-দরজার সন্ধান পাওয়া গেল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশ-মণ-ভারবাহী একটা লরি পিপে আর বস্তায় বোঝাই হয়ে রওনা হয়ে গেল সরাইখানাটা থেকে। ততক্ষণে বাড়িটাকে ঘিরে উৎসুক এক জনতার ভিড় জমে উঠেছে।

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা করচাগিনা গরমকালে একদিন বাড়ি ফিরে এল তার জিনিসপত্রের ছোট্ট পুঁটুলিটা নিয়ে।

পাভেলের ঘটনাটা আরতিওমের কাছে শুনে ভয়ানক কান্নাকাটি করল সে। জীবনটা এখন তার কাছে শূন্য আর নিরানন্দ হয়ে উঠেছে। টাকা-পয়সা ছিল না, কাজের চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে তাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সে লাল ফৌজের লোকদের জামা-কাপড় কেচে দেবার জন্যে বাড়িতে আনা শুরু করল, তারা তাকে মজুরি বাবদ নগদ পয়সার বদলে সৈন্যদের জন্যে বরাদ্দ খাবার দেয়।

একদিন সে জানলার বাইরে আরতিওমের পায়ের শব্দ শুনল--শব্দটা যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু দ্রুত। দরজাটা ঠেলে চৌকাঠের ওপর থেকেই আরতিওম জানাল, 'পাভকার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।'

পাভেল লিখেছে:

'প্রিয় ভাই আরতিওম, আমি বেঁচে আছি, তবে খুব একটা ভালো নই। কোমরের নিচে একটা গুলি বিঁধেছিল, অবশ্য এখন সেরে উঠছি ক্রমশই। ডাক্তার বলছেন, হাড়টা অক্ষতই আছে। সুতরাং আমার জন্যে ভেবো না, ঠিক হয়ে উঠব আমি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি হয়ত ছুটি পাব, তখন কিছুদিনের জন্যে একবার বাড়ি যাব। আমি মার ওখানে যাবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি। আমি কমরেড কতোভ্স্কি-পরিচালিত ঘোড়সওয়ার-বাহিনীতে ঢুকেছি। তুমি তাঁর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই, বীরত্বের জন্যে বিখ্যাত তিনি। তাঁর মতো লোক আমি আর দেখি নি, আমাদের এই কম্যান্ডার কতোভ্স্কির প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা জন্মেছে। মা কি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরেছেন? ফিরে থাকলে তাঁকে আমার ভালোবাসা জানিও। আমার জন্যে তোমার যা যা অসুবিধে ঘটেছে, তার জন্যে মাপ কোরো। ইতি, তোমার ভাই পাভেল।

'পুনশ্চ: আরতিওম, দয়া করে বনপরিদর্শকের বাড়ি গিয়ে এই চিঠিটার কথা একবার বলে এসো।'

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা পাভেলের চিঠিখানা নিয়ে অনেক চোখের জল ফেলল। মাথা-মোটা ছোঁড়াটা হাসপাতালের ঠিকানাটুকু পর্যন্ত জানায় নি।

স্টেশনের যে সবুজ-রঙের রেল-গাড়িটার গায়ে লেখা আছে 'রাজনীতিক বিভাগের আন্দোলন ও প্রচার-দপ্তর', সের্গেই আজকাল সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত করে। প্রচার ও আন্দোলন বিভাগের এই গাড়ির একটা কামরায় উস্তিনোভিচ আর মেদভেদেভার অফিস। সের্গেই এলেই তাকে দেখে মেদভেদেভা ঠোঁটে সদাসর্বদা ধরে থাকা সিগারেটের ফাঁকে কৌতুকের হাসি হাসে।

রিতা উস্তিনোভিচের সঙ্গে জেলা কমসোমল কমিটির সম্পাদকের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। উস্তিনোভিচের সঙ্গে প্রতিবার কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর চলে আসার সময়ে বই আর কাগজপত্রের বাণ্ডিল ছাড়াও অস্পষ্ট একটা খুশির অনুভূতিও সের্গেই বয়ে আনে মনে মনে।

রাজনীতিক বিভাগের খোলা থিয়েটারটায় প্রতিদিন বিস্তর শ্রমিক আর লাল ফৌজের লোকের সমাবেশ হচ্ছে। বারো নম্বর আর্মির প্রচার-ট্রেনটা সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল রঙের পোস্টার সেঁটে স্টেশনের একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই কর্মমুখর সেটা। ভেতরে একটা ছাপাখানা বসানো হয়েছে, সেখান থেকে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে ছেপে বেরিয়ে আসছে খবরের কাগজ, পুস্তিকা, ঘোষণাপত্র, ইত্যাদি। লড়াইয়ের ফ্রণ্ট এখান থেকে কাছাকাছিই।

একদিন বিকেলে সের্গেই থিয়েটারে হঠাৎ এসে পড়ে একদল লাল ফৌজের লোকের সঙ্গে রিতাকে দেখতে পেল। সেদিন রাত্রে স্টেশনে রাজনীতিক বিভাগের লোকদের থাকার জায়গায় রিতাকে পেঁছে দেবার সময় সের্গেই হঠাৎ বলে ফেলল, 'কমরেড রিতা, সব সময়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে কেন বলো তো? তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, এতো ভালো লাগে! তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর প্রতিবারই মনে হয় যেন আমি একটানা চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করে যেতে পারি।'

রিতা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'দেখো, কমরেড ব্রুঝাক, এসো একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক: আর কখনো এমন ধারা কাব্যি করে কথা বোলো না যেন। ওসব আমি পছন্দ করি নে।'

ধমক-খাওয়া ইস্কুলের ছেলের মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সের্গেই বলল, 'আমি তো সেরকম কিছু বলি নি। ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু দু'জনে... আমি তো প্রতিবিপ্লবী কোনো কথা বলি নি, বলেছি কি? বেশ, কমরেড উস্তিনোভিচ, আমি তেমন আর একটা কথাও বলব না!'

তাড়াতাড়ি কোনো রকমে রিতার করমর্দন করেই সে বিদায় নিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে গেল শহরের দিকে।

কয়েকদিন স্টেশনের দিকে আর সের্গেই যায় নি। ইগ্নাতিয়েভা তাকে আসতে বললেও সে কাজে ব্যস্ততার দোহাই পেড়ে গেল না। সত্যিই তার কাজ ছিল বিস্তর।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে শুদিক্ গুলিতে আহত হল। যে-রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল, সেই পাড়াটায় চিনিকলের ওপরওয়ালা পোলিশ কর্তাব্যক্তিদেরই বেশির ভাগ বসবাস। খানাতল্লাশি চালিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর 'তীরন্দাজ' নামে একটি পিলসুদ্স্কি সংগঠনের কাগজপত্র পাওয়া গেল।

বিপ্লবী কমিটিতে একটা সভা ডাকা হয়েছিল। উস্তিনোভিচ উপস্থিত ছিল। সে একপাশে সের্গেইকে ডেকে শান্ত গলায় বলল, 'তোমার ফিলিস্টাইন আত্মাভিমানে ভারি ঘা লেগেছে দেখছি? ব্যক্তিগত ব্যাপার টেনে এনে তুমি তোমার কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাও? তা চলবে না, কমরেড।'

অতএব সের্গেই আবার আগেকার মতো স্টেশনে সেই সবুজ-রঙের রেল-গাড়িটায় যাতায়াত শুরু করল।

একটা উয়েজ্‌দ্‌-সম্মেলনে উপস্থিত ছিল সের্গেই। দু'দিন ধরে জোরালো তর্কবিতর্কে যোগ দিল সে। তারপর তৃতীয় দিনে সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেল নদীর ওপারে বনের মধ্যে—পুরো একটা দিন-রাত্রি কাটল সেখানে একটা বোম্বেটে দলের সঙ্গে লড়াই করে। এই দলটার নেতা জারুদ্‌নি নামে পেৎলিউরার একজন সামরিক অফিসার।

ফিরে এসে ইগ্নাতিয়েভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে উস্তিনোভিচ্‌কেও দেখতে পেল সে। পরে তাকে স্টেশনে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে বিদায় নেবার সময়ে সে তার হাতখানা জোরে চেপে ধরল।

উস্তিনোভিচ রেগে টেনে ছাড়িয়ে নিল হাতখানা। আবার সের্গেই প্রচার-আন্দোলনের রেলগাড়িটায় যাতায়াত বন্ধ করে দিল বেশ কিছু দিনের জন্যে, কাজ পড়লেও রিতাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তার এরকম ব্যবহারের জন্যে রিতা কৈফিয়ত চাইলে সে কাটা কাটা জবাব দেয়, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ কী? বললেই তো আমাকে হয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক, না হয় আত্মাভিমানী ফিলিস্টাইন, আর না হয় ওই রকম আর একটা কিছু বলে গাল দেবে।'

ককেশীয় 'লাল-পতাকা' অর্ডারপ্রাপ্ত ডিভিশনের ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল। রোদে পোড়া তিনজন কম্যান্ডার এসে উঠল বিপ্লবী কমিটিতে। তাদের মধ্যে লম্বা, ছিপছিপে, কোমরে পেটাই করা রুপোর পাতের বেল্ট আঁটা একজন সরাসরি দোলিন্নিকের কাছে এসে দাবি জানাল, 'এক-শো গাড়ি খড় চাই, কোনো ওজর চলবে না, যেমন করে হোক জোগাড় করে দিতেই হবে। ঘোড়াগুলো আমাদের না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে।'

সুতরাং খড় জোগাড় করে আনার জন্যে সের্গেইকে পাঠানো হল দু'জন লাল ফৌজের লোকের সঙ্গে। একটা গ্রামে একদল কুলাক্ তাদের আক্রমণ করল। লাল ফৌজের লোক দু'জনের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তারা নির্মম প্রহার দিয়ে ছাড়ল তাদের। ছেলেমানুষ বলে সের্গেইয়ের ঠেঙানিটা অল্পের ওপর দিয়ে গেল। গরিব চাষীদের কমিটির লোকজন তাদের তিনজনকে গাড়ি করে পেঁছে দিয়ে গেল শহরে।

একটা সশস্ত্র ফৌজীদলকে পাঠানো হল সেই গ্রামে। পরের দিনই খড় জোগাড় করা হল।

ব্যাপারটা বাড়িতে জানিয়ে সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলার ইচ্ছে ছিল না, তাই সের্গেই সেরে না ওঠা অবধি ইগ্নাতিয়েভার ওখানে থাকল। রিতা উস্তিনোভিচ তাকে এখানে দেখতে এসে সেই প্রথমবার তার হাত এমন নিবিড় আবেগে আর সস্নেহে চেপে ধরল যে সের্গেই নিজে হলে এরকম করতে সাহস করত না।

একদিন দুপুরবেলায় বেশ গরম পড়েছিল -- সের্গেই প্রচার-আন্দোলনের রেলগাড়িটায় এল রিতার সঙ্গে দেখা করতে। পাভেলের চিঠিখানা সে তাকে পড়ে শুনিয়ে তার

এই বন্ধুটির সম্বন্ধে কিছু বলল। বেরিয়ে আসার সময় পেছন ফিরে বলল, 'বনে গিয়ে একবার হ্রদটায় একটা ডুব দিয়ে নেব ভাবছি।'

কাজ করতে করতে মুখ তুলে রিতা বলল, 'একটু দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

আয়নার মতো মসৃণ আর শান্ত হ্রদটা। উষ্ণ টলটলে জলে আরামের আমন্ত্রণ।

রিতা হুকুম দিল, 'তুমি ওই রাস্তাটার ধারে দাঁড়াও গিয়ে। আমি এবার জলে নামব।'

সাঁকোটার পাশে একটা পাথরের উপর বসে সের্গেই সূর্যের দিকে তার মুখটা তুলে ধরল। পেছনে রিতার জলে ঝাঁপাঝাঁপির শব্দ তার কানে আসছে।

এমন সময়ে দেখতে পেল, প্রচার-ট্রেনের সামরিক কমিশার চুঝানিন আর তনিয়া তুমানভা রাস্তা বেয়ে হাত ধরাধরি করে আসছে। কেতাদুরস্ত চামড়ার কোমরবন্ধনী লাগানো অসংখ্য ফিতে আঁটা সুন্দর সামরিক উর্দি-পরা আর ক্রোম-চামড়ার মচমচে বুট পায়ে চুঝানিনকে দেখাচ্ছে দিব্যি চৌকস ছোকরা। তনিয়ার সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথা কইছে সে।

তনিয়াকে চিনল সের্গেই — এই মেয়েটিই তাকে পাভেলের চিঠি এনে দিয়েছিল। তনিয়াও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে -- যেন তাকে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছে। সামনাসামনি যখন এসে পড়ল ওরা, তখন সের্গেই পকেট থেকে পাভেলের চিঠিখানা বের করে তনিয়ার কাছে গিয়ে বলল, 'একটু শুনুন, কমরেড। আমার এই চিঠিটায় আপনারও কিছু সংস্রব আছে।'

চুঝানিনের কাছ থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে চিঠিটা নিল তনিয়া — পড়বার সময় তার হাতের মধ্যে কাগজের টুকরোটা

অল্প একটু কেঁপে গেল। সের্গেইকে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওর আর কোন খবর পেয়েছেন?'

'না।'

সেই মুহূর্তে রিতার পায়ের নিচে পাথরের নুড়িতে কড়মড় শব্দ বাজতেই চুঝানিন তাকে দেখে তনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, 'চলো, আমরা বরং চলে যাই।'

কিন্তু রিতার বিদ্রূপ আর ভর্ৎসনায় ভরা স্বরে থেমে পড়ল সে।

'কমরেড চুঝানিন! ট্রেনে ওরা আপনাকে সারাদিন ধরে খুঁজছে।'

বিরক্তিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুঝানিন কর্কশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে ছাড়াই ওরা চালিয়ে নেবে' খন।'

তনিয়া আর সামরিক কমিশারের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে রিতা শুকনো গলায় মন্তব্য করল, 'এই অকর্মাটাকে এতদিনে বিদায় করে দেওয়াই উচিত ছিল!'

ওক্‌গাছের বিরাট উঁচু মাথাগুলো হাওয়ার দমকে নাড়া খেয়ে গোটা বনটায় মর্মর ধ্বনি উঠেছে। হ্রদের বুক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা সতেজ মধুরতা। সের্গেই উঠে পড়ল জলে নামবার জন্যে।

সাঁতার কেটে ফিরে এসে দেখে, রাস্তার অদূরে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর রিতা বসে আছে।

কথা বলতে বলতে তারা বনের গভীরে চলে এল, লম্বা ঘন ঘাসে ভরা একটা ফাঁকা জায়গায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে বসল তারা। বনের মধ্যে নিবিড় প্রশান্তি। ওক্‌গাছগুলো কানাকানি করছে নিজেদের মধ্যে। নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে রিতা এক হাত বিছিয়ে নিল মাথার নিচে। লম্বা ঘাসের মধ্যে তার সুঠাম পা দুটি ঢাকা পড়ল।

হঠাৎ তার পায়ের দিকে চোখ পড়ল সের্গেইয়ের। রিতার ভালো করে তালি মারা বুটজোড়ার দিকে লক্ষ্য করে সে নিজের আঙুল বেরিয়ে পড়া জুতোর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

'হাসির কী দেখলে?' জিজ্ঞেস করল রিতা।

নিজের জুতোটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সের্গেই বলল, 'এ রকম বুট পরে আমরা লড়াই করব কী করে?'

জবাব দিল না রিতা। একটা ঘাসের শীষ কামড়াতে কামড়াতে সে অন্য কথা ভাবছে বলে বোঝা গেল। শেষে বলল, 'চুঝানিনটা অতি বাজে কমিউনিস্ট। আমাদের সমস্ত রাজনীতিক কর্মী ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে, ও কিন্তু নিজেরটা ছাড়া আর কারুর কথা ভাবে না। ও পার্টির মধ্যে দৈবাৎ এসে ঢুকেছে... ফ্রন্টের অবস্থাটা এদিকে সত্যিই খুব গুরুতর। এখনও দীর্ঘ আর প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমাদের দেশকে।' একটু থেমে আবার বলল, 'কথা আর বন্দুক -- এই দুই দিয়েই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সের্গেই। কমসোমলের শতকরা পঁচিশ জন সভ্যকে ফৌজে যোগ দিতে হবে — কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত শুনেছ তো? আমার মনে হয়, এখানে আর বেশি দিন থাকার মেয়াদ আমাদের নেই।'

ওর কথা বলার মধ্যে কি একটা নতুন সুর শুনতে পেয়ে সের্গেই বিস্মিত হল। নিজের উপর রিতার কালো গভীর চোখের দৃষ্টি অনুভব করে তার সমস্ত বিচার-বিবেচনা চুলোয় দিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে হল, রিতার চোখ দুটো যেন আয়নার মতো স্বচ্ছ, কিন্তু যথাসময়ে সে সামলে নিল নিজেকে।

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে রিতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পিস্তলটা গেল কোথায়?'

ক্ষোভের সঙ্গে কোমরবন্ধনীটা নাড়াচাড়া করে সের্গেই বলল, 'সেই কুলাক্‌দের দলটা ছিনিয়ে নিয়েছে।'

রিতা তার কোর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝকঝকে একটা অটোম্যাটিক পিস্তল বের করল। ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে প্রায় প'চিশ পা দূরে একটা গাছের খাঁজ-কাটা গঁড়ির দিকে পিস্তলের নলীটা উ'চিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই ওক্‌গাছটা দেখছ তো?' বলেই প্রায় নিশানা না করেই সে চোখ-বরাবর পিস্তলটা তুলে ধরে গুলি করল। গঁড়িটার গা থেকে খানিকটা বাকল টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ল নিচে।

'দেখলে তো?' নিজের কৃতিত্বে ভারি খুশি হয়ে সে আবার গুলি ছুঁড়ল। আর একবার গাছের খানিকটা বাকল টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ল ঘাসের বুকে।

'আচ্ছা, নাও,' পিস্তলটা সের্গেইয়ের হাতে দিয়ে কৌতুক করে হেসে রিতা বলল, 'দেখা যাক তোমার দৌড় কতদূর।'

তিনবার গুলি ছুঁড়ে একবার মাত্র তাগ মাফিক লাগাতে পারল সের্গেই।

প্রশ্রয়ের হাসি হাসল রিতা, 'আমি ভেবেছিলাম, তাও পারবে না বুঝি।'

পিস্তলটা জমিতে রেখে গা এলিয়ে দিল সে ঘাসের ওপর। তার নিটোল বুকের ওপরে টান টান হয়ে আছে কোর্তাটা।

কোমল গলায় সে বলল, 'এখানে এসো, সের্গেই।'

কাছে সরে এল সের্গেই।

'আকাশটা দেখো একবার। কী নীল! তোমার চোখেরও ওই রঙ। এটা কিন্তু ভালো নয়। চোখের রঙ হওয়া উচিত ছিল ধূসর — ইস্পাতের মতো। নীল রঙটা বড্ডো কোমল।'

তারপর হঠাৎ তার সোনালী চুলে ভরা মাথাটাকে চেপে ধরে রিতা তার ঠোঁটে চুমো খেল প্রবল আবেগভরে।

দু'মাস কেটে গেছে। শরৎকাল।

রাত্রি যেন অলক্ষ্যে এসে গাছগুলোকে সব কালো পর্দায় ঘিরে দিয়েছে। ডিভিশনের সদর দপ্তরের টেলিগ্রাফকর্মীটি ঝুঁকে পড়েছে তার যন্ত্রটার ওপরে: টরেটক্কা শব্দে সংকেত ফুটে উঠছে একটা সরু লম্বা কাগজের ফালির ওপরে, সেটা তার আঙুলের নিচ দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর সে ফুটকি আর ড্যাশ্‌চিহ্নগুলিকে দ্রুত শব্দ আর কথায় রূপান্তরিত করে চলেছে:

'এক-নম্বর ডিভিশনের সদর দপ্তরের অধিনায়ককে—কপি শেপেতোভ্‌কা শহরের বিপ্লবী কমিটির সভাপতির কাছে। এই তার পাবার পরে দশ ঘণ্টার মধ্যে শহরের সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান সরিয়ে ফেলুন। ফ্রণ্টের ভারপ্রাপ্ত 'ক' রেজিমেণ্টের সেনাপতির অধীনে একটা ব্যাটালিয়ন শহরে রেখে যান! ডিভিশনের সদর দপ্তর, রাজনীতিক বিভাগ এবং সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানকে বারাঞ্চেভ্‌ স্টেশনে স্থানান্তরিত করুন। এই নির্দেশ ঠিকমতো পালন করা হল কি-না, তা ডিভিশনের সর্বাধিনায়ককে জানান।

(স্বাক্ষরিত)।'

দশ মিনিট বাদেই একটা মোটরসাইকেল তার হেড-লাইটের আলোয় অন্ধকার চিরে শহরের ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সেটা থামল বিপ্লবী কমিটির বাড়ির সদরে। মোটরসাইকেল-চালক দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে সভাপতি দোলিন্নিকের হাতে টেলিগ্রামখানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। বিশেষ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট কর্মিদল প্রস্তুত হয়ে নিল তাড়াতাড়ি। এক ঘণ্টার মধ্যেই

বিপ্লবী কমিটির জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে গাড়িগুলো-শহরের পথে পথে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে চলল পদোল্‌স্ক স্টেশনের দিকে। সেখান থেকে মালপত্রগুলো রেলগাড়িতে তুলে দেওয়া হল।

টেলিগ্রামের খবরটা শুনে সেগেই মোটরসাইকেল-চালকের পেছনে বাইরে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে একটু স্টেশনে পৌঁছে দেবেন, কমরেড?'

'চেপে বোসো পেছনে, কিন্তু সাবধান, আঁকড়ে ধরে থাকবে জোরে।'

প্রচার-আন্দোলনের গাড়িখানা ইতিমধ্যেই ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দশ-বারো পা দূরে রিতাকে দেখতে পেল সেগেই। সে অনুভব করল, অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ আজ তার কাছ-ছাড়া হতে চলেছে। তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বিদায় প্রিয় কমরেড রিতা! আবার একদিন না একদিন আমাদের দেখা হবেই। ভুলো না আমাকে।'

কান্নায় তার গলা ধরে আসছে বুঝতে পেরে পাছে কেঁদে ফেলে এই ভয়ে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল সে। এখুনি তার চলে যাওয়া দরকার। আর কথা বলতে না পেরে সেগেই শুধু সজোরে রিতার হাত দুটো চেপে মুচড়ে দিতে লাগল।

সকালে দেখা গেল শহর আর স্টেশন নির্জন, ফাঁকা। শেষ ট্রেনটা যেন বিদায়-ঘোষণায় সিটি বাজিয়ে বেরিয়ে গেছে। শহরে রেখে যাওয়া হয়েছে যাদের, সেই পশ্চাদ্‌রক্ষী ব্যাটালিয়নটি রেল-লাইনের দু'ধারে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে আছে।

গাছের ডালগুলোকে রিক্ত করে দিয়ে হলদে পাতাগুলো

ঝরে পড়ছে। পড়ন্ত পাতাগুলো হাওয়ার তাড়নায় মর্মর ধ্বনি তুলছে পথে পথে।

লাল ফৌজের ওভারকোট পরে, কাঁধের ওপর কার্তুজ-আঁটা ক্যাম্বিসের ফিতে ঝুলিয়ে সের্গেই আরও দশজন লাল ফৌজের সৈনিকের সঙ্গে মিলে চিনি-কলের সামনের চৌরাস্তায় পাহারায় খাড়া। পোলিশ সৈন্যরা আসছে।

আভ্‌তোনম পেত্রভিচ তার পড়শী গেরাসিম লেওন্তিয়েভিচের দরজায় কড়া নাড়ল। গেরাসিমের এখনও রাত্রির ঘুমের পোশাক ছাড়া হয় নি। দরজার ফাঁকে মুখটা বের করে শুধোয়, 'কি ব্যাপার?'

রাস্তা দিয়ে চলেছে অস্ত্রসজ্জিত লাল ফৌজের সৈন্যরা -- তাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আভ্‌তোনম পেত্রভিচ চোখ টিপে বলল, 'ওরা চলে যাচ্ছে।'

গেরাসিম লেওন্তিয়েভিচ চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পোলিশদের প্রতীক-চিহ্ন কী রকমের, জানেন?'

'এক-মুণ্ডুওয়ালা একটা ঈগল, যতদূর জানি।'

'কোন্ চুলোয় পাওয়া যেতে পারে সেটা, বলুন দেখি?'

বিব্রতভাবে তার মাথাটা একবার চুলকে নিল আভ্‌তোনম পেত্রভিচ। তারপর দু'-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'এই এদের আর ভাবনা কি। স্রেফ গুটিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। আর তোমাকে-আমাকে ভেবে মরতে হবে নতুন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানিয়ে চলা যায় কেমন করে।'

নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল মেশিনগানের খটাখট আওয়াজে। স্টেশনের দিক থেকে একটা ইঞ্জিনের সিটি ভেসে এল। সেই দিক থেকেই শুনতে পাওয়া গেল কামানের গুমগুম শব্দ।

একটা ভারি গোলা অনেক উঁচু দিয়ে শূন্যে হাওয়া কেটে এসে প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল চিনি-কলের ওপাশের রাস্তাটায়। একরাশ নীল ধোঁয়ায় ঢেকে গেল রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়গুলো। নিঃশব্দে, গম্ভীর মুখে পেছনে হঠে চলা লাল ফৌজের সেনাদল সারি-বেঁধে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যেতে যেতে ঘন ঘন পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে তারা।

সের্গেইয়ের গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে ফেলে আশেপাশের কমরেডদের চোরা-চাউনিতে দেখে নিল — কেউ তা লক্ষ্য করে নি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে।

সের্গেইয়ের পাশাপাশি চলেছে আন্তেক ক্লপোতোভ্স্কি — করাত-কলের লম্বা রোগা একজন মজুর। তার রাইফেলের ঘোড়াটার ওপরে ধরে রেখেছে সে আঙুলটা। বিষণ্ণ-গম্ভীর আর চিন্তামগ্ন আন্তেকের সঙ্গে সের্গেইয়ের চোখাচোখি হতেই বলে উঠল সে, 'ওরা আমাদের লোকজনের ওপরে — বিশেষ করে আমার পরিবারের ওপরে — দারুণ অত্যাচার চালাবে, কারণ আমরা পোলিশ। বলবে, 'পোলিশ হয়েও কি-না পোলিশ লিজিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ।' নিশ্চয় ওরা আমার বুড়ো বাবাকে করাত-কল থেকে লাথি মেরে হাঁকিয়ে দিয়ে চাবুক-পেটা করবে। বাবাকে বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে আসবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই সে পরিবারের আর-সবাইকে ছেড়ে আসতে চাইল না। আমার আর তর সইছে না ওই হারামজাদা শুয়োরগুলোকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে!' প্রায় চোখের ওপরে নেমে আসা তার শিরস্ত্রাণটাকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঠেলে সরিয়ে দিল আন্তেক।

...বিদায়, শেপেতোভ্কা! তুমি অসুন্দর, অপরিচ্ছন্ন তোমার পথ-ঘাট, কুৎসিত তোমার ছোট ছোট বাড়িগুলো, বাঁকাচোরা এলোমেলো তোমার সড়ক — তবু তুমি পুরাতনী, চিরপ্রিয়া।

বিদায়, প্রিয়জনেরা — ভালিয়া, আর অন্যান্য কমরেডরা যারা গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে থেকে গেলে, তোমাদের সকলের কাছে বিদায়! পোলিশ লিজিয়ন এগিয়ে আসছে — নির্মম, ভয়ঙ্কর, বেপরোয়া!

তেলচিটে কোর্তা গায়ে রেল-শ্রমিকরা বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল লাল ফৌজের চলে যাওয়ার দিকে।

'আমরা আবার আসব, কমরেড!' — বেদনার্ত মনে চেঁচিয়ে উঠল সেগেঈ।

অষ্টম অধ্যায়

ভোরের কুয়াশায় অস্পষ্ট নদীটার ঝিকিমিকি তেমন ফুটছে না। দুই তীরের মসৃণ নুড়িগুলোয় জলের চাপড়ে মৃদু কুলকুল শব্দ উঠছে। পাড়-ঘেঁষা চড়ার কাছে অগভীর জলে নদী শান্ত, সেখানে রুপোলী বুকে তার যেন ঢেউয়ের ওঠা-পড়া প্রায় নেই বলেই মনে হয়। মাঝ-দরিয়ায় কিন্তু জলের স্রোত গভীর আর অশান্ত বেগে পাক খেয়ে বয়ে চলেছে। নীপারের এই মহিমাময় সৌন্দর্য গোগলের রচনায় অমর হয়ে আছে। ডান দিকের উঁচু পাড়টা খাড়া নেমে গেছে জলে — যেন একটা পাহাড়ের অগ্রগতি থমকে গেছে ফুঁসে ওঠা জলের প্রতিরোধে। ওপারে প্রায়-সমতল বাঁ-পাড়টার বুকে এখানে-ওখানে বালিয়াড়ি — বসন্তকালে ঢলের শেষে নদীর জল সরে গিয়ে ওগুলো জেগে উঠেছে।

নদীর পাড়ে একটা ছোট ট্রেঞ্চের মধ্যে ভোঁতা-নলওয়ালা একটা 'ম্যাক্সিম' মেশিনগানের পাশে পাঁচজন। এটা সাত-নম্বর রাইফেল-ডিভিশনের একটা সামনের ঘাঁটি। নদীর দিকে মুখ করে মেশিনগানের সবচেয়ে কাছাকাছি বসে আছে সেগেঈ ব্রুঝাক।

আগের দিন অবিশ্রাম লড়াইয়ের পরে নিতান্ত শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পোলিশ গোলন্দাজ-বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলির ঝাপটায় হঠে তারা কিয়েভ ছেড়ে দিয়ে এসে এখন নদীর বাঁ-পাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে।

এই পিছিয়ে আসা, প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুর হাতে কিয়েভকে ছেড়ে দিয়ে আসার ফলে এরা ভয়ানক আঘাত পেয়েছে। সাত-নম্বর ডিভিশনটি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। বনের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে মালিন্ স্টেশনে রেল-লাইনের কাছে বেরিয়ে এসে তারা প্রচণ্ড একটা পাল্টা আঘাত হেনে পোলিশ ফৌজকে পিছু হঠিয়ে দিয়ে কিয়েভের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল।

কিন্তু পরে সেই সুন্দর শহরটিকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে; লাল ফৌজের সৈন্যদের মনে দারুণ আফসোস।

লাল সৈন্যদলগুলিকে দারনিৎসা থেকে হঠিয়ে দেবার পর পোলিশ সেনাবাহিনী এখন নদীর বাঁ-ধারে রেল-সাঁকোটার পাশে ছোট ঘাঁটি দখল করে আছে। কিন্তু প্রচণ্ড প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে তাদের এর বেশি এগুনোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আগের দিনের ঘটনাগুলো সের্গেই ভাবছিল মনে মনে।

গতকাল দুপুরে তার সৈন্যদল পোলিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে। কালকেই সে প্রথম শত্রুর সঙ্গে সরাসরি হাতাহাতি লড়াই করেছে। রাইফেলের আগায় লাগানো লম্বা তলোয়ারের মতো ফরাসী বেয়নেট সামনে বাগিয়ে ধরে তার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিল পোলিশ লিজিয়নের একজন তরুণ সৈন্য; দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলতে বলতে খরগোসের মতো সে সের্গেইয়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, এক মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ সময়ের

জন্যে তার উন্মাদের মতো চোখ দুটো সের্গেই দেখতে পেয়েছিল। পরমুহূর্তেই পোলিশটার বেয়নেটের সঙ্গে সের্গেইয়ের বেয়নেটের ঠোকাঠুকি হতেই চকচকে ফরাসী বেয়নেটটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল একপাশে। মুখ থুবড়ে পড়েছিল পোলিশ ছেলেটা...

হাত কাঁপে নি সের্গেইয়ের। সে জানে—এরকম আরও অনেক মানুষ মারতে হবে। যে-সের্গেই এতো নিবিড় মধুর আবেগে ভালবাসতে পারে, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে, সেই সের্গেইকেই আবার হত্যাও করতে হয়। তার স্বভাবের মধ্যে কোনোরকম নিষ্ঠুরতা নেই, কোন পাপ নেই। কিন্তু সে জানে তাকে এই সব বিপথচালিত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে—দুনিয়ার যতো পরগাছারা ওদের মনের মধ্যে পাশব বিদ্বেষের একটা উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে ঠেলে পাঠিয়েছে সের্গেইয়ের দেশের বিরুদ্ধে। সুতরাং তাকেই—সের্গেইকেই—আজ হত্যা করতে হবে যাতে যেদিন মানুষ আর মানুষকে মারবে না সেইদিনটি দ্রুত এগিয়ে আসে।

পারামোনভ আস্তে করে তার কাঁধে চাপড় মারল, 'চলো, সের্গেই, এবার যাওয়া যাক বরং, নইলে ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে।'

এক বছর ধরে পাভেল করচাগিন দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—কখনও ঘোরে মেশিনগানের গাড়িতে বা কামান-বওয়া খোলা গাড়িতে, কখনও ঘোরে ধূসর রঙের এক-কান-কাটা ছোট ঘোড়ায় চেপে। সে এখন সুপরিণত মানুষ, নানান কষ্টের মধ্যে দিয়ে অসুবিধে সয়ে সয়ে তার মন পরিণত, তার শরীর শক্ত-সমর্থ। কার্তুজ-আঁটা ভারি ফিতের ভারে তার গায়ের কোমল চামড়ায় যে ফোসকা পড়েছিল তা অনেক-

দিন হল সেরে গেছে, রাইফেল-ঝোলানো চামড়ার ফালিটার নিচে কাঁধের ওপর কড়া পড়ে গেছে।

এই এক বছরে পাভেলের অনেক কিছু নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেশের চতুর্দিকে কুচকাওয়াজ করে ফিরেছে সে তারই মতো ছেঁড়াখোঁড়া অপ্রতুল পোশাক-পরা আরও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে — সেই সব মানুষ, যাদের মনে নিজেদের শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে দুর্জয় সংকল্পের উদ্দীপনা জ্বলছে। মাত্র দু'বার সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে পাভেল উপস্থিত থাকতে পারে নি -- প্রথম বার, যখন তার কোমরের নিচে গুলি বিঁধেছিল, আর দ্বিতীয় বার, ১৯২০-র ফেব্রুয়ারির সেই নিদারুণ শীতে, সে তখন টাইফাস্ রোগের গরমে-ঘামে ছটফট করছিল।

বারো-নম্বর আর্মির বিভিন্ন রেজিমেণ্টে আর ডিভিশনে যত লোক পোলিশ মেশিনগানের গুলিতে মারা পড়েছে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি লোক মারা গেছে টাইফাস্ রোগে। সেই সময়ে বারো-নম্বর আর্মি প্রায় গোটা উত্তর ইউক্রেন জুড়ে বিরাট একটা এলাকায় লড়াই চালাচ্ছিল, যাতে পোলিশরা আর এগুতে না পারে।

অসুখটা থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পাভেল এসে যোগ দিয়েছে তার সৈন্যদলে। তারা এখন কাজাতিন- -উমান শাখা-রেললাইনের ওপরে ফ্রন্তোভ্কা স্টেশনটা দখল করে আছে।

ফ্রন্তোভ্কা স্টেশনটার চারিদিকে বন। ছোট একটা স্টেশন-ঘর আর তার চারপাশে কতকগুলো ভাঙাচোরা ফাঁকা কুঁড়েঘর নিয়ে জায়গাটা। তিন বছর ধরে প্রায়ই যুদ্ধ চলার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বেসামরিক জীবন একেবারে অসম্ভব

হয়ে গেছে। কতবার যে হাত-বদল হয়েছে এই ফ্রস্তোভ্কা তার ইয়ত্তা নেই।

আবার কতকগুলো গুরুতর ঘটনা ঘটতে চলেছে। বারো-নম্বর আর্মির সৈন্যসংখ্যা ভয়ানক রকম কমে গেছে, আংশিকভাবে তাদের সংগঠনও ভেঙে পড়েছে, পোলিশ সৈন্যবাহিনীর চাপে কিয়েভ পর্যন্ত পিছিয়ে আসছে তারা — এমন সময়ে জয়োল্লাসে মত্ত পোলিশ শ্বেতরক্ষীদের ওপরে একটা মোক্ষম আঘাত হানবার জন্যে প্রজাতন্ত্র তার সমস্ত শক্তি সংহত করতে লেগেছে।

এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির ডিভিশনগুলিকে সেই উত্তর ককেশাস থেকে বদলি করে আনা হচ্ছে একেবারে ইউক্রেনে। বহু যুদ্ধের আগুনে পোড়-খাওয়া সব লোক এরা। সামরিক ইতিহাসে অতুলনীয় এক অভিযানে এদের লাগানো হচ্ছে। উমান অঞ্চলে একে একে এসে জড়ো হয়েছে চার-নম্বর, ছ'-নম্বর, এগারো-নম্বর আর চোদ্দ-নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন। এখানে আসার পথে তারা মাখ্নোর বোম্বেটে দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসে, এবার ফ্রণ্টের পেছন-ঘাঁটিতে নিজেদের শক্তি সংহত করে নিচ্ছে — সাড়ে ষোল হাজার তরোয়াল, স্তেপ অঞ্চলের কড়া রোদে পোড়-খাওয়া সাড়ে ষোল হাজার সৈনিক।

শত্রুপক্ষ যাতে এই চরম আঘাতটা ব্যর্থ করে দিতে না পারে, সেইটেই এই সন্ধিক্ষণে লাল ফৌজের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদের আর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সামরিক নেতৃত্বের সবচেয়ে মুখ্য ভাবনা। এই বিরাট ঘোড়সওয়ার বাহিনীটার যাতে ঠিকমতো সমাবেশ হতে পারে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উমান্-এর দিকটায় লড়াই বন্ধ রাখা হয়েছে। মস্কো থেকে ফ্রণ্টের সদর দপ্তর খারকভ পর্যন্ত আর সেখান থেকে চোদ্দ-নম্বর আর

বারো-নম্বর আর্মির সদর ঘাঁটি পর্যন্ত যোগাযোগের টেলিগ্রাফ-লাইন অবিরাম কর্মমুখর। টেলিগ্রাফ অপারেটররা অনবরত সাংকেতিক ভাষার হুকুম-নির্দেশ নিতে ব্যস্ত: 'ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সমাবেশের দিক থেকে পোলিশদের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও।' যখন মাঝে মাঝে পোলিশ সৈন্যদের এগিয়ে আসার ফলে বুদিওনি-ঘোড়সওয়ার ডিভিশনগুলি বিব্রত হয়ে পড়ছে, শুধু তখনই শত্রুকে রুখবার জন্যে লড়াই চালানো হচ্ছে।

সৈন্যদের তাঁবুর একপাশে আগুনের কুণ্ডলী জ্বলছে লাল শিখার ফুলকি ছড়িয়ে। আগুন থেকে ধোঁয়ার রাশি পাক খেয়ে খেয়ে উঠে গুনগুন শব্দ তোলা অস্থির মশার ঝাঁকগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বলন্ত কুণ্ডলীটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে মানুষগুলো বসে আছে, আগুনের আলোয় একটা তামাটে আভা ফুটেছে তাদের মুখে। আগুনের ধারে ধারে বসানো নীলচে-ধূসর গরম ছাইয়ের ওপর বসানো টিনের পাত্রগুলোয় জল ফুটছে।

একটা জ্বলন্ত কাঠের তলা থেকে আগুনের একটা শিখা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে ওদের মধ্যে একজনের ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ওপর পড়ল। মাথাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বিরক্তিভরা গলায় বিড়বিড়িয়ে বলল, 'ধুত্তোরি ছাই!'

আগুনের পাশে আর-যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একদমক হাসির রোল উঠল।

গোঁফ-ছাঁটা একজন মধ্যবয়সী সৈনিক আগুনের আলোয় তার রাইফেলের নলটা পরীক্ষা করছিল — সে বলে উঠল, 'বই পড়ায় এতোই আত্মহারা ছেলেটা যে আগুনে পুড়লেও খেয়াল করে না।'

কে-একজন বলল, 'কী পড়ছ, আমাদের সবাইকে একটু শোনাও না, করচাগিন?'

লাল ফৌজের ওই তরুণ সৈনিকটি মাথা থেকে এক গোছা পোড়া চুল টেনে ফেলে মৃদু হাসল, 'সত্যিকারের একটা ভালো বই, কমরেড আন্দ্রোশ্চুক। শেষ না করে আর কিছুতেই ছাড়তে পারছি না।'

করচাগিনের পাশের বোঁচা-নাক ছেলেটা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তার থলেটার ছেঁড়া-ফিতে মেরামত করছিল—সে জিজ্ঞেস করল, 'বইটা কী সম্বন্ধে?' মোটা সুতোটা দাঁতে কেটে বাকিটা ছুঁচের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শিরস্ত্রাণে সেটাকে আটকে রেখে সে বলল, 'যদি প্রেমের গল্প হয়, তাহলে শুনতে রাজি আছি।'

একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল এই মন্তব্যে। মাৎভেইচুক তার ছোট করে ছাঁটা চুলওয়ালা মাথাটা তুলে সেই বোঁচা-নাক ছেলেটার দিকে একটা চতুর ভঙ্গিতে চোখ টিপে বলল, 'প্রেম বড়ো ভালো জিনিস, সেরেদা। আর তোমার চেহারাটাও খাসা — একেবারে পটের ছবিটির মতো। আমরা যেখানেই যাই, তোমার পেছনে ছুটোছুটি করে মেয়েদের তো জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাবার জোগাড়। তবে তোমার মতো এমন সুন্দর সুপুরুষের চেহারাতেও একটা ছোট খুঁত আছে, এইটে বড়ো দুঃখের কথা: নাকের বদলে তোমার মুখের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা পাঁচ-কোপেক মুদ্রা। কিন্তু সেটা সহজেই ঠিক করে নেওয়া যায় — এক রাত্তিরের জন্যে শুধু নাকের সঙ্গে একটা পাঁচ-সেরী 'নভিৎস্কি'* বেঁধে ঝুলিয়ে রাখো, ব্যস্, সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

* এক ধরনের হাত-বোমা, প্রায় সাড়ে চার সের ওজন, কাঁটাতারের বেড়াজাল উড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।—সম্পাঃ

ঠাট্টাটুকু শুনে এমন উচ্চকিত হাসি হেসে উঠল সবাই যে মেশিনগান বইবার গাড়িগুলোর সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে ছটফটিয়ে উঠল।

সেরেদা গ্রাহ্য না করার ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে তাকাল। তারপর বেশ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে কপালের পাশে ঠোকা মেরে বলল, 'মুখের সৌন্দর্যের চেয়ে এর ভেতরে কী আছে সেইটেই বড়ো কথা। এই তোমার কথাই ধরো—তোমার জিভটা তো বোলতার হুলের মতো, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার গাধার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি নয়, একটা কথার মানে বুঝতেই তোমার এক বেলা লেগে যায়।'

দু'জনে প্রায় মারামারি বেধে যায় আর-কি, এমন সময়ে বিভাগীয় কম্যান্ডার তাতারিনভ্ তাদের শান্ত করল, 'আহা, রাগারাগি করছ কেন, ভাই? বরং ততক্ষণ করচাগিন আমাদের পড়ে শোনাক দেখি শোনার মতো কিছু যদি থাকে।'

'সেই ভালো। শুরু করো, পাভ্‌লুশ্‌কা!' চারিদিক থেকে বলে উঠল সবাই।

একটা ঘোড়ার জিন আগুনের কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার ওপর বসে পাভেল ছোট মোটা বইটা তার হাঁটুর ওপর রেখে পাতা ওলটাল।

'কমরেড, বইটার নাম 'দি গ্যাড্‌ফ্লাই'। ব্যাটালিয়ন কমিশার বইটা আমাকে দিয়েছেন। চমৎকার বই। তোমরা যদি চুপ করে বসে শোনো, তাহলে পড়তে পারি।'

'লাগাও, লাগাও! কিচ্ছু ভেবো না—কেউ বাধা দেবে না।'

কিছুক্ষণ বাদে রেজিমেণ্ট-কম্যান্ডার কমরেড পুজিরেভ্‌স্কি তার কমিশারের সঙ্গে এদের অলক্ষ্যে আগুনের কাছে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে দেখে—একজন বই পড়ছে আর এগারো জোড়া চোখ তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কমিশারের

দিকে ফিরে ওদের দেখিয়ে কম্যাণ্ডার বলল, 'আমাদের রেজিমেণ্টের স্কাউট-দলের অর্ধেকই এখানে আছে দেখছি। এদের মধ্যে চারজন একেবারে সদ্য কমসোমল থেকে এসেছে, বয়েসেও ছেলেমানুষ। কিন্তু এরা সবাই খুব ভালো সৈনিক। যে ছেলেটা পড়ছে, তার নাম করচাগিন। আর ওই যে বসে আছে, যার চোখ দুটো নেকড়ের বাচ্চার মতো, ওর নাম ঝারকি। ওরা দু'জনে বন্ধু, কিন্তু আবার ওদের দ'ুজনের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে একটা নিঃশব্দ প্রতিযোগিতাও চলছে সব সময়। করচাগিনই এ পর্যন্ত আমাদের দলে সবচেয়ে ভালো স্কাউট ছিল, কিন্তু এখন ওর রয়েছে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এখন ওরা যা করছে এটা রাজনীতিক কাজ, এতে বেশ ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এমন ছেলেদের খুব জুতসই নাম বানানো হয়েছে 'তরুণ প্রহরী'। ভারি জুতসই হয়েছে নামটা, আমার মনে হয়।'

কমিশার জিজ্ঞেস করল, 'যে পড়ছে, ওই কি এদের রাজনীতিক পরিচালক?'

পায়ের গুঁতো মেরে ঘোড়াটা হাঁকিয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে পুজিরেভ্স্কি বলল, 'না। ক্রামের এদের রাজনীতিক পরিচালক।'

'এই যে, কি খবর কমরেডরা!' হেঁকে উঠল সে।

সবাই ফিরে তাকাল কম্যাণ্ডারের দিকে। সে ততক্ষণে জিন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে দলটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'শরীরটাকে একটু গরম করে নিচ্ছ নাকি, ভাই?' দরাজ হাসি হেসে কথাটা বলার সময়ে তার অল্প-চেরা মঙ্গোলীয় চোখের আর শক্ত মুখের কড়া ভাবটুকু একেবারে মুছে গেল।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কমরেডকে যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়, এরা সবাই ঠিক তেমনিভাবেই তাদের

কম্যাণ্ডারকে অভিবাদন জানাল। কমিশার নামল না ঘোড়া থেকে।

খাপে-ভরা পিস্তলটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে পুজিরেভ্স্কি করচাগিনের পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'একটা করে সিগারেট খাওয়া যাক? খুব ভালো খানিকটা তামাক আছে আমার কাছে।'

একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে নিয়ে সে কমিশারের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এগোও, দরোনিন। আমি একটু বসি। আমাকে সদর ঘাঁটিতে দরকার পড়লে জানিও।'

দরোনিন চলে গেলে পুজিরেভ্স্কি করচাগিনকে বলল, 'আচ্ছা, পড়ে যাও, আমিও শুনব।'

শেষ পর্যন্ত পড়ার পর পাভেল বইটা হাঁটুর ওপরে নামিয়ে রেখে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই ভাবছে 'গ্যাড্ফ্লাই'এর মর্মান্তিক পরিণতির কথা।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুজিরেভ্স্কি রইল আলোচনা আরম্ভ হবার অপেক্ষায়।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সেরেদা বলল, 'বড়ো ভয়ানক কাহিনী। দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে। 'গ্যাড্ফ্লাই' যা করেছে, খুব কম লোকই তা পারে। কিন্তু মানুষ যখন লড়াই করবার মতো একটা আদর্শ খুঁজে পায়, তখন সে যে-কোনো কষ্ট সইবার বলিষ্ঠতা অর্জন করে।'

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, দারুণ নাড়া খেয়েছে সেরেদার মন। বইটা তার মনে গভীর দাগ কেটেছে।

আন্দ্রিউশা ফমিচেভ রাগে গর্জে উঠল, 'ওই যে পাদ্রীটা ওর মুখের মধ্যে একটা ক্রুশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, ওই হারামজাদাটাকে হাতের কাছে পেলে পিষে মারতাম এখুনি!'—

ফমিচেভ বেলাইয়া-সের্কভ থেকে এসেছে, সেখানে ও ছিল একজন মুচির সহকারী।

কাঠি দিয়ে একটা মেস্‌টিন আগুনের কাছাকাছি ঠেলে দিয়ে গভীর বিশ্বাস-ভরা গলায় আন্দ্রোশ্চুক বলল, 'মরবার মতো একটা সত্যিকারের আদর্শ থাকলে মানুষ মরতে কুণ্ঠিত হয় না। আদর্শই মানুষকে শক্তি জোগায়। যা করছি ঠিকই করছি—এটা জানা থাকলে সব সহ্য করে বীরের মতো মরা যায়। আমি একটা ছেলেকে জানতাম, পোরাইকা তার নাম। ওদেসায় শ্বেতরক্ষীরা তাকে কোণঠাসা করে ফেললে সে একাই একটা গোটা পল্টনের বিরুদ্ধে এগিয়েছিল। তারপর ওরা তাকে বেয়নেটে বিঁধে ফেলবার আগেই সে একটা হাত-বোমা ফাটিয়ে নিজেকে আর সেই সঙ্গে ওদের সবগুলোকে উড়িয়ে দিল। অথচ দেখতে সে এমন কিছু অসাধারণ ছেলে ছিল না। বইয়ের গল্পে যাদের সম্বন্ধে পড়া যায়, ও মোটেই সেরকম ছিল না—যদিও ওকে নিয়ে গল্প লেখা উচিত। আমাদের মধ্যে এরকম বিস্তর বীর-ছেলে আছে।'

মেস্‌টিনের ভেতরটা সে একটা চামচ দিয়ে নেড়ে ঠোঁট কুঁচকে একটু চেখে নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'কেউ কেউ আছে, অপমান সয়ে কুকুরের মতো অসম্মানের মরণ যারা মরে।—ইজিয়াস্লাভ্‌ল-এর লড়াইয়ের একটা ঘটনার কথা বলি, শোনো। গোরিন নদীর ধারে সেটা একটা পুরনো শহর, রাজারাজড়াদের আমলে তৈরি হয়েছিল। কেল্লার মতো করে তৈরি একটা পোলিশ গির্জা ছিল ওখানে। শহরে ঢুকে আমরা তো বাঁকাচোরা সরু রাস্তাগুলো দিয়ে একজনের পেছনে আরেকজন সার বেঁধে যাচ্ছি। আমাদের ডান দিকটায় পাহারায় আছে একদল লাত্‌ভিয়ান সৈন্য। বড়ো রাস্তাটায় পড়তেই দেখি একটা বাড়ির বেড়ার গায়ে জিন-লাগানো তিনটে ঘোড়া বাঁধা।

'আমরা তো ভাবলাম—যাক, এতক্ষণে জনকতক পোলিশ সৈন্যকে নাগালে পাওয়া গেছে! জন দশেক আমরা ছুটে ঢুকে পড়লাম আঙিনায়—আমাদের আগে আগে সেই লাতভিয়ান সৈন্যদলের কম্যান্ডার দৌড়াল তার মোজার-পিস্তলটা নাড়তে নাড়তে।

'সামনের দরজাটা খোলা। দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল, পোলিশদের বদলে আমাদেরই লোক রয়েছে সেখানে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসবার জন্যে একটা টহলদার ঘোড়সওয়ার-দল এরা। আমাদের আগেই এসে পেঁৗছেছে। যে দৃশ্যটা আমাদের চোখে পড়ল, সেটা মোটেই শোভন নয়। এই বাড়িতে যে পোলিশ অফিসারটি ছিল, তারই বউটার ওপরে ওরা অত্যাচার করছে। লাতভিয়ান কম্যান্ডার ব্যাপারটা দেখে নিয়েই তার নিজের ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল। তার সৈন্যরা এসে ওই তিনজন লোককে ধরে বাইরে টেনে আনল। ঘটনাটার সময়ে আমরা মাত্র দু'জন ছিলাম রাশিয়ান, বাকি সবাই লাতভিয়ান। এই কম্যান্ডারটির নাম ব্রেদিস্। আমি ওদের ভাষা বুঝি না, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে সে এই তিনজনকে খতম করে ফেলার জন্যে হুকুম দিয়েছে। এই লাতভিয়ানরা ভারি দুর্ধর্ষ, কিছুতেই দমে না কখনও। তারা তো এই তিনজনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে। স্পষ্টই দেখতে পেলাম, ওই তিনজন লোকের আর কিছুতেই পার নেই। ওদের মধ্যে একজনের খুব দশাসই লম্বা-চওড়া চেহারা, বিশ্রী মুখখানা। সে তো প্রাণপণে লাথি ছুঁড়ে যুঝছে আর চেঁচিয়ে বলছে—একটা বাজে মেয়েমানুষের জন্যে তাকে গুলি করে মারার কোনো এক্তিয়ার তাদের নেই। অন্য দু'জনও প্রাণভিক্ষা চাইছে।

'আমার তো ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে উঠল। ব্রেদিস-এর কাছে

ছুটে গিয়ে বললাম, 'কমরেড কম্যান্ডার, সামরিক আদালতের ওপরে ওদের বিচারের ভার ছেড়ে দাও, তুমি কেন ওদের রক্তে নিজের হাত নোংরা করতে যাচ্ছ? শহরে লড়াই শেষ হয় নি এখনও, এদিকে আমরা কেন এই জানোয়ারগুলোর জন্যে সময় নষ্ট করতে যাই?' সে তো আমার দিকে বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখে তাকাল। সত্যি বলছি, কথাটা বলে ফেলেছি বলে আমার রীতিমত আফসোস হল। পিস্তলটা আমার দিকেই বাগিয়ে ধরল সে। সাত বছর ধরে যুদ্ধ করছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে যে আমার সত্যিই দারুণ আতংক হয়েছিল সে কথা স্বীকার করছি। দেখলাম, লোকটা তক্ষুণি গুলি করে মারবে। ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় সে আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে যা বলল, কোনো রকমে তার মানেটা বুঝলাম, 'আমাদের ঝাণ্ডা আমাদেরই রক্তের রঙে লাল। এই লোকগুলো গোটা লাল ফৌজের কলংক। দস্যুতা করার শাস্তি— মৃত্যু!'

'দৃশ্যটা আর সহ্য করতে না পেরে আমি আঙিনাটা থেকে প্রাণপণে ছুটে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, পেছনে গুলির শব্দ শুনলাম। বুঝলাম, খতম হয়ে গেল সেই তিনজন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে যখন জুটলাম, ততক্ষণে শহরটা আমাদের দখলে চলে এসেছে।

'একেই বলতে চাই কুকুরের মতো মরা—ওই তিনজন লোক সেইভাবেই মরেছে। ওদের তিনজনের ওই টহলদার-দলটি হচ্ছে মেলিতোপল্-এ যারা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তাদেরই একটি দল। এক সময়ে তারা মাখ্নোর দলে ছিল। আজেবাজে কয়েক জন লোক—এই আর কি!'

মেস্-টিনটা টেনে নিয়ে আন্দ্রোশ্চুক তার রুটির থলিটা খুলতে আরম্ভ করল।

'আমাদের লোকজনের মধ্যেও অমন জানোয়ারের সাক্ষাৎ

মাঝে মাঝে মিলবে। সবারই উপর নজর রাখা তো যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তারাও বিপ্লবের পক্ষে। অথচ এদের জন্যেই আমাদের বদনাম হয়। কিন্তু দৃশ্যটা ছিল অতি অসহ্য। চট্ করে আমি ঘটনাটা ভুলব না।' চায়ে চুমুক দিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

তাঁবুর লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে সেরেদার নাক-ডাকানো বাঁশি শোনা যাচ্ছে। পুজিরেভ্স্কি ঘোড়ার জিনে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। দলের রাজনীতিক পরিচালক ক্রামের বসে বসে নোটবুকে কী যেন লিখছে।

পরের দিন একটা স্কাউটিং-এর কাজ থেকে ফিরে এসে পাভেল একটা গাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে ক্রামেরকে ডাকল। তার সবেমাত্র চা খাওয়া শেষ হয়েছে।

'শোনো, ক্রামের, আমি যদি এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মিতে বদলি হই, তাহলে কেমন হয়? দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, বড়ো রকম কিছু হবে ওদিকে। মজা দেখবার জন্যে তো আর ওদের অমন জমায়েত করা হয় নি! আমাদের এদিকে তো বিশেষ কিছু হবে মনে হচ্ছে না।'

বিস্মিত হয়ে ক্রামের তাকাল তার দিকে, 'বদলি হতে চাও? সিনেমা দেখতে গিয়ে জায়গা বদল করার মতোই ফৌজেও দল বদল করা যায় বলে ভেবেছ না-কি?'

পাভেল বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু একজন সৈন্য কোথায় লড়াই করছে তাতে কি কিছু এসে যায়? আমি তো আর পেছনে পালিয়ে যাচ্ছি না।'

কিন্তু ক্রামের সরাসরি এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিল, 'তাহলে ফৌজের শৃঙ্খলা থাকে কোথায়? তুমি মোটেই খারাপ ছেলে নও. পাভেল। কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তোমার

চালচলন একটু নৈরাজ্যবাদীর মতো। তোমার ইচ্ছে মতো সব কিছু করবে বলে ভেবেছ না-কি? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পার্টি আর কমসোমল কঠিন শৃঙ্খলার ভিত্তিতে স্থাপিত। সব আগে পার্টি। যার যেখানে থাকা সবচেয়ে দরকার সেইখানেই তাকে থাকতে হবে, সে যেখানে থাকতে চায় সেখানে নয়। পুজিরেভ্স্কি তোমার বদলির দরখাস্ত একবার ফেরত দিয়েছে? এই তো তোমার কথার জবাব।'

বলতে বলতে ক্রামের এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে এক দমক কেশে উঠল সে। লম্বা রোগা এই মানুষটা ছাপাখানার কম্পোজিটর ছিল, সিসের গুঁড়ো তার ফুসফুসের মধ্যে কায়েমী বাসা বেঁধেছে. মাঝে মাঝে তার রক্তহীন গালে একটা অস্বাস্থ্যকর লালচে আভা দেখা দেয়।

সে শান্ত হয়ে আসার পর পাভেল নিচু গলায় কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'যা বললে সবই ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমি বুদিওনি-বাহিনীতেই যাব।'

পরের সন্ধ্যেয় তাঁবুর পাশে আগুনের কুণ্ডলীর আড্ডায় দেখা গেল — পাভেল অনুপস্থিত।

পাশের গ্রামে পাহাড়ের ওপর একটা ইস্কুল-বাড়ির বাইরে বুদিওনি-ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একদল সৈনিক একটা বড়ো বৃত্তাকারে জড়ো হয়েছে। দৈত্যের মতো বিরাট-দেহ একজন একটা মেশিনগানের গাড়ির পেছনে বসে মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে দিয়ে অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। তার অপটু আঙুল-চালনার ফলে যন্ত্রটা থেকে বেতালা নানারকম উচ্চকিত গোঙানির সুর বেরিয়ে আসছে — যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাজনাটা। অবিশ্বাস্য রকমের চওড়া আর লাল রঙের ব্রীচেজ পরা আরেকজন ঘোড়সওয়ার চক্রটার মাঝখানে উন্মত্ত হয়ে

'হোপাক' নাচ নাচছে—কিন্তু নাচের সঙ্গে বাজনা না মেলাতে লোকটাও বেতালা হয়ে নাচছে।

মেশিনগান-টানা গাড়িটার চারপাশে আর বেড়ার উপর ঠেলে-হেঁচড়ে উঠে উৎসুক চোখে জড়ো হয়েছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই সৈন্যদের মজার ব্যাপার-ট্যাপার দেখবার জন্যে—সৈন্যদলটা সবেমাত্র ওদের গ্রামে ঢুকেছে।

'লাগাও দেখি হে তোপ্‌তালো! হ্যাঁ, পায়ের গুঁতোয় মাটি খুঁড়ে ফেল, তবে তো! ধাঁই ধপাধপ—হ্যাঁ, একেই তো বলে নাচ, ভায়া! ওহে, বলি ও বাজিয়ে, জোরসে বাজাও না!'

কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদারের বিরাট মোটা আঙুলগুলো লোহার ঘোড়ার নাল অতি সহজে বেঁকিয়ে ফেলতে পারলেও, বাজনাটার চাবির ওপর নড়াচড়া করতে লাগল অত্যন্ত আনাড়ীভাবে।

একজন তামাটে রঙের ঘোড়সওয়ার সৈন্য ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, 'মাখ্‌নোর ডাকাত-দলের হাতে আমাদের আফানাসি কুলিয়াব্‌কো মারা পড়াতে বড়ো দুঃখ হচ্ছে। ছেলেটা অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পারত বড় চমৎকার। আমাদের দলের ডান দিকে থাকত ও। আহা, মারা গেল ছেলেটা! খুব ভালো সৈনিক ছিল, আর সবার সেরা অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার!'

পাভেল দাঁড়িয়ে ছিল জমায়েতের মধ্যে এক জায়গায়। ঐ শেষ কথাটা কানে গেল তার। ভিড় ঠেলে মেশিনগানের গাড়িটার কাছে এসে অ্যাকর্ডিয়নের হাপরটার ওপরে হাত রাখল সে। বন্ধ হয়ে গেল বাজনাটা।

অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার ভ্রূকুটি করে জানতে চাইল, 'কী চাও তুমি?'

তোপ্‌তালো থেমে পড়ল, ক্রুদ্ধ একটা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে, 'ব্যাপার কী?'

পাভেল বাজনার ফিতেটা টেনে নিয়ে বলল, 'দেখি একবার চেষ্টা করে।'

বুদিওনি-ঘোড়সওয়ারটি এই অচেনা লাল ফৌজের সৈন্যটার দিকে একটু অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়ন ঝুলিয়ে দেবার ফিতেটা নিজের কাঁধ থেকে খুলে দিল।

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পাভেল তার হাঁটুর ওপর অ্যাকর্ডিয়নটা রেখে পাখার মতো খুলে ছড়িয়ে ধরল ভাঁজ-করা হাপরটা। তারপর যন্ত্রটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল মন-মাতানো ছন্দের মিষ্টি সুর-ঝঙ্কার—অ্যাকর্ডিয়নের সবখানি বলিষ্ঠতা উপচে উঠল সে-সুরে:

আহা-হা, ছোট্ট আপেল,
চললে কোথায় হে?
'চেকা'র হাতে পড়বে ঠিকই,
আসবে না আর ফিরে।

পরিচিত সুরের তালে তালে তোপ্‌তালো একটা বিরাট পাখির মতো দুই হাত ছড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল চক্করটার মাঝখানে—অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে সুরের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নিজের পায়ে, হাঁটুতে, মাথায়, কপালে, জুতোর তলায় এবং শেষ পর্যন্ত মুখের ওপর চাপড় মেরে মেরে নাচতে লাগল।

অ্যাকর্ডিয়নটা দ্রুত থেকে দ্রুততর বেজে চলল মত্ত মন-মাতানো সুরে আর দম একেবারে ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত উদ্দাম ভঙ্গীতে পা ছুঁড়ে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে খেয়ে চক্করটার চারিদিকে নেচে চলল তোপ্‌তালো।

১৯২০-র ৫ই জুন কয়েকটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড লড়াইয়ের

শেষে সেনাপতি বুদিওনির এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মি তৃতীয় আর চতুর্থ পোলিশ আর্মির মাঝখান দিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ফেলল — পথে পোলিশ জেনারেল সাভিৎস্কির অধীনস্থ একটা ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড ধ্বংস করে দিয়ে বন্যার মতো এগিয়ে চলল রুঝিনির দিকে।

পোলিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি করে একটা হানাদার দল গড়ে তুলে সেটাকে খাড়া করে দিল ব্যূহ যেখানে ভেঙে গিয়েছিল সেইখানে। পগ্রেবিশ্চে স্টেশন থেকে লড়াইয়ের জায়গাটায় পাঁচটা ট্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি এনে ফেলা হল। কিন্তু পোলিশরা যেখান থেকে আক্রমণ চালাবে বলে স্থির করেছিল সেই জারুদ্নিৎসির পাশ কাটিয়ে গিয়ে বুদিওনি-বাহিনী পোলিশদের পশ্চাদ্ভাগে পৌঁছে গেল।

পোলিশদের এই পশ্চাদ্ভাগে কাজাতিন হচ্ছে একটা সবচেয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা — এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মি সেইদিকেই এগুবে বলে পোলিশ কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিল; পেছন দিক থেকে তাদের ওপর হামলা চালাবার হুকুম দিয়ে পোলিশ জেনারেল কর্নিৎস্কির ঘোড়সওয়ার-ডিভিশনটাকে পাঠানো হল। এর ফলে কিন্তু পোলিশদের অবস্থার উন্নতি ঘটল না। তারা অবশ্য ভাঙা ব্যূহটা জুড়ে দিয়ে ঘোড়সওয়ার আর্মিটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হল, কিন্তু নিজেদের সৈন্যসারির পেছনে শক্তিশালী একটা শত্রু ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর উপস্থিতির ফলে তাদের পেছনের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ দেখা দিল, কিয়েভে পোলিশ ফৌজের ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়বার সম্ভাবনাও দেখা দিল — এই সবের ফলে পোলিশ ফৌজের অবস্থাটা মোটেই নিশ্চিন্ত হবার মতো রইল না। এগিয়ে যাবার পথে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার ডিভিশনগুলি পোলিশদের পশ্চাদপসরণের পথে বাধা সৃষ্টি

করার জন্যে ছোট ছোট রেল-সাঁকোগুলো উড়িয়ে দিয়ে আর রেল-লাইন উপড়ে ফেলতে ফেলতে চলল।

পোলিশদের একটা আর্মির সদর ঘাঁটি আছে জিতোমির-এ (আসলে গোটা পোলিশ ফ্রন্টের সদর ঘাঁটিটাই সেখানে)—এ খবরটা পোলিশ যুদ্ধবন্দীদের কাছে জানতে পেরে, এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির কম্যান্ডার জিতোমির আর বের্দিচেভ্ দুটো জায়গাই দখল করবে বলে ঠিক করল—এই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন আর প্রশাসন-কেন্দ্র। সাতই জুনের ভোরে চার-নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন পুরো বেগে এগিয়ে চলল জিতোমির-এর দিকে।

পাভেল করচাগিন ঘোড়ায় চেপে চলেছে এদের একটা স্কোয়াড্রনের ডানদিকের অবস্থানে—মৃত অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার কুলিয়াব্‌কোর জায়গায়। সৈন্যদের সমবেত অনুরোধে তাকে এই দলটায় ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, এমন চমৎকার একজন অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়েকে তারা হাতছাড়া করতে চায় নি।

মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়াগুলিকে না থামিয়ে তারা জিতোমিরের দিকে এগোল পাখার আকারে ছড়িয়ে—সূর্যের আলোয় তাদের খোলা তলোয়ারগুলো ঝিকমিক করছে।

খুরের শব্দে মাটি কেঁপে উঠছে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে ঘোড়াগুলো, রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে মানুষগুলো।

পায়ের নিচে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে। বাগান আর পার্ক দিয়ে সাজানো মস্ত শহরটা ফৌজীদলটার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে দ্রুত। ঘোড়সওয়ার-বাহিনী বন্যার স্রোতের মতো বাগানগুলোর পাশ দিয়ে এসে পড়ল শহরের কেন্দ্রে—একেবারে মৃত্যুরই মতো অমোঘ একটা ভয়ংকর রণধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হল।

এই হঠাৎ আক্রমণে পোলিশরা এতোই হতচকিত হয়ে পড়ল যে তারা বিশেষ কিছু প্রতিরোধ দিয়ে উঠতে পারল না। স্থানীয় রক্ষী-সেনাদল একেবারে গুঁড়িয়ে গেল।

পাভেল করচাগিন তার ঘোড়াটার কাঁধের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে বেগে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। পাশাপাশি চলেছে তোপ্‌তালো সরু-পাওয়ালা একটা কালো ঘোড়ায় চেপে। এই দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারটি এক সময়ে তলোয়ারের অভ্রান্ত লক্ষ্যে একটি আঘাতেই একজন পোলিশ সৈন্যের মাথা উড়িয়ে দিল, লোকটা তার কাঁধে বন্দুক তুলে নেবারও সময় পেল না।—পাভেল দেখল দৃশ্যটা।

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে তাদের ঘোড়াগুলো, লোহার নাল লাগানো খুরের শব্দ উঠছে পাথরের বুকে। তারপরে একটা মোড়ের মাথায় তারা একটা মেশিনগানের একেবারে সামনে এসে পড়ল—ঠিক রাস্তার মাঝখানে বসানো রয়েছে মেশিনগানটা, নীল রঙের উর্দি পরা চৌকোনা টুপি মাথায় তিনজন পোলিশ তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। চতুর্থ একজন লোকও রয়েছে, তার কোটের গলার বেড়ে সোনালী কারুকার্য, সে পাভেল আর তোপ্‌তালোর দিকে তার মোজার-পিস্তলটা বাগিয়ে ধরল।

তোপ্‌তালো বা পাভেল কেউই ঘোড়ার গতিবেগ রুখতে না পেরে মেশিনগানের ওপরে একেবারে মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে পড়েছে। অফিসারটি পিস্তলের গুলি ছুঁড়ল পাভেলকে লক্ষ্য করে—কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পাভেলের গাল ঘেঁষে গুলিটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল, পরমুহূর্তেই অফিসারটির মাথা ঠুকে গেল পাথর-বাঁধানো রাস্তার ওপরে—ঘোড়াটার গতিবেগের ধাক্কায় সে চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মেশিনগানটা বর্বর আর উন্মত্তভাবে দ্রুত-ক্রমান্বয়ে গর্জে উঠল আর ডজনখানেক গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল তোপ্‌তালো আর তার কালো ঘোড়াটা।

পাভেলের ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর করে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে একটা আতঙ্কের হাঁক ছেড়ে ওই দু'জনের প্রাণহীন দেহের ওপর দিয়ে একটা লাফ মেরে এসে পড়ল মেশিনগানের লোকগুলির ওপরে। পাভেলের তলোয়ারটা শূন্যে একটা ঝিলিক তুলে বেঁকে নেমে এসে একটা নীল রঙের চৌকোনা ফৌজী টুপির মধ্যে কেটে বসে গেল।

আরেকবার ঝলকানি দিয়ে ওপরে উঠে এল তলোয়ারটা আরেকটা মাথার ওপরে নেমে আসার জন্যে তৈরি হয়ে, কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়াটা লাফিয়ে পড়ল একপাশে।

ততক্ষণে পুরো স্কোয়াড্রনটা বন্যায় ফুঁসে ওঠা পাহাড়ী নদীর মতো রাস্তায় নেমে এসেছে—অসংখ্য তলোয়ারের ফলা ঝিকিয়ে উঠেছে শূন্যে।

জেলখানার লম্বা সরু বারান্দাগুলোয় চিৎকারের প্রতিধ্বনি।

যন্ত্রণাবিদ্ধ শীর্ণ-মুখ মেয়ে-পুরুষে গাদাগাদি ঠাসা ছোট ছোট জেল-কুঠরিগুলোয় দারুণ চাঞ্চল্য। শহরে যে লড়াই চলেছে তার আওয়াজ তারা শুনছে—তার মানে কি মুক্তি? শহরের বুকে হঠাৎ নেমে-আসা এই বাহিনী কি এসেছে তাদের মুক্তি দিতে?

জেলের আঙিনাটায় গুলি চলছে। লোকজন ছোটাছুটি করছে বারান্দা বেয়ে। আর তারপরেই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি শোনা গেল, 'কমরেডসব, তোমরা মুক্ত!'

পাভেল ছুটে গেল একটা তালাবন্ধ দরজার কাছে—দরজাটার গায়ে ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে অনেক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে। ভীষণ জোরে তালাটার ওপরে পাভেল তার রাইফেলের কুঁদোটা দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগল।

পাভেলকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মিরোনভ তার পকেট থেকে একটা হাত-বোমা বের করে বলল, 'দাঁড়াও, একটা বোমা ফাটিয়ে ভাঙি ওটাকে।'

তাদের দলের কম্যান্ডার ৎসিগারচেঙ্কো তার হাত থেকে বোমাটা ছিনিয়ে নিল, 'থামো, থামো, আহাম্মক কোথাকার! পাগল না-কি? এক্ষুণি চাবি নিয়ে এসে পড়বে। ভাঙতে না পারলে চাবি দিয়েই খোলাব।'

জেলখানার প্রহরীদের ততক্ষণে বারান্দা দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে রিভলভার উ'চিয়ে ধরে। তারপরে জেলখানার বারান্দা ভরে উঠল ছেঁড়া পোশাক-পরা, নোংরা, আনন্দে উন্মত্ত মেয়ে-পুরুষের ভীড়ে।

জেল-কুঠরিটার দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ধরে পাভেল ছুটে ভেতরে ঢুকল, 'কমরেড, মুক্ত তোমরা! আমরা বুদিওনির সৈনিক—আমাদের ফৌজ শহর দখল করে নিয়েছে!'

একটি মেয়ে জল-ভরা চোখে পাভেলের কাছে ছুটে এসে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা এই পাথুরে আঁধার কুঠরিগুলোয় পুরে দিয়েছিল পাঁচ হাজার একাত্তর জন বলশেভিককে আর লাল ফৌজের দু'হাজার রাজনীতিক কর্মীকে—এরা সবাই গুলিতে কিংবা ফাঁসিতে মরবার অপেক্ষায় ছিল; এদের উদ্ধার করতে পারাটা এই সৈন্যদলের যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধে জিতে-নেওয়া সমস্ত জিনিসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যুদ্ধজয়ের চেয়েও এটা ঢের বড়ো পুরস্কার। সাত হাজার

বিপ্লবীর চোখে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার কেটে গিয়ে ফুটে উঠল জুন মাসের উষ্ণ দিনের সূর্যের উজ্জ্বলতা।

একজন বন্দী আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটে এল পাভেলের কাছে, তার গায়ের চামড়াটা শুকনো লেবুর রঙের মতো বিবর্ণ। সে হল সামুইল লেখের -শেপেতোভ্কার সেই ছাপাখানার একজন কম্পোজিটর।

সামুইলের মুখে তার নিজের শহরের নিদারুণ রক্তাক্ত ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে পাভেলের মুখ কালো হয়ে উঠল। প্রত্যেকটা কথা যেন হৃৎপিন্ডের মধ্যে আগুনে গলানো ধাতুর মতো কুরে কুরে দিচ্ছে।

'রাত্রিবেলায় এসে ওরা আমাদের গ্রেপ্তার করল—আমাদের সবাইকে একসঙ্গে। কোনো হারামজাদা আমাদের ফাঁস করে দিয়ে এসেছিল সামরিক পুলিসের কাছে। একবার ওদের হাতের মুঠোয় পড়লেই আর ওদের দয়ামায়া নেই। জানো পাভেল, সাংঘাতিক মারধোর করল আমাদের। আমার তো তবু অন্যদের চেয়ে কম কষ্ট হয়েছে, কারণ গোটা কতক ঘুসি খেয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু অন্যরা আমার চেয়ে শক্তসমর্থ ছিল।

'গোপন করার কিছুই ছিল না আমাদের। ওরা সবই আমাদের চেয়েও ভালো জানত। আমরা যা যা বন্দোবস্ত করেছিলাম তার সবই ওরা জানত। আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক ছিল, সুতরাং এতে আর বিস্ময়ের কী আছে! সে সব দিনের কথা বলতেও আমার কষ্ট হয়, পাভেল। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের অনেককেই তুমি জানো। ভালিয়া ব্রুঝাক্, আব রেজা গ্রিৎস্মান—চমৎকার মেয়ে, সবে সতেরো বছরে পা দিয়েছে, কী সুন্দর বিশ্বাসে ভরা ওর চোখ দুটি ছিল, পাভেল। তারপর সাশা বুনশাফ্ৎ, তুমি তো চেনো তাকে,

আমাদের কম্পোজিটরদের মধ্যে একজন, আমুদে ছেলেটা, সব সময় ছাপাখানার মালিককে ব্যঙ্গ করে ছবি আঁকত। তাকে আর হাই ইস্কুলের দু'জন ছাত্র নভোসেল্‌স্কি আর তুঝিৎস্‌কে গ্রেপ্তার করেছিল—এদেরও তুমি চেনো। অন্যরাও সবাই স্থানীয় কিংবা জেলা সদরের লোক। সব-শুদ্ধ ঊনত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়—তাদের মধ্যে ছ'জন মেয়ে। প্রত্যেকের ওপরেই পাশব অত্যাচার করা হয়। প্রথম দিনেই ভালিয়া আর রোজাকে ধর্ষণ করল। জানোয়ারগুলো যতো রকমে পারে বেচারীদের ওপর অত্যাচার চালায়, তারপরে মুমূর্ষু অবস্থায় ওদের জেল-কুঠরিতে টেনে-হিঁচড়ে এনে ফেলে যায়। ঘটনাটার পরেই রোজা প্রলাপ বকতে শুরু করে আর দিন কয়েকের মধ্যে তার মাথা খারাপ হয়ে যায় একেবারে।

'ও পাগল হয়ে গেছে সেটা ওরা বিশ্বাস করল না। বলল, ওটা রোজার ভান মাত্র। আর প্রতি বার ওকে জেরা করার সময়ে নির্মমভাবে মার দিত। রোজাকে শেষ পর্যন্ত ওরা যখন গুলি করে মারল, তখন কী সাংঘাতিক চেহারা হয়েছিল তার! মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল মারের দাগে, উন্মত্ত চোখ দুটিতে তাকে দেখাতো বুড়ির মতো।

'ভালিয়া ব্রুঝাক্‌ শেষ অবধি চমৎকার বীরত্ব দেখিয়েছে। ওরা সবাই সত্যিকারের সংগ্রামী সৈনিকের মতো প্রাণ দিয়েছে। জানি না কোথা থেকে ওরা এতো সহ্য করার শক্তি পেয়েছিল। ওঃ পাভেল, ওদের মৃত্যুর ঘটনা কী করে বর্ণনা করব? বড়ো বীভৎস সেই মৃত্যু!

'ভালিয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের কাজ করছিল: পোলিশ সদর ঘাঁটির বেতার-অপারেটরদের সঙ্গে আর জেলা সদরে আমাদের লোকদের সঙ্গে ভালিয়া যোগাযোগ রাখত। তাছাড়া, ওরা ওর বাড়ি তল্লাশি করার সময়ে দুটো হাত-বোমা আর

একটা পিস্তল পেয়েছিল। হাত-বোমা দুটো ওকে দিয়েছিল সেই উস্কানিদাতা দালাল। সবকিছুই এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে সদর ঘাঁটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল বলে ওদের অভিযুক্ত করা যায়।

'উঃ পাভেল, শেষের সেই দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, তুমি পীড়াপীড়ি করছ বলেই বলছি। সামরিক আদালতে ভালিয়াকে এবং আর-দু'জনকে ফাঁসি দেবার আর বাকি সবাইকে গুলি করে মারবার হুকুম হল।

'পোলিশ সৈন্যদের মধ্যে যারা আমাদের পক্ষে কাজ করত, তাদের বিচার দু'দিন আগে হয়ে গিয়েছিল।

'কর্পোরাল স্নেগুরকো—অল্পবয়েসী একজন বেতার-অপারেটর, যুদ্ধের আগে লদ্‌জ-এ ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করত—তাকে দেশদ্রোহ আর সৈন্যদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রচার চালানোর অভিযোগে গুলি করে মারবার হুকুম হল। সে আপীল করে নি, হুকুম হবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেই গুলিতে মারা পড়ল।

'তার বিচারের সময় ভালিয়াকে সাক্ষী দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সে আমাদের বলেছিল—স্নেগুরকো কমিউনিস্ট প্রচার চালানোর অভিযোগটা স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু দেশের প্রতি বেইমানি করেছে—এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। সে বলেছিল, 'পোলিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই আমার স্বদেশ। হ্যাঁ, আমি পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হয়েছে এবং সৈন্যদলে ঢোকার পর আমার মতো অন্যান্য যারা লড়াই করবার জন্যে ফ্রন্টে চালান হয়ে এসেছে, তাদের চোখ খুলে দেবার জন্যে আমি

আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই করেছি। এর জন্যে তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পার, কিন্তু দেশদ্রোহী হিসেবে নয়—দেশদ্রোহী আমি কিছুতেই নই, কখনো হবোও না। তোমাদের স্বদেশ আর আমার স্বদেশ এক নয়। তোমাদের দেশ ধনীদের, আমার দেশ চাষী-মজুরদের মাতৃভূমি। এবং আমার সেই স্বদেশে — যে স্বদেশ একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস — সেই স্বদেশে আমাকে কেউ কোনদিন দেশদ্রোহী বলবে না।'

'দণ্ড ঘোষণার পর আমাদের সবাইকে একসঙ্গে রাখা হয়েছিল। মারবার আগে আমাদের জেলে বদলি করে দেওয়া হল। রাত্রিবেলায় ওরা হাসপাতালের পাশে জেলখানার সামনের দিকটায় ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করল। গুলি করে মারবার জন্যে বনের ওধারে রাস্তার কাছাকাছি একটা বড়ো খানা-মতো জায়গা বেছে নিল। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে গোর দেবার জন্যে একটা বড়ো কবর খোঁড়া হল।

'মৃত্যুদণ্ডের খবরটা সারা শহরে বিজ্ঞপ্তি লটকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সবাই জানতে পারে। জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই পোলিশরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের মারবার ব্যবস্থা করেছিল। সকাল থেকেই তারা সেই জায়গাটায় শহরের লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে আসতে শুরু করে দিল। কেউ কেউ গেছে কৌতূহলের বশে — যদিও দৃশ্যটা বড়ো সাংঘাতিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল-দেয়ালের বাইরে জমে উঠেছে একটা বিরাট ভিড়। আমাদের কুঠুরির মধ্যে থেকে তাদের গুঞ্জনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জনতার পেছনে রাস্তার ওপরে ওরা সব মেশিনগান খাড়া রেখেছে। সমস্ত জায়গা থেকে ঘোড়সওয়ার-সান্ত্রী আর সাধারণ সেপাইদের এনে মোতায়েন করেছে। গোটা একটা ব্যাটালিয়ন লাগিয়েছে রাস্তাগুলো আর

আশেপাশের ক্ষেত-বাগানগুলো ঘিরে রাখবার জন্যে। যাদের ফাঁসি হবে, তাদের জন্যে মঞ্চটার পাশে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

'নিঃশব্দে আমরা শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি। মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছি নিজেদের মধ্যে। পরস্পরকে যা বলার ছিল সবই আমাদের আগের রাত্রে বলা হয়ে গেছে, বিদায়ও নিয়ে রেখেছি। শুধু কুঠুরিটার এক কোণে বসে রোজা আপন মনে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। ভালিয়া এতদিন ধরে নিদারুণ মারধোর আর অত্যাচার সয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে -- নড়াচড়া করতে পারছে না বলে চুপ করে শুয়ে আছে বেশির ভাগ সময়। স্থানীয় দু'জন কমিউনিস্ট মেয়ে --- এরা দুই বোন -- পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শেষ বিদায় নেবার সময় চোখের জল আর সামলাতে পারে নি। গ্রামের একজন জোয়ান তরুণ স্তেপানভ --- ওকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দু'জন সামরিক পুলিস ঘায়েল হয়েছিল ওর হাতে -- সে এগিয়ে এসে বোন দুটিকে বলল, 'কান্না নয়, কমরেড! এখানে কেঁদে যাও, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ওখানে যেন কেঁদো না। ওই হারামজাদা জানোয়ারগুলোকে হাসাহাসি করার সুযোগ যেন আমরা না দিই। ওরা তো কিছুতেই কোনরকম দয়া দেখাবে না। মরতেই হবে আমাদের, সুতরাং সুন্দরভাবে মরব। নতজানু হব না আমরা। মনে রেখো কমরেডসব, আমরা মাথা উঁচু করে মরব।'

'তারপর ওরা আমাদের নিতে এল। সবার আগে শ্ভারকোভ্স্কি -- গোয়েন্দা-কর্তা, পাগলা কুত্তার মতো, নির্যাতন চালিয়ে আনন্দ পায়। নিজে যখন ধর্ষণ করে না, তখনও সে তার পুলিসদের ধর্ষণ করতে দিয়ে দেখে মজা উপভোগ করে। রাস্তার উপর দুই সারি পাহারাওলার মাঝখান

দিয়ে আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হল ফাঁসি-মঞ্চটার কাছে। এই সামরিক পাহারাওলাদের কাঁধের ওপর হলদে রঙের পটি দেখে আমরা নাম দিয়েছিলাম 'ক্যানারি' পাখি। খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে 'ক্যানারিরা' দাঁড়িয়ে ছিল।

'রাইফেলের গুঁতোয় ঠেলে ওরা আমাদের জেল-আঙিনাটায় বের করে এনে এক-এক সারিতে চারজন করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপরে ফটক খুলে রাস্তায় বের করে এনে ফাঁসি-মঞ্চের দিকে মুখ করে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল যাতে নিজের নিজের পালা আসার আগে আমরা আমাদের কমরেডদের মরণটা দেখতে পাই। মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি উঁচু ফাঁসি-মঞ্চ। মাথার ওপরে আড়কাঠটা থেকে ফাঁস লাগানো তিনটে ভারি দড়ি ঝুলছে। ফাঁসের নিচে সিঁড়িওয়ালা একটা মঞ্চ, কাঠের ছোট খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া, যাতে সেটাকে পায়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায়। উত্তাল জনসমুদ্র থেকে একটা ক্ষীণ গুঞ্জন উঠছে। প্রত্যেকের দৃষ্টি আমাদের ওপর আটকে গেছে যেন। আমাদের কিছু লোককে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম।

'কিছু দূরে একটা উঁচু বারান্দায় একদল পোলিশ অভিজাত আর অফিসার দূরবীন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলশেভিকদের ফাঁসি দেখতে এসেছে ওরা।

'পায়ের নিচে বরফ নরম ঠেকল। বনটা বরফে শাদা হয়ে আছে, পেঁজা তুলোর মতো ঘন তুষারে ঢাকা পড়েছে গাছগুলো। তুষারের কণাগুলো ধীরে পাক খেয়ে খেয়ে আমাদের উত্তপ্ত মুখের ওপর পড়ে গলে যাচ্ছে, ফাঁসি-মঞ্চের সিঁড়িগুলো বরফের গালিচায় ঢেকে গেছে। আমাদের গায়ে জামা-কাপড় সামান্যই, কিন্তু কেউই ঠাণ্ডা বোধ করছি না। স্তেপানভ লক্ষ্যই করে নি যে সে খালি মোজা-পায়ে চলেছে।

'ফাঁসি-মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক অভিশংসক আর বড় বড় অফিসার। শেষ পর্যন্ত ভালিয়াকে আর অন্য যে-দু'জন কমরেডকে ফাঁসি দেওয়া হবে, তাদের বের করে আনা হল জেলখানা থেকে। ওরা তিনজনেই হাত ধরাধরি করে আসছে। ভালিয়াকে মাঝখানে ধরে দু'পাশে দু'জন নিয়ে আসছে, কারণ তার নিজে হেঁটে আসার শক্তি নেই। কিন্তু, 'সুন্দরভাবে মরব আমরা, কমরেড!' স্তেপানভের সেই কথা মনে রেখে সে প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখবার চেষ্টা করছে। একটা পশমের কোর্তা তার গায়ে, কিন্তু কোট নেই।

'ওদের হাত ধরাধরি করে আসাটা যে শ্ভারকোভ্স্কির পছন্দ হয় নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল, কারণ সে ওদের পেছন দিক থেকে ঠেলা দিল। ভালিয়া কী যেন বলে উঠতেই একজন ঘোড়সওয়ার সেপাই তার মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে চাবুক কষিয়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি স্ত্রীলোক আর্তচিৎকার করে পাগলের মতো ছটফট করেছে সান্ত্রীদের বেড়া ভেঙে বন্দীদের কাছে আসার চেষ্টায়। কিন্তু ওকে ধরে টেনে সরিয়ে দেওয়া হল। সে নিশ্চয়ই ভালিয়ার মা। ওরা ফাঁসি-মঞ্চের কাছাকাছি আসতেই ভালিয়া গাইতে শুরু করল। এমন স্বর আর কখনও শুনি নি -- মৃত্যুর মুখে যে এগিয়ে চলেছে কেবল সে-ই ওরকম আবেগ দিয়ে গাইতে পারে। ভালিয়া গাইছিল 'ভার্শাভিয়াঙ্কা' গানটা, তার সঙ্গে অন্য দু'জনও গলা মেলাল। ঘোড়সওয়ার পাহারাওলারা মত্ত আক্রোশে চাবুক চালাতে লাগল, কিন্তু ওদের তিন জনের গায়ে লাগছে বলেই মনে হল না। মাটিতে পেড়ে ফেলে ওদের বস্তার মতো টেনে নিয়ে তোলা হল ফাঁসি-মঞ্চে। হুকুমনামাটা তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার পরেই ওদের গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল। সেই মুহূর্তে আমরা গাইতে শুরু করলাম:

'চারদিক থেকে সেপাই-সান্ত্রীরা ছুটে এল আমাদের দিকে; শুধু এইটুকু দেখতে পেলাম — মঞ্চের নিচে ঠেকা দেওয়া কাঠের খুঁটিটা রাইফেলের কুঁদোয় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল আর তিনটে দেহ দড়ির ফাঁসে আটকে গিয়ে কেঁপে উঠল...

'বাদবাকি আমাদের সবাইকেই দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন সময়ে ঘোষণা হল যে আমাদের মধ্যে দশ জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে কুড়ি বছর করে কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছে। বাকি ষোল জনকে গুলি করে মারা হল।'

সামুইল তার জামার কলারটা চেপে টানল — যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে তার।

'তিন দিন ধরে ওদের দেহ ওইখানে দড়ির ফাঁসে ঝুলে রইল। দিন-রাত্রি পাহারা দিত ফাঁসি-মঞ্চটাকে। তারপরে আর একদল নতুন বন্দী জেলখানায় এসে আমাদের বলল, চারদিনের দিন কমরেড তবোল্‌দিনের দেহটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায়— তবোল্‌দিন ওদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভারি ছিল। তারপরে ওরা বাকি দু'জনকেও নামিয়ে নিয়ে সবাইকেই সেইখানেই গোর দিয়েছে।

'কিন্তু ফাঁসি-মঞ্চটাকে নামিয়ে নেওয়া হয় নি। আমাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা খাড়া ছিল। নতুন শিকারের জন্যে সেটা দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।'

চুপ করে সামুইল দৃষ্টিহীন অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে — কিন্তু পাভেলের খেয়াল নেই যে তার বলা শেষ হয়ে গেছে। তিনটি দেহ দড়িতে লটকানো আর মাথাটা ভয়ংকরভাবে একপাশে হেলে যাওয়া অবস্থায় নিঃশব্দে ঝুলতে থাকল তার চোখের সামনে।

বাইরে সমস্ত সৈন্যকে জড়ো হবার আহ্বান জানিয়ে বিউগ্‌ল্‌

বেজে উঠতেই পাভেল চমকে সচেতন হয়ে উঠল। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় সে বলল, 'চলো সামুইল, যাওয়া যাক।'

সারি দিয়ে ঘোড়সওয়ার দাঁড়ানো রাস্তা দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একসারি পোলিশ বন্দীকে। জেলখানার ফটকে দাঁড়িয়ে রেজিমেণ্টের কমিশার কাগজের প্যাডে একটা হুকুম লিখে নিচ্ছে।

একজন খাটো চওড়া-কাঁধ স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারকে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'কমরেড আন্তিপভ্, এটা নাও, আর, সমস্ত বন্দীকে নিয়ে যাও নভোগ্রাদ-ভলিনস্কির দিকে ঘোড়সওয়ার-পাহারায়। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে কি-না দেখো। তারপরে তাদের গাড়িতে তুলে সেই একই দিকে পাঠাও। শহর থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও। ওদের নিয়ে ঝামেলা সওয়ার মতো সময় আমাদের নেই। কিন্তু বন্দীদের ওপর কোনরকম দুর্ব্যবহার চলবে না কিছুতেই।'

ঘোড়াটায় চেপে বসে পাভেল সামুইলের দিকে ফিরে তাকাল, 'শুনলে তো? ওরা আমাদের লোকজনকে ফাঁসি দেয়, কিন্তু সেই আমরাই ওদের আবার পাহারাধীনে পৌঁছে দিই ওদের স্বপক্ষের লোকজনের কাছে, আর তাছাড়া, ভালো ব্যবহারও করি। কোত্থেকে শক্তি পাই তার জন্য?'

রেজিমেণ্টের কমিশার ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল। পাভেল শুনল, সে যেন নিজেকেই বলছে, 'নিরস্ত্র কয়েদীর ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করার শাস্তি — মৃত্যু। আমরা শ্বেতরক্ষী নই!'

ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে যেতে পাভেলের মনে পড়ল ফৌজের সবাইকে যেটা পড়ে শোনানো হয়েছিল সেই বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নির্দেশনামার শেষ কথাগুলো:

'শ্রমিক-কৃষকের এই দেশ তার লাল ফৌজকে ভালবাসে, তার জন্যে গর্ব বোধ করে। সেই ফৌজের পতাকায় একটাও কালো দাগ লাগতে দেওয়া চলবে না।'

আপন মনেই বলে উঠল পাভেল, 'একটাও কালো দাগ লাগতে দেওয়া চলবে না।'

চার-নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন যখন জিতোমির দখল করে নিচ্ছে, তখন সাত-নম্বর রাইফেল ডিভিশনের কুড়ি-নম্বর ব্রিগেড কমরেড গোলিকভের নেতৃত্বাধীন একটা আক্রমণকারী দলের অংশ হিসেবে ওকুনিনোভো গ্রামের এলাকায় নীপার নদী পার হচ্ছিল।

পঁচিশ-নম্বর রাইফেল ডিভিশন এবং একটা বাশ্‌কির ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড নিয়ে গড়া আর একটা বাহিনীর ওপর নির্দেশ আছে — নীপার পার হয়ে ইর্‌শা স্টেশনের কাছে কিয়েভ—কোরোস্তেন্‌ রেল-লাইনটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই কাজটা করতে পারলে কিয়েভ থেকে পোলিশদের পিছু হঠে যাবার একমাত্র পথটা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই নদী পার হবার সময়েই শেপেতোভ্‌কা কমসোমল সংগঠনের সভ্য মিশা লেভ্‌চুকভ মারা পড়ল। নড়বড়ে ভাসমান সাঁকোটার ওপর দিয়ে তারা দৌড়ে চলেছে, এমন সময় নদীর ওপারে খাড়া পাড়টার কোনো জায়গা থেকে ছোঁড়া একটা গোলা মাথার ওপর দিয়ে বিশ্রী ভাবে শিস কেটে নদীতে এসে পড়ল জলটা তোলপাড় করে দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিশা অদৃশ্য হয়ে গেল সাঁকোর একটা ভেলার নিচে। নদী গ্রাস করে নিল তাকে — ফিরিয়ে দিল না। ইয়াকিমেঙ্কো নামে একজন ছেঁড়া টুপি পরা সোনালী চুলওয়ালা সৈন্য চেঁচিয়ে উঠল, 'মিশ্‌কা! আরে, ও যে মিশ্‌কা! পাথরের

মতো ডুবে গেল, বেচারি!' এক মুহূর্ত সে আতঙ্কভরা চোখে কালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তার পেছনে যারা দৌড়ে আসছে তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল সামনে. 'হাঁ করে ওখানে দেখছ কী, মুখ্যু কোথাকার! এগিয়ে চলো!'

কারুর জন্যে অপেক্ষা করবার অবসর নেই -- ব্রিগেডটা এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছে, আর-সবাই ইতিমধ্যেই নদীর ডান পাড়টা দখল করে নিয়েছে।

সের্গেই মিশার মৃত্যুর খবরটা জানতে পারে চার দিন পরে। ততদিনে ব্রিগেডটা বুচা স্টেশন দখল করে নেবার পর কিয়েভের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পোলিশদের প্রচণ্ড আক্রমণ রুখছে। ওরা কোরোস্তেনের ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

সামনের সারিতে যারা গুলি ছুঁড়ছে, তাদের মধ্যে সের্গেইয়ের পাশে মাটির ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে ইয়াকিমেঙ্কো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে। ফলে, তার রাইফেলটা এখন বড়ো বেশি গরম হয়ে গেছে -- বল্টুটাকে ঠেলে পেছন দিকে সরাতে গিয়ে মুশকিল হচ্ছে। মাথাটা সাবধানে নিচু করে রেখে সের্গেইয়ের দিকে ফিরে সে বলল, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিতে হবে রাইফেলটাকে। তেতে লাল হয়ে গেছে একেবারে!'

গুলির আওয়াজের মধ্যে সের্গেই কোনমতে শুনতে পেল তার কথাটা। আওয়াজ একটু কমে এলে ইয়াকিমেঙ্কো যেন নেহাত প্রসঙ্গক্রমেই কথাটা বলল, 'তোমার কমরেড নীপারে ডুবে মারা গেছে। আমি কিছু করতে পারার আগেই সে তলিয়ে যায়।' এইটুকুই শুধু সে বলল। রাইফেলের বল্টুটা পরখ করে নিয়ে আরেকটা ক্লিপ বের করে নিয়ে সে বন্দুকটায় আর এক দফা গুলি ভরতে লাগল।

বের্দিচেভ দখল করার জন্যে যাদের পাঠানো হয়েছিল, সেই এগারো-নম্বর ডিভিশনটা পোলিশদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ল। রক্তাক্ত লড়াই চলল শহরের রাস্তায় রাস্তায়। মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণের মধ্যে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়াররা এগুতে থাকল। তবুও শহর দখল হয়ে গেল, বিপর্যস্ত পোলিশ ফৌজের অবশেষটা পালিয়ে গেল। ট্রেনগুলো রেল-স্টেশনে অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু পোলিশদের সবচেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি হল গুলি-গোলা মজুদ করা একটা গুদাম উড়ে যাবার ফলে—তাদের গোটা ফ্রণ্টে গুলি-গোলা সরবরাহ করা হচ্ছিল এখান থেকে। লক্ষ লক্ষ গোলা শূন্যে ছিটকে উঠল। বিস্ফোরণের ফলে জানলার শার্সিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল।

জিতোমির আর বের্দিচেভ দখল হয়ে যাবার ফলে পোলিশরা তাদের পশ্চাদ্ভাগে একটা বড়ো রকম ঘা খেল। দু'দিক দিয়ে দুটো স্রোতের মতো তারা কিয়েভ থেকে বেরিয়ে আসছে—চারপাশের ইস্পাতের বেষ্টনীর ভেতর থেকে পথ কেটে বেরুবার জন্যে তারা বেপরোয়া হয়ে লড়ছে।

যুদ্ধের এই ঝোড়ো ঝাপটায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে পাভেলের কাছে ইদানীং তার নিজের চিন্তাটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে গেছে। তার ব্যক্তিসত্তা মিশে গেছে সমষ্টির মধ্যে। প্রত্যেকটি সংগ্রামী সৈনিকের মতোই, পাভেলও 'আমি' কথাটি ভুলে গেছে; বাকি থাকল শুধু 'আমরা' — আমাদের ফৌজ, আমাদের পল্টন, আমাদের ব্রিগেড।

ঘূর্ণিবাত্যার মতো প্রচণ্ড বেগে চলেছে ঘটনাপ্রবাহ। প্রত্যেকটা দিন বয়ে আনে নতুন কিছু।

আঘাতের পর আঘাত হেনে পোলিশদের গোটা পশ্চাদ্ভাগ

একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বুদিওনির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী -- পাহাড় ভেঙে নেমে আসা তুষারস্তূপের মতো। জয়ের পর জয়ের উত্তেজনায় মাতাল ঘোড়সওয়ারের ডিভিশনগুলো নিদারুণ একটা প্রচণ্ডতা নিয়ে পোলিশদের পশ্চাদ্‌ভাগের একেবারে কেন্দ্রে নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির ওপরে নেমে এসেছে।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন খাড়া পাহাড়ের পাথুরে তীরের বুকে আছড়ে পড়ে, পিছিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম তারা মাঝে মাঝে পিছিয়ে আসছে, তারপর আক্রমণ করবারই জন্যে এগিয়ে গিয়ে নিদারুণ চিৎকারে বলে উঠছে 'এগিয়ে চলো! আরও এগিয়ে!'

কিছুতেই রক্ষা পেল না পোলিশরা — কাঁটাতারের বেড়াজালেও না, শহরে ঘাঁটি গেড়ে মোতায়েন বাহিনীর বেপরোয়া প্রতিরোধেও না। সাতাশে জুন সকালে বুদিওনির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী ঘোড়া থেকে না নেমেই স্লুচ্‌ নদী পার হয়ে এসে নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পোলিশদের তারা শহর থেকে বের করে দিয়ে কোরেৎসের দিকে হাঁকিয়ে দিল। সেই একই সময়ে পঁয়তাল্লিশ-নম্বর ডিভিশন নোভি-মিরোপোলের কাছে স্লুচ্‌ নদী পার হয়ে এল এবং কতোভ্‌স্কির ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড ছোট শহর লিউবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির বেতারকেন্দ্র ফ্রন্টের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে একটা নির্দেশ পেল - রোভ্‌নো দখল করবার জন্যে তাদের পুরো ঘোড়সওয়ার ফৌজকে লাগাতে বলা হচ্ছে। লাল ফৌজের ডিভিশনগুলির দুর্নিবার আক্রমণে পোলিশরা ভগ্নোদ্যম আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

এই উদ্দাম দিনগুলোর মধ্যে একদিন একজনের সঙ্গে অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিতভাবে পাভেল করচাগিনের দেখা হয়ে গেল। তাদের ব্রিগেডের অধিনায়ক তাকে স্টেশনে পাঠিয়েছিল, সেখানে একটা সাঁজোয়া রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া হাঁকিয়ে খাড়া রেল-বাঁধের ওপর উঠে সে ইস্পাত-ধূসর রেল-কামরাটার সামনে লাগাম টানল। কামানের কালো নলগুলো গাড়িটার কামান-বুরুজের মধ্যে লুকিয়ে আছে, সাঁজোয়া ট্রেনটাকে ভয়ংকর আর দুর্ভেদ্য বলে মনে হচ্ছে। গাড়িটার চাকা ঢেকে রাখা ভারি ইস্পাতের সাঁজোয়া-পাতটা তুলে ধরে জনকতক লোক তেল-লাগা পোশাকে কাজ করছিল।

চামড়ার কোর্তা পরা লাল ফৌজের একজন এক-বাল্তি জল বয়ে আনছিল, তার কাছে গিয়ে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'এই ট্রেনের কম্যান্ডার কোথায়?'

ইঞ্জিনটার দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, 'ওইখানে।'

ইঞ্জিনের কাছে ঘোড়া থামিয়ে পাভেল বলল, 'আমি কম্যান্ডারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

বসন্তের দাগওয়ালা-মুখ আপাদমস্তক চামড়ায় ঢাকা একজন লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমিই কম্যান্ডার।'

পাভেল পকেট থেকে একটা খাম বের করল, 'আমাদের ব্রিগেডের অধিনায়ক এই নির্দেশনামাটা দিয়েছেন। খামটা সই করে দিন।'

কম্যান্ডার খামটা হাঁটুর ওপরে রেখে নাম সই করে দিল। একজন লোক একটা তেলের টিন নিয়ে ইঞ্জিনের মাঝখানের চাকাটায় কাজ করছিল। পাভেল শুধু তার চওড়া পিঠের দিকটা আর তার চামড়ার পাতলুনের পকেট থেকে বেরিয়ে পড়া পিস্তলের বাঁটটা দেখতে পাচ্ছিল।

ট্রেন-কম্যান্ডার খামটা পাভেলের হাতে ফিরিয়ে দেবার পর সে লাগাম টেনে রওনা হতে যাবে, এমন সময় তেলের টিন

হাতে লোকটা খাড়া হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যেন একটা ভীষণ দমকা হাওয়ার ঝাপটায় পাভেল নেমে পড়ল তার ঘোড়ার ওপর থেকে।

'আরতিওম!'

লোকটা চটপট মাটিতে রাখল তেলের টিনটা। ভালুকের মতো সর্বাঙ্গ দিয়ে সে তরুণ লাল ফৌজের সৈনিকটিকে জড়িয়ে ধরল।

'পাভকা! আরে হতভাগা! তুই!' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে সে চিৎকার করে উঠল।

সাঁজোয়া ট্রেনের কম্যান্ডার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, আর জনকতক গোলন্দাজ পাশে দাঁড়িয়ে হাসি-মুখে দেখছিল দুই ভাইয়ে হঠাৎ দেখা হবার আনন্দের দৃশ্যটা।

উনিশে অগস্ট ল্‌ভোভ্‌ অঞ্চলে একটা যুদ্ধ চলার সময়ে ব্যাপারটা ঘটল। লড়াইয়ের সময়ে টুপিটা হারিয়ে ফেলে পাভেল তার ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরেছে। সামনের স্কোয়াড্রনগুলো ইতিমধ্যেই পোলিশ বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেছে। এমন সময়ে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে দেমিদোভ এসে পাভেলের পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের ডিভিশনের কম্যান্ডার মারা পড়েছেন!'

চমকে উঠল পাভেল। তার আদর্শ বীর কম্যান্ডার লেতুনভ, অসীম বীরত্বে ভরা মানুষটি মারা পড়েছেন! একটা উন্মত্ত ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল।

তলোয়ারটার উল্টো পিঠ দিয়ে সে তার ঘোড়া গ্নেদ্‌কোকে তাড়া দিল--ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার মুখের দুই পাশে লাগামে রক্তমাখা ফেনা জমে উঠেছে। তবু পাভেল তার পিঠে চেপে লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'মেরে ফেল, খতম করে ফেল নরকের কীটগুলোকে! এইসব পোলিশ শ্লিয়াখ্‌তাকে দাও শেষ করে! ওরা লেতুনভকে মেরে ফেলেছে!' অন্ধের মতো সে তলোয়ারের চোট বসিয়ে দিল সবুজ উর্দি-পরা একটা লোকের ওপর। ডিভিশনের কম্যান্ডারের মৃত্যুতে উন্মাদ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে লাল ফৌজের ঘোড়সওয়াররা একটা গোটা পোলিশ পল্টনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

লড়াইয়ের মাঠের ওপর দিয়ে শত্রুসৈন্যের পেছন পেছন ওরা তাড়া করে ঘোড়া হাঁকাল—কিন্তু এতক্ষণে একটা পোলিশ গোলন্দাজদল গোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। চারিদিকে মৃত্যু হেনে গোলার টুক্‌রোগুলো বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক ঝলক তীব্র সবুজ আলোর বিদ্যুৎ খেলে গেল পাভেলের চোখের সামনে। বাজের শব্দে কানে তালা ধরে গেল তার। মাথার খুলির মধ্যে ফুঁড়ে ঢুকে গেল আগুনে লাল করে তাতানো লোহার শিক। অদ্ভুতভাবে ভয়ানক রকম টলছে মাটিটা, যেন উল্টে যাচ্ছে পৃথিবীটা।

একটা কুটোর মতো পড়ে গেল পাভেল তার জিনের ওপর থেকে। সোজা গ্নেদ্‌কোর মাথার ওপর দিয়ে ধুপ্‌ করে সে মাটির ওপর গিয়ে পড়ল।

কালো রাত্রি ঘনিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে...

নবম অধ্যায়

অক্টোপাসের ঠেলে-বেরোন চোখটা বেড়ালের মাথার মতো বড়ো, জ্বলজ্বলে লাল একটা চোখ, মণিটা সবুজ, সজীব দ্যুতিতে দপদপ করছে। অক্টোপাসের কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর শুঁড়গুলো—জট-পাকানো কতকগুলো সাপের মতো কুণ্ডলী বেঁধে পাক খেয়ে এপাশ-ওপাশ করছে, কর্কশ আঁশে ঢাকা

চামড়া আতঙ্ক জাগিয়ে খসখস শব্দে নড়াচড়া করছে। নড়ে উঠল অক্টোপাসটা। একেবারে চোখের ওপরই ও যেন অক্টোপাসটাকে দেখতে পাচ্ছে। অক্টোপাসের শুঁড়গুলো এবার ওর শরীরের ওপর দিয়ে সুড়সুড় করে এগিয়ে এল। ঠাণ্ডা শুঁড়গুলোর স্পর্শে বোলতার কামড়ের যন্ত্রণা। হুল বের করে অক্টোপাসটা তার মাথার মধ্যে কামড় বসাচ্ছে ভিমরুলের মতো। পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে অক্টোপাসটা ওর রক্ত শুষে নিচ্ছে। ও স্পষ্ট অনুভব করছে--ওর দেহের রক্ত বেরিয়ে গিয়ে ঢুকছে অক্টোপাসটার ফুলে-ওঠা দেহের মধ্যে। হুলের মধ্যে দিয়ে রক্ত শুষেই চলেছে অক্টোপাসটা—কী অসহ্য রক্ত-শোষণের সেই যন্ত্রণা!

কোথায় যেন অনেক অনেক দূরে ও মানুষের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে:

'ওর নাড়িটা এখন কেমন?'

আরেকটা নারী-কণ্ঠ নরম স্বরে জবাব দিচ্ছে, 'নাড়ির গতি এক-শো-আটত্রিশ। জ্বরের তাপমাত্রা ১০৩·১। সমস্তক্ষণ ভুল বকছে।'

অক্টোপাসটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু যন্ত্রণাটা থেকে গেল। পাভেল অনুভব করল সে যেন তার মণিবন্ধটা ধরেছে। চোখ দুটো খুলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পাতা দুটো এতো ভারি যে মেলে ধরবার শক্তি নেই তার। এতো গরম লাগছে কেন? মা নিশ্চয় উনুনটায় আগুন দিয়েছে। আবার সে শুনতে পাচ্ছে সেই গলার স্বর:

'নাড়ির গতি এখন এক-শো-বাইশ।'

চোখের পাতাটা খুলবার চেষ্টা করল পাভেল—কিন্তু শরীরের ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

নিদারুণ তেষ্টা পেয়েছে — এক্ষুণি তাকে উঠে পড়ে খানিকটা জল খেতেই হবে। কিন্তু উঠছে না কেন সে? নড়তে চেষ্টা করছে — কিন্তু হাত-পাগুলো তাকে মানছে না কিছুতেই, দেহটা যেন নিজের নয়। মা তাকে এক্ষুণি খানিকটা জল এনে দেবে। মাকে বলবে পাভেল, 'জল খাব আমি।' কী যেন নড়ে উঠছে তার পাশে — অক্টোপাসটা আবার তার ওপরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে নাকি? ওই যে আসছে, লাল চোখটা তার দেখতে পাচ্ছে ও...

বহু দূর থেকে সেই কোমল গলার স্বরটা আসছে:

'ফ্রসিয়া, একটু জল আনুন!'

'কার নাম ওটা?' কিন্তু মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মানসিক অবসাদে আর একবার অন্ধকার এসে আচ্ছন্ন করল তাকে। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই তার মনে পড়ল, 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

আবার গলার স্বর শুনতে পেল:

'জ্ঞান ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

আরও কাছে, আরও স্পষ্ট সেই মিষ্টি গলার স্বর:

'জল খাবে, কমরেড?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছে না-কি? আমি কি অসুস্থ? ও হ্যাঁ, আমাকে ওই টাইফাসের অসুখে পেড়েছে।' তৃতীয় বারের মতো সে তার চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করল। এবং শেষ পর্যন্ত পারল। চেতনা ফিরে আসতেই, তার অল্প খোলা চোখের সংকীর্ণ দৃষ্টিপথে প্রথমেই নজরে পড়ল — তার মাথার ওপরে ঝুলছে একটা লাল গোল জিনিস। কিন্তু কি একটা কালো জিনিস তার দিকে ঝুঁকে এগিয়ে আসতেই তার পেছনে আড়াল হয়ে গেল ওই লাল গোল জিনিসটা। তারপর তার ঠোঁটের ওপর গেলাসের শক্ত কাচের স্পর্শ, জলের

স্পর্শ — প্রাণদায়িনী জল। শরীরের ভেতরের আগুনটা তার নিভে গেল।

তৃষ্ণা মিটতে শান্ত স্বরে ফিসফিসিয়ে পাভেল বলল, 'এবার একটু ভালো লাগছে।'

'দেখতে পাচ্ছেন আমায়, কমরেড?'

তার ওপরে ঝুঁকে পড়া সেই কালো মূর্তিটা জিজ্ঞেস করল। তারপর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে কোনরকমে বলল, 'দেখতে পাচ্ছি না, তবে শুনতে পাচ্ছি...'

'কেই বা বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে ও সামলে উঠবে? তবু ও আবার টেনে-হেঁচড়ে বেঁচে উঠেছে! অত্যন্ত মজবুত ওর শরীর। নিনা ভ্লাদিমিরভ্না, আপনি গর্ব করতে পারেন। আপনি সত্যিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

মেয়েটি অল্প একটু কেঁপে ওঠা গলায় জবাব দিল, 'ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার!'

তেরো দিন ধরে অচৈতন্য হয়ে থাকার পর পাভেল করচাগিনের জ্ঞান ফিরে এল।

তরুণ দেহখানা তার মৃত্যুকে মেনে নিতে চায় নি, ধীরে ধীরে সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। যেন নতুন করে জন্ম নেবার মতো। সবকিছু নতুন আর আশ্চর্য ঠেকছে। শুধু মাথাটা তার অনড় হয়ে পড়ে আছে — প্লাস্টারের ছাঁচে আটকানো দুর্বিষহ রকমের ভারি — মাথাটাকে নড়াবার শক্তি ওর নেই। কিন্তু অন্যান্য প্রত্যঙ্গের অনুভূতি শিগগিরই ফিরে এল, অল্প কয়েকদিনেই ও নিজের আঙুলগুলো বাঁকাতে পারল।

সামরিক ক্লিনিক্যাল হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার নিনা ভ্লাদিমিরভ্না তার ঘরে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে লাইলাক্-ফুলের মতো রঙের মলাট দেওয়া একটা মোটা

নোটবইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। নোটবইটার পাতায় পাতায় পরিষ্কার হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে সংক্ষিপ্ত নোট লেখা আছে:

২৬এ অগস্ট, ১৯২০

অ্যাম্বুল্যান্স ট্রেনে আজ কয়েকজন গুরুতর রকম আহত লোককে আনা হয়েছে। একজন আহতের মাথায় সাংঘাতিক চোট লেগেছে। কোণের দিকে জানলাটার পাশে ওকে আমরা রেখেছি। মোটে সতের বছর বয়েস। ওর পকেটে পাওয়া কাগজপত্র আর ও কীভাবে আহত হল তার পূর্ণ বিবরণ সমেত আমাকে ওরা একটা খাম দিয়েছে। ওর নাম করচাগিন, পাভেল আন্দ্রেয়েভিচ। ওর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে— ইউক্রেনের কমসোমলের বেশ জীর্ণ সভ্য-কার্ড (নং ৯৬৭), ছেঁড়া একটা লাল ফৌজের পরিচয়পত্র আর ফৌজী নির্দেশের একটা কপি, যাতে বলা হয়েছে যে লাল ফৌজের সৈন্য পাভেল করচাগিন একটা স্কাউটিংয়ের কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে করেছে বলে তাকে সাধুবাদ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে তার নিজেরই লেখা একটা নোটও আছে: 'যদি আমি মারা যাই, তাহলে দয়া করে এই ঠিকানায় আমার আত্মীয়দের চিঠি দেবেন: শেপেতোভ্‌কা শহর, ডিপো, কারিগর আরতিওম করচাগিন।'

১৯এ অগস্ট একটা গোলার টুকরোর আঘাত পাবার পর থেকেই ও অজ্ঞান হয়ে আছে। কাল আনাতোলি স্তেপানভিচ ওকে পরীক্ষা করবেন।

২৭এ অগস্ট

আজ আমরা করচাগিনের ক্ষতটা পরীক্ষা করেছি। ক্ষতটা খুব গভীর, খুলি ফেটে গেছে এবং মাথার ডান দিকের

গোটাটাই অসাড় হয়ে গেছে। ডান চোখের একটা রক্তবাহ ফেটে গিয়ে চোখটা ভয়ানক রকম ফুলে উঠেছে।

ফুলে ওঠা এড়াবার জন্যে আনাতোলি স্তেপানভিচ চোখটা তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফোলাটা কমে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হওয়ায় আমি তাঁকে সেটা না করতে মিনতি করেছি। উনি সম্মত হয়েছেন।

ছেলেটির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে — একমাত্র এই কারণেই আমি তাঁকে সেটা করতে দিই নি। ছেলেটি সেরে উঠতে পারে; সেক্ষেত্রে তার অঙ্গহানি হলে ভারি দুঃখের কারণ হবে।

ছেলেটি সমস্তক্ষণ ভুল বকছে আর ভয়ানক ছটফট করছে। আমাদের মধ্যে একজন করে সব সময় ওর বিছানার পাশে ডিউটিতে রয়েছে। আমি ওর পেছনে অনেক সময় দিই। মারা যাবার পক্ষে ওর বয়স নিতান্তই অল্প। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি মৃত্যুর মুঠো থেকে এই তরুণ প্রাণটিকে আমি ছিনিয়ে আনবই। হয়ত সফল হবো।

কাল আমার কাজের সময় শেষ হয়ে যাবার পরে ওর ওয়ার্ডে আমি কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, সেখানে ওর অবস্থাটাই সবচেয়ে গুরুতর। বসে বসে আমি ওর ভুল বকা শুনলাম। মাঝে মাঝে সেগুলো একটা গল্পের মতো শোনায় — ওর জীবনের অনেক কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ছেলেটি অতি বিশ্রীরকম গালাগাল দিতে থাকে। ওর ভাষাটা জঘন্য। ওর মুখে এরকম গালাগালি শুনে কি জানি কেন আমার বড়ো ক্ষোভ হচ্ছে। ও বাঁচবে বলে আনাতোলি স্তেপানভিচ মনে করেন না। বুড়ো মানুষটি অভিযোগের সঙ্গে সক্ষোভে বিড় বিড় করে বললেন, 'এইসব প্রায় বাচ্চাদের কেন ফৌজে আনে তা বুঝি নে। ভারি বিশ্রী ব্যাপার!'

৩০এ অগস্ট

করচাগিন এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। যেসব রুগীদের সম্বন্ধে কোনো আশা নেই, তাদের যে ওয়ার্ডে পাঠানো হয়, তাকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে। নার্স ফ্রসিয়া প্রায় সদাসর্বদাই তার পাশে আছে। দেখা গেল, সে ছেলেটিকে চেনে। এক সময়ে ওরা একসঙ্গে কাজ করেছে। কী অসীম যত্ন করছে সে ছেলেটাকে! এখন আমিও বুঝছি তার কোন আশাই নেই।

২রা সেপ্টেম্বর

রাত ১১টা। আজ আমার বড় চমৎকার দিন। আমার রুগী করচাগিন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সংকট কেটে গেছে। গত দু'দিন আমি বাড়ি ফিরি নি, হাসপাতালেই সমস্তক্ষণ কাটিয়েছি।

আরও একটি জীবন রক্ষা পেল এতে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের ওয়ার্ডে একটা মৃত্যুর সংখ্যা কমল। আমার এই দারুণ খাটুনির কাজে একজন রুগীর সেরে ওঠাটাই সবচেয়ে ভালো ব্যাপার। ওরা শিশুর মতো স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ে আমার প্রতি।

ওদের বন্ধুত্ব সরল আর আন্তরিক এবং ওদের বিদায় নেবার সময়ে আমিও প্রায়ই কেঁদে ফেলি। এটা যে একটু হাস্যকর তা জানি। কিন্তু তবু কিছুতেই সামলাতে পারি না।

১০ই সেপ্টেম্বর

করচাগিন আজ তার বাড়িতে প্রথম চিঠি পাঠাল—ও যা যা বলে গেল, সেই মতো আমিই চিঠিখানা লিখে দিলাম।

ও জানাচ্ছে — আঘাতটা ওর এমন কিছু গুরুতর নয়, শিগগিরই সেরে উঠে ও একবার বাড়ি যাবে। দারুণ রক্তক্ষয় হয়েছে ওর, মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এখনও ও খুব দুর্বল।

১৪ই সেপ্টেম্বর

করচাগিন আজ প্রথম হাসল। ওর হাসিটা বড় সুন্দর। সাধারণত ওর বয়সের তুলনায় ও খুবই গম্ভীর। খুব আশ্চর্য দ্রুত সেরে উঠছে ও। করচাগিন আর ফ্রসিয়ার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। প্রায়ই ফ্রসিয়াকে ওর বিছানার পাশে দেখি। সে নিশ্চয়ই ওকে আমার কথা বলেছে—আমার গুণকীর্তন করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে—ইদানীং করচাগিন আমাকে দেখলেই একটা ক্ষীণ হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানায়। গতকাল সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার বাহুতে ওই কালো কালো দাগ কিসের, ডাক্তার?'

আমি ওকে বলি নি যে ওই দাগগুলো ওরই আঙুলের চিহ্ন—জ্বরের ঘোরে ভুল বকার সময়ে সে সজোরে আঙুল দিয়ে আমার বাহু চেপে ধরেছিল।

১৭ই সেপ্টেম্বর

করচাগিনের কপালের ক্ষতটা চমৎকার সেরে উঠছে। ক্ষতটা ধুয়ে বেঁধে দেবার সময়ে যে আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে এই ছেলেটি যন্ত্রণা সহ্য করে, তা দেখে আমরা ডাক্তাররা বিস্মিত হয়েছি।

সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে রুগীরা দারুণ চেঁচায় আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের নিয়ে মহা অসুবিধেয় পড়তে হয়। কিন্তু এই রুগীটি শান্তভাবে শুয়ে থাকে। খোলা ক্ষতটা যখন আয়োডিন দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় তখন সে শক্ত হয়ে নিজেকে টান টান করে রাখে তারের মতো। মাঝে মাঝে

অজ্ঞানও হয়ে যায়—কিন্তু একবারও আমরা ওর মুখ থেকে যন্ত্রণার আওয়াজ বেরুতে শুনি নি।

এখন সবাই বুঝতে পারি, করচাগিন যখন কাতরায় তখন সে অজ্ঞান। কি জানি, কোথা থেকে ছেলেটি এই প্রচণ্ড সহ্যশক্তি পেল।

২১এ সেপ্টেম্বর

আজ আমরা প্রথম করচাগিনকে ঠেলা-চেয়ারে করে বড়ো বারান্দাটায় এনে বসাই। বাগানটা দেখে কী উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ, কী রকম লোভীর মতো ও মুক্ত বাতাস টেনে নিল নিশ্বাসের সঙ্গে! ওর মাথাটা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, মাত্র একটা চোখ খোলা। সেই প্রাণোজ্জ্বল চোখটা পৃথিবীর দিকে চেয়ে রয়েছে···পৃথিবীর সঙ্গে যেন এই প্রথম তার দৃষ্টি-বিনিময়।

২৬এ সেপ্টেম্বর

আজ দুটি তরুণী হাসপাতালে এসেছিল করচাগিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাইরের লোকদের বসার নিচের ঘরটায় আমি নেমে গেলাম। মেয়ে দুটির মধ্যে একজন ভারি সুন্দরী। ওরা নিজেদের নাম বলল, তনিয়া তুমানভা আর তাতিয়ানা বুরানোভ্স্কায়া। তনিয়ার কথা আমি শুনেছি—জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার সময়ে করচাগিন নামটা বলত। তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আমি দিলাম ওদের।

৮ই অক্টোবর

করচাগিন এখন প্রথমবার নিজে নিজেই বাগানে হেঁটে বেড়িয়েছে। ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞেস করছে—হাসপাতাল

থেকে ছাড়া পাবে কবে। আমি বলেছি—শিগগিরই। রুগীদের সঙ্গে দেখা করার প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট দিনে মেয়ে দুটি ওকে দেখতে আসে। কেন যে করচাগিন কাতরায় নি তা এখন জানতে পেরেছি। আমি জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, ''দি গ্যাডফ্লাই' বইটা পড়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

১৪ই অক্টোবর

করচাগিন ছাড়া পেয়ে গেছে। গভীর আবেগের সঙ্গে সে আমার কাছে বিদায় নিল। চোখের ওপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা তার খুলে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু তার মাথাটা বাঁধা। ডান-চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে বেশ স্বাভাবিকই আছে। এই চমৎকার তরুণ কমরেডটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে গভীর বেদনা জমে উঠল মনে।

কিন্তু এই তো রীতি: সেরে উঠলেই ওরা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, হয়ত আর দেখা হবে না কখনও।

বিদায় নেবার সময় করচাগিন বলল, 'আহা, বাঁ-চোখটা গেল না কেন? এখন আমি গুলি ছুঁড়ব কী করে?'

ও এখনও ফ্রণ্টের কথা ভাবছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর পাভেল কিছুদিন বুরানোভ্স্কির বাড়িতে রইল। তনিয়া এখানেই আছে।

পাভেল তনিয়াকে অবিলম্বে কমসোমলের কাজকর্মের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করল। শহরের কমসোমলের একটা সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে তনিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে এ ব্যাপারের সূত্রপাত করল। তনিয়া যেতে রাজি, কিন্তু সভায় যাবার জন্যে পোশাক বদলে সে যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তাকে দেখে পাভেল দারুণ বিরক্তির সঙ্গে নিজের

ঠোঁট কামড়ে ধরল। খুব কেতাদুরস্ত পোশাক পরে নিজেকে রীতিমত চটকদার করে তুলেছে সে—পাভেল বুঝতে পারল যে এটা তার মহলে একেবারেই বেখাপ্পা হয়ে পড়বে।

তাদের মধ্যে প্রথম ঝগড়ার কারণ ঘটল এই নিয়ে। কেন ওরকম পোশাক পরতে গেল—পাভেল এই প্রশ্ন তোলাতে তনিয়া অসন্তুষ্ট হল।

'কেন যে আমাকে আর-সবার মতোই দেখতে হতে হবে, তা তো বুঝে উঠতে পারছি না। আমার পোশাকে যদি তোমার না পোষায়, তাহলে আমি না হয় বাড়িতেই থাকি।'

ক্লাব-ঘরে আর-সবার বিবর্ণ কোর্তা আর ছেঁড়াখোঁড়া ব্লাউজের মধ্যে তনিয়ার সুন্দর পোশাকটা এতো চোখে ঠেকল যে পাভেল দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তরুণ-তরুণীরা সবাই তাকে বাইরের লোক হিসেবে ধরে নিল, সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে তনিয়াও সবাইকে অগ্রাহ্য করার একটা উন্নাসিক মনোভাব দেখাল।

মোটা সুতী জামা পরা চওড়া-কাঁধ ডক-খালাসী জাহাজ-ঘাটার কমসোমল সংগঠনের সম্পাদক পান্‌ক্রাতভ পাভেলকে একপাশে ডেকে চোখের ইসারায় তনিয়াকে দেখিয়ে ভ্রূকুটি করে বলল, 'এই পুতুলটিকে তুমিই এখানে নিয়ে এসেছ না-কি?'

'হ্যাঁ,' কাটা জবাব দিল পাভেল।

'হুম,' পান্‌ক্রাতভ মন্তব্য করল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এখানকার সঙ্গে ও ঠিক খাপ খাচ্ছে না। বড্ডো বেশি রকম বুর্জোয়া গোছের দেখতে। এখানে ঢুকতে পেল কী করে?'

রগ দুটো দপদপ করে উঠল পাভেলের।

'ও আমার এক বন্ধু। আমিই ওকে এনেছি এখানে। বুঝলে? আমাদের প্রতি ওর মোটেই কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নেই,

যদিও নিজের সাজপোশাকের দিকে ওর বড়ো বেশি নজর। তবু কে কী রকম পোশাক পরছে তাই দেখে সবসময়ে মানুষকে যাচাই করা উচিত নয়। তুমি যেমন জানো তেমনি আমিও জানি কাকে এখানে আনা যায় না-যায়—সুতরাং তোমার অতো খবরদারি করার কোনো দরকার নেই, কমরেড!'

সে বেশ একটু ঝাঁজালো আর অপমানজনক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পান্‌ক্রাতভ যে সবার সাধারণ মতটাকেই প্রকাশ করেছে সেটা বুঝতে পেরে সে সামলে নিল। এবং তার ফলে তনিয়ার ওপর রাগটা বেড়েই গেল। 'যা ওকে বলেছিলাম, ঠিক তাই হল! কী দরকারটা পড়েছিল ওর ওমনি ধারা চাল দেখাতে যাবার?'

সেইদিন সন্ধ্যায় তাদের বন্ধুত্বের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। পাভেল যে সম্পর্কটাকে এতদিন চিরস্থায়ী বলে ভেবে এসেছে, গভীর ক্ষোভ আর হতাশার সঙ্গে সেই সম্পর্কটার ভাঙন লক্ষ্য করতে লাগল সে।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল -প্রত্যেকবার দেখাশোনার মধ্যে দিয়ে, প্রত্যেকটা সংলাপের মধ্যে দিয়ে তারা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যেতে থাকল। তনিয়ার খেলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পাভেলের কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে।

দু'জনেই অনুভব করছে—ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটা অনিবার্য।

আজ তারা শেষবারের মতো কুপেচেস্কি-বাগানে মিলিত হয়েছে। শুকনো পাতায় পথগুলো ঢেকে গেছে। উঁচু খাড়াইটার মাথায় ওরা আল্‌সের ধারে এসে দাঁড়িয়ে নিচে নীপারের ধূসর জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সাঁকোটার

মস্ত উঁচু খিলানের ওপাশ থেকে একটা গাধা-বোট পেছনে দুটো ভারি বজরা টেনে নিয়ে ক্লান্ত ভাবে নদী বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য ওপারের ব্রুখানভ দ্বীপের বুকে সোনার ছোপ দিয়েছে—ঘরবাড়িগুলোর জানলায় আগুন ধরে গেছে যেন।

সূর্যের ফালি ফালি সোনালী আলোর দিকে তাকিয়ে তনিয়া গভীর বিষাদের সঙ্গে বলল, 'ওই ডুবন্ত সূর্যের মতোই আমাদের বন্ধুত্বও কি মিলিয়ে যাবে?'

পাভেল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। কঠিন চোখে ভ্রূকুটি করে নিচু গলায় উত্তর দিল, 'তনিয়া, আমাদের মধ্যে এসব কথা আগেও হয়ে গেছে। তুমি তো জানো, আমি ভালবেসেছিলাম তোমাকে, এখনও আমার ভালবাসা ফিরে আসতে পারে—কিন্তু তার জন্যে তোমাকে মিলতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমি আর সেই আগেকার পাভ্‌লুশা নই। পার্টির চেয়ে তোমাকে বড়ো করে দেখব—একথা যদি ভেবে থাকো, তাহলে আমি খারাপ স্বামী হব। কারণ, আমি সর্বদা পার্টিকে আগে স্থান দেব, তারপরে স্থান দেব তোমাকে আর অন্যসব আত্মীয়স্বজনদের।'

নিবিড় বেদনাভরা চোখে তনিয়া তাকিয়ে রইল নিচের ঘন নীল জলের দিকে—তার চোখ ভরে উঠল জলে।

পাভেল তার বাদামী রঙের ঘন চুলের দিকে, তার পাশ-ফেরানো মুখখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—যে-মুখখানাকে সে এতো নিবিড়ভাবে চেনে। মেয়েটির প্রতি একটা করুণার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল তার মন—সে তার কাছে এক সময়ে এত প্রিয় ছিল!

তনিয়ার কাঁধের ওপরে আস্তে হাতখানা রাখল সে।

'তনিয়া, তোমার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে আমাদের সঙ্গে এসে

মিলে যাও। একসঙ্গে আমরা মালিক-শ্রেণীকে খতম করব। আমাদের মধ্যে বহু চমৎকার মেয়ে আছে--তারা এই নিদারুণ লড়াইয়ের সব-রকম বোঝা বইছে, সব রকমের কষ্ট আর অসুবিধে সইছে। তারা তোমার মতো শিক্ষিতা না হতে পারে, কিন্তু কেন, কেন তুমি আমাদের মধ্যে আসতে চাও না? তুমি বলেছ—চুঝানিন তোমাকে চরিত্রভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু চুঝানিনটা তো একটা অধঃপতিত লোক, ও যোদ্ধা নয়। তুমি বলেছ, কমরেডরা নাকি তোমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে নি। কিন্তু তুমিই বা কেন সেদিন ওরকম বড়লোকদের নাচের আসরে যাবার মতো পোশাক পরেছিলে? দোষটা তোমারই ঠুনকো আত্মাভিমানের: আর-সবাই পরছে বলেই আমাকেও এই পুরনো নোংরা ফৌজী কোর্তা পরতে হবে কেন?--এই রকম ভেবেছিলে তুমি। একজন শ্রমিককে ভালবাসার সাহস তোমার ছিল--কিন্তু তুমি একটা আদর্শকে ভালবাসতে পারছ না। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, তোমাকে নিয়ে ভালো কথাই মনে রাখতে চাই।'

আর কিছু বলল না পাভেল।

পরের দিন পাভেল রাস্তায় দেখতে পেল আঞ্চলিক 'চেকা' কমিটির সভাপতির একটা নির্দেশ লটকানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে--তাতে নাম-সই করা আছে—ঝুখ্‌রাই। তার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। অনেক হাঙ্গামার পর সে সেই জাহাজীর দপ্তরে ঢুকতে পেল। সান্ত্রীরা কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না। ফলে, পাভেল এমন একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল যে প্রায় গ্রেপ্তার হয় আর-কি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেল সে।

ফিওদর তাকে আন্তরিক খুশির সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল।

তার একটা হাত কাটা গেছে--গোলা লেগে উড়ে গিয়েছিল হাতখানা।

ওদের কথাবার্তা তৎক্ষণাৎ কাজের আলোচনায় মোড় নিল।

'ফ্রন্টে ফিরে যাবার জন্যে উপযুক্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তুমি আমাকে এখানকার প্রতিবিপ্লবীদের উৎখাত করার কাজে সাহায্য করতে পারো। কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও,' বলল ঝ্খ্রাই।

পোলিশ শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। লাল ফৌজ শত্রুপক্ষকে প্রায় একেবারে ওয়ারস'এর দেয়াল পর্যন্ত হঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বৈষয়িক আর শারীরিক শক্তি কমে আসায় এবং রসদ জোগান দেবার ঘাঁটি অনেক পেছনে পড়ে থাকায় তারা পোলিশদের এই শেষ ঘাঁটিটা দখল করে নিতে পারে নি। তাই তারা ফিরে এসেছে। ওয়ারস থেকে লাল ফৌজের এই পিছিয়ে আসার ব্যাপারটাকে পোলিশরা নাম দিয়েছে 'ভিস্টুলার অলৌকিক ঘটনা'। এর ফলে, অভিজাতদের করায়ত্ত পোল্যান্ড আরও কিছুদিনের মতো আয়ু ফিরে পেল—পোলিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন কার্যকরী করে তুলতে কিছুটা দেরি থেকে গেল।

রক্তাক্ত দেশ এখন খানিকটা বিশ্রাম চায়।

পাভেল তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল না, কারণ শেপেতোভ্কা আবার পোলিশদের দখলে চলে গেছে এবং সেটা সাময়িকভাবে একটা সীমান্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শান্তি-আলোচনা চলছে। 'চেকা'র জন্যে নানান

নের কাজে পাভেলের দিনরাত্রি কাটছে। থাকল ঝুখরাইয়ের ঘরে। তার নিজের শহর পোলিশদের দখলে চলে গেছে শুনে সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ঝুখ্‌রাইকে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন যদি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে আমার মা কি সীমান্তের অন্য দিকে পড়ে যাবে?'

ফিওদর তার ভয় দূর করল, 'খুব সম্ভব গোরিন নদীটার গতিপথ ধরে সীমান্ত নির্দিষ্ট হবে। তার মানে, তোমাদের শহরটা আমাদের এলাকার মধ্যে পড়বে। যাই হোক, খুব শিগগিরই জানতে পারব আমরা।'

পোলিশ সীমান্ত থেকে দক্ষিণে ডিভিশনের পর ডিভিশন চালান করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, ওদিকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যখন পোলিশ সীমান্তে তার সমস্ত মনোযোগ সংহত করেছে, তখন ভ্রাঙ্গেল এদিকে এই বিরতির সুযোগে ক্রিমিয়ায় তার গোপন ঘাঁটি থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে নীপারের ধার ঘেঁষে উত্তর দিকে তার অব্যবহিত লক্ষ্য ইয়েকাতেরিনস্লাভ এলাকা দখল করবার জন্যে এগিয়ে আসতে লেগেছে।

পোলিশদের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ায় সোভিয়েত সরকার প্রতিবিপ্লবীদের এই শেষ ঘাঁটিটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে অবিলম্বে ফৌজ পাঠিয়ে দিল ক্রিমিয়ায়।

ট্রেন-ভর্তি সৈন্যদল, ঠেলা-গাড়ি, রান্নার সরঞ্জাম আর কামান দক্ষিণ দিকে যাবার পথে কিয়েভের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে যানবাহন-চলাচলের জন্যে যে 'চেকা' আছে তারা ইদানীং প্রাণপণে পরিশ্রম করছে। যানবাহন-চলাচল অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে চলাচল একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের সেসব দিনরাত নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। স্টেশনগুলোয় সব ট্রেন আটকে আছে, খালি

লাইন পাওয়া না যাওয়ায় চলাচল প্রায়ই বন্ধ থাকছে। কোনো-না কোনো ডিভিশনের চলার পথ পরিষ্কার করে দেবার হুকুম দিয়ে টেলিগ্রাফ-অপারেটররা অসংখ্য জরুরী তার পাঠাচ্ছে টরে-টক্কা শব্দে। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মধ্যে থেকে ফুটকি আর ড্যাশ্ চিহ্নিত অন্তহীন লম্বা কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসছে—প্রত্যেকটাই সর্বাগ্রে বিবেচনার জন্যে দাবি জানাচ্ছে, 'অন্য সবকিছুর আগে এটা করা চাই... এটা সামরিক হুকুম... অবিলম্বে পথ পরিষ্কার করে দাও...'। প্রায় প্রত্যেকটা তারবার্তাতেই একবার করে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই হুকুম না মানা হলে দোষীদের বিপ্লবী সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হবে।

যানবাহন বিনা বাধায় চলাচলের দায়িত্ব পড়েছে স্থানীয় পরিবহন সংক্রান্ত 'চেকা'র উপর।

বিভিন্ন সৈন্যদলের অধিনায়করা অনবরত 'চেকা'র সদর দপ্তরে রিভলভার বাগিয়ে ঢুকে পড়ে দাবি জানাচ্ছে যে ফৌজের সর্বাধিনায়কের সই করা অমুক নম্বরের টেলিগ্রাম অনুযায়ী তাদের ট্রেনগুলোকেই আগে রওনা করে দেওয়া হোক।

সেটা করা যে অসম্ভব—এ কৈফিয়ত শুনতে কেউই রাজি নয়, 'আমাদের ট্রেনটা রওনা করে দিতেই হবে—তা করতে গিয়ে যদি তোমাদের কলিজা ফেটেও যায়, তবুও!' এবং একদমক ভীষণ গালাগাল বেরিয়ে আসছে তারপর। বিশেষ গুরুতর ব্যাপারগুলোয় ঝুখ্‌রাইয়ের জরুরী তলব পড়ে। তখন এইসব উত্তেজিত মানুষগুলো—যারা পরস্পরকে ওইখানেই যেন গুলি করে মারবার জন্যে তৈরি—তারা শান্ত হয়ে পড়ে।

এই লৌহদৃঢ় মানুষটির শান্ত আর বরফের মতো ঠাণ্ডা গলার স্বরের কাছে কোন আপত্তি টেকে না—তার

উপস্থিতির ফলেই খাপের মধ্যে রিভলভারগুলো ফের ঢুকে যায়।

মাথার মধ্যে একটা ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে পাভেল অফিস থেকে টলতে টলতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে আসে। 'চেকা'র কাজে তার স্নায়ুর ওপরে ভয়ানক রকম চাপ পড়ছে।

একদিন সে হঠাৎ একটা গুলি-গোলার বাক্সে বোঝাই ছাদখোলা গাড়ির ওপরে সের্গেই ব্রুঝাককে দেখতে পেল। সের্গেই গাড়িটার ওপর থেকে লাফিয়ে পাভেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় তাকে চিৎপাত করে ফেলে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে।

'পাভ্‌কা, ওরে শয়তান! তোর ওপর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছি—এ তুই ছাড়া আর কেউ নয়।'

এই দুই তরুণ বন্ধুর মধ্যে এত কথা বলার আছে যে কোথা থেকে তারা শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। ওদের দু'জনের শেষ দেখা হবার পর কত কী ঘটে গেছে! পরস্পরকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওরা কথা বলে যেতে লাগল। ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্‌ তাদের কানে যায় নি। ট্রেনটা যখন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে চলা শুরু করেছে, তখন মাত্রই ওরা আলিঙ্গনমুক্ত হল।

তখনও তাদের অনেক কথা বলতে বাকি ছিল পরস্পরকে। কিন্তু ট্রেনটা ক্রমশই দ্রুতগতি নিচ্ছে। সের্গেই তার বন্ধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে কী একটা বলে প্ল্যাটফর্ম বেয়ে ছুটতে ছুটতে একটা মাল-কামরার খোলা দরজা ধরে ফেলল। ভেতর থেকে কয়েকটা হাত বেরিয়ে এসে তাকে ধরে টেনে তুলে নিল ভেতরে। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পাভেলের মনে পড়ল, ভালিয়ার মৃত্যু সম্বন্ধে

সের্গেই কিছুই জানে না। কারণ, শেপেতোভ্‌কা ছাড়ার পর ও আর সেখানে যায় নি — আর, আজকের এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবার এই সময়টুকুর মধ্যে পাভেলেরও সে কথাটা বলতে ভুল হয়ে গেছে।

পাভেল ভাবল, 'না-জানাটাই ভালো। ওর মনের শান্তি তাতে বজায় থাকবে।' সে জানত না যে বন্ধুর সঙ্গে আর কোনদিন তার দেখা হবে না। শরতের বাতাসের দিকে বুক-খোলা অবস্থায় গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সের্গেইও জানত না যে সে তার মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে।

দরোশেঙ্কো নামে একজন লাল ফৌজের সৈন্য সের্গেইকে তাড়া দিল, 'ওখান থেকে নেমে এসো, সেরিওঝা।' দরোশেঙ্কোর গায়ে একটা কোট যার পেছন দিকটা পুড়ে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে।

হেসে বলল সের্গেই, 'ঠিক আছে, বাতাসের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে।'

এক সপ্তাহ বাদে প্রথম লড়াইয়ের দিনেই একটা এলোপাতাড়ি বুলেট এসে সের্গেইয়ের বুকে বিঁধল।

টলতে টলতে একটু এগোল, যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে গেল বুকটা, শূন্যে কি যেন মুঠো করে ধরবার চেষ্টা করল, তারপর বুকে হাত দুটো জোরে চেপে ধরে কয়েক পা টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেল সে মাটির ওপর ভারি একটা বোঝার মতো। ইউক্রেনের সীমাহীন স্তেপভূমির দিকে তার দৃষ্টিহীন নীল চোখ দুটি নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

'চেকা'র স্নায়ুপেষা কাজকর্ম পাভেলের দুর্বল শরীরের ওপরে দারুণ একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। সেই পুরোন

তের জন্য প্রচন্ড মাথাধরাটা তার ক্রমশই বাড়ছে। একবার একাদিক্রমে দু'রাত্রি জাগার ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর তবেই সে ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করবে বলে ঠিক করল।

'তোমার কি মত, ফিওদর—আমি যদি অন্য কোনো কাজে লাগার চেষ্টা করি, তাহলে কেমন হয়? আমার নিজের সবচেয়ে পছন্দ রেল-কারখানায় আমার নিজের কাজটাই করি। ভয় হচ্ছে আমার মাথার মধ্যে কী যেন গোলমাল হয়েছে। চিকিৎসা কমিশনে ওরা আমাকে ফৌজের কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কাজ ফ্রণ্টে লড়াইয়ের কাজের চেয়েও খারাপ। এই দু'দিন ধরে সুতির-এর ডাকাত-দলটাকে পাকড়াও করতে গিয়ে আমার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এইসব মারামারির কাজ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই কিছুদিনের জন্যে। দেখতেই পাচ্ছ ফিওদর, আমি যদি খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই না পারি তাহলে আর তোমার কী কাজে লাগব বলো?'

উদ্বেগভরা চোখে ঝুখ্‌রাই পাভেলের মুখখানা ভালো করে দেখল।

'হ্যাঁ, তোমাকে বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে না। আমারই দোষ। অনেক আগেই আমার তোমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বড্ডো ব্যস্ত ছিলাম বলে লক্ষ্য করি নি।'

এই কথাবার্তার অল্পকিছু পরেই পাভেল কমসোমলের আঞ্চলিক কমিটিতে এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা কাগজ—যাতে বলা হয়েছে যে তাকে কাজ দেবার জন্যে কমিটির কাছে পেশ করা হল।

টুপিটা কায়দা করে প্রায় নাকের ওপর ঠেলে দেওয়া একটি

ছেলে কাগজটার ওপরে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধূর্তভাবে বলল, ''চেকা' থেকে আসছ, অ্যাঁ? ভারি ফূর্তির ওই সংগঠনটা। এখানে আমরা তোমার জন্যে এক্ষুণি কাজ জুটিয়ে দিচ্ছি। ছেলেদের আমাদের দরকার। কোথায় যেতে চাও তুমি? খাদ্য জন-কমিশারিয়েৎ? না? আচ্ছা, তাহলে জাহাজ-ঘাটায় প্রচার-আন্দোলনের বিভাগ সম্বন্ধে কী মনে করো? তাও না? তাহলে তো মুশকিল হল। ওখানকার কাজটা সুবিধের—আলাদা বিশেষ রেশনও পাওয়া যায়।'

পাভেল তার কথায় বাধা দিল।

'আমি রেলওয়ে মেরামত কারখানাটায় যেতে চাই,' বলল সে।

'রেলওয়ে কারখানায়?' হাঁ হয়ে গেল ছেলেটির মুখ, 'হুম্... সেখানে আমাদের কাউকে দরকার পড়বে বলে আমার মনে হয় না। তবে, তুমি উস্তিনোভিচের কাছে একবার যাও। সে তোমাকে একটা কোথাও কাজে লাগিয়ে দেবে।'

ঘোর রঙের এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার পর অল্পক্ষণ কথাবার্তার শেষে ঠিক হয়ে গেল, পাভেল রেলওয়ে কারখানায় কাজ করবে আর সেখানকার কমসোমল সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হবে।

ইতিমধ্যে শ্বেতরক্ষীরা ক্রিমিয়ার প্রবেশপথটায় জড়ো হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এককালে এই সরু ভূখণ্ডটি ছিল ক্রিমিয়ার তাতার আর জাপোরোঝিয়ে-কসাকদের বাসভূমির মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা — এখন এটা আধুনিক সশস্ত্র সৈন্যব্যূহে সাজানো পেরেকপ্-এর ফ্রন্ট।

এই ক্রিমিয়াতেই পেরেকপের পেছনে গোটা দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে পুরনো

দুনিয়াটা, তার বিনাশ অবধারিত; এখানে নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবে তারা মদের নেশায় চুর হয়ে হুল্লোড় করে বেড়ায়।

শরতের এক শীতার্ত স্যাঁতসেঁতে রাত্রে শ্রমজীবী মানুষের হাজার হাজার সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়ল সিভাশের হিম-শীতল জলের বুকে -- অন্ধকারের আড়ালে প্রণালীটা পার হয়ে এসে দুর্গের ভেতরে সুরক্ষিত হয়ে অবস্থিত শত্রুকে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করা তাদের উদ্দেশ্য। এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন ইভান ঝার্কি — মেশিনগানটা যাতে জলে ভিজে না যায় তার জন্যে সেটাকে মাথার ওপরে তুলে ধরে সে জল কেটে চলেছে।

তারপর, ভোরবেলায় পেরেকপের উপর যখন মরিয়া সংগ্রাম শুরু হয়েছে, সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ চলেছে দুর্গের উপর, তখন সিভাশ্ প্রণালী পার হয়ে আসা প্রথম দলটি লিতোভস্কি উপদ্বীপের ওপর তীরে উঠে পড়েছে শ্বেতরক্ষীদের পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্যে। এবং প্রথম যারা টেনে-হেঁচড়ে পাথুরে ডাঙাটায় এসে উঠেছে, তাদের মধ্যে ইভান ঝার্কি একজন।

এরকম হিংস্র লড়াই আগে কখনো হয় নি। জল থেকে উঠে আসা লাল ফৌজের সৈন্যদের ওপর বর্বর নির্মমতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্বেতরক্ষী ঘোড়সওয়াররা। ঝার্কির মেশিনগান অনর্গল মৃত্যু উদ্গিরণ করে চলল একবারও না থেমে। সীসের বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়া আর মানুষের দেহের স্তূপ জমে উঠল। দ্রুত ক্রমান্বয়ে নতুন গোলার মালা পরিয়ে নিচ্ছে ঝার্কি তার মেশিনগানে।

শত শত কামানের গোলার আওয়াজে পেরেকপ্ গর্জন করে উঠল। গোটা পৃথিবীটাই যেন একটা অতল গহ্বরের মধ্যে

তলিয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার মৃত্যুবাহী গোলার কান-ফাটানো আর্ত আওয়াজ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে আকাশকে, গোলাগুলো বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে ফেটে পড়ছে। ছিন্নভিন্ন মাটি কালো মেঘ হয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে।

বীভৎস জানোয়ারটার মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। ক্রিমিয়ার ভেতরে বয়ে চলল এক ঘোড়সওয়ার আর্মির লাল বন্যা — ওরা চলেছে শেষ অমোঘ আঘাতটা হানবার জন্যে। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা শ্বেতরক্ষীরা আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলল বন্দর ছেড়ে-যাওয়া জাহাজগুলোয় চাপবার জন্যে।

লাল ফৌজের বহু ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তার গায়ে প্রজাতন্ত্রী সরকার সোনার 'অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার' আটকে দিল। ওই কোর্তাগুলির মধ্যে একটা কোর্তা — কমসোমলের মেশিনগান-গোলন্দাজ ইভান ঝার্কির।

পোলিশদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হয়ে গেল এবং ঝুখ্রাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেপেতোভ্কা সোভিয়েত ইউক্রেনেই থেকে গেল। শহর থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে একটা নদী এখন সীমান্তের চিহ্ন।

১৯২০-র ডিসেম্বরের এক স্মরণীয় সকালে পাভেল তার নিজের শহরে ফিরে এল। বরফে ঢাকা প্ল্যাটফর্মটার ওপরে নেমে সে একনজর তাকাল 'শেপেতোভ্কা-১ নং' লেখা সাইনবোর্ডটার দিকে। তারপর বাঁয়ে ঘুরে সোজা স্টেশনের ডিপোয় গিয়ে আরতিওমের খোঁজ করল। কিন্তু তার দাদা সেখানে নেই। গায়ের ওপরে সামরিক কোটটা আঁট করে নিয়ে পাভেল বনের মধ্যে দিয়ে শহরের দিকে চলল।

দরজায় ঘা পড়তে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা উঠে বলল, 'ভেতরে আসুন।' দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটা বরফে ঢাকা মূর্তি — মা তার ছেলের প্রিয় মুখখানা দেখতে পেল। হাত দুটো বুকের ওপর চেপে ধরল সে। আনন্দের আচ্ছন্নতায় সে মুখের কথা হারিয়ে ফেলেছে।

ছেলের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল স তার মুখ। গাল বেয়ে ঝরে পড়ল আনন্দের অশ্রু।

আর পাভেল সেই হালকা ছোট্ট দেহখানিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মায়ের দুশ্চিন্তার ছাপ-ধরা, কষ্টের আর উদ্বেগের বলি-চিহ্নিত মুখের দিকে। তার শান্ত হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল সে।

অনেক কষ্ট সয়েছে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনা। এবার আবার তার চোখের দৃষ্টিতে সুখের উজ্জ্বলতা ফিরে এল। যে ছেলেকে আর কোনদিন দেখতে পাবার আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, সেই ছেলে আবার ফিরে আসায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন তার আশ মেটে না।

তিন দিন পরে একদিন গভীর রাত্রে কাঁধের ওপর সৈনিকের বোঁচকাটা বেঁধে যখন আরতিওমও ফিরে এসে ছোট্ট ঘর-খানাকে ভরাট করে তুলল, তখন মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভনার সুখের আর সীমা রইল না।

করচাগিন পরিবার এতদিনে আবার পুনর্মিলিত হয়েছে। দুই ভাই-ই মৃত্যুকে এড়িয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। নিদারুণ কষ্ট আর নানান পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসে আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে তারা।

মা তার ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবি তারা?'

হালকা সুরে আরতিওম জবাব দিল, 'আমি আবার ওই রেল-কারখানাতেই গিয়ে ঢুকব, মা!'

আর পাভেল দু'সপ্তাহ বাড়িতে কাটানোর পর কিয়েভে ফিরে গেল — সেখানে কাজ পড়ে রয়েছে তার।

প্রথম ভাগ শেষ

নিকোলাই অস্ত্রভস্কি

দ্বিতীয় ভাগ

দুই ভাগে সমাপ্ত

দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ / ৬ আশ্বিন ১৩৮৭ ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

প্রকাশক

বি. রায়

দেশকাল

৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে

কোলাজ

২ জওহরলাল নেহরু রোড

কলকাতা-৭০০ ০১৩

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

রাত্রি-দুপুর। শেষ ট্রামগাড়িখানা অনেকক্ষণ আগে তার নড়বড়ে দেহখানা টেনে নিয়ে ফিরে গেছে ডিপোয়। জানলার গোড়ায় চাঁদের একফালি ঠান্ডা আলো এসে পড়েছে। বিছানার ওপরে তারই আভার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরের বাকি অংশটুকু আধা-অন্ধকার। কোণের দিকে টেবিলটার ওপরে একটা ঠুলি-পরানো ডেস্ক্-আলোর বৃত্তের নিচে ঝুঁকে বসে আছে রিতা তার মোটা নোটবইটার সামনে।

এটা তার রোজনামচা। পেন্সিলের সরু সীস্টা তার লিখে চলেছে এই কথাগুলো:

২৪এ মে

আমার স্মৃতিগুলোকে লিখে রাখবার জন্যে আমি আরেকবার চেষ্টা করতে বসেছি। এই রোজনামচা লেখার ব্যাপারে আরেকবার একটা বড়ো রকম ফাঁক পড়েছে। শেষবার লেখার পর ছ'সপ্তাহ কেটে গেছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

রোজনামচা লেখার সময় পাই কোথায়? রাত্তির বারোটা বেজে গেছে, এদিকে এই আমি এখনও লিখে চলেছি। ঘুম আসছে না কিছুতেই। কমরেড সেগাল চলে যাবেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করবার জন্যে। খবরটা পেয়ে আমরা সবাই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। ভারি চমৎকার লোক—আমাদের এই লাজার আলেক্সান্দ্রভিচ। তাঁর বন্ধুত্ব যে আমাদের পক্ষে কতোখানি, সেটা আমি এর আগে পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি। উনি চলে গেলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ক্লাসটা ভেস্তে যেতে বাধ্য। আমাদের 'ছাত্ররা' কতদূর এগিয়েছে হিসেব নেবার জন্যে আমরা কাল তাঁর ওখানে রাত্রি প্রায় একটা-দেড়টা পর্যন্ত ছিলাম। প্রাদেশিক কমসোমল কমিটির সম্পাদক আকিম এসেছিল। আর সেই অসহ্য তুফ্তা-টাও এসেছিল। ওই সবজান্তাটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে! পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠেছিল। সেগালের ছাত্র করচাগিন যখন তুফতাকে চমৎকার যুক্তি দিয়ে তর্কে হারিয়ে দিল, তখন ভারি খুশি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। না, এই দুটো মাস বৃথা যায় নি। এমন চমৎকার ফল যদি পাওয়া যায়, তাহলে পরিশ্রম করার জন্যে কোনো ক্ষোভ থাকে না। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, ঝুখ্রাইকে নাকি সামরিক অঞ্চলের বিশেষ বিভাগে বদলি করা হচ্ছে। কি জানি কেন।

লাজার আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ছাত্রটির ভার আমার ওপর দিয়ে বললেন, 'যে কাজটা শুরু করেছি, তোমায় সেটা শেষ করতে হবে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থামলে চলবে না। দেখো রিতা, তুমি আর ও—দুজনে দুজনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। ছেলেটির মধ্যে এখনও খানিকটা শৃঙ্খলার অভাব আছে। ওর স্বভাবটা উদ্দাম রকমের,

আবেগের উচ্ছ্বাসে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা। আমার মনে হচ্ছে, তুমিই ওকে সবচেয়ে ভালো ভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, রিতা। তোমার সাফল্য কামনা করছি। আমাকে মস্কোতে চিঠি লিখতে ভুলো না।'

আজ সলোমেন্‌কা জেলা কমিটির জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একজন নতুন সম্পাদক পাঠানো হয়েছে। ঝার্‌কি তার নাম। সৈন্যদলে তাকে আমি চিনতাম।

কাল দ্‌মিত্রি দুবাভা আসবে করচাগিনকে নিয়ে। দুবাভার একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে রাখা যাক: লম্বায় মাঝারি, শক্তসমর্থ, পেশীবহুল। ১৯১৮-য় কমসোমলে ঢুকেছে। ১৯২০ থেকে পার্টি সভ্য। 'বিরোধীপক্ষ শ্রমিকদল'এ থাকার জন্যে যে-তিনজনকে প্রাদেশিক কমসোমল কমিটি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে সে একজন। তাকে শেখানো বড়ো শক্ত ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক দিন অসংখ্য প্রশ্ন তুলে আসল বিষয়টা থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সমস্ত আলোচনাটাকে ভেস্তে দিত। সে আর আমার আরেকজন ছাত্রী ওলগা ইউরেনেভার মধ্যে প্রায় ঝগড়া হত। প্রথম আলাপ-পরিচয়ের দিনেই ওলগার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুবাভা মন্তব্য করে বসল, 'তোমার সাজ-পোশাকটা কিন্তু মোটেই ঠিক হয় নি, বুড়ি। পরা উচিত ছিল পেছন দিকে চামড়ার পটি-লাগানো প্যাণ্ট, নাল্‌ওয়ালা জুতো, বুদিওনি টুপি আর একটা তলোয়ার। এই পোশাকে তুমি না-মেয়ে না-মরদ।'

ওলগা অবশ্য এ ধরনের কথা সহ্য করার পাত্রী নয়। আমাকেই শেষ পর্যন্ত থামাতে হল। আমার মনে হয় দুবাভা করচাগিনের বন্ধু। আচ্ছা, আজ রাত্তিরের মতো এই পর্যন্ত। শুতে যাবার সময় হল।

।

জ্বলন্ত রোদে শুকনো মাটি খাঁ-খাঁ করছে। রেলওয়ে-প্ল্যাট্‌ফর্মগুলোর ওপর দিয়ে ওভারব্রিজটার লোহার রেলিং তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। গরমে ঘর্মাক্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে মানুষগুলো ক্লান্তভাবে পুলটায় উঠছে। এদের বেশির ভাগই ট্রেনযাত্রী নয়, রেলওয়ে-অঞ্চলের লোক এরা—খাস শহরে যাবার জন্যে এরা এই পুলটা ব্যবহার করে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় পাভেল রিতাকে দেখতে পেল। ও তার আগেই স্টেশনে এসে গেছে—পুলটা থেকে যারা নেমে আসছে তাদের লক্ষ্য করছে।

ওর কাছ থেকে গজ তিনেক দূরে পাভেল একটু থামল। রিতা দেখতে পায় নি তাকে। রিতার সম্বন্ধে পাভেলের সম্প্রতি যে নতুন আগ্রহটা জেগেছে, সেই আগ্রহ নিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল সে। ডোরা-কাটা একটা ব্লাউজ আর শস্তা কাপড়ের ছোট একটা গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট রিতার পরনে। কাঁধের ওপর ঝোলানো একটা নরম চামড়ার কোর্তা। ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ফাঁকে রোদে পোড়া মুখখানা পেছন দিকে একটু হেলিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে, রোদের তেজে কুঁচকে গেছে চোখ—দেখতে দেখতে এই প্রথম করচাগিনের হঠাৎ মনে হল: তার বন্ধু আর শিক্ষক এই রিতা শুধুমাত্র প্রাদেশিক কমসোমল কমিটির একজন সভ্য নয়, আরও কিছু... কিন্তু এ ধরনের 'পাপচিন্তা'কে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে বুঝতে পেরেই পাভেল নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। রিতার কাছে গেল সে।

'পুরো এক ঘণ্টা ধরে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি, লক্ষ্যই করো নি আমাকে,' তাকে বলল পাভেল, 'চলো আমাদের ট্রেন এসে গেছে।'

প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল তারা।

কমসোমলের জেলা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে রিতাকে ওদের প্রাদেশিক কমিটি আগের দিন মনোনীত করেছে। আর, করচাগিনকে যেতে হবে রিতার সহকারী হিসেবে। আপাতত তাদের অব্যবহিত সমস্যাটা হচ্ছে ট্রেনে চাপা— মোটেই সহজ নয় কাজটা। একেই তো ট্রেন যাতায়াত করে ক্বচিৎ কখনও। যখন যায়, তখন আবার গোটা স্টেশনটাকেই দখলে নিয়ে নেয় সর্বশক্তিমান 'পাঁচ-জনের কমিটি'--এদের কাছ থেকে অনুমতিসূচক ছাড়পত্র না পেলে কাউকে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকতে দেওয়া হয় না। প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকার বা বেরুবার সমস্ত পথ এই কমিটির লোকজন পাহারা দেয়। মানুষে অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে ট্রেনগুলো আসে, উদ্বিগ্ন যাত্রীদের অতি সামান্য অংশমাত্র তাতে চাপতে পারে, কিন্তু আবার কবে দৈবাৎ কখন একটা ট্রেন এসে পড়বে--এই ভরসায় কেউই আর দিনের পর দিন পড়ে থাকতে চায় না। সুতরাং, প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকার দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার লোক দুর্ভেদ্য কামরাগুলোতে গিয়ে চাপার আশায়। তখনকার দিনে স্টেশনগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই জনতা অবরোধ করে থাকত আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিমত দারুণ মারামারি পর্যন্ত হয়ে যেত।

প্ল্যাট্‌ফর্মের প্রবেশপথে যে ভীড় জমায়েত হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে বারকতক ঠেলে ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর পাভেল মাল-গুদামের পথটা দিয়ে রিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। স্টেশনের এই সব আঁটঘাটগুলো পাভেল ভালোভাবেই জানে। চার নম্বর কামরাটার কাছে অতি কষ্টে এসে পৌঁছাল তারা। কামরাটার দরজার সামনে একজন 'চেকা'র লোক গরমে দারুণ ঘামতে ঘামতে ভিড় ঠেকাচ্ছে আর অনবরত বলে চলেছে, 'কামরা ভরতি হয়ে গেছে।

পেছনে জোড়ের ওপর কিংবা ছাদে চড়ে যাওয়াটা নিষেধ।'

ক্রুদ্ধ নাগরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কমিটির দেওয়া টিকিটগুলো তার নাকের সামনে উঁচিয়ে ধরেছে। ক্রুদ্ধ গালাগাল, চেঁচামেচি আর প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি চলেছে প্রত্যেকটি কামরায়। পাভেল বুঝতে পারল—চলিত রীতিতে ট্রেনে চাপা অসম্ভব। কিন্তু চাপতেই হবে, নইলে সম্মেলনটা বানচাল হয়ে যাবে।

রিতাকে একপাশে নিয়ে সে তার কার্যক্রমটা ছকে নিল: গাড়িটার ভেতরে ঠেলে ঢুকে একটা জানলা খুলে ফেলে সে তার ফাঁক দিয়ে রিতাকে ভেতরে উঠে আসতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

'তোমার ওই কোর্তাটা আমাকে দাও। এটা যে-কোনো পরিচয়পত্রের চেয়ে ভালো।'

কোর্তাটা পরে নিয়ে পাভেল তার পিস্তল পকেটে এমনভাবে পুরে নিল যাতে সেটার হাতল আর ঝোলাবার দড়িটা বাইরে থেকে দেখা যায়। খাবারের ব্যাগটা রিতার কাছে রেখে কামরাটার দরজায় গিয়ে উত্তেজিত ট্রেনযাত্রীদের দঙ্গলটাকে কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে সে দরজার হাতলটা মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলল।

'এই কমরেড! ঢুকছ কোথায়?'

পাভেল ঘাড় ফিরিয়ে গাঁট্টাগোট্টা 'চেকা'র লোকটির দিকে তাকাল, 'আমি বিশেষ বিভাগের লোক। এই গাড়ির সব যাত্রীর কাছে কমিটির দেওয়া টিকিট আছে কিনা দেখতে চাই।' এমন স্বরে সে কথাগুলো বলল যাতে তার এ কাজ করার অধিকার সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

'চেকা'র লোকটি একনজর পাভেলের পকেটের দিকে তাকিয়ে

ঘামে ভেজা কপালটা জামার হাতায় মুছে নিয়ে ক্লান্তভাবে বলল, ‘ঢুকতে যদি পারো তো যাও।’

হাত দিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে, মাঝে মাঝে আশেপাশে দু-চারটে ঘুষি চালিয়ে, ওপরের তাকে ভর করে, মাঝের পথটুকুতে যে যাত্রীরা তাদের মোটঘাটের ওপর গেড়ে বসেছিল তাদের ওপর দিয়ে এগিয়ে পাভেল কামরাটার মাঝখানে গিয়ে পেঁছিল। চারিদিক থেকে তার ওপরে যে গালাগালির বর্ষণ চলল তা সে গ্রাহ্যও করল না।

কামরার মেঝেয় নামবার সময় দৈবক্রমে পাভেলের পা পড়ে গিয়েছিল একজন মোটাসোটা মহিলার হাঁটুর উপর। সে চিৎকার করে উঠল, ‘আ মোলো যা, চোখ মেলে দেখিস্ নে কোথায় পা রাখছিস!’ বিরাট একটা তেলের টিন দুই হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে কোনক্রমে তার তিন-মনী দেহখানাকে বেঞ্চিটার একপ্রান্তে গুঁজে দেবার ব্যবস্থা করেছিল মহিলাটি। এই রকম সব টিন, বাক্স, বস্তা আর ঝুড়িতে বোঝাই হয়ে আছে প্রত্যেকটা তাক। কামরাটার মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা।

গালাগালির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, পাভেল মহিলাটির কাছে দাবি জানাল, ‘দেখি তো আপনার টিকিটখানা!’

‘কী!’ খেঁকিয়ে উঠল মহিলাটি এই অবাঞ্ছনীয় টিকিট-পরীক্ষকটির দিকে।

সবার ওপরের তাকটা থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এল আর একটা বিশ্রী কর্কশ গলা শোনা গেল, ‘ভাস্‌কা, এ ব্যাটা আবার এখানে কি করতে এল? দিয়ে দাও দেখি ওকে একখানা যমের বাড়ির টিকিট।’

পাভেলের ঠিক মাথার ওপরেই আবির্ভূত হল একটা বিরাট দেহ আর লোমশ বুক—স্পষ্টতই এই লোকটা ভাস্‌কা।

একজোড়া রক্তাক্ত চোখে গোরুর মতো নিষ্পলক চাউনিতে সে তাকিয়ে আছে পাভেলের দিকে।

'ছেড়ে দাও না মেয়েছেলেটিকে। আবার টিকিট চাও কেন?'

পাশে ওপরের তাক থেকে চার জোড়া পা ঝুলছে। এই পা-জোড়াগুলির মালিক যারা, তারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে সশব্দে সূর্যমুখী ফুলের বিচি চিবোচ্ছে। এদের মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই পাভেল বুঝে নিল এরা কারা: খাবার-জিনিসের চোরাকারবারী হাঙরের একটা দল— ঝানু জোচ্চোর, এক জায়গা থেকে খাবার জিনিসপত্র কিনে নিয়ে অন্য জায়গায় ফাট্‌কা-দরে বিক্রি করে দেয়। এদের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে নষ্ট করার মতো সময় পাভেলের হাতে নেই। যে করে হোক, রিতাকে তার ভেতরে নিয়ে আসা চাই।

'এটা কার বাক্স?' জানলাটার নিচে রাখা কাঠের একটা বাক্স দেখিয়ে পাভেল একজন রেলকর্মচারীর পোশাক-পরা বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করল।

বাদামী রঙের মোজা-পরা একজোড়া মোটাসোটা পায়ের দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, 'ওই মেয়েটির।'

জানলাটা খুলতে হবে, অথচ ওই বাক্সটা পথ আটকে রেখেছে। কোনো দিকে সরাবার জায়গা নেই দেখে পাভেল বাক্সটাকে নিয়ে ওপরের তাকে বসে থাকা তার মালিকের হাতেই তুলে দিল।

'একটু ধরুন এটা দয়া করে, জানলাটা খুলব।'

খ্যাঁদা-নাক স্ত্রীলোকটির হাঁটুর ওপরে বাক্সটা বসিয়ে দিতেই সে চিৎকার করে উঠল, 'অন্যের জিনিসে হাত দিও না বলে দিচ্ছি!'

পাশে বসা লোকটিকে সে বলে উঠল, 'এই মোত্‌কা, কি আরম্ভ করেছে লোকটা দেখো দিকি!' সেই লোকটা পাভেলের

পিঠের ওপর তার স্যান্ডাল-পরা পায়ের একটা গংতো মারল।

'দেখো হে! আর এক ঘা বসাবার আগেই কেটে পড়ো এখান থেকে!'

পাভেল নিঃশব্দে সহ্য করে গেল লাথিটা। জানলাটা খোলার দিকেই তার সমস্ত মনোযোগ।

রেলকর্মচারীটিকে সে বলল, 'একটু সর‌ুন দয়া করে।'

পাভেল আরেকটা টিন সরিয়ে দিতেই জানালার সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। নিচে প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর রিতা। তাড়াতাড়ি সে ব্যাগ্‌টা পাভেলের হাতে তুলে দিল। তেলের টিন-ওয়ালা সেই মোটা মেয়েটির হাঁটুর ওপরে ব্যাগটা ছংড়ে দিয়ে পাভেল নিচু হয়ে ঝংকে রিতার হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে তুলল। প্ল্যাট্‌ফর্মের প্রহরীটি এই নিয়ম-লঙ্ঘনটুকু লক্ষ্য করার আগেই রিতা ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রহরীটা কিছ‌ু করতে না পেরে বাইরে থেকে গালাগাল করতে লাগল। রিতা ঢুকতেই ওই ফাট্‌কাবাজের দলটা এমন বিশ্রী হৈ-হল্লা তুলল যে হঠাৎ ঘাব্‌ড়ে গেল রিতা। মেঝের ওপরে দাঁড়াবারও জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। নিচের বেঞ্চিটার এক প্রান্তে কোনোরকমে পাদ‌ুটো রাখার মতো জায়গা করে নিয়ে রিতা ওপরের তাকটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে কুৎসিত গালাগাল। ওপর থেকে সেই বিশ্রী গলার ভাঙা আওয়াজ শোনা গেল, 'কাণ্ড দেখো শ‌ুয়োরটার! নিজে ঢুকে গিয়ে আবার পেছন পেছন ওর মাগ্‌টাকেও টেনে তুলল।'

ওপর থেকে একটা কর্কশ গলা বলে উঠল, 'মোত্‌কা, দাও তো ওর নাকের ওপর একটা গোত্তা বসিয়ে।'

স্ত্রীলোকটি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল পাভেলের মাথার ওপরে তার কাঠের বাক্সটা খাড়া বসিয়ে রাখার জন্যে। কামরাটায় এই দ‌ুটি নতুন আগন্তুকের চারিদিকে ঘিরে

রয়েছে একসার শয়তানীতে ভরা বর্বর মুখ। রিতাকে যে এহেন একটা অবস্থার মধ্যে এনে ফেলতে হয়েছে, তার জন্যে পাভেলের দুঃখ হল। কিন্তু যা হোক করে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই।

মোত্‌কা বলে যে-লোকটিকে ডাকা হয়েছিল, তার দিকে ফিরে পাভেল বলল, 'দাঁড়াবার জায়গাটা থেকে তোমার বস্তাগুলো সরিয়ে নিয়ে এই কমরেডকে একটু জায়গা দাও।' কিন্তু উত্তরে লোকটা এমন কুৎসিত একটা গালাগাল দিয়ে উঠল যে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল পাভেলের। ডান চোখের ভুরুর ওপরকার রগ্‌টা তার যন্ত্রণায় দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল।

শয়তান লোকটাকে সে বলে উঠল, 'দাঁড়াও বদমায়েশ, এর ফল পাইয়ে দিচ্ছি তোমার!' কিন্তু উত্তরে শুধু ওপর থেকে একটা লাথি নেমে এল তার মাথায়।

'বেশ করেছ, ভাস্‌কা, লাগাও আরেকটা গুঁতো!' চারিদিক থেকে সমর্থনের চিৎকার উঠল।

শেষ পর্যন্ত পাভেল তার আত্মসংযম হারাল এবং এসব ক্ষেত্রে বরাবরের মতোই তার করণীয়গুলোকে সে সুনির্দিষ্ট দ্রুতগতিতে করে গেল।

চিৎকার করে উঠল সে, 'বেজন্মা ফাট্‌কাবাজ যতো সব, পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস?' আর অতি সহজ তৎপরতার সঙ্গে ওপরের তাকে উঠে গিয়েই মোত্‌কার তেড়া-চোখো হেঁড়ে-মুখের ওপর ঝাড়ল একটা প্রচণ্ড ঘুসি। এতো জোরে মেরেছিল ঘুসিটা যে ফাট্‌কাবাজ লোকটা অন্য যাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল।

'বেরো এখান থেকে, শুয়োর, নইলে গুলি করে মারব তোদের গোটা দলটাকে!' ওদের চারজনের নাকের সামনে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল পাভেল।

এবারে একেবারে উল্টে গেল অবস্থাটা, করচাগিনকে কেউ আক্রমণ করলেই রিতাও যাতে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে পারে, তার জন্যে তৈরি হয়ে সে ঘটনাটার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। ওপরের তাকটা দ্রুত খালি হয়ে গেল। ফাট্‌কাবাজের দলটা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল পাশের কামরাটায়।

ওপরের খালি তাকটায় রিতাকে উঠে যেতে সাহায্য করার সময় পাভেল ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'তুমি থাকো এখানে, এই লোকগুলোর কী করা যায় একবার দেখে আসি।'

তাকে আটকাবার চেষ্টা করল রিতা, 'আবার ওদের সঙ্গে মারামারি করতে চললে, না-কি?'

'না,' পাভেল আশ্বস্ত করল তাকে, 'এক্ষুণি আসছি।'

জানলাটা আবার খুলে ফেলে সে তার ফাঁকে গলিয়ে নেমে এল প্ল্যাট্‌ফর্মে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সে তার ভূতপূর্ব ওপরওয়ালা যানবাহন বিভাগের 'চেকা'র কর্তা বুর্‌মেইস্তের-এর সঙ্গে দেখা করল। লাতভিয়ার এই লোকটি তার সব কথা শোনার পর হুকুম দিল — গোটা গাড়িটা খালি করে দিয়ে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিতে হবে।

চাপা ক্রোধের সঙ্গে বুর্‌মেইস্তের বলল, 'আমিও ঠিক এই কথাই বলছিলাম। ট্রেনগুলো সব এই স্টেশনে এসে পেঁছানোর আগে থেকেই ফাট্‌কাবাজদের দলে বোঝাই হয়ে আসে।'

'চেকা'র দশজন লোকের একটা দল গাড়িটাকে খালি করে দিল। পাভেল তার আগেকার কাজের দায়িত্ব নিয়ে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার কাজে সাহায্য করতে লাগল। সে তার আগেকার 'চেকা' কমরেডদের সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি ছিন্ন করে নি। কমসোমলের সম্পাদক হিসেবে পাভেল সেখানকার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কর্মীকে এখানে কাজ করবার জন্যে পাঠিয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে থেকে বাজে লোকদের

বের করে দেবার পর পাভেল রিতার কাছে ফিরে এল। এবারে গাড়িটায় চেপে যারা চলেছে তারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের যাত্রিদল: লাল ফৌজের লোক আর অফিস-কারখানার কর্মী—যারা দরকারী কাজে চলেছে।

কামরার এক কোণে ওপরের তাকে বসেছে রিতা আর পাভেল। খবরের কাগজের বাণ্ডিলেই জায়গাটা এতো জুড়ে গেছে যে শুধু রিতার শোবার মতো জায়গাটুকুই আছে।

'ঠিক আছে,' বলল রিতা, 'কোনো রকমে কুলিয়ে নেব আমরা।'

শেষ পর্যন্ত চলতে শুরু করেছে ট্রেনটা।

ধীরে ধীরে গাড়িটা স্টেশনের বাইরে গড়িয়ে চলেছে, এমন সময়ে দু-এক মুহূর্তের জন্যে ওরা দুজনে দেখতে পেল—প্ল্যাটফর্মে এক গাদা বস্তার ওপরে সেই মোটা স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছে। তার চেঁচানি ওদের কানে গেল, 'ওরে, মান্‌কা, আমার তেলের টিনটা গেল কোথায়?'

কোণঠাসা হয়ে জায়গাটুকুর মধ্যে বসেছে পাভেল আর রিতা। খবরের কাগজের বাণ্ডিলগুলো ওদের আড়াল করেছে অন্যান্য সহযাত্রীদের দৃষ্টি থেকে। আপেল আর রুটির টুকরো চিবুতে চিবুতে ওরা ওদের যাত্রাবম্ভের ঘটনাটা বলাবলি করছে আর হাসছে- যদিও ঘটনাটা মোটেই হাস্যকর নয়।

গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে ট্রেনটা। যতোটা বইতে পারা সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশি যাত্রীবোঝাই হয়ে পুরন, জীর্ণ কামরাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আর্তনাদ তুলছে আর রেলের প্রত্যেকটি জোড়ের মুখে একবার করে ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠছে। কামরাব মধ্যে গোধূলির ঘন নীল আলো নামল

জানলার ফাঁকে। তারপর রাত্রি এসে অন্ধকারে ঢেকে দিল গাড়িটাকে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রিতা। ব্যাগ্‌টার ওপরে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে সে। তাক্‌টার ধারে বসে পাভেল সিগারেট খাচ্ছে। সে-ও ক্লান্ত, কিন্তু শোবার জায়গা নেই। খোলা জানলা দিয়ে রাত্রির তাজা হাওয়া ঢুকছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে রিতা জেগে উঠে অন্ধকারে পাভেলের সিগারেটের লাল আভা দেখতে পেল। বুঝল, এমনই তার স্বভাব — ওর অসুবিধে ঘটানোর চেয়ে সে বরং গোটা রাত বসেই কাটাবে।

হাল্‌কা স্বরে ও বলল, 'কমরেড করচাগিন, ও সব বুর্জোয়া রীত ছেড়ে শুয়ে পড়ো।'

বাধ্যভাবে পাভেল ওর পাশে শুয়ে পড়ে আরাম করে তার ধরে-ওঠা পা দুটো বিছিয়ে দিল।

'কাল অনেক কাজ আছে আমাদের। সুতরাং ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো খানিকটা — ডানপিটে কোথাকার!' বন্ধুভাবে রিতা ওর গলা জড়িয়ে ধরল। পাভেল নিজের গালের ওপরে অনুভব করল রিতার চুলের স্পর্শ।

পাভেলের কাছে রিতা অতি পবিত্র। পাভেলের সে বন্ধু, কমরেড, রাজনীতিক শিক্ষক। কিন্তু আবার সে নারীও বটে। এ সম্বন্ধে পাভেল প্রথম সচেতন হয়ে ওঠে সেই রেল-পুলটার কাছে এবং এই জন্যেই রিতার বাহুবন্ধন তাকে এখন এতোটা আলোড়িত করে তুলেছে। রিতার গভীর আর নিয়মিত নিঃশ্বাস অনুভব করছে পাভেল। তার খুব কাছাকাছি এক জায়গায় রিতার ঠোঁট দুটি। এই নৈকট্য তার মনে একটা তীব্র কামনা জাগাল সেই ঠোঁট দুটির স্পর্শ পাবার জন্যে। প্রাণপণ চেষ্টায় ঝোঁকটাকে দমন করল সে।

অন্ধকারের মধ্যে মৃদু হাসল রিতা, যেন পাভেলের

মনোভাবকে আন্দাজ করেই। প্রেমের আবেগভরা আনন্দ আর বিচ্ছেদের বেদনা—এই দুইয়েরই অভিজ্ঞতা তার ইতিমধ্যেই হয়েছে। দু'জন বলশেভিককে সে ভালবেসেছে। শ্বেতরক্ষীদের গুলি এসে সেই দু'জনকেই ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এদের মধ্যে একজন ছিল বিরাট-দেহ সাহসভরা সুপুরুষ, একটা ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার; অপরজন উজ্জ্বল নীল-চোখ একটি তরুণ।

চাকার নিয়মিত ছন্দের দোলায় পাভেল অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ইঞ্জিনের তীব্র সিটিটা না বেজে ওঠা পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙল না।

প্রতিদিনই গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় রিতাকে, তাই রোজনামচা লেখার প্রায় সময়ই পায় না সে। কিছুদিন বাদ যাবার পর আরও কতকগুলো ছোট ছোট লেখা দেখা গেল তার রোজনামচার পাতায়:

১১ই অগস্ট

প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ হয়েছে। আকিম, মিখাইলো এবং আরও জনকতক খারকভে গেছে সারা ইউক্রেন সম্মেলনে--আমার ওপরে লেখালেখির কাজের ভারগুলো সব দিয়ে গেছে। প্রাদেশিক কমিটিতে কাজ করার জন্যে দুবাভা আর পাভেলকে পাঠানো হয়েছে। দ্মিত্রিকে পেচোস্কর্ জেলার কমসোমল কমিটির সম্পাদক করে দেবার পর থেকে তার পড়াশোনার ক্লাসে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একগাদা কাজের মধ্যে ডুবে গেছে সে। পাভেল খানিকটা পড়াশোনা করবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছি না

আমরা, কারণ, হয় আমি ভয়ানক ব্যস্ত থাকি, আর না হয় তাকে কোনো একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে কোথাও পাঠানো হয়। রেলপথের অবস্থাটায় ইদানীং এমন সংকট দেখা দিয়েছে যে কমসোমলের কর্মীদের সেখানে কাজ করার জন্যে অনবরত দলে দলে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঝার্কি কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কমসোমলের ছেলেদের অন্য কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে সে অভিযোগ করছিল। বলছিল, তাদের নিজেদের কাজের জন্যে ওদের ভীষণ দরকার।

২৩এ অগস্ট

আজ যখন বারান্দাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম—ম্যানেজারের দপ্তরের বাইরে পান্‌ক্রাতভ আর আরেকজন লোকের সঙ্গে পাভেল দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু কাছাকাছি আসতেই শুনলাম, পাভেল বলছে, 'ওখানে বসা লোকগুলোকে গুলি করা উচিত। লোকটা বলে কি-না— 'আমাদের হুকুম বাতিল করে দেবার কোনো অধিকার তোমাদের নেই, রেলওয়ের জালানিকাঠ-সংগ্রহকারী কমিটিই হচ্ছে এখানকার কর্তা, কমসোমলের ছেলেদের এ ব্যাপারের মধ্যে না আসাই ভালো।'—লোকটার আস্পর্ধাটা যদি দেখতে একবার!.. গোটা জায়গাটাই এই এদেরই মতো সব পরগাছায় ভর্তি!' অত্যন্ত কুৎসিত একটা কথা বলে সে তার বক্তব্য শেষ করল। পানক্রাতভ আমাকে দেখতে পেয়ে ওর গা টিপল। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেল আমাকে দেখেই বিবর্ণ মুখে আমার সঙ্গে চোখাচোখি না করেই চলে গেল। এখন আর ও বেশ কিছুদিন আমার কাছে ঘেঁষবে না। ও জানে, খারাপ কথা আমি সহ্য করব না।

আমাদের ব্যুরো সভ্যদের একটা আলোচনা-বৈঠক হয়েছে। অবস্থাটা ক্রমশই খুব গুরুতর হয়ে উঠছে। এখনই আমি খুব বিশদভাবে সব লিখে উঠতে পারছি না। জেলা সম্মেলন থেকে আকিম ফিরে এসেছে। দেখে মনে হল ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। গতকাল আরেকখানা মাল-সরবরাহের গাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। এই রোজনামচা লিখে রাখার চেষ্টা আর করে উঠতে পারব বলে আমার মনে হচ্ছে না। এমনিতেই এটা বেশ খানিকটা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আমি করচাগিনের আসার অপেক্ষায় আছি। সেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বলল--ও আর ঝারকি একটি পাঁচজনের কমিউন সংগঠিত করে তুলছে।

একদিন রেল-কারখানায় কাজ করার সময়ে টেলিফোনে পাভেলের ডাক এল। রিতা ডাকছে। সেদিন সন্ধের দিকে ওর কোনো কাজ নেই, তাই ও প্রস্তাব করছে—প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে তারা যে অধ্যায়টা পড়া শুরু করেছিল, সেটা শেষ করে ফেলবে।

ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটে রিতার বাড়ির কাছাকাছি এসে পাভেল ওপরের দিকে তাকিয়ে তার জানলায় আলো দেখতে পেল। ওপরে দ্রুত উঠে এসে সে বরাবরের মতো দরজায় একটু ঠুকেই ভেতরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে বিছানাটার ওপরে — যে-বিছানায় কোনো তরুণ কমরেডকে মুহূর্তের জন্যেও বসতে পর্যন্ত দেওয়া হত না — শুয়ে আছে একজন সৈনিকের উর্দি-পরা লোক। টেবিলের ওপরে একটা পিস্তল, ন্যাপস্যাক আর একটা লাল

তারকা-চিহ্নিত টুপি। পাভেলের অপরিচিত এই লোকটাকে নিবিড়ভাবে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পাশে বসে আছে রিতা। ঘনিষ্ঠ আলাপে ব্যস্ত ওরা দুজন, এমন সময় পাভেল ঢুকতেই রিতা উজ্জ্বল মুখে তাকাল তার দিকে।

রিতার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠল লোকটি।

পাভেলের সঙ্গে করমর্দন করে রিতা বলল, 'পাভেল, এই হচ্ছে...'

'দাভিদ উস্তিনোভিচ,' বলল লোকটি পাভেলের হাত সজোরে চেপে ধরে।

খুশির হাসি হেসে রিতা বলল, 'বেশ একটু অপ্রত্যাশিতভাবেই এসে পড়েছে ও।'

পাভেল নিস্পৃহভাবে এই আগন্তুকটির সঙ্গে করমর্দন করল, তার চোখে একটা অপমানের ঝিলিক খেলে গেল। লোকটির কোর্তার হাতার ওপরে পর-পর চারটে পটি বসানো চিহ্ন লক্ষ্য করল সে—কম্পানি অধিনায়কের চিহ্ন এটা।

রিতা কিছু বলতে যাবে, এমন সময় পাভেল তাকে বাধা দিল, 'আমি তোমাকে বলে যেতেই এসেছিলাম — আজ সন্ধ্যেয় জাহাজঘাটায় আমি কাঠবোঝাই করার কাজে ব্যস্ত থাকব। তাছাড়া, তোমার কাছেও তো একজন দেখা করতে এসেছেন দেখছি। আচ্ছা, চলি তাহলে। ছেলেরা আমার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে।'

বলেই, যেমন হঠাৎ সে এসে পড়েছিল তেমনি আবার হঠাৎ সে বেরিয়ে গেল। এরা ওর সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নামার শব্দ শুনতে পেল। তারপরে বাইরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়ে সব আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

দাভিদের সপ্রশ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরে রিতা ইতস্তত করে বলল, 'কি যেন একটা কিছু হয়েছে ওর।'

...পুলটার নিচে ওখানে একটা রেল-ইঞ্জিন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তার বিরাট বলিষ্ঠ ফুসফুসের ভেতর থেকে বের করে দিলে এক ঝাঁক সোনালি আগুনের ফুল্‌কি। অদ্ভুত আর অপরূপ নাচের ভঙ্গিতে ফুল্‌কিগুলো হাওয়ায় ভেসে ওপরে উঠে গিয়ে ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল।

রেলিংটার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পাভেল তাকিয়ে রইল রেল-পয়েন্টের ওপর সিগ্‌ন্যালের রঙীন আলোগুলোর মিট্‌মিটানির দিকে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে লাগল সে।

'এইটে তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কমরেড করচাগিন, যে রিতার স্বামী আছে আবিষ্কার করে তুমি এত আঘাত পেলে কেন? স্বামী নেই এমন কথা সে কি তোমায় বলেছিল কখনও? আর বললেই বা, তোমার তাতে কী? এভাবে নিচ্ছ কেন ব্যাপারটাকে? তুমি ভেবেছিলে, কমরেড, যে তোমাদের মধ্যে সম্পর্কটা একটা সম্পূর্ণ কামনাহীন আদর্শ বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়... এ রকম ধারণাটা গড়ে উঠতে দিলে কী করে?' নিজেকে তীব্র ব্যঙ্গ করে বলে উঠল সে মনে মনে, 'কিন্তু ও যদি রিতার স্বামী না হয়? দাভিদ উস্তিনোভিচ ওর ভাই বা কাকা হতে পারে... সে ক্ষেত্রে তুমি লোকটার প্রতি অবিচার করেছ -- আহাম্মক কোথাকার! অন্য যে-কোনো মরদের চেয়ে তুমি ভাল কিসে? লোকটা ওর ভাই কিনা জানাটা খুবই সহজ। মনে করো, লোকটিকে শেষ পর্যন্ত ওর ভাই বা কাকা বলে জানা গেল, তখন এই ব্যবহারের পর তুমি রিতার সামনে দাঁড়াবে কোন মুখে? না, ওর সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ করতেই হবে তোমায়!'

ইঞ্জিনের একটা তীব্র সিটির আওয়াজ এসে বাধা দিল তার চিন্তায়।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফেরার সময় হল। যথেষ্ট হয়েছে এইসব বাজে চিন্তা!'

রেল-শ্রমিকরা যেখানে থাকে, সেই অঞ্চলটাকে বলা হয় সলোমেন্‌কা। এখানে পাঁচজন তরুণ মিলে একটা ক্ষুদে কমিউন গড়েছে। এরা হচ্ছে ঝার্‌কি, পাভেল, ক্লাভিচেক নামে একজন হাসিখুশি সোনালী-চুলওয়ালা চেক্‌ ছেলে, রেল-কারখানার কমসোমল সম্পাদক নিকোলাই ওকুনেভ. আর স্তেপান আরতিউখিন নামে একজন বয়লার-মেরামতি মিস্ত্রি যে ইদানীং রেলওয়ে-'চেকা'য় কাজ করছে।

একখানা ঘর জোগাড় করে নিয়েছে তারা। তিনদিন ধরে সমস্ত অবসরের সময়টুকু তারা ঝাড়পোঁছ করে, চুণকাম করে ঘরটা সাজিয়ে কাটিয়েছে। বালতি নিয়ে তারা এতবার দৌড়াদৌড়ি করেছে যে পড়্‌শীরা ভাবতে শুরু করেছিল যে বাড়িটায় আগুনই লেগে গেছে বুঝি। নিজেদের জন্যে দেয়ালে আটকানো শোবার পাটাতন বানিয়ে নিল ওরা, পার্ক থেকে ম্যাপলগাছের পাতা কুড়িয়ে তাই ভর্তি করে তোশক তৈরি করে নিল। তারপর চতুর্থ দিনে দেয়ালে লটকানো পেত্রভ্‌স্কির একটা ছবি আর বিরাট একটা মানচিত্রে সজ্জিত হয়ে ঘরটা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পরিচ্ছন্নতায় ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল।

জানলা দুটোর ফাঁকে একটা তাক উঁচু করে বইয়ের সারিতে সাজানো। দুটো কাঠের বাক্সের ওপর কার্ডবোর্ড বসিয়ে নিয়ে চেয়ারের কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আরেকটু বড়ো আরেকটা বাক্স দেয়াল-আলমারি হিসেবে কাজে লাগছে। ঘরের মাঝখানে

বিলিয়ার্ড খেলার একটা বিরাট টেবিল - তার ওপরকার কাপড়টা নেই। ঘরের বাসিন্দারা এটাকে নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে বয়ে এনেছে মালগুদাম থেকে। দিনের বেলায় এটা টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, রাত্রে ক্লাভিচেক এটার ওপরে শোয়। এই পাঁচটি ছেলের প্রত্যেকেই নিজের নিজের যা-কিছু জিনিসপত্র সব নিয়ে এল। গৃহস্থালির বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লাভিচেক এই সব কমিউনের জিনিসপত্রের একটা ফর্দ বানিয়ে ফেলেছে। সে ফর্দটাকে দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা তাতে আপত্তি জানাল। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পাঁচজনের সাধারণ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হল। রোজগার, রেশন এবং বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে যে সব জিনিস আসে — সবই সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে যার যার অস্ত্র। সর্ববাদীসম্মতভাবে স্থির হল: কমিউনের কোনো সভ্য যদি সাধারণ-মালিকানার নিয়ম ভেঙে তার কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সে কমিউন থেকে বিতাড়িত হবে। ওকুনেভ আর ক্লাভিচেক দাবি করল: কমিউন থেকে বের করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘরও ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই প্রস্তাবও গৃহীত হল।

জেলা কমসোমলের সমস্ত সক্রিয় সভ্য এই কমিউনের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিল। পাশের বাড়ির পড়শীর কাছ থেকে বিরাট একটা সামোভার ধার করে আনা হল। এদের চা-খাওয়ানো উপলক্ষে কমিউনের মজুত স্যাকারিনের সবটাই খরচ হয়ে গেল। চা-পানের পর তারা সবাই একসঙ্গে গান ধরল — বলিষ্ঠ তরুণ গলার আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘরের কড়ি-বরগা:

চোখের জলে ডুবেছে এই তামাম দুনিয়াটা,
কী নিদারুণ মেহনতে দিন আমাদের কাটে।

কিন্তু এবার, দেরি নেই, দীপ্ত ভোরের ছটা
উঠছে ফুটে...

তালিয়া লাগ্‌ুতিনা এই সমবেত-সঙ্গীত পরিচালনা করছিল। তামাক কারখানায় কাজ করে মেয়েটা। তার মাথায় জড়ানো লাল রুমালটা এক পাশে হেলে পড়েছে, দুষ্টুমিতে ভরা তার চোখ দুটো নাচছে — সে চোখের গভীরতার মাপ এ পর্যন্ত কেউ নেয় নি। তালিয়ার হাসিটা অত্যন্ত সংক্রামক, দুনিয়াটাকে সে দেখে তার আঠারো বছর বয়সের উজ্জ্বল চূড়া থেকে। বাহু দুটো তার ওপর দিকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে গেছে. গানের সুর বেরিয়ে আসছে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তূরীভেরী বাজছে:

যাক ছড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বন্যাসম বেগে
এ গান মোদের — গর্বভরে উড়ছে রে-নিশান,
আমাদেরই কলিজার এই খুনের রঙে লাল,
দুনিয়া জুড়ে জ্বলছে যে ওই ঝাণ্ডা খরশান।

অনেক রাত্রে মজলিস শেষ হল। ছেলেমেয়েদের সতেজ তরুণ গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে জেগে উঠল নিস্তব্ধ রাস্তাগুলো।

টেলিফোনটা বেজে উঠতে ঝার্‌কি রিসিভারটা তুলে নিল। সম্পাদকের দপ্তরে জমায়েত একদল কমসোমল সভ্য চেঁচামেচি করছিল, তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল সে, ‘চুপ করো, কিছু শুনতে পাচ্ছি না!’

গোলমালটা একটু কমে এল।

‘হ্যালো! ও, তুমি। হ্যাঁ, এক্ষুণি। আলোচনার বিষয়টা কী? ও, সেই পুরনো ব্যাপার — জাহাজঘাটা থেকে জ্বালানিকাঠ বয়ে আনা। কী বলছ? না, ওকে কোথাও পাঠানো হয় নি।

এখানেই আছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও? আচ্ছা, একটু ধরো।'

ঝার্কি পাভেলকে ইসারায় ডাকল।

'কমরেড উঁস্তিনোভিচ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' রিসিভারটা ওর হাতে দিয়ে বলল সে।

পাভেল শুনল রিতার গলা, 'ভেবেছিলাম তুমি শহরের বাইরে গেছ বুঝি। আজ সন্ধ্যেয় আমার কোন কাজ নেই। এসো না একবার? আমার ভাই চলে গেছে। এই শহর দিয়ে যাচ্ছিল সে, আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে বলে ঠিক করেছিল। দু'বছরের মধ্যে আমাদের দেখা হয় নি।'

রিতার ভাই!

আর কিছু কানে ঢুকল না পাভেলের। সেদিনের সন্ধ্যার বিশ্রী ঘটনাটার কথা আর সেই রাত্রে রেল-পুলের ধারে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে-কথা মনে পড়ছিল। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যাতেই রিতার কাছে গিয়ে সে সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলবে। ভালবাসা সঙ্গে করে আনে নিদারুণ বেদনা আর উদ্বেগ। এখন কি আর ওসবের মধ্যে যাওয়ার সময়?

রিতার স্বর তার কানে এল, 'শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। আমি ব্যুরোর মিটিংটার শেষে যাব।'

রিসিভারটা টাঙিয়ে রাখল সে।

সরাসরি রিতার চোখের দিকে তাকিয়ে, ওক-কাঠের টেবিলের ধারটা চেপে ধরে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা করার জন্যে আসতে পারব বলে মনে হয় না।'

পাভেল দেখতে পেল, তার এই কথা শুনে রিতার চোখের ঘন পল্লব উঠে এল ওপরের দিকে। কাগজের ওপরে তার

পেন্সিলটা চলতে চলতে ইতস্তত করে থেমে গেল খোলা খাতাটার বুকে।

'কেন?'

'আমার পক্ষে সময় পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তুমি তো জানোই, সময়টা আমাদের এখন বড়ো সুবিধের যাচ্ছে না। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাদের এটা এখন বন্ধ করে দিতে হবে...'

তার শেষ কথাগুলো যাতে তেমন স্থির-নিশ্চিত মতো না শোনায়, তার জন্যে সে সচেতন ছিল।

মনের মধ্যে একটা ক্রোধ জমে উঠছিল পাভেলের, 'আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা কেন? সরাসরি স্পষ্ট করে ফয়সালা করে ফেলার মতো সাহস তোমার নেই!'

অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে বলে গেল, 'তাছাড়া, আমি তোমাকে কিছুদিন থেকেই বলতে চাচ্ছিলাম — তোমার ব্যাখ্যাগুলো ঠিকমতো বুঝে নিতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। সেগালের কাছে যখন আমি পড়তাম, তখন যা শিখতাম সেটা আমার মাথার মধ্যে থেকে যেত। কিন্তু তোমার কাছে পড়ে তা থাকে না। তোমার পড়ানোর পরে আমাকে প্রত্যেকবারই তোকারেভের কাছে গিয়ে আরেকবার সব ঠিক মতো বুঝে নিতে হয়। আমারই দোষ এটা — আমার ভোঁতা বুদ্ধি ঠিক মতো নিতে পারে না তোমার সব কথা। আরেকটু মাথাওয়ালা কোনো ছাত্র তোমায় খুঁজে নিতে হবে।'

রিতার সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাভেল রিতার সঙ্গে ইচ্ছে করেই সমস্ত যোগসূত্রগুলো ছিন্ন করে দিয়ে গোঁয়ারের মতো বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ, এভাবে চালিয়ে গেলে আমাদের পক্ষে শুধু সময় নষ্ট করাই হবে।'

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে সে চেয়ারটা সাবধানে পা দিয়ে পাশে ঠেলে দিল। রিতার নুয়ে-পড়া মাথা আর মুখটার দিকে তাকাল পাভেল — বাতির আলোয় বিবর্ণ দেখাচ্ছে মুখখানা। টুপিটা মাথায় দিল সে।

'আচ্ছা, বিদায়, কমরেড রিতা। এতদিন ধরে তোমার সময় নষ্ট করেছি বলে আমি দুঃখিত। এর অনেক আগেই আমার কথাটা বলা উচিত ছিল তোমাকে। এইটেই আমার দোষ হয়ে গেছে।'

রিতা যান্ত্রিকভাবে তার হাতখানা এগিয়ে দিল পাভেলের দিকে, কিন্তু পাভেলের এই আকস্মিক নিস্পৃহতায় সে এত স্তম্ভিত হয়েছে যে, সামান্য কয়েকটা কথা ছাড়া বেশি কিছু আর সে বলতে পারল না, 'তোমায় দোষ দেব না, পাভেল। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলার কোনো উপায় যদি আমি বের করতে না পেরে থাকি, তাহলে দোষটা তো আমারই।'

ভারি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল পাভেল। বেরিয়ে এসে আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নিচে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল — ফিরে গিয়ে সব কিছু খোলসা করে বলার সময় এখনও বয়ে যায় নি... কিন্তু কী লাভ? কিসের জন্যে? রিতার ঘৃণাভরা জবাব পেয়ে ফের বেরিয়ে আসার জন্যে? না।

রেলওয়ে সাইডিং ভাঙাচোরা রেলগাড়ি আর অকর্মণ্য ইঞ্জিনের কবরখানা হয়ে উঠেছে। বাতাসের ঘূর্ণি এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে জনহীন কাঠের কারখানার শুকনো কাঠের গুঁড়োগুলো।

শহরটার চারিধারে বনের ঝোপেঝাড়ে আর খাদে-খন্দে ওর্‌লিক-এর দস্যুদলের লোকজন ওৎ পেতে আছে। দিনের বেলায় এরা আশেপাশের গ্রামগুলোয় কিংবা বনের মধ্যে

এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রিবেলায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে রেলপথের ওপরে, লাইন উপড়ে ফেলে দেয় বেপরোয়াভাবে, তারপরে সেই শয়তানির শেষে গুঁড়ি মেরে ফিরে যায় তাদের ঘাঁটিগুলোয়।

রেলপথের এই উঁচু পাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে অনেকগুলি ইঞ্জিন। কামরাগাড়িগুলো ভেঙে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে ঘুমন্ত মানুষের দল চাপাটির মতো চেপ্টে গেছে, বহুমূল্য খাদ্যশস্য রক্তে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে।

দস্যুদলটা হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো ছোটখাটো শহরের মধ্যে, ভয়-পাওয়া মুর্গিগুলো ডাক ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিধারে। কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দেয় ওরা যেদিকে-সেদিকে। জেলা সোভিয়েতের বাড়ির বাইরে সামান্য কিছুক্ষণ রাইফেল-ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যায় — শব্দটা পায়ের নিচে শুকনো সরু গাছের ডাল মাড়িয়ে চলার চড়্‌চড়ে আওয়াজের মতো। তারপরে ডাকাতরা তাদের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলোয় চেপে সবেগে ছুটে চলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে, সামনে যাকে পায় তাকেই কেটে ফেলে। মানুষের ওপরে তারা এমন শান্তভাবে কোপ বসায় যেন কাঠ চিরছে। গুলি ছোঁড়ে খুব কম, কারণ বুলেট দুষ্প্রাপ্য।

দলটা যেমন দ্রুত আসে, তেমনি দ্রুত চলেও যায়। সর্বত্র ডাকাতদের চোখ আর কান কাজ করে চলেছে। জেলা সোভিয়েতের ছোট শাদা বাড়িটার দেয়াল ভেদ করে সেই সব চোখ দেখতে পায় পাদ্রীর বাড়ি আর কুলাকদের খামারবাড়িগুলো — সেখান থেকে একটা অদৃশ্য সুতো চলে গেছে বনের ঝোপঝাড়গুলোর দিকে। অস্ত্রশস্ত্রের বাক্স, টাটকা মাংসের টুকরো, নীলচে রঙের নির্জলা মদের বোতল ইত্যাদিও

চালান হয়ে যায় সেই একই দিকে। ছোটখাটো আতামানদের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলা খবরাখবরও চলে যায়, আর তাদের কাছ থেকে প্যাঁচালো পথে সেটা গিয়ে পৌঁছোয় স্বয়ং ওর্‌লিকের কাছে।

যদিও দলটায় দু-তিনশোর বেশি বোম্বেটে নেই, তবু তারা এতদিন ধরে ধরা-পড়ার হাত এড়িয়েছে। কতকগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এরা একই সঙ্গে দু-তিনটে অঞ্চলে কাজ চালায়। ওদের সবাইকে ধরা অসম্ভব। আগের রাত্রের ডাকাতটাকে হয়ত পরদিন সকালে দেখা যাবে নির্বিরোধী একজন চাষী — ক্ষেত-বাগানে এটা-ওটা কাজে ব্যস্ত, ঘোড়াটাকে খাওয়াচ্ছে কিংবা দিব্যি পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টহলদার ঘোড়-সওয়ারদলের ঘোড়া হাঁকিয়ে যাওয়ার দিকে।

আলেক্সান্দর পুজিরেভস্কি এই তিনটি অঞ্চলে তাঁর রেজিমেন্টের সঙ্গে নাছোড়বান্দার জেদ নিয়ে অবিশ্রাম তাড়া করে ফিরছেন ডাকাতদলটাকে। মাঝে মাঝে তিনি তাদের লেজে ঘা দিতে সমর্থ হয়েছেন; একমাস বাদে ওর্‌লিক দুটো অঞ্চল থেকে তার গুন্ডাদলকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইদানীং সে সংকীর্ণ একফালি জায়গার মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

শহরের জীবন চিরাচরিত ঢিমে চালে বয়ে চলেছে। এখানকার পাঁচটি বাজারে কোলাহলরত জনতা জমে ওঠে। এই প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে দুটো দিকে প্রবণতা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়: যতোটা বেশি পারা যায় হাতিয়ে নেওয়া, আর যতোটা কম দিতে পারা যায়। যতো রকমের সব ঠক আর জোচ্চোর তাদের উদ্যম আর যোগ্যতাকে খাটিয়ে নেবার

অজস্র সুযোগ পায় এই পরিবেশে। ভিড়ের মধ্যে ওত পেতে ঘুরে বেড়ায় শত শত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক যাদের চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় সততা ছাড়া আর সবকিছু। গোবরগাদায় মাছির মতো এসে জড়ো হয় এখানে শহরের যতো বদমায়েশ লোক একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে: নিরীহ সাদাসিধে লোকদের ঠকানো। যে-সামান্য কয়েকটা ট্রেন আসে, তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দলে দলে বস্তা-কাঁধে লোক—এরা তৎক্ষণাৎ সোজা বাজারমুখো রওনা দেয়।

রাত্রে যখন বাজার অঞ্চলটা নির্জন হয়ে পড়ে তখন অন্ধকার দোকানঘরের সারিগুলো বীভৎস আর বিদ্‌ঘুটে দেখায়।

এই জনহীন অঞ্চলটায়, যেখানে প্রত্যেকটি দোকানঘরের পেছনে বিপদ রয়েছে ওত পেতে, সেখানে অন্ধকার নামার পর শুধু সাহসী লোকই যেতে পারে। প্রায়ই রাত্রিবেলায় গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ ওঠে লোহার ওপর হাতুড়ির আঘাত এসে পড়ার মতো শব্দ তুলে, আর দেখা যায় হয়তো কোনো মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় তার নিজেরই চাপ-চাপ রক্তে। সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গাগুলো থেকে জনকতক মিলিশিয়ার লোক (তারা একা এদিকে আসতে সাহস করে না) এখানে এসে পড়তে পড়তে দুমড়ানো বিকৃত মৃতদেহটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। খুনীরা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে, আর বাজার-চত্বরের নিয়মিত রাত্রির বাসিন্দা লোক সেই গোলমালের মধ্যে এক-দমক হাওয়ার মতো উড়ে গেছে।

বাজারের সামনেই 'ওরিয়ন' সিনেমা। রাস্তা আর চত্বরটা বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল। প্রবেশপথে জনতা ভিড় জমিয়ে তোলে।

হলের ভেতরে সিনেমার প্রজেক্টার-যন্ত্রটা মৃদু আওয়াজের সঙ্গে পর্দার ওপরে অতিনাটকীয় সব প্রেমের দৃশ্য ফুটিয়ে

তোলে। মাঝে মাঝে ফিল্ম কেটে যায়, দর্শকরা আপত্তি জানিয়ে চিৎকার করে আর তার মধ্যে অপারেটর প্রজেক্টারটাকে বন্ধ করে দেয়।

শহরতলীতে আর শহরের কেন্দ্রে জীবন তার স্বাভাবিক গতিতেই চলেছে বলে মনে হয়। এমন কি, বিপ্লবী-কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র যে পার্টির প্রাদেশিক কমিটি, সেখানেও সব কিছু বেশ শান্ত। কিন্তু এটা শুধু বাইরের প্রশান্তি।

একটা ঝড় ঘনিয়ে উঠছে শহরে।

নানান্ দিক থেকে যারা তাদের সামরিক রাইফেলগুলো জামার নিচে লুকিয়ে আসে, তাদের অনেকেই এই আসন্ন ঝড়ের কথাটা জানে। খাবার-জিনিসপত্রের ফাট্কাবাজ সেজে যারা ট্রেনের ছাদে চেপে আসে, তারাও কথাটা জানে। এরা তাদের বস্তাগুলো নিয়ে বাজারে যাবার বদলে যায় সাবধানে মনে করে রাখা কতকগুলো ঠিকানায়।

এরা জানে। কিন্তু শ্রমিক-অঞ্চলের লোকেরা এবং, এমন কি, বলশেভিকরাও আসন্ন এই ঝড়ের কোনো আঁচ পায় নি।

শহরের মাত্র পাঁচজন বলশেভিক জানে কিসের ষড়যন্ত্র চলেছে।

পেৎলিউরার দলের বাদবাকি লোককে লাল ফৌজ শ্বেত পোল্যাণ্ডে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরা ওয়ারস'তে কতকগুলো বৈদেশিক মহলের সহযোগিতায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্যে তোড়জোড় চালাচ্ছে।

পেৎলিউরার ফৌজের যে-অংশটুকু তখনও টিকে আছে, তাদের নিয়ে একটা হাম্লাদারদল তৈরি হচ্ছে।

প্রতিবিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় একটা কমিটি আছে শেপেতোভ্কায়-ও। সাতচল্লিশজন লোক আছে এতে। এদের অধিকাংশই হচ্ছে ভূতপূর্ব সক্রিয় প্রতিবিপ্লবী যাদের স্থানীয়

'চেকা' বিশ্বাস করে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে দিয়েছে।

এই সংগঠনের নেতা ফাদার ভাসিলি, ইনসাইন ভিন্নিক আর কুজ্‌মেঙ্কো নামে একজন পেৎলিউরা-অফিসার। গোয়েন্দাগিরির কাজটা চালায় পাদ্রীর মেয়েগুলো, ভিন্নিক-এর বাবা আর ভাই এবং সামোতিয়া নামে একজন লোক। এই লোকটা যা হোক করে কার্যনির্বাহক কমিটির দপ্তরে ঢুকে গেছে।

পরিকল্পনাটা ছিল সীমান্তের বিশেষ বিভাগটির ওপর রাত্রে হাত-বোমা ছুঁড়ে হামলা চালিয়ে কয়েদীদের খালাস করে নেওয়া এবং, সম্ভব হলে, রেল-স্টেশনটাকে দখল করে ফেলা।

ইতিমধ্যে, গোপনে অফিসারদের এনে জড়ো করা হচ্ছে বড়ো শহরে, সেটা অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হবার কথা। আশেপাশের বনেজঙ্গলে সরিয়ে আনা হচ্ছে ডাকাতদের দলগুলোকে। বিশ্বাসভাজন লোকদের মারফত এখান থেকে রুমানিয়ার সঙ্গে আর স্বয়ং পেৎলিউরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

বিশেষ বিভাগে তার দপ্তরে ফিওদর ঝুখ্‌রাই ছ'রাত্রি ঘুমোয় নি। যে পাঁচজন বলশেভিক জানে কী ঘটতে চলেছে তাদের মধ্যে সে একজন। বড়ো রকম শিকার তাকের মধ্যে পাবার পর জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করার সময় বাঘ-সিংহ-মারনেওয়ালা শিকারীদের যেমন হয় এই ভূতপূর্ব নাবিকটি ইদানীং সেইরকম একটা উত্তেজনা অনুভব করছে।

সোরগোল তুলে সবাইকে সাবধান করে দেবার ঝুঁকি নিতে পারে না সে। রক্তপিপাসু রাক্ষসটাকে বধ করতেই হবে। তারপর, একমাত্র তখনই প্রত্যেকটা ঝোপের পেছনে সচকিত

হয়ে না তাকিয়ে, শান্তভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু জানোয়ারটা যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায় কিছুতেই। এই ধরনের জীবন-মরণ সংগ্রামে ধৈর্য আর দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

আসল সংকটের মুহূর্তটা এগিয়ে এসেছে।

শহরের কোনো এক স্থানে ষড়যন্ত্রের গোপন জায়গাগুলোর গোলকধাঁধার মধ্যে একটা সময় ঠিক করে ফেলা হয়েছে: আগামীকাল রাত্রে।

কিন্তু যে পাঁচজন বলশেভিক ব্যাপারটা জানত তারা আগেই আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের সময় হল---আজ রাত্রে।

এইদিন সন্ধ্যের সময় ডিপো থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা সাঁজোয়া-ট্রেন আর তেমনি নিঃশব্দে তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ভারি গেট।

সাংকেতিক টেলিগ্রাম চলে গেল তার বেয়ে, আর, যে-সমস্ত সজাগ আর সতর্ক লোকদের ওপর প্রজাতন্ত্র নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছে, তারা এই জরুরি তলবের জবাবে তৎক্ষণাৎ ভিমরুলের চাকটিকে পিষে মারবার ব্যবস্থা করল।

ঝার্কিকে টেলিফোন করল আকিম।

'সেল-মিটিংগুলোর ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? বেশ। এক্ষুণি একটা আলোচনা-বৈঠকের জন্যে চলে এসো, আর জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। জালানির সমস্যাটা যতোটা ভেবেছি আমরা তার চেয়েও গুরুতর। তোমরা এখানে এসে পৌঁছালে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।' দৃঢ় গলায় দ্রুত বলে গেল আকিম কথাগুলো।

'এই জালানিকাঠের ব্যাপারটা দেখছি আমাদের পাগল করে ছাড়বে।' বিরক্তি-ভরা গলায় ঝার্কি উত্তর দিল রিসিভারটা রাখতে রাখতে।

লিৎকে ঝড়ের বেগে মোটর হাঁকিয়ে সদর-দপ্তরে পেঁছে দিল সম্পাদক দুজনকে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে জ্বালানিকাঠের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে তাদের এখানে তলব করা হয় নি।

দপ্তর-ব্যবস্থাপকের ডেস্ক্-এর ওপরে মেশিনগান রাখা আছে আর এটার পাশে বিশেষ সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজরা ব্যস্ত। শহরের পার্টি আর কমসোমল সংগঠনগুলোর শান্ত্রীরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দাগুলোয়। সম্পাদকের দপ্তরের চওড়া দরজাটার পেছনে প্রাদেশিক পার্টি কমিটির ব্যুরোর জরুরী বৈঠক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রাস্তার দিকে জানলার ঘুলঘুলির ফাঁকে তার বেরিয়ে গিয়ে যুক্ত হয়েছে দুটো চলমান ফৌজী টেলিফোনের সঙ্গে।

ঘরটার মধ্যে কথাবার্তার একটা চাপা গুঞ্জন। এই ঘরে রয়েছে আকিম, রিতা আর মিখাইলো। রিতার মাথায় একটা লাল ফৌজের শিরস্ত্রাণ, পরনে খাকি-স্কার্ট, চামড়ার কোর্তা, কোমরবন্ধনীটা থেকে ভারি একটা মোজার-পিস্তল ঝুলছে -- একটা কম্পানির রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কাজ করার সময় সে এই রকম উর্দি পরে থাকত।

ঝারকি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তাকে, 'ব্যাপারখানা কী?'

'সতর্কতাসূচক একটা মহলা, ভানিয়া। এখনই আমরা তোমার পাড়ায় যাব। পাঁচ-নম্বর পদাতিক-বাহিনীর ইস্কুলে আমরা জড়ো হব। কমসোমল আর পার্টি সভ্যরা তাদের সেল-মিটিংয়ের পরে সরাসরি ওখানে যাবে। আসল কথাটা হচ্ছে— কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ওখানে যেতে হবে।'

পুরনো সামরিক ইস্কুলের বন। তার বিরাট প্রাচীন ওক্‌গাছগুলো, জোলোঘাস আর শ্যাওলা-জমা পুকুর, আর চওড়া ধুলোভর্তি বীথি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

বনের মাঝখানে একটা উঁচু শাদা দেওয়ালের পেছনে ইস্কুল-বাড়ি---যেটা ইদানীং লাল ফৌজের পদাতিক বাহিনীর অধিনায়কদের জন্যে পাঁচ-নম্বরের ইস্কুলের জায়গা। গভীর রাত্রি এখন। বাড়িটার ওপরতলা অন্ধকার। বাইরে থেকে একটা গভীর প্রশান্তির ভাব। এমনি যদি কেউ এদিক দিয়ে দৈবাৎ যায়, তাহলে ভাববে--ইস্কুলের লোকজন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তাহলে লোহার ফটক খোলা কেন, আর তার পাশে ওই বিরাট ব্যাঙের মতো দেখতে কালো জিনিস দুটোই বা কী? রেলওয়ে-অঞ্চলের চারিদিক থেকে যারা এই জায়গাটায় এসে জড়ো হচ্ছে, তারা জানে, রাত্রির সতর্কতাসূচক সংকেত পাবার পর আর ইস্কুলের বাসিন্দারা কেউ ঘুমুতে পারে না। তারা তাদের কমসোমলের আর পার্টি সেল-মিটিংয়ের সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসছে। নিঃশব্দে, একে একে, জোড়ায় জোড়ায় আসছে, একসঙ্গে তিনজনের বেশি কেউ আসে না এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের কমিউনিস্ট পার্টি সভ্যের কার্ড কিংবা কমসোমলের কার্ড সঙ্গে আনছে। এই কার্ড ছাড়া লোহার ফটক দিয়ে ঢুকতে পারবে না কেউ।

সবার জড়ো হবার জন্যে বড়ো হল-ঘরটা আলোয় উজ্জ্বল, ইতিমধ্যেই সেখানে বহু লোক এসে গেছে। জানলাগুলো ভারি মোটা ক্যাম্বিসের কাপড়ে মোড়া। যে-সমস্ত বলশেভিক এখানে তলব হয়ে এসেছে, তারা শান্তভাবে তাদের ঘরে-তৈরি সিগারেট খাচ্ছে আর মামুলি একটা সতর্কতাসূচক সমাবেশের জন্যে এতো বেশি সাবধানতা নেওয়া হয়েছে দেখে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা আরম্ভ করে দিয়েছে। এটা যে সত্যিকারের একটা বিপদসংকেত, তা কেউই বুঝে উঠতে পারে নি। বিশেষ বিভাগের সৈন্যদলগুলোয় শৃঙ্খলা আর

অভ্যেস বজায় রাখার জন্যে এটা করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ সৈনিক যারা, তারা কিন্তু ইস্কুল-বাড়ির আঙিনায় ঢোকামাত্র এটাকে একটা সত্যিকারের বিপদসংকেত বলে বুঝতে পেরেছে। সাবধানতাটুকু বড়ো বেশি রকম দেখা যাচ্ছে। ফিসফিসিয়ে বলা হুকুম-অনুযায়ী ফৌজী ছাত্রেরা সব বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। মেশিনগানগুলোকে নিঃশব্দে হাতে করে বয়ে আনা হচ্ছে আঙিনায় এবং বাড়িটার কোনো জানলায় এক বিন্দু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না।

জানলার ধারে একটা মেয়ের পাশে দুবাভা বসেছিল—তার কাছে গিয়ে পাভেল করচাগিন জিজ্ঞেস করল, 'গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে নাকি, মিতিয়াই?' তার পাশের মেয়েটাকে পাভেল দিন দুয়েক আগে ঝারকির ওখানে দেখেছে বলে মনে পড়ল।

দুবাভা কৌতুকের সঙ্গে পাভেলের কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'পা কাঁপছে বুঝি, অ্যাঁ? কিচ্ছু ঘাবড়াবার নেই, কী করে লড়াই করতে হয়, আমরা ঠিকমতো শিখিয়ে দেব তোমাদের। তোমাদের মধ্যে আলাপ নেই, না?' মেয়েটিকে মাথা নেড়ে দেখাল সে, 'ওর নাম আন্না, পদবীটা জানি নে, তবে পদটা জানি—ও হচ্ছে প্রচার-আন্দোলন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী।'

দুবাভা এইভাবে যার পরিচয় দিল, সেই মেয়েটি তার মাথায় বাঁধা বেগুনি রঙের রুমালটার ফাঁকে বেরিয়ে-পড়া একগোছা চুল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সাগ্রহে করচাগিনকে দেখছিল। তার সঙ্গে করচাগিনের চোখাচোখি হতেই দু-এক মুহূর্তের জন্যে নিঃশব্দে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল। দীর্ঘ চোখের পাতার নিচে তার উজ্জ্বল আর নিবিড় কালো চাউনি পাভেলের চাউনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল। আরক্ত হচ্ছে বুঝে পাভেল ভুরু কুঁচকে দৃষ্টি সরিয়ে

নিয়ে দুবাভার দিকে তাকাল। জোর করে মুখে হাসি এনে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মধ্যে আন্দোলনের কাজটা চালায় কে?'

সেই মুহূর্তে হল-ঘরে একটা সাড়া উঠল। মিখাইলো শ্কোলেঙ্কো একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, 'এক-নম্বর কম্পানির সৈন্যরা সারি বাঁধো! জলদি করো, কমরেড, চটপট!'

প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি আর আকিমের সঙ্গে ঢুকল ঝুখ্‌রাই। তারা এইমাত্র এসে পেঁাছেছে।

হল-ঘরটা এখন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সারি বেঁধে দাঁড়ানো মানুষে ভরে উঠেছে।

ট্রেনিংয়ের জন্যে ব্যবহৃত একটা মেশিনগানের মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি হাত তুলে বলল, 'কমরেডসব! অত্যন্ত গুরুতর আর জরুরী একটা ব্যাপারে আপনাদের এখানে তলব করা হয়েছে। আমি এখন যে কথাগুলো বলব, সে কথাগুলো নিরাপত্তামূলক কারণে এমন কি গতকাল পর্যন্তও বলা যেত না। আগামীকাল রাত্রে এই শহরে আর ইউক্রেনের সর্বত্র একটা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারিত হয়ে আছে। শ্বেতরক্ষী অফিসারে ছেয়ে গেছে শহর। শহরের চারিধার ঘিরে ডাকাতদের দল জমা করা হয়েছে। চক্রান্তকারীদের একাংশ সাঁজোয়া-গাড়ি-বাহিনীতে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে তারা ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সময় হাতে থাকতেই 'চেকা' ষড়যন্ত্রটা ধরে ফেলেছে এবং আমরা তাই গোটা পার্টি আর কমসোমল সংগঠনগুলিকে সশস্ত্র করে তুলছি। সামরিক ইস্কুলের বাহিনী আর 'চেকা'র ফৌজী দলের সঙ্গে এক-নম্বর আর দু'-নম্বর কমিউনিস্ট ব্যাটালিয়ন কাজ করবে। সামরিক

ইস্কুলের সৈন্যদলগুলো ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে। এবার আপনাদের পালা, কমরেডসব। পনের মিনিটের মধ্যে যে যার হাতিয়ার নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে। সমস্ত কাজটা পরিচালনা করবেন কমরেড ঝুখ্‌রাই। সৈন্যদলের অধিনায়করা তাঁর কাছ থেকে নিজের নিজের কাজের নির্দেশ নেবেন। অবস্থার গুরুত্বটা বারবার করে বলার কোনো দরকার দেখি না। আগামী কালকের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে আজকেই রোখা চাই।'

সিকি ঘণ্টা বাদে সশস্ত্র ব্যাটালিয়নটা ইস্কুল-বাড়ির আঙিনায় দাঁড়াল সার বেঁধে।

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদলটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ঝুখ্‌রাই।

সারির তিন-পা আগে সামনে দাঁড়িয়ে আছে চামড়ার কোমরবন্ধনীপরা দুজন লোক: ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার মেনিয়াইলো—ঢালাই-কারখানার মজুর সে, উরাল অঞ্চলের বিরাটকায় মানুষ, এবং তার পাশে কমিশার আকিম। বাঁদিকে এক-নম্বর কম্পানির পল্টনগুলো, তাদের দু-পা সামনে কম্পানির কম্যাণ্ডার আর রাজনীতিক নেতা। এদের পেছনে কমিউনিস্ট ব্যাটালিয়নের নিস্তব্ধ সারি দাঁড়িয়ে আছে; এদের সংখ্যা তিনশো।

ফিওদর সংকেত জানাল:

'কাজে নামবার সময় হয়েছে।'

নির্জন রাস্তা দিয়ে কুচ্‌কাওয়াজ করে চলল তিনশো মানুষ। শহরটা ঘুমোচ্ছে তখন।

ল্‌ভোভ্‌স্কায়া স্ট্রিট আর দিকায়া স্ট্রিটের মোড়ে এসে এরা থামল। এইখান থেকে কাজ শুরু হবে।

নিঃশব্দে ঘিরে ফেলল তারা পাড়াগুলো। একটা দোকানের সামনের সিঁড়িতে হেড্‌কোয়ার্টার বসানো হল।

শহরের কেন্দ্রের দিক থেকে একটা মোটরগাড়ি তার হেড্‌লাইটের উজ্জ্বলতায় একটা আলোর পথ কেটে ল্‌ভোভ্‌স্কায়া স্ট্রিট বেয়ে দ্রুত এসে পড়ল। ব্যাটালিয়নের ঘাঁটির সামনে এসে গাড়িটা হঠাৎ থামল।

এই দফায় লিৎকে তার বাবাকে নিয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ছেলের দিকে মাথাটা ফিরিয়ে লাতভিয়ান ভাষায় অল্প গোটাকতক কাটা-কাটা কথা বললেন কম্যান্ড্যাণ্ট। সামনে একটা লাফ দিয়েই গাড়িটা রাস্তার বাঁকে এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৈত্যের মতো গাড়ি হাঁকাচ্ছে গুগো— স্টিয়ারিং হুইলে তার হাত দুটো এত জোরে চেপে বসেছে যেন সে-দুটো হুইলেরই অংশ, তার চোখ-জোড়া রাস্তার ওপরে আটকানো।

হ্যাঁ, আজ রাত্রে গুগোর এই উন্মত্ত গাড়ি-চালনার দরকার আছে! এত জোরে গাড়ি হাঁকালে তার দু-রাত্রি হাজতবাসের শাস্তি পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই!

উল্কার বেগে রাস্তা বেয়ে উড়ে চলেছে গুগো লিৎকে।

চক্ষের পলকে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঝুখ্‌রাইকে গাড়ি হাঁকিয়ে এনে ফেলেছে তরুণ লিৎকে। ঝুখ্‌রাই তাকে তারিফ না জানিয়ে পারল না, 'আজ রাত্রে যদি তুমি কাউকে চাপা না দাও তাহলে কাল তুমি একটা সোনার ঘড়ি পাবে।'

খুশিতে উপছে উঠল গুগো, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ওই মোড়টা ফেরার জন্যে দশ দিনের হাজতবাস সাজা পাব...'

প্রথম আঘাত হানা হল ষড়যন্ত্রীদের সদর-ঘাঁটির উপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার-করা প্রথম লোকগুলোকে

আর দলিলপত্রের বাণ্ডিল পেঁছে দেওয়া হল বিশেষ বিভাগে।

দিকায়া স্ট্রিটের এগারো নম্বর বাড়িতে হুরবের্ট নামে একজন লোক থাকে,—'চেকা'র কাছে যে খবর এসেছিল, তাতে এই শ্বেতরক্ষী ষড়যন্ত্রে লোকটার হাত বড়ো কম ছিল না। অফিসারদের যে-দলটার পদোল্ অঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটানোর কথা, তাদের নামের তালিকা এর কাছে ছিল।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট লিৎকে স্বয়ং দিকায়া স্ট্রিটে এলেন লোকটাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। হুর্‌বের্টের ঘরের জানলাগুলো বাড়ির বাগানের দিকে। এই বাগানটা আর ভূতপূর্ব একটা মঠ-বাড়ির মাঝখানে উঁচু দেওয়ালের ব্যবধান। হুরবের্ট বাড়ি নেই। প্রতিবেশীরা বলল, তাকে সেদিন সারা দিনের মধ্যে দেখা যায় নি। খানাতল্লাশি করে সেই নাম-ঠিকানার তালিকাগুলো আর এক-বাক্স হাত-বোমা পাওয়া গেল। বাইরে পাহারাদারির জন্যে সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ দিয়ে লিৎকে কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করার জন্যে ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ রইলেন।

সামরিক ইস্কুলের তরুণ ছাত্রটিকে নিচে বাগানের এক কোণে পাহারা দেবার জন্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে সে আলোকিত জানলাটি দেখতে পাচ্ছিল। এখানে একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে একটু ভয়-ভয় করছিল তার। দেয়ালটার ওপর নজর রাখার জন্যে বলা হয়েছিল তাকে। তার পাহারাদারির জায়গাটা থেকে এই ভরসা-জাগানো আলোর রেখাটা বড়ো দূরে বলে মনে হল তার। এবং, হতভাগা চাঁদটা কেবলই মেঘের পেছনে আড়াল হয়ে গিয়ে গিয়ে অবস্থাটাকে আরও খারাপ করে তুলছে। রাত্রিবেলায় ঝোপঝাড়গুলো যেন তাদের নিজস্ব এক ধরনের অশুভ

জীবনসঞ্চারে প্রাণ পেয়ে ওঠে। তরুণ সৈন্যটি তার নিজের চারিধারের অন্ধকারকে বিঁধল তার বেয়নেটের খোঁচায়। না, কিচ্ছু নেই।

'আমাকে এখানে খাড়া করে দিয়েছে কেন? এই দেয়ালটা বেয়ে তো আর কারুর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়—এটা ঢের বেশি উঁচু। জানলাটার কাছে গিয়ে বরং ভেতরে একনজর দেখে নেওয়া যাক।' দেয়ালটার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে সে তার সোঁদা শ্যাওলা-গন্ধী কোণটা থেকে বেরিয়ে এল। জানলাটার কাছাকাছি সে আসতেই লিৎকে টেবিলের ওপর থেকে কাগজগুলো তুলে নিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দেয়ালের মাথায় একটা ছায়া দেখা গেল, যেখান থেকে জানলার পাশে শান্ত্রীটাকে আর ঘরের ভেতরে লিৎকে দুজনকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বেড়ালের মতো তৎপরতার সঙ্গে একটা গাছের ডালে ঝুলে পড়ল ছায়াটা, তারপর মাটিতে নেমে পড়ল। নিঃশব্দে এগিয়ে এল শিকারটার দিকে গুঁড়ি মেরে। একটা মাত্র আঘাতেই নাবিকের লম্বা সরু একটা ছোরা হাতল পর্যন্ত গলায় বিঁধে গিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল শান্ত্রীটি।

আশেপাশের বাড়িগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যে সৈন্যরা, তাদের চমকে দিয়ে বাগানে একটা গুলির আওয়াজ উঠল।

ছ'জন লোক ছুটে এল বাড়িটার দিকে. রাত্রির অন্ধকারে তাদের পা-ফেলার জোরালো আওয়াজ উঠল।

টেবিলটার ওপরে ঝুঁকে নেতিয়ে পড়ে আছেন লিৎকে, তাঁর মাথার ক্ষত থেকে রক্ত চুয়ে পড়ছে। মারা গেছেন তিনি। গুঁড়িয়ে গেছে জানলার শার্সিটা। কিন্তু হত্যাকারী দলিলপত্রগুলো হাতিয়ে নেবার সময় পায় নি।

মঠ-বাড়ির দেয়ালটার পিছনে আরও কতকগুলো গুলির

আওয়াজ শোনা গেল। দেয়াল টপ্‌কে এসে রাস্তায় পড়ে খুনীটা লুকিয়ানভ পতিত জমির দিকটা দিয়ে পালাবার চেষ্টায় গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু একটা বুলেট এসে তার দৌড়ানো রুখে দিল।

সারা রাত্রি ধরে খানাতল্লাশি চলল। বাসিন্দার তালিকায় যাদের নাম ছিল না আর যাদের কাছ থেকে সন্দেহজনক কাগজপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল, সেই শত শত লোকদের চালান করে দেওয়া হল 'চেকা'র কাছে। সেখানে একটা কমিশন সন্দেহভাজন লোকদের বাছাই করার কাজে ব্যস্ত থাকল।

এখানে-ওখানে চক্রান্তকারীরা পাল্টা আক্রমণ চালাল। জিলিয়ানস্কায়া স্ট্রিটে একটা বাড়িতে খানাতল্লাশি চলবার সময়ে আন্তন লেবেদেভ একটা গুলিতে মারা গেল।

সলোমেন্‌কা রেজিমেণ্ট পাঁচজন লোক হারাল সেই রাত্রে, আর 'চেকা' হারাল সেই একাগ্র বলশেভিক আর প্রজাতন্ত্রের বিশ্বস্ত সান্ত্রী ইয়ান লিৎকে-কে।

কিন্তু শ্বেতরক্ষী অভ্যুত্থানটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া হল।

সেই রাত্রেই শেপেতোভ্‌কায় ফাদার ভাসিলিকে তার মেয়েদের সঙ্গে এবং দলের আর-সবাইয়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল।

উত্তেজনাটা কমল।

কিন্তু শিগগিরই আরেকটা নতুন শত্রু শহরটাকে বিপন্ন করল: রেল-চলাচল একেবারে বন্ধ, কপালে আসন্ন শীতকালের অনাহার আর ঠাণ্ডায় দুর্ভোগ।

সবকিছু এখন নির্ভর করছে খাদ্যশস্য আর জালানিকাঠের ওপর।

ফিওদর তার খাটো নল-ওয়ালা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে পাইপের বাটিটার মধ্যে ছাইটুকু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল সাবধানে। নিভে গেছে পাইপটা।

ডজন-খানেক সিগারেটের ধূসর ধোঁয়ার একটা ঘন মেঘ জমে উঠেছে ঘরের ছাদের নিচে আর প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি যেখানে বসে আছে সেই চেয়ারটার ওপর দিকে। টেবিলের চারধারে আর ঘরের কোণে কোণে যারা বসে আছে, তাদের মুখগুলো ধোঁয়ার মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সভাপতির পাশেই বসে আছে তোকারেভ, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিরক্তির সঙ্গে সে তার পাতলা দাড়ি টানছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে বেঁটে টাক-মাথা একটা লোকের দিকে; এই লোকটা চড়া সরু গলায় অনর্গল কথা বলে চলেছে—অর্থহীন ফাঁকা বুলিগুলো তার শূন্যগর্ভ ডিমের খোলার মতোই অন্তঃসারশূন্য।

বৃদ্ধ শ্রমিক তোকারেভের চোখের দিকে তাকিয়ে আকিমের মনে পড়ল—ছেলেবেলায় তার গ্রামে একটা লড়ায়ে-মোরগ ছিল, প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সেই মোরগটার চোখে ঠিক এইরকম তীব্র দৃষ্টি ফুটে উঠত।

পার্টির প্রাদেশিক কমিটি একঘণ্টার ওপর আলোচনা-বৈঠকে বসেছে। টেকো লোকটা রেলওয়ের জালানিকাঠ-কমিটির সভাপতি।

সামনের কাগজের স্তূপের মধ্যে দ্রুত আঙুল চালিয়ে টাক-মাথা লোকটা গড়গড়িয়ে বলে চলেছে, '...এ অবস্থায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রাদেশিক কমিটির আর রেলওয়ে-

পরিচালনা দপ্তরের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা অসম্ভব। আমি আবার বলছি, আজ থেকে একমাসের মধ্যেও আমরা চার-শো ঘন-মিটারের বেশি জালানিকাঠ দিয়ে উঠতে পারব না। আর এই যে এক লক্ষ আশি হাজার ঘন-মিটার দরকার, এটা হল গিয়ে নিতান্তই...' উপযুক্ত কথাটা হাতড়াবার চেষ্টা করতে সে বলল, 'ইয়ে... মানে, নিতান্তই আকাশকুসুম কল্পনা!' বক্তব্য শেষ করে সে তার ছোট্ট মুখটাকে একটা আহত ভঙ্গিতে বন্ধ করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ফিওদর তার আঙুলের ডগায় পাইপ ঠুকে ছাই ঝেড়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভাঙল তোকারেভ।

'শুধু শুধু কথা চিবিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই,' গুরুগম্ভীর গলায় সে বলতে শুরু করল, 'রেলওয়ের জালানিকাঠ-কমিটির হাতে জালানিকাঠ নেই, কোনোদিন ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না... এই তো?'

টাকওয়ালা লোকটি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল।

'মাপ করবেন, কমরেড, জালানিকাঠ আমরা মজুত করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু রেলপথ ছাড়া অন্যপথে মাল-চলাচলের ব্যবস্থার ঘাটতির ফলে...' ঢোক গিলে একটা চৌখুপী-ছক-কাটা রুমাল বের করে সে তার চকচকে মাথাটা মুছে নিল। রুমালটা পকেটে গোঁজার জন্যে বারকতক ব্যর্থ চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত সেটাকে অস্বস্তির সঙ্গে হাতব্যাগের নিচে গুঁজে দিল সে।

এক কোণ থেকে দেনেক্কো মন্তব্য করল, 'জালানিকাঠগুলো সরবরাহের জন্যে কী ব্যবস্থা করেছেন আপনি? এ ব্যাপারে যেসব বিশেষজ্ঞ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত গ্রেপ্তার করার পর অনেক দিনই তো কেটে গেছে।'

টাকওয়ালা লোকটি তার দিকে ফিরে বলল, 'রেলপথের কর্তৃপক্ষকে আমি তিনবার লিখে জানিয়েছি যে, আমাদের যদি মাল-চালানির উপযুক্ত ব্যবস্থা না দেওয়া হয়, তাহলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে...'

তোকারেভ বাধা দিল তাকে।

'ওকথা তো আমাদের শোনা হয়ে গেছে,' শত্রুতাভরা চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে সে শুকনো গলায় বলল, 'আপনি কি আমাদের বোকার দল বলে ঠাউরেছেন?'

এই কথায় টাকওয়ালা মানুষটি অনুভব করল তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা শীতল শিহরণ নেমে গেল।

নিচু গলায় বলল সে, 'প্রতিবিপ্লবীদের কাজের কৈফিয়ত তো আমি দিতে পারি না।'

'কিন্তু আপনি তো জানতেন যে রেল-লাইন থেকে বহু দূরের বনে গাছকাটা হয়—জানতেন কিনা?'

'সে কথা শুনেছি, কিন্তু আমার এলাকার বাইরে অনিয়ম ঘটেছে, সেদিকে আমার ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নি।'

ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভাপতি জানতে চাইল, 'কতজন লোক আছে আপনার বিভাগে?'

'প্রায় দু-শো,' জবাব দিল টেকো লোকটি।

হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল তোকারেভ, 'তার মানে পরগাছাগুলোর মাথাপিছু বছরে এক ঘন-মিটার কাঠ!'

'রেলওয়ের জালানিকাঠ-কমিটির জন্যে খাদ্যের বিশেষ রেশন বরাদ্দ হয়েছে—শ্রমিকদের যে-খাবারটা পাওয়া উচিত তার থেকে কেটে নিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আপনারা কী করছেন বলুন তো? মজুরদের জন্যে যে দু-গাড়ি ময়দা

পেলেন, সেটার কী হল?' চেপে ধরল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি।

চারিদিক থেকে এইরকম চোখা চোখা প্রশ্নের বর্ষণ হতে থাকল টাক-মাথা লোকটার ওপর, আর বিরক্তিকর পাওনাদারদের হাত এড়াবার মতো সে তাদের কথা এড়াবার চেষ্টা করল।

পাঁকাল মাছের মতো পাক খেয়ে সে এঁকেবেঁকে সরাসরি জবাব এড়িয়ে যেতে লাগল, কিন্তু চোখ দুটো তার অস্বস্তির সঙ্গে নিজের চারদিকে ঘোরাফেরা করছে। বিপদ আন্দাজ করে তার ভীরু মন শুধু একটা জিনিসের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে: এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সরে পড়ে তার আরামে ভরা বাড়িটার মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া-- সেখানে তার রাত্রের খাবার সাজানো রয়েছে আর তার স্ত্রী—যৌবন যার এখনও ফুরিয়ে যায় নি—আরাম করে বসে পল্-দ্য-কক্'এর লেখা হাল্কা উপন্যাস পড়ে সময় কাটাচ্ছে।

টাক-মাথা লোকটার জবাবগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনতে শুনতে ফিওদর তার নোটবুকে লিখল, 'আমার মনে হয়, এই লোকটাকে খুব ভালো করে যাচাই করা উচিত। ব্যাপারটা শুধু অযোগ্যতাই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। আমি এর সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানি... এই আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে ওকে চলে যেতে দাও, যাতে আমরা কাজের কথায় আসতে পারি।'

সভাপতি তার এই নোট পড়ে ফিওদরের দিকে মাথা নাড়ল।

ঝুখ্‌রাই উঠে গিয়ে বারান্দায় এল একটা টেলিফোন করার জন্যে। সে ফিরে এল যখন, তখন সভাপতি প্রস্তাবটা পড়ছে:

'...অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে রেলওয়ের জালানিকাঠ-কমিটির কর্তাদের বরখাস্ত করা হোক এবং কাঠ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধান-বিভাগের কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হোক।'

টেকো লোকটি আরও খারাপ কিছু হবে ভেবেছিল। একথা ঠিক যে অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু সেটা সামান্য ব্যাপার। আর ওই বোয়ার্‌কার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার কোনো ভাবনা নেই, ওটা তো আর তার এলাকা নয়। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল সে, 'আমি তো ভেবেছিলাম, সত্যিই কিছু খুঁড়ে বের করেছে বুঝি ওরা...'

এখন প্রায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েই, নিজের কাগজপত্রগুলো তার হাতব্যাগে পুরতে পুরতে সে বলল, 'আমি অবশ্য পার্টির বাইরেকার একজন বিশেষজ্ঞ লোক। আপনারা আমাকে অবশ্যই অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি খালাস। আমার যেটা করবার কথা, সেটা করা অসম্ভব ছিল বলেই আমি করে উঠতে পারি নি।'

কেউ কোনো মন্তব্য করল না। টাকওয়ালা লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রাস্তার দরজাটা খুলল দারুণ একটা স্বস্তির সঙ্গে।

সামরিক উর্দি-পরা একটা লোক তার দিকে এগিয়ে এল, 'মশাই, আপনার নামটা?'

ধুক্‌পুক্ করে উঠল তার বুকের ভেতর, থতমত খেয়ে বলল সে, 'চের্... ভিন্‌স্কি...'

ওপরের ঘরে এই লোকটা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মিটিং-টেবিলটার চারধারে তেরোটা মাথা ঝুঁকে পড়ল।

মেলে-ধরা মানচিত্রটার ওপরে আঙুল চালিয়ে ঝুখ্‌রাই

বলল, 'এইখানে দেখুন। এইটে বোয়ার্কা স্টেশন। এখান থেকে চার মাইল দূরে গাছ-কাটা হয়। এই জায়গায় দু'-লক্ষ দশ হাজার ঘন-মিটার কাঠ জমা হয়ে আছে। পুরো একটা শ্রমবাহিনী এই কাঠটা জড়ো করে তুলেছে আট মাসের কঠিন পরিশ্রমে। আর, ফলটা কী হয়েছে? বিশ্বাসঘাতকতা। রেলওয়েতে আর শহরে জালানিকাঠ নেই। এই কাঠগুলো চার মাইল রাস্তা বেয়ে স্টেশনে নিয়ে আসতে পাঁচ-হাজার গাড়ি লাগালেও একমাসের কম লাগবে না—তাও আবার যদি দৈনিক দুটো করে খেপ দেয়। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা প্রায় দশ মাইল দূরে। তার উপর, ওর্লিক আর তার দল এই অঞ্চলটায় শিকারের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে... এর মানেটা কী বুঝতে পারছেন তো?.. এই দেখুন, পরিকল্পনা অনুযায়ী গাছ-কাটা এইখান থেকে শুরু হয়ে স্টেশনের দিকটায় এগিয়ে আসতে থাকার কথা—আর ওই বদমায়েশগুলো সেটাকে একেবারে বনের ভেতরের দিকে নিয়ে গেছে। উদ্দেশ্যটা—যাতে আমরা রেল-লাইনের দিকে কাঠগুলো বয়ে আনতে না পারি। এবং ওরা বিশেষ ভুলও করে নি—আমরা কাঠ বয়ে আনার এই কাজটার জন্যে মাত্র এক-শো'টা গাড়িও পাব না। এটা ওরা একটা সাংঘাতিক ঘা বসিয়েছে আমাদের ওপর... অভ্যুত্থানের ব্যাপারটার চেয়ে এটা কম গুরুতর নয়।'

মানচিত্রের মোমে-মাজা কাগজটার ওপরে ঝুখ্রাইয়ের শক্ত ভারি মুঠিটা এসে পড়ল।

ঝুখ্রাই যেটা বলতে বাকি রেখেছে, অবস্থার সেই আরও ভীষণ দিকটা এই তেরো জনের প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পেল। শীত আসন্ন। এরা দেখতে পেল—তুষারপাতের হিমশীতল মুঠোর মধ্যে আটকে গেছে হাসপাতাল, ইস্কুল,

অফিস-বাড়ি আর লক্ষ লক্ষ মানুষ; লোকের ভিড়ে ছেয়ে গেছে স্টেশন, আর এদিকে যাত্রী বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সপ্তাহে মাত্র একখানা ক'রে ট্রেন।

গভীর একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে অবস্থাটা প্রত্যেকে কল্পনা করতে লাগল।

শেষে ফিওদর তার হাতের মুঠিটা খুলল।

'একটা মাত্র উপায় আছে, কমরেডসব,' বলল সে, 'তিন মাসের মধ্যে স্টেশন থেকে গাছ-কাটার জায়গাটা পর্যন্ত চার মাইল ছোট-লাইনের একটা রেলপথ আমাদের তৈরি করে নিতেই হবে। কাঠ-কাটা শুরু হয়েছে যেখানটায়, সেখান পর্যন্ত লাইনের প্রথম অংশটা ছ'সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি করে নেওয়া চাই। আমি গত এক সপ্তাহ ধরে এ ব্যাপারে লেগে আছি। আমাদের দরকার,' গলাটা শুকিয়ে এসেছে ঝুখ্‌রাইয়ের, ভাঙা স্বরে সে বলে চলল, 'সাড়ে তিন-শো শ্রমিক আর দুজন ইঞ্জিনিয়র। যথেষ্ট রেলের মাল আর সাতটা ইঞ্জিনও আছে পুশ্চা-ভোদিৎসায়। কমসোমলের কর্মীরা গুদাম-ঘরে খুঁজে খুঁজে বের করেছে। যুদ্ধের আগে পুশ্চা-ভোদিৎসা থেকে শহর পর্যন্ত একটা ছোট রেল-লাইন বসাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মুশকিলটা হচ্ছে, বোয়ার্‌কায় শ্রমিকদের থাকার মতো জায়গা নেই, একটামাত্র ভাঙাচোরা বাড়ি আছে— ইস্কুল। ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে এক একবারে দু'সপ্তাহের জন্যে ওখানে লোক পাঠাতে হবে আমাদের। তার বেশি দিন ওরা ওখানে থাকতে পারবে না। কমসোমলীদের কি পাঠাব আমরা ওখানে, আকিম?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই সে বলে যেতে লাগল, 'কমসোমল যতো বেশি সংখ্যায় সম্ভব সভ্যদের ওখানে পাঠিয়ে দেবে। প্রথমে ধরা যাক সলোমেন্‌কা সংগঠনটিকে আর শহরের সংগঠনের একটা

অংশকে। কাজটা কঠিন, খুবই কঠিন, কিন্তু ছেলেদের যদি বুঝিয়ে বলা হয় বিপদটা কতোখানি, তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি ওরা করবে।'

রেলওয়ের বড়োকর্তা সন্দেহের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'আমার মনে হয়, কোনো লাভ নেই। বনের ভেতর দিয়ে এ রকম অবস্থায় শরতের বৃষ্টির মুখোমুখি আর আসন্ন তুষারপাতের মধ্যে সাড়ে চার মাইল লাইন পাতা...' ক্লান্তভাবে বলা শুরু করেছিল সে। কিন্তু ঝুখ্‌রাই তাকে থামিয়ে দিল।

'জালানিকাঠের সমস্যাটার দিকে তোমার বেশি নজর রাখা উচিত ছিল, আন্দ্রেই ভাসিলিয়েভিচ। লাইনটা পাততেই হবে, এবং পেতে ফেলবও আমরা। হাত গুটিয়ে বসে থেকে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে নিশ্চয়ই মরতে চাই নে আমরা।'

হাতিয়ার-সরঞ্জামের শেষ বোঝাটা ট্রেনে চাপিয়ে নেওয়া হল। ট্রেনের লোকজন তাদের নিজের নিজের জায়গায় গেল। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। রিতার চকচকে চামড়ার কোর্তাটা বেয়ে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

তোকারেভের হাত জোরে চেপে ধরে রিতা নরম গলায় বলল, 'আমাদের শুভকামনা রইল।'

বৃদ্ধ তার ঘন ধূসর ভুরুর নিচ দিয়ে রিতার দিকে সস্নেহে তাকাল।

নিজের মনের কথার জবাবেই যেন সে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই আমাদের ফেলেছে ওই শয়তানগুলো। তোমরা বরং এদিকের ব্যাপারগুলোর দিকে একটু নজর রেখো---যাতে ওখানে কোনো গোলমাল বাধলে তোমরা ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে চাপ দিতে পার। এখানকার এইসব

অকর্মাগুলো গড়িমসি ছাড়া কিছু করতে পারে না। আচ্ছা, এবার ট্রেনে চাপার সময় হল, মেয়ে।'

বৃদ্ধ তার কোর্তার বোতাম আঁটল। শেষ মুহূর্তে রিতা প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করল, 'করচাগিন যাচ্ছে না? তাকে তো কই ছেলেদের মধ্যে দেখতে পেলাম না।'

'না, সে আর কার্যাধ্যক্ষ ট্রলি চেপে গতকাল চলে গেছে আমাদের আসার ব্যবস্থা করার জন্যে।'

সেই মুহূর্তে তাদের দিকে প্ল্যাট্‌ফর্ম বেয়ে তাড়াতাড়ি আসছিল ঝার্‌কি, দুবাভা আর আন্না বোর্‌হাৎ—আন্নার কাঁধের ওপর কোর্তাটা আলতোভাবে রাখা, আর সরু আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা।

এরা এসে পড়ার আগে তোকারেভকে রিতার আর একটা মাত্র প্রশ্ন করার মতো সময় ছিল।

'করচাগিনকে তোমার পড়ানো চলছে কেমন?'

বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধ তাকাল রিতার দিকে।

'কিসের পড়ানো? ওর ভার তো তোমার ওপর, তাই না? তোমার কথা অনেক বলেছে ও আমায়। তোমার জগতেই তো ওর বাস।'

অবিশ্বাসের চোখে তাকাল রিতা। 'ঠিক বলছ, কমরেড তোকারেভ? আমার কাছে পড়ার পর ও কি বরাবর তোমার কাছে ঠিকমতো সবকিছু বুঝে নেবার জন্যে যায় নি?'

জোরে হেসে উঠল বৃদ্ধ। 'আমার কাছে? কই, আমি তো কোনোদিন ওর টিকিও দেখতে পাই নে।'

আওয়াজ ছাড়ল ইঞ্জিনটা। একটা কামরা থেকে ক্লাভিচেক চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, কমরেড উস্তিনোভিচ, আমাদের খুড়োকে ছেড়ে দাও! ওঁকে না হলে আমাদের চলবে কী করে?'

চেক-ছেলেটি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু

এসে-পড়া আর তিনজনকে দেখে নিজেকে সামলে নিল সে। এক মুহূর্তের জন্যে তার নজর পড়ল আন্নার চোখের উদ্বেগভরা চাউনির দিকে, দুবাভার দিকে আন্নার বিদায়ের হাসিটুকু লক্ষ্য করে একটু যন্ত্রণাবোধও হল তার। তাড়াতাড়ি সে জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

শরতের বৃষ্টি নেমেছে। ছাট এসে লাগছে মুখে। সীসের মতো কালো, জলে ভারি, নিচু মেঘের স্তর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে মাটির বুকের ওপর দিয়ে। শরতের এই শেষের দিনগুলি এসে অরণ্যপ্রহরীদের নিষ্পত্র করে দিয়েছে। প্রাচীন হর্নবিম-গাছগুলোকে কেমন যেন শীর্ণ আর দুর্বল দেখাচ্ছে—তাদের বলি-রেখাঙ্কিত গুঁড়িগুলো বাদামী শেওলায় ঢেকে গেছে। নির্মম শরৎ তাদের শ্যামলশোভাময় পত্রচ্ছদ কেড়ে নিয়েছে। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন আর অসহায়।

স্টেশনের ছোট্ট বাড়িটা যেন বনের নির্জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। স্টেশনের মাল-তোলার পাথুরে প্ল্যাটফর্মটা থেকে সদ্য কেটে তোলা মাটির একফালি পথ চলে গেছে বনের দিকে। এই পথটার চারধারে পিঁপড়ের মতো মানুষের ভিড়।

পায়ের নিচে বিশ্রীভাবে আটকে যাচ্ছে চটচটে কাদা মাটি। বাঁধটার পাড়-ঘেঁষে মানুষগুলো প্রচন্ড বেগে খুঁড়ে চলেছে আর পাথরের সঙ্গে ঠুকে গিয়ে গাঁতি-বেলচার আওয়াজ উঠছে।

সরু চালুনির ফাঁক দিয়ে জল ঝরে পড়ার মতো বৃষ্টি নেমেছে। হিমশীতল জলের ফোঁটা মানুষগুলোর পোশাক ভেদ করে গায়ে এসে লাগছে। বৃষ্টিতে তাদের এতো পরিশ্রমের ফল ধুয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—মাটিটা কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাঁধটার ঢালু বেয়ে।

সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে তাদের পোশাকগুলো কনকনে ঠান্ডা

আর ন্যাতার মতো হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়েই মানুষগুলো অন্ধকার নেমে আসার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর, রোজ একটু একটু করে মাটির এই বাঁধটা এগিয়ে চলেছে বনের ভেতর দিকে।

আগে একটা পাকা বাড়ি ছিল, তারই কুৎসিত কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশন থেকে অনতিদূরে। টেনে-হিঁচড়ে কিংবা খুঁড়ে তুলে যা কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, বাড়িটার থেকে সেসবই নিয়ে গেছে লুটেরার দল অনেক আগেই। দরজা-জানলার জায়গাগুলোয় হাঁ-করা গর্ত। এককালে যেখানে উনুনের পাল্লা ছিল, এখন সেখানে কালো অন্ধকার। ভাঙাচোরা ছাদটার গর্তগুলোর ফাঁকে বর্গাগুলো দেখাচ্ছে কঙ্কালের পাঁজরার মতো।

চারটে বড়ো কামরায় মাত্র কংক্রিটের মেঝেটুকু আস্ত আছে। রাত্রে চার-শো লোক এই মেঝের ওপর তাদের জলে-ভেজা কাদা-লেপা পোশাকে শুয়ে থাকে। দরজার কাছে যখন তারা জামাকাপড়গুলো নিংড়ে নেয়, তখন তার থেকে কাদাটে জল চুইয়ে পড়ে। বৃষ্টির উদ্দেশে আর এই পাঁকালো জমির উদ্দেশে মানুষগুলো নিদারুণ গাল পাড়ে। কংক্রিটের মেঝেতে খড়ের পাতলা আস্তরণের ওপর ঘন সারি বেঁধে তারা একটু গরম পাবার জন্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে থাকে। তাদের পোশাকগুলো থেকে অল্প অল্প বাষ্প ওঠে, কিন্তু শুকিয়ে যায় না। ফাঁকা জানলার কাঠামোগুলোয় আটকে দেওয়া চটের ছালাগুলোর ফাঁকে বৃষ্টির ছাট এসে পড়ে আর মেঝে দিয়ে জল চুইয়ে আসে। টিনের ছাদটার যেটুকু বাকি আছে, তার ওপরে বৃষ্টির চড়বড়ে শব্দ ওঠে আর দরজার বিরাট ফাঁকগুলো দিয়ে বাতাস ঢোকে শিস্ কেটে।

সকালে এরা চা খায় ভেঙে-নুয়ে-পড়া একটা ব্যারাক-ঘরে, যেটার মধ্যে রান্নার কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর কাজে যায় সবাই। দুপুরে খাবার স্রেফ্ ডাল সেদ্ধ—দিনের পর দিন এই একই অসহ্য একঘেয়ে খাদ্য। আর, দৈনিক বরাদ্দ—কয়লার মতো কালো দেড় পাউণ্ড রুটি।

শহর থেকে এর বেশি আর জোগান দেওয়া সম্ভব নয়।

কার্যাধ্যক্ষ ভালেরিয়ান নিকোদিমভিচ পাতোশকিন—লম্বা, রোগাটে বৃদ্ধ, দুই গাল তার বসে গেছে, আর প্রধান-মিস্ত্রি ভাকুলেঙ্কো—গাঁট্টাগোট্টা, মোটা নাক আর কর্কশ মুখের ভাব—এরা দুজন স্টেশন কর্তার বাড়িতে রয়েছে।

স্টেশনে 'চেকা'র প্রতিনিধির নাম খোলিয়াভা—বেঁটেখাটো চট্‌পটে এই লোকটির ছোট্ট কামরায় তার সঙ্গে রয়েছে তোকারেভ।

অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে মানুষগুলো কষ্ট সহ্য করে চলেছে আর রেল-লাইন পাতার জন্যে এই বাঁধটা দিনের পর দিন বনের মধ্যে ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।

কিছু লোক অবশ্য পালিয়ে গেছে: প্রথমে ন'জন, তার কয়েকদিন বাদেই আরও পাঁচজন।

প্রথম বড়ো বিপদ ঘটল কাজ শুরু হবার এক সপ্তাহ বাদে: রাত্রির ট্রেনে রুটির সরবরাহ এসে পৌঁছল না।

তোকারেভ্‌কে জাগিয়ে তুলে দুবাভা খবরটা জানাল।

পার্টি গ্রুপের সম্পাদকটি বিছানার ধারে তার লোমশ পা দুটো ঝুলিয়ে বসে বগলের নিচে চুলকোতে লাগল প্রাণপণে।

'খেল্ শুরু হল!' ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলে সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে লাগল।

খোলিয়াভা তার ছোট ছোট পা দ্রুত চালিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

'এক্ষুণি ছুটে গিয়ে বিশেষ বিভাগকে টেলিফোন করো।' তাকে নির্দেশ দিয়ে তোকারেভ দুবাভার দিকে ফিরে বলল, 'রুটি সম্বন্ধে একটি কথাও কাউকে বলবে না, মনে থাকে যেন।'

রেলওয়ে টেলিফোন-অপারেটরদের সঙ্গে পুরো আধঘণ্টা চেঁচামেচি করার পর অদম্য খোলিয়াভা শেষ পর্যন্ত বিশেষ বিভাগের প্রধান-সহকারী ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হল। এই সমস্ত সময়টুকু তার পাশে অধৈর্যের সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করেছে তোকারেভ।

'কী! রুটি গিয়ে পৌঁছয় নি? এখুনি দেখছি এর জন্যে কে দায়ী!' টেলিফোনের তার বেয়ে আসা ঝুখ্‌রাইয়ের গলাটা ভয়ঙ্কর শোনাল।

ক্রুদ্ধ তোকারেভ চেঁচিয়ে বলল, 'কাল লোকগুলোকে খেতে দেব কী?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ — বোঝা গেল ঝুখ্‌রাই একটা কিছু ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে।

শেষে বলল, 'আজ রাত্রেই পেয়ে যাবে রুটি। আমি গুগো লিৎকে-কে পাঠাচ্ছি গাড়িতে। ও রাস্তা জানে। সকালের মধ্যে রুটি পেয়ে যাবে।'

ভোরের দিকে সর্বাঙ্গে কাদা-লেপা একটা গাড়ি রুটি-বোঝাই সব বস্তা নিয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল। ক্লান্তভাবে নেমে এল লিৎকে — নিদ্রাহীন একটা রাত্রির শেষে তার মুখ বিবর্ণ আর শীর্ণ।

রেল-লাইন পাতার কাজটা নিয়ে একটা লড়াই ক্রমশ তীব্রতর হয়ে দাঁড়াল। রেলওয়ের পরিচালনা-দপ্তর জানাল — লাইন-পাতার জন্যে স্লিপার পাওয়া যাচ্ছে না। শহরের কর্তৃপক্ষ লাইন-পাতার জায়গায় রেল-লাইন আর ইঞ্জিন পাঠাবার কোন উপায় করে উঠতে পারল না। ইঞ্জিনগুলোরও দেখা গেল বেশ কিছু

মেরামতি দরকার। প্রথম দলে যে শ্রমিকরা কাজে গিয়েছিল, তাদের বদলি হিসেবে যাবার জন্যে আর-কোনো শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ প্রথম দলের শ্রমিকরা এতো ক্লান্ত যে তাদের আর আট্‌কে রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নেতৃস্থানীয় পার্টি সভ্যেরা এসে জড়ো হল ভেঙে নুয়ে পড়া চালাটার নিচে — চিম্‌নিহীন একটা পল্‌তের আলোয় ঘরটা আব্‌ছারকম আলোকিত। এখানে তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করল।

পরদিন সকালে তোকারেভ, দুবাভা আর ক্লাভিচেক শহরে এল ছ'জন লোক সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনগুলো মেরামত করে নেবার জন্যে যাতে রেলগুলো তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারে। ক্লাভিচেকের পেশা ছিল রুটি তৈরি করা, তাকে সরবরাহ বিভাগে পাঠানো হল পরিদর্শক হিসেবে; অন্যেরা রওনা হল পুশ্চা-ভোদিৎসার দিকে।

এদিকে সমস্তক্ষণ বৃষ্টি পড়েই চলল অবিরাম ধারায়।

পাভেল করচাগিন কাদায় আট্‌কে যাওয়া তার পা-টা বেশ একটু জোরেই টানল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা ঠাণ্ডার অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিল -- ক্ষয়ে-যাওয়া তলাটা তার শেষ পর্যন্ত জুতো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই কাজে আসার সময় থেকেই তার ছেঁড়া বুট-জোড়াটা অত্যন্ত অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে। কখনও শুকোয় না জুতোটা আর ভেতরে ঢুকে-যাওয়া কাদা প্যাচ্‌প্যাচ করে হাঁটার সময়। এখন তো একটা তলা একেবারেই গেল — বরফ-ঠাণ্ডা কাদাজমি তার নগ্ন পায়ের তলাটা যেন কেটে দিতে লাগল। জুতোর তলাটা কাদা থেকে টেনে তুলে গভীর হতাশার সঙ্গে সেটার দিকে তাকিয়ে, সে যে আর গাল পাড়বে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল। একটা খালি-পা নিয়ে কাজ চালানো

সম্ভব নয় — খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাই সে ব্যারাক-ঘরটায় ফিরে এসে তোলা-উনুনটার পাশে বসল। কাদা-লেপা পায়ের পট্টিটা খুলে নিয়ে আড়ষ্ট পাটিকে মেলে দিল আগুনের দিকে।

রেল-লাইনম্যানের বউ ওদার্কা রান্নাঘরের টেবিলটায় বীট্ কাটছিল — এখানকার রাঁধুনির সহকারী হিসেবে কাজ করে সে — বেশ লম্বা-চওড়া স্ত্রীলোক, এখনও বয়েস আছে তার, চওড়া কাঁধ প্রায় পুরুষালি ধরনের, পীনোন্নত বুক, বেশ গুরুনিতম্বিনী। বেশ জোরের সঙ্গে ছুরি চালাচ্ছে সে আর সব্জির টুকরোগুলো তার ক্ষিপ্র আঙুলগুলোর নিচে পাহাড়ের মতো দ্রুত জমে উঠছে।

পাভেলের দিকে তাচ্ছিল্যভরে একনজর তাকিয়ে ওদার্কা তার উদ্দেশে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'খাবার পাবার আশায় যদি এসে থাকো, তাহলে একটু আগেই এসে গেছ হে ছেলে। কাজে ফাঁকি দিয়ে এভাবে কেটে পড়ার জন্যে লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার! পা সরিয়ে নাও উনুন থেকে। এটা রান্নাঘর, স্নানঘর নয়!'

ঠিক সেই সময় একটি বয়স্ক রাঁধুনি এসে পড়ল।

অসময়ে রান্নাঘরে তার এই এসে পড়ার কারণটা ব্যাখ্যা করল পাভেল, 'হতভাগা বুটটা আমার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে একেবারে।'

বৃদ্ধ রাঁধুনি ছেঁড়া বুটটার দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নেড়ে ওদার্কাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর স্বামী হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে — লোকটা একটু-আধটু মুচিগিরি জানে। সেই ব্যবস্থা বরং করো, নইলে ভয়ানক অসুবিধেয় পড়বে। বুট ছাড়া তো চালাতে পারবে না।'

কথাটা শুনে ওদার্কা পাভেলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে

দেখল। অনুতাপের সঙ্গে স্বীকার করল সে, 'আমি তোমাকে কাজে-ফাঁকিদেনেওয়ালা বলে ধরে নিয়েছিলাম।'

পাভেল যে কিছু মনে করে নি, সেইটে বোঝাবার জন্যে হাসল। ওদারকা বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল বুটটা।

'সেলাই করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই,' সিদ্ধান্ত করল সে, 'আচ্ছা, আমি যেটুকু করতে পারি সেটা বলছি। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা গালোশ্-জুতো পড়ে রয়েছে — সেটা তোমাকে এনে দেব! তুমি সেটা বুটের ওপরে পরে নিতে পারো। এভাবে তো চলাফেরা করতে পারবে না, অসুখে পড়বে তাহলে! যে-কোনো দিন বরফ-পড়া শুরু হবে এখন!'

ওদারকা এবার গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার ছুরিটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উঁচু একটা গালোশ্-জুতো আর খানিকটা মোটা কাপড়ের ফালি নিয়ে ফিরে এল।

এতক্ষণে পাভেলের পা শুকনো আর গরম হয়ে উঠেছে, মোটা কাপড়ে পা জড়িয়ে গালোশ্-জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে সে এর প্রতিদানে ওদারকার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল।

তোকারেভ রাগে ছটফট করতে করতে ফিরে এল শহর থেকে। খোলিয়াভার ঘরে সে সক্রিয় কমিউনিস্টদের একটা আলোচনা-বৈঠক ডেকে অপ্রিয় খবরটা শোনাল তাদের।

'গোটা পথ জুড়ে কেবল বাধা আর বাধা। যেখানেই যাও, চাকা ঘুরছে বলে মনে হলেও, দেখবে সামনে এগুচ্ছে না একটুও। ওই 'শাদা ইঁদুরগুলো' সংখ্যায় বড়ো বেশি, আর মনে হচ্ছে — আমাদের জীবনভর ওরাও টিকে থাকবে। আমি

বলে দিচ্ছে তোমাদের — অবস্থাটা খুব খারাপ ঠেকছে। আমাদের বদলি-লোকদের আসার এখনও কোন ব্যবস্থা করে ওঠা যায় নি, আর কতোজন যে আসবে তাও কেউ জানে না। যে-কোনো দিন বরফ পড়তে পারে, আর তার আগেই ওই জোলো বাদার ওপর দিয়ে লাইন-পাতার কাজটা যেমন করে হোক শেষ করতেই হবে আমাদের — কারণ মাটি জমাট বেঁধে গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, শহরের লোকজন যারা সব কিছুর মধ্যে তালগোল বাধিয়ে ফেলছে, তাদের ওরা চাঙ্গা করে তুলবে, এদিকে আমাদের এখানে কাজের গতি ডবল বাড়িয়ে দিতে হবে। রেল-লাইনটা পাততেই হবে এবং মরে গেলেও আমরা পাতবই লাইনটা। যদি না পারি, তাহলে আমরা বলশেভিক নই — ক্ষীণপ্রাণ জেলি-মাছ কতকগুলো।'— তোকারেভের ভাঙা গম্ভীর গলার স্বরে ইস্পাতের দৃঢ়তা, ঘন ভুরুর নিচে চোখ দুটোয় তার জেদভরা দৃষ্টি।

'আজ নিজেদের মধ্যে আমরা একটা আলোচনা-বৈঠক ডাকব এবং পার্টি সভ্যদের সবাইকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিয়ে আগামী কাল থেকে সবাই কাজে লেগে যাব। যারা পার্টি সভ্য নয়, তাদের আমরা সকালে ছেড়ে দেব; বাদবাকি আমরা থাকব — এই হচ্ছে প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত।' ভাঁজ-করা একটা কাগজ পানক্রাতভের হাতে দিয়ে সে বলল।

পানক্রাতভের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখে পাভেল করচাগিন লেখাটা পড়ল:

> 'জরুরী অবস্থার দরুন কমসোমলের প্রত্যেকটি সভ্যকে কাজে লেগে থাকতে হবে এবং জ্বালানিকাঠের প্রথম কিস্তিটা না পেঁাছানো পর্যন্ত কেউ ছাড় পাবে না।
>
> **রিতা উস্তিনোভিচ**
>
> **কমসোমলের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের পক্ষে।'**

নিচু ব্যারাকটা লোকে ভর্তি—সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে একশো-কুড়ি জন মানুষের গাদাগাদি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলের ওপরে উঠেছে, এমন কি, কেউ কেউ তোলা-উনুনটার ওপরেও চেপে বসেছে।

পানক্রাতভ মিটিং আরম্ভ করল। তারপরে তোকারেভ ছোট একটু বক্তৃতা দিয়ে যে-ঘোষণাটা দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল, তার ফলটা হল একটা বোমা ফেটে পড়ার মতো:

'কমিউনিস্ট আর কমসোমল সভ্যেরা কেউ কাল কাজ ছেড়ে যেতে পারবে না।'

বৃদ্ধ মানুষটি তার এই ঘোষণাটা করবার সময় এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে এই সিদ্ধান্তের যে আর কোনো নড়চড় নেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই গর্ত থেকে বেরিয়ে শহরে যাবার, বাড়ি যাওয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে দিল তার এই কথা। ক্রুদ্ধ কতকগুলো গলার আওয়াজে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আর সবকিছু চাপা পড়ে গেল। নড়েচড়ে ওঠা দেহগুলো ক্ষীণ তেলের আলোর শিখাটিকে ভয়ানক রকম কাঁপিয়ে তুলল। আধা-অন্ধকারে বেড়েই চলল গোলমাল। অনেকে ঘরে ফিরতে চায়। অন্যরা বিরক্তির সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, যতদূর পারা যায় তারা কষ্ট সহ্য করেছে। কেউ কেউ চুপ করে শুনল খবরটা। এবং ছেড়ে যাবার কথা বলল একজন মাত্র।

'জাহান্নমে যাক সব!' এক কোণ থেকে কুৎসিত একরাশ গালাগাল ছেড়ে সে বলে উঠল, 'এখানে আমি আর একদিনও থাকছি না। এমন সশ্রম দণ্ডভোগ করা যেতে পারে বেআইনী অপরাধ কিছু করে থাকলে তার শাস্তি হিসেবে। কিন্তু আমরা কী করেছি? দু'সপ্তাহ সয়েছি আমরা, খুব হয়েছে। এই

সিদ্ধান্ত যারা করেছে, তারা এগিয়ে এসে নিজেরা নামুক না কাজে! এমন কেউ কেউ হয়তো আছে যারা এই পচা কাদায় খোঁচাখুঁচি করে মরতে চায়, কিন্তু আমার তো এই একটাই মোটে জীবন। আমি চল্লাম কাল।'

গলাটা আসছিল ওকুনেভের পেছন দিক থেকে। লোকটাকে দেখবার জন্যে একটা দেশলাই জ্বালল সে। দেশলাইয়ের আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল বক্তার রাগে বিকৃত হাঁ-করা মুখখানা। প্রাদেশিক খাদ্য-বিভাগের এক কেরানীর ছেলেটিকে চিনে নেবার জন্যে ওকুনেভের পক্ষে সেই এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

'দেখে রাখছ, অ্যাঁ?' খিঁচিয়ে উঠল ছেলেটি, 'বেশ, বেশ। আমি ভয় পাই নে, চোর নই আমি।'

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। পানক্রাতভ উঠে শরীরটাকে টান করে দাঁড়াল।

'এ কী ধরনের কথা? পার্টি কাজকে সশ্রম দণ্ডভোগের সঙ্গে তুলনা করার গোস্তাকি কার?' সামনের সারিগুলোর ওপরে ভারি চোখে তাকিয়ে নিয়ে সে বজ্রস্বরে বলে উঠল, 'না, কমরেড, আমাদের শহরে ফিরে যাওয়া চলবে না। আমাদের জায়গা এটাই। আমরা যদি এখন সরে পড়ি, তাহলে শীতে জমে মারা যাবে লোকজন। যতো তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করব আমরা, তত শীগগির বাড়ি ফিরতে পারব। পেছন দিক থেকে ওই কাঁদুনে ইঁদুরটা যে পালিয়ে যাবার কথা বলছে, সেটা আমাদের আদর্শের সঙ্গে বা শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খায় না।'

ডক-মজুর পানক্রাতভ — লম্বা বক্তৃতা করতে ভালবাসে না সে। কিন্তু এই ছোট্ট বিবৃতিটুকুতেও বাধা দিল সেই একই

ক্রুদ্ধ গলার স্বর, 'পার্টি সভ্য নয় যারা, তারা তো চলে যাবে, না-কি?'

'হ্যাঁ।'

খাটো ওভারকোট-পরা একটি ছেলে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এল। একটা কমসোমল কার্ড বাদুড়ের মতো উড়ে ঘরটা পার হয়ে এসে পানক্রাতভের বুকের ওপর ঠুকে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ে খাড়া হয়ে রইল।

'এই নাও তোমাদের কার্ড। এক টুকরো কার্ডবোর্ডের জন্যে আমি আমার শরীর বলি দিয়ে বসার ঝুঁকি নিতে চাই নে!'

শেষ কথাগুলো তার ডুবে গেল ক্রুদ্ধ কতকগুলো গলার গর্জনে:

'যেটা ছুঁড়ে দিলে, সেটাকে কি মনে করেছ?'

'বেইমান বেজন্মা!'

'আরামে থাকার কথা ভেবে কমসোমলে ঢুকেছিল।'

'তাড়িয়ে দাও ওকে!'

'ছেড়ে দাও তো, একবার দেখে নিই ছারপোকাটাকে!'

দলত্যাগী ছেলেটা মাথা নিচু করে বেরোবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। কুষ্ঠরোগীর সামনে লোকে যেমন সংকুচিত হয়ে আসে, তেমনিভাবে সরে গিয়ে তাকে সবাই বেরিয়ে যাবার পথ করে দিল। তার পেছনে দরজাটা একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল।

ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া সেই কমসোমল সভ্যকার্ডখানা তুলে নিয়ে পানক্রাতভ সেটাকে তেলের আলোর শিখার ওপরে ধরল। কার্ডবোর্ডের টুকরোটা জ্বলে উঠে পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দুমড়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল।

বনের মধ্যে একটা গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। নুয়ে-পড়া ব্যারাক-ঘরটার দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের অন্ধকারে। এক মুহূর্তে ইস্কুল-বাড়ি আর ব্যারাক-ঘরটার মধ্যে থেকে লোকজন দৌড়ে বেরিয়ে এল। একজন হোঁচট খেয়ে আবিষ্কার করল — দরজার বাজুটার ফাঁকে এক টুকরো হাল্কা কাঠের তক্তা আট্‌কানো। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠল, অস্থির শিখাটাকে বাতাস থেকে আড়াল করে সবাই পড়ল:

> 'এখান থেকে সরে পড়ো, যেখান থেকে এসেছ সেইখানে ফিরে যাও। যদি না যাও, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকটি লোককে ধরে ধরে গুলি করে মারব। আগামী কাল রাত্রি পর্যন্ত তোমাদের চলে যাবার জন্যে সময় দিলাম।
>
> **আতামান চেস্‌নক।'**

চেস্‌নক ওর্‌লিকের দলের লোক।

রিতার কামরায় টেবিলের ওপর রয়েছে একটা খোলা রোজনামচার খাতা।

২রা ডিসেম্বর

আজ সকালে আমাদের এখানে প্রথম তুষারপাত হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। ভিয়াচেস্লাভ ওল্‌শিনস্কির সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হল, আমরা দুজনে একসঙ্গে রাস্তায় নেমে হেঁটে চললাম।

ওল্‌শিনস্কি বলছিল, 'এই প্রথম তুষারপাতটা আমি ভারি উপভোগ করি সবসময়। বিশেষ করে, এই রকম ঠাণ্ডা যখন পড়ে। ভারি সুন্দর, না?'

আমি কিন্তু বোয়ারকার কথা ভাবছিলাম — বললাম, তুষারপাত আর ঠাণ্ডা মোটেই খুশি করে না আমাকে, বরং দমিয়ে দেয়। কেন, সেটা বললাম ওকে।

ওল্‌শিনস্কি বলল, 'ওটা নেহাতই একটা আত্মমুখী প্রতিক্রিয়া। এই কথার থেকে যদি কেউ যুক্তি দেখায়, তাহলে, বলতে গেলে, যুদ্ধের সময় যে-কোনো আমোদ-প্রমোদ, যে-কোনো আনন্দের প্রকাশকেই নিষিদ্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু জীবন তো তা নয়। লড়াই যেখানে চলছে, সেই একফালি সীমান্ত-এলাকাতেই দুঃখ-বিষাদ সীমাবদ্ধ। সেখানেই মৃত্যুর আসন্নতায় জীবন ছায়াচ্ছন্ন। তবু সেখানেও লোকে হাসে। এবং যুদ্ধ সীমান্ত থেকে দূরে জীবনের স্রোত চিরাচরিতভাবেই বয়ে চলে: মানুষ হাসে, কাঁদে, দুঃখ পায়, আনন্দ করে, ভালবাসে, আমোদ-প্রমোদ আর উত্তেজনা চায়...'

ওল্‌শিনস্কির এই কথাগুলির মধ্যে কোনোরকম ব্যঙ্গের আভাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। পররাষ্ট্র জন-কমিশারিয়েটের একজন প্রতিনিধি এই ওল্‌শিনস্কি। ১৯১৭ থেকে পার্টি সভ্য। ভালোভাবে পোশাক-আশাক পরে সে, সর্বদা পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো. সবসময়ে তার গায়ে একটা মৃদু সুগন্ধ। আমাদের বাড়িতে সেগালের ঘরে সে আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বেশ আগ্রহ জাগে — ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে, প্যারিসে বহু বছর ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার ভালো রকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কারণ, ওর কাছে আমি মুখ্যত নারী; আমি যে ওর পার্টি কমরেড, এ ব্যাপারটা ওর কাছে পরবর্তী বিবেচনার বিষয়। এটা ঠিক যে এ সম্বন্ধে ওল্‌শিনস্কি

তার মনোভাব আর মতামত লুকোবার চেষ্টা করে না — নিজের মতবাদ সম্বন্ধে খুলে বলার পৌরুষ ওর আছে এবং আমার প্রতি ওর মনোযোগের মধ্যে কোনোরকম স্থূলতা নেই। এক ধরনের সৌন্দর্যের সঙ্গে সেটাকে প্রকাশ করার দিকে ওর একটা পটুত্ব আছে। তবু, আমি ওকে পছন্দ করি না।

ওল্‌শির্নাস্কির এই সুমার্জিত ইউরোপীয় আদব-কেতার চেয়ে ঝুখ্‌রাইয়ের রুক্ষ সরলতা আমার ঢের বেশি রুচিসম্মত।

বোয়ারকা থেকে খবর আসে সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের আকারে। প্রতিদিন আরও দু-শো গজ লাইন পাতা হচ্ছে। ওরা সরাসরি বরফ-জমাট মাটির ওপরে স্লিপার পাতছে — তার জন্যে অল্প গর্ত খুঁড়ে মাটি কেটে তুলছে। মাত্র দু-শো চল্লিশ জন লোক কাজ চালাচ্ছে। বদলি হিসেবে যারা গিয়েছিল, তাদের অর্ধেক লোক পালিয়ে গেছে। অবস্থা সেখানে সত্যিই ভয়ানক। বরফে যখন সব কিছু ঢেকে যাবে, তখন তার মধ্যে কী করে যে ওরা কাজ চালাবে তা আমি তো কল্পনা করতে পারছি না।

দুবাভা আজ এক সপ্তাহ হল গেছে। পুশ্চা-ভোদিৎসায় ওরা আটটা ইঞ্জিনের মধ্যে মাত্র পাঁচটা মেরামত করে নিতে পেরেছে। বাকিগুলোর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতির অংশ পাওয়া যায় নি।

দ্‌মিত্রি দুবাভার বিরুদ্ধে ট্রামওয়ে-কর্তৃপক্ষ অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রুজু করেছে। পুশ্চা-ভোদিৎসা থেকে শহর অবধি ট্রামওয়ের যতগুলো খোলা-গাড়ি যাতায়াত করে, তার সবগুলোকে দ্‌মিত্রি আর তার কর্মিদল আটক করে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে বোয়ারকার ওদিকে লাইন-পাতার জন্যে রেল-বোঝাই করেছিল। শহরে রেল-স্টেশনে ওরা ট্রাম-লাইন বেয়ে উনিশ গাড়ি-ভর্তি রেল এনে ফেলেছিল। ট্রামের কর্মীরা খুশি মনেই সাহায্য করেছিল ওদের।

সলোমেন্‌কা'য় কমসোমলের যারা তখনও ছিল, তারা ট্রেনের মালগাড়িগুলোয় রেলগুলো তুলে দেবার কাজ সারারাত্রি ধরে করল। তারপরে এদের নিয়ে দ্‌মিত্রি দুবাভা আর তার কর্মিদল বোয়ারকায় রওনা হয়ে যায়।

দুবাভার এই কাজটা সম্বন্ধে কমসোমল ব্যুরোয় আলোচনা তুলতে গররাজি হয়েছে আকিম। ট্রামওয়ে পরিচালনা বিভাগে যে বিশ্রীরকম আমলাতন্ত্র আর গড়িমসি আছে, সে কথা দ্‌মিত্রি দুবাভা আমাদের বলেছে। ওরা এই কাজটার জন্যে দুখানার বেশি গাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিল।

তুফ্‌তা অবশ্য আড়ালে দুবাভাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিরস্কার করেছে। 'এই সব পার্টিজানসুলভ কৌশল ছেড়ে দেবার সময় এসেছে,' বলেছিল সে, 'নইলে একদিন নিজের অজানতেই জেলে গিয়ে পড়বে। অস্ত্রের জবরদস্তির সাহায্য না নিয়ে তুমি কি একটা বোঝাপড়ায় আসতে পার নি?'

দুবাভাকে আমি আর কোনোদিন এতোটা ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি। রাগে চিৎকার করে উঠেছিল সে, 'তা তুমি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে দেখলে পারতে, ঘুণ-ধরা কলমনবীশ কোথাকার! বসে বসে চেয়ার গরম করতে আর মুখ নাড়তেই তো পারো খালি। ওই রেলগুলো না নিয়ে বোয়ারকায় ফিরে গেলে লোকে আমায় মেরে ফেলত। এখানে বসে বসে সবার পেছনে লেগে না থেকে কিছু দরকারী কাজ করিয়ে নেবার জন্যে তোমাকে একবার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তোকারেভ তোমার মাথায় কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারবে!' দ্‌মিত্রি এতো জোরে চেঁচাচ্ছিল যে গোটা বাড়ি জুড়ে তার কথা শোনা যাচ্ছিল।

তুফ্‌তা দুবাভার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ লিখছিল, কিন্তু আকিম আমাকে ঘরের বাইরে যেতে বলে মিনিট দশেক তার

সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলল। তার পর তুফ্‌তা রাগে লাল হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এল।

৩রা ডিসেম্বর

প্রাদেশিক কমিটির কাছে আরেকটা অভিযোগ এসেছে — এবার যানবাহন-চলাচলের 'চেকা' থেকে। পানক্রাতভ, ওকুনেভ এবং আরও জনকতক কমরেড নাকি মতোভিলভ্‌কা স্টেশনে গিয়ে সেখানকার খালি বাড়িগুলো থেকে সমস্ত দরজা-জানলার কাঠামোগুলো খুলে নিয়ে এসেছে। ওরা যখন এই সব জিনিস ট্রেনের মালগাড়িতে তুলছিল, তখন স্টেশনে 'চেকা'র কর্মীটি ওদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। ওরা তাকে নিরস্ত্র করে তার রিভলভারের সমস্ত টোটা বের করে ফেলে দেয় এবং ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করার পর অস্ত্রটা তাকে ফেরত দেয়। ওরা দরজা-জানলার কাঠামোগুলো নিয়ে চলে এল। রেলওয়ের সরবরাহ বিভাগ তোকারেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে সে বোয়ারকা স্টেশনের মালগুদাম থেকে কুড়ি পুদ পেরেক নিয়েছে। স্লিপারের জন্যে তারা যে কাঠ ব্যবহার করছে, সেই কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনার জন্যে যে চাষীরা তাদের সাহায্য করেছিল, মজুরি হিসেবে তোকারেভ এই পেরেকগুলো তাদের দিয়েছে।

আমি এইসব অভিযোগের কথা কমরেড ঝুখ্‌রাইকে বললাম। সে কিন্তু শুধু হাসল। বলল, 'এ সবগুলোরই ব্যবস্থা আমরা করব।'

রেল-লাইন পাতার কাজের ওখানে অবস্থাটা অত্যন্ত সঙ্গীন; এখন প্রতিটি দিনই অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসের জন্যে এখানে আমাদের চাপ দিতে হচ্ছে। যারা নানা ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে, তাদের প্রায়ই প্রাদেশিক

কমিটিতে হাজির করাতে হচ্ছে। আর ওদিকে, কাজের খাতিরে ছেলেরা ক্রমশই বেশি বেশি মাত্রায় মামুলী দস্তুরগুলো ডিঙিয়ে চলেছে।

ওল্‌শিনস্কি আমায় একটা ছোট ইলেক্‌ট্রিক উনুন এনে দিয়েছে। আমি আর ওলগা ইউরেনেভা তাতে আমাদের হাত গরম করি, কিন্তু ঘরটা ও দিয়ে বিশেষ কিছু গরম হয় না। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে বনের মধ্যে ওই লোকগুলো কী করে কাটাচ্ছে, তাই ভাবি। ওলগা বলছিল, হাসপাতালে এতো ঠাণ্ডা যে রোগীরা কম্বলের নিচে শীতে কাঁপে। সেখানে মাত্র দু'দিন অন্তর একবার আগুন জ্বালিয়ে ঘরগুলো গরম করা হয়।

না, কমরেড ওল্‌শিনস্কি, যুদ্ধসীমান্তের দুঃখদুর্দশা আমাদের এই পেছনের ঘাঁটিরও দুঃখদুর্দশা।

৪ঠা ডিসেম্বর

সারারাত্রি বরফ পড়েছে। বোয়ারকা থেকে ওরা লিখছে -- সমস্ত কিছু বরফে ঢেকে গেছে, লাইন-পথ পরিষ্কার করার জন্যে ওদের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আজ প্রাদেশিক কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কাঠ কাটার জায়গাটা পর্যন্ত রেল-লাইন পাতার প্রথম অংশটুকু ১৯২২-এর ১লা জানুয়ারির মধ্যে শেষ করতে হবে। তাদের এই সিদ্ধান্ত বোয়ারকায় পৌঁছালে তোকারেভ নাকি মন্তব্য করেছে, 'তা আমরা করব— যদি তার আগেই আমরা শিঙে না ফুঁকি।'

করচাগিন সম্বন্ধে কিছুই খবর পাই না। পানক্রাতভের ওই 'ঘটনা'টার মতো কোনো কিছুতে সে জড়িয়ে পড়ে নি দেখে আমি একটু আশ্চর্যই হচ্ছি। আমাকে সে এড়িয়ে চলেছে কেন, তা এখনও বুঝতে পারছি না।

গতকাল রেল-লাইন পাতার জায়গার ওখানে ডাকাতদলের একটা হামলা হয়ে গেছে।

নরম তুষারের মধ্যে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছে ঘোড়াগুলো। তুষারের স্তূপ বসে বসে যাচ্ছে তাদের পায়ের নিচে। মাঝে মাঝে বরফের নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়া দু'-একটা গাছের সরু ডাল কোনো ঘোড়ার খুরের চাপে মট্ করে ভেঙে যাচ্ছে আর ঘোড়াটা ভড়্কে গিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে একপাশে লাফিয়ে উঠছে। তখন তার কানের ওপর বন্দুকের চাপ পড়ে আর সে ছুটে চলে আর সকলের পিছু পিছু।

জন দশেক ঘোড়সওয়ার পার হয়ে এল সরু লম্বা পাহাড়ী উঁচু জায়গাটা, যার ওধারে এক ফালি কালো জমি — এখনও জমিটুকু বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে নি।

এখানে এসে ঘোড়সওয়াররা লাগাম টেনে থামাল তাদের ঘোড়াগুলো। রেকাবগুলো ঠোকাঠুকি হয়ে ক্ষীণ একটা আওয়াজ উঠল। দলের নেতার বিরাট জোয়ান ঘোড়াটা সশব্দে গা-ঝাড়া দিল, অনেকক্ষণ একটানা দৌড়ানোর পর তার সর্বাঙ্গ ঘামে চকচকে হয়ে উঠেছে।

ঘোড়সওয়ার দলের নেতা ইউক্রেনীয় ভাষায় বলল, 'এখানে হতভাগাদের অনেকগুলোই আছে দেখছি। যাই হোক, আমরা ওদের মনে পরকালের ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও! আতামান বলেছেন, কালকের মধ্যেই বেজন্মাগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। ব্যাটারা জালানিকাঠ কাটার জায়গাটার বড্ড কাছাকাছি এসে যাচ্ছে।'

সরু রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে একজনের পেছনে আর

একজন সারি বেঁধে এরা ঘোড়া হাঁকিয়ে স্টেশন পর্যন্ত এল। পায়ে হাঁটার গতিতে ঘোড়ার বেগ কমিয়ে তারা পুরনো ইস্কুল-বাড়িটার কাছে ফাঁকা জায়গাটার কাছে গাছগুলোর পেছনে এসে থামল।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চিরে দিল একঝাঁক গুলির আওয়াজ। তুষারে আচ্ছন্ন একটা বার্চগাছের ডাল চাঁদের আলোয় রুপোর মতো ঝক্‌মক করছিল, বরফের স্তরটা ডাল থেকে খসে পড়ল লাফিয়ে-পড়া কাঠবেড়ালির মতো। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বন্দুকের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেওয়ালের ওপর খসে-আসা চুন-বালির আস্তরণ ফুটো করে দিয়ে গুলি ঢুকে যাচ্ছে। পানক্রাতভের আনা জানলার শার্সি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়ে কাচের ঝন্‌ঝনানির আওয়াজ উঠল।

কংক্রিটের মেঝের ওপর থেকে মানুষগুলো গুলির আওয়াজে লাফিয়ে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক সব বস্তু ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখেই একজনের ওপরে আরেকজন চেপে শুয়ে পড়ল।

পাভেলের কোটের প্রান্তটা টেনে ধরল দুবাভা, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'বাইরে।'

'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো, উজ্‌বুক কোথাকার!' হিসহিসিয়ে উঠল দ্‌মিত্রি দুবাভা, 'বাইরে মাথা বের করেছ কি ওরা তোমায় খতম করে দেবে।'

দরজাটার ঠিক কাছে তারা পাশাপাশি পড়ে রইল। দুবাভা তার পিস্তল দরজার দিকে তাক করে ধরে মেঝের ওপর সটান হয়ে আছে। উবু হয়ে বসে পাভেল তার রিভলভারের টোটা ভরবার ঘরগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে। পাঁচবার গুলি চালাবার মতো

টোটা ভরা আছে ওটায়, বাকি ঘর খালি। টোটা ভরার চাক্তিটা ঘুরিয়ে নিয়ে তৈরী করল সে।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল গুলি-ছোঁড়া। পরবর্তী নিস্তব্ধতাটুকু অবাক করে দিল সবাইকে।

ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে দুবাভা হুকুম দিল, 'যাদের অস্ত্র আছে, তারা এদিকে এসো।'

সাবধানে দরজাটা খুলল পাভেল। খোলা জায়গাটা জনহীন। হাল্কাভাবে ঝরে পড়ছে বরফের চিল্‌কে।

বনের মধ্যে ততক্ষণে দশজন সওয়ার তাদের ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে দ্রুত দৌড় করিয়ে নিয়ে চলেছে।

পরের দিন দুপুরবেলায় শহর থেকে একটা ট্রলি এসে পেঁছল। ঝুখ্‌রাই আর আকিম নেমে এল—তাদের নিতে এসেছে তোকারেভ আর খোলিয়াভা। একটা 'মাক্সিম' মেশিনগান, কয়েক বাক্স টোটা-ভর্তি মেশিনগানের বেল্ট্ আর দু-ডজন রাইফেল নামিয়ে আনা হল প্ল্যাট্‌ফর্মে।

রেল-লাইন পাতার জায়গাটার দিকে তারা এগুল তাড়াতাড়ি। ফিওদরের লম্বা ওভারকোটের নিচের দিকটা বরফের ওপরে আঁকাবাঁকা নক্সা কেটে নেতিয়ে চলেছে তার পিছু পিছু। সে এখনও জাহাজী মানুষের মতোই থপ্‌থপে ভঙ্গিতে হাঁটে—যেন কোনো ডেস্ট্রয়ারের দোলায়মান পাটাতনের ওপরে পায়চারি করছে। ফিওদরের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে লম্বা পাওয়ালা আকিম, কিন্তু এদের সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্যে তোকারেভকে মাঝে মাঝে অল্প অল্প দৌড়াতে হচ্ছে।

'ডাকাত-দলের হামলাটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা নয়। লাইন পাতার ঠিক পথের ওপরেই একজায়গায় জমিটা বিশ্রীরকম উঁচু হয়ে উঠেছে। মন্দ কপাল আমাদের আর কি।

তার মানে, আরও অনেকটা বাড়তি খোঁড়ার কাজ করতে হবে।'

বৃদ্ধ থেমে পড়ল। বাতাসের দিকে পেছন ফিরে হাতটা গোল করে ধরে তার ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠি আড়াল করে সে একটা সিগারেট জ্বালাল। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে দ্রুত এগুল আর দুজনের সঙ্গ ধরবার জন্যে। তোকারেভের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল আকিম, কিন্তু ঝুখ্‌রাই এগিয়ে চলেছে।

তোকারেভকে জিজ্ঞেস করল আকিম, 'তোমার কী মনে হয়—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাইন পেতে ফেলতে পারবে?'

জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল তোকারেভ। শেষে বলল, 'দেখো, ছেলে, কথাটা হচ্ছে সাধারণ নিয়মে কাজটা করে ওঠা যায় না। তবে, আমাদের করতেই হবে—ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই।'

ফিওদরের সঙ্গ ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল তারা।

উত্তেজনার সঙ্গে বলে চলল তোকারেভ, 'অবস্থাটা এই—পাতোশ্‌কিন আর আমি, মাত্র দুজনে আমরা জানি যে এই যৎসামান্য মালমসলা আর কাজ করার লোক নিয়ে এ অবস্থার মধ্যে একটা লাইন পাতা অসম্ভব। কিন্তু আর সবাই, প্রত্যেকেই জানে যে লাইনটা পেতে ফেলতেই হবে যে-কোনো উপায়ে। সেই জন্যেই তো বলছি যে শীতে জমে যদি আমরা মরে না যাই, তাহলে লাইন পাতা হবে ঠিকই। তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখো: এক মাসেরও বেশি আমরা এখানে মাটি খুঁড়ে চলেছি, আমাদের কাজে বদলি হিসেবে আসা চার-নম্বর দলটাকে বিশ্রাম দেবার সময় হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্তক্ষণ গোড়ার শ্রমিকদলের বেশির ভাগটা কাজ করেই চলেছে। শুধু বয়েসে তরুণ বলেই এরা চালিয়ে যেতে পারছে। কিন্তু এদের অর্ধেক লোকেরই ঠান্ডা লেগেছে

শীতে। দেখে তোমাদের সত্যিই দুঃখ হবে। সোনার টুকরো ছেলে সব—কিন্তু এই হতচ্ছাড়া জায়গাটা একাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

সরু করে পাতা রেল-লাইনটা স্টেশন থেকে প্রায় পৌনে-এক মাইল দূরে এসে শেষ হয়েছে। সেটাকে ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল লম্বা এক ফালি জায়গা জুড়ে সমান উঁচু পথটার ওপরে যা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় যেন একটা কাঠের গুঁড়ির বেড়া ঝড়ের ঝাপটায় পড়ে গেছে—এগুলো রেল বসাবার স্লিপার কাঠ, সব ঠিক মতো জায়গায় দৃঢ়ভাবে আট্‌কে বসানো। আর এটাকে ছাড়িয়ে চড়াইয়ের জায়গাটা পর্যন্ত সমস্তটা শুধু একটা সমান উঁচু পথ।

এই অংশটায় কাজ করছে পানক্রাতভের রেলপথ-কর্মীদের এক-নম্বর দল। চল্লিশ জন লোক স্লিপারগুলো আটকাবার শিক গাঁথছে আর লালচে-রঙের দাড়িওয়ালা একজন চাষী নতুন একজোড়া বাকলের জুতো পায়ে দিয়ে ধীরে-সুস্থে রাস্তার বুকে গুঁড়ি-কাঠের বোঝা নামাচ্ছে। কিছু দূরে আরও কতকগুলো স্লেজ-গাড়ি থেকে মাল নামানো হচ্ছে। দুটো লম্বা লোহার ডাণ্ডা পড়ে আছে মাটিতে—স্লিপারগুলোকে ঠিক মতো সমান্তরাল করে বসাবার জন্যে এগুলো ব্যবহার করা হয়। পাথর-কুচিগুলো সমান করে বসাবার জন্যে কোদাল-শাবল-বেল্‌চা সবই ব্যবহার করা হচ্ছে।

রেল-লাইনের স্লিপার পাতার কাজটা মন্থর আর শ্রমসাপেক্ষ। মাটির বুকের ওপর দৃঢ়ভাবে আটকে দেওয়া চাই স্লিপারগুলো, যাতে প্রত্যেকটার ওপরে রেলের চাপ সমানভাবে পড়ে।

দলের মাত্র একজন লোক স্লিপার বসাবার পদ্ধতিটা জানে। সে হল তালিয়ার বাবা, রেল-লাইন সর্দার লাগুতিন—চুয়ান্ন বছর বয়েস তার, কয়লার মতো কালো দাড়ি মাঝখানে সিঁথি কাটা, মাথার একটা চুলও পাকে নি। এই কাজের গোড়া থেকেই সে বোয়ারকায় খাটছে, তরুণ কর্মীদের সঙ্গে সমস্ত রকমের কষ্ট সমানে সহ্য করে চলেছে এবং গোটা শ্রমিকদলটার শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। পার্টি সভ্য না হলেও লাগুতিন সমস্ত পার্টি সভায় সম্মানের আসন পায়। এ জন্যে তার ভারি গর্ব এবং সে কথা দিয়েছে কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এখান থেকে যাবে না।

বদলির লোক এলেই সে প্রতিবারেই খাসা মেজাজেই বলে, 'তোমাদের ওপর কাজ চালাবার ভার ছেড়ে দিয়ে আমি কী করে চলে যাব? একজন অভিজ্ঞ লোক যদি সব কিছুর ওপর নজর না রাখে, তাহলে একটা না একটা গোলমাল বাধবেই। অভিজ্ঞতার কথাই যদি বলো, আমার জীবনে যে আমি দেশের নানা জায়গায় কতো অসংখ্য স্লিপার ঠুকে বসিয়েছি, তা আজ আর মনেও করতে পারি না।' সুতরাং সে থেকে গেছে।

লাগুতিন যে তার কাজ ভালো করেই জানে, সেটা পাতোশ্‌কিন জানে আর তাই সে তার এলাকায় কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে ক্কচিৎ কখনও আসে। পানক্রাতভ একটা স্লিপার বসানোর জন্যে গর্ত খুঁড়ছিল, পরিশ্রমে ঘেমে গেছে সে, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে—এমন সময়ে আকিম আর ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে তোকারেভ সেখানে এসে পড়ল।

জাহাজের মাল-খালাসী তরুণটিকে আকিম প্রায় চিনতেই পারে নি। পানক্রাতভ খুব রোগা হয়ে গেছে, তার শুকনো গাল-বসা গম্ভীর মুখের ওপর চওড়া চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

ঘামে-ভেজা উষ্ণ একটা হাত আকিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, 'আরে, এই যে, বড়ো-কর্তারা সব এসে গেছেন!'

কোদালের ঠুনঠুন আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। চারিধারে বিবর্ণ আর শুকনো মুখগুলোর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল আকিম। এদের কোট আর কোর্তাগুলো বরফের ওপরে হেলা-ফেলায় স্তূপীকৃত।

লাগুতিনের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তোকারেভ পানক্রাতভকে নিয়ে মাটি খোঁড়ার জায়গাটায় নিয়ে এল আগন্তুকদের। ঝুখ্‌রাইয়ের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে মাল-খালাসী ছেলেটি।

'মতোভিলভ্‌কায় কী ঘটেছিল বলো তো, পানক্রাতভ? ওই 'চেকা' লোকটির অস্ত্র কেড়ে নেওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বলে কি তোমাদের মনে হয় না?' গম্ভীর মুখে ফিওদর জিজ্ঞেস করল স্বল্পভাষী মাল-খালাসী ছেলেটিকে।

পানক্রাতভ মিইয়ে যাওয়া ভঙ্গীতে হাসল।

'উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারেই সবটা করা হয়েছিল,' ব্যাখ্যা করে বলল সে, 'ওর অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্যে ও বলেছিল আমাদের। ও যে আমাদেরই একজন। ব্যাপারটা সব যখন আমরা ওকে বুঝিয়ে বললাম, ও তখন বলল, 'তোমাদের মুশকিলটা আমি বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু ওই জানলা-দরজাগুলো তোমাদের নিয়ে যেতে দেবার অধিকার আমার নেই। রেলওয়ের সম্পত্তি লোপাট হওয়া বন্ধ করার জন্যে কমরেড জের্জিনস্কির হুকুম আছে আমাদের ওপর। এখানকার এই স্টেশন-মাস্টারটা আমার ওপরে লাঠি উঁচিয়ে বসে আছে। বেজন্মা ব্যাটা এটা-ওটা চুরি করছে আর আমি ওর সে পথ বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি যদি তোমাদের এই

কাজটা বিনা বাধায় করতে দিই, তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে আর বিপ্লবী আদালতে আমার বিচার হবে। তবে, তোমরা আমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে সরে পড়তে পাব। আর যদি স্টেশন-মাস্টার রিপোর্ট না করে, তাহলে ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে যাবে।' সুতরাং আমরা তাই করেছি। আর যাই হোক, আমরা তো ওই দরজাজানলাগুলো নিজেদের জন্যে নিই নি, না কি?'

ঝুখ্‌রাইয়ের চোখ দুটো এক নিমেষের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে সে বলে চলল, 'যদি চাও তো তোমরা আমাদের শাস্তি দিতে পার, কিন্তু, কমরেড ঝুখ্‌রাই, ওই ছেলেটিকে কোনো কড়া রকম শাস্তি দিয়ো না যেন।'

'ব্যাপারটা এইখানেই চুকিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু দেখবে যাতে আর ভবিষ্যতে এরকম কিছু না হয়--শৃঙ্খলার দিক থেকে এটা খারাপ। আমলাতন্ত্রকে সংগঠিতভাবেই গুঁড়িয়ে দেবার মতো শক্তি এখন আমাদের হয়েছে। এসো এখন আরও গুরুতর বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক।' তারপর ডাকাতদলের হামলার ব্যাপারটা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল ফিওদর।

বোয়ারকা স্টেশন থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে যেখানে রেল-লাইনের পথ আটকে মাটিটা খানিকটা উঁচু হয়ে উঠেছে, সেখানে একদল লোক ভীষণ জোরে মাটি কোপাচ্ছে।

এই গোটা শ্রমিকদলটার যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে তাই নিয়ে সশস্ত্র হয়ে সাতজন লোক পাহারা দিচ্ছে। খোলিয়াভার রাইফেল আর করচাগিন-পানক্রাতভ-দুবাভা-খমুতোভের পিস্তল--এই হচ্ছে এদের মোট অস্ত্রশস্ত্র।

ঢালুতে বসে পাতোশ্‌কিন তার নোটবইয়ে নানা অঙ্ক

টুকে রাখছে। এই কাজে সেই একমাত্র ইঞ্জিনিয়র। ভাকুলেঙ্কো সেদিন সকালে পালিয়ে গেছে—ডাকাতদের হাতে মারা পড়ার চেয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোটাকেই সে শ্রেয় বলে মনে করেছে।

'এই ঢিবিটাকে কেটে পথ করার জন্যে দু'সপ্তাহ লাগবে। মাটিটা ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে।' পাতোশ্‌কিন নিচু গলায় বলল খমুতোভকে। সে তার পাশে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

খমুতোভ তার গোঁফের প্রান্তটা মুখে টেনে ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল, 'পুরো লাইনটা পাতার জন্যে আমাদের পঁচিশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, আর আপনি এইটুকুর জন্যেই পনের দিনের হিসেব কষছেন!

'হয়ে উঠবে না বলেই তো আমি মনে করি: অবশ্য আমি এর আগে কখনও এরকম অবস্থার মধ্যে আর এরকম শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করি নি। আমার ভুলও হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, আমার আগে আরও দুবার ভুল হয়েছে।'

এমন সময়ে ঝুখ্‌রাই, আকিম আর পানক্রাতভকে ঢালুটার দিকে আসতে দেখা গেল।

'দেখো, ওদিকে কারা আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল পিওৎর্‌ ত্রফিমভ—রেল-কারখানার একজন মিস্ত্রি এই তরুণ ছেলেটি, তার গায়ে কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া একটা পুরনো সোয়েটার। করচাগিনের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে সে আগন্তুকদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। পর মুহূর্তেই করচাগিন হাতে কোদাল ধরেই ছুটে নেমে এল ঢিবিটা বেয়ে। মাথায় চাপানো হেলমেটের নিচে তার চোখে আবেগদীপ্ত সম্ভাষণের হাসি। করমর্দনের সময় ফিওদর তার হাতখানা কিছুক্ষণ চেপে ধরে রইল।

'এই যে, পাভেল! এই অদ্ভুত পোশাকে তোমায় দেখে প্রায় চিনতেই পারি নি।'

শুকনো গলায় হাসল পানক্রাতভ, 'অদ্ভুত পোশাক বৈকি। আলো-বাতাস খেলার জন্যে যথেষ্ট খোলা জায়গা তো আছে জামাটায়। পালিয়ে গেছে যারা, তাদের মধ্যে কেউ একজন ওর ওভারকোটটা মেরে নিয়ে গেছে। ওকুনেভ ওকে দিয়েছে ওই কোর্তাটা—ওরা কমিউন করে আছে জানো তো। কিন্তু পাভেল ঠিক আছে, ওর গায়ের রক্ত খুব গরম। আরও একটা সপ্তাহ ও কনক্রিটের মেঝেটায় গড়াগড়ি দিয়ে নিজেকে গরম রাখবে -বিচালির আস্তরণটার জন্যে এমন কিছু যায় আসে না—তারপরে দিব্যি একটা পাইন-কাঠের কফিনের মধ্যে শোবার জন্যে ও তৈরি হয়ে উঠবে।' মর্মান্তিক একটা কৌতুক করল জাহাজের মাল-খালাসীটি।

কালো ভুরু আর ভোঁতা নাকওয়ালা ওকুনেভ তার দুষ্টুমিভরা চোখ দুটো কুঁচকে প্রতিবাদ জানাল, 'কিচ্ছু ভেবো না, আমরা পাভ্লুশকার ভালোমন্দের ভার নিচ্ছি। আমরা সবাই ভোট দিয়ে ওকে রান্নাঘরে ওদারকাকে সাহায্য করার জন্যে পাঠিয়ে দেব। ওর যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তাহলে দুমুঠো বাড়তি খাবারও ভরে নিতে পারবে, আবার শরীরটাকে গরম করার জন্যে উনুন ঘেঁষে কিংবা স্বয়ং ওদারকার গায়ে সেঁটে থাকতেও পারবে।'

এক দমক হাসির হুল্লোড় উঠল এই মন্তব্যে।

সেদিন ওরা হাসল এই প্রথম।

ফিওদর ঢিবি-জমিটা ভাল করে দেখার পর তোকারেভ আর পাতোশ্কিনের সঙ্গে স্লেজ-গাড়িতে চেপে কাঠ-কাটার জায়গাটায় গেল। ওরা ফিরল যখন, তখন মানুষগুলো সব

দুর্নিবার সংকল্প নিয়ে ঢিবিটা খুঁড়ে চলেছে। কোদালের দ্রুত ওঠানামা আর পরিশ্রমের চাপে নুয়ে পড়া শ্রমিকদের পিঠগুলো লক্ষ্য করল ফিওদর। আকিমের দিকে ফিরে সে নিচু গলায় বলল, 'সভা-সমিতির দরকার নেই। এখানে কোনো আন্দোলনেরও প্রয়োজন নেই। তুমি ঠিকই বলেছ তোকারেভ—সোনার টুকরো ছেলে সব এরা। ইস্পাত কঠিনতর হয়ে উঠছে এইখানেই।'

মাটি খুঁড়ছে যারা, তাদের দিকে তাকিয়ে রইল ঝুখ্‌রাই সপ্রশংসে আর কঠিন অথচ স্নেহভরা গর্বের সঙ্গে। এদের মধ্যে কেউ কেউ মাত্র অল্প কিছুদিন আগেও এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের বেয়নেটের ইস্পাত-ফলা বাগিয়ে ধরে। সেটা অভ্যুত্থানের আগের রাত্রের ঘটনা। আর এখন, একমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের দৃঢ়তা নিয়ে এরা খেটে চলেছে যাতে রেলপথের ইস্পাত-ধমনীটা গিয়ে পেঁছায় উষ্ণ-স্বাচ্ছন্দ্য আর জীবনের মহার্ঘ উৎসমুখে।

বিনীতভাবে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে, পাতোশ্‌কিন ফিওদরকে বুঝিয়ে দিল যে দু'সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে উঁচু জমিটা খুঁড়ে সমান করা অসম্ভব। ফিওদর তার যুক্তিগুলো শুনে গেল অন্য একটা চিন্তায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে। স্পষ্টতই অন্য কোনো একটা বিশেষ সমস্যায় তার চিন্তা নিবিষ্ট।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'ঢিবি কাটার সব কাজ বন্ধ রেখে ওদিক থেকে লাইন-পাতার কাজ চালিয়ে যাও। ঢিবিটার ব্যবস্থা আমরা অন্যভাবে করব।'

স্টেশনে এসে টেলিফোনে সে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চালাল। দরজার বাইরে পাহারায় ছিল খোলিয়াভা। ভেতর থেকে ফিওদরের কর্কশ গম্ভীর গলা শুনতে পাচ্ছিল সে,

'সামরিক এলাকার সেনানী-মণ্ডলীর অধিনায়ককে টেলিফোনে আমার নাম করে বলো পুজিরেভ্স্কির রেজিমেণ্টকে এখুনি এই লাইন-পাতার অঞ্চলে বদলি করে দিক। ডাকাতগুলোকে অবিলম্বে এই অঞ্চল থেকে হঠিয়ে দিতেই হবে। বিস্ফোরণকর্মীদের দল নিয়ে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন পাঠাও। বাকিটুকুর ব্যবস্থা আমি নিজে করব। রাত্রি বেলায় ফিরে আসব। লিৎকেকে বলে দিও রাত্রি বারোটার সময়ে যেন গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকে।'

ব্যারাক-ঘরটার মধ্যে আকিমের একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষে ঝুখ্রাই বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কমরেডসুলভ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে এক ঘণ্টা অলক্ষ্যে কেটে গেল। ফিওদর সবাইকে জানাল... কাজটা শেষ করার জন্যে যে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা আর বাড়ানোর কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

'এখন থেকে আমরা কাজটাকে সামরিক ভিত্তিতে চালাব,' বলল সে। 'পার্টি সভ্যদের নিয়ে কমরেড দুবাভার নেতৃত্বে বিশেষ একটা বাহিনী গড়া হবে। এই বাহিনীর ছ'টা দলের প্রত্যেকের ওপর এক-একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব থাকবে। বাকি কাজটুকু ছ'টা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকটা দলকে তার এক-একটা দেওয়া হবে। পয়লা জানুয়ারির মধ্যে পুরো কাজটা শেষ হওয়াই চাই। যে দলটা প্রথমে তাদের কাজ শেষ করবে, তাদের শহরে ফিরে বিশ্রাম করতে দেওয়া হবে। তাছাড়া, যে দল প্রথমে কাজ শেষ করবে, সেই দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীকে 'অর্ডার অফ্ রেড ব্যানার' পুরস্কার দেওয়ার জন্যে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটি সরকারকে অনুরোধ জানাবে।'

বিভিন্ন দলের নেতা হিসেবে এরা নিযুক্ত হল: ১ নং

দলে — কমরেড পানক্রাতভ; ২ নং দলে – কমরেড দুবাভা; ৩ নং দলে- কমরেড খমুতোভ; ৪ নং দলে--কমরেড লাগুতিন; ৫ নং দলে—কমরেড করচাগিন; ৬ নং দলে— কমরেড ওকুনেভ।

'রেল-লাইন পাতার কাজের প্রধান হিসেবে এবং রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে আগেকার মতোই থাকবেন কমরেড আন্তন নিকিফরোভিচ তোকারেভ।' এই কথা বলে তার বক্তব্য শেষ করল ঝুখ্‌রাই।

এক ঝাঁক পাখির হঠাৎ ডানা ছড়িয়ে উড়ে যাবার মতো হাততালির আওয়াজ উঠল এবং দৃঢ়তায় ভরা গম্ভীর মুখগুলো স্মিত হাসিতে কোমল হয়ে এল। ঝুখ্‌রাইয়ের বক্তৃতার এই কৌতুকে ভরা বন্ধুসুলভ পরিসমাপ্তিটুকু এক ঝলক হাসির দমকে সভার গুমোট মনোযোগের আবহাওয়াটাকে সহজ করে দিল।

আকিম আর ফিওদরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসার জন্যে প্রায় কুড়ি জন লোক ভিড় করে স্টেশনে এল।

করচাগিনের সঙ্গে করমর্দন করার সময়ে ফিওদর তার তুষারে ঢাকা গালোশ্-জুতোটার দিকে নজর করল। নিচু গলায় সে বলল, 'একজোড়া বুট-জুতো তোমায় পাঠিয়ে দেব আমি। ঠাণ্ডায় তোমার পা এখনও টাটিয়ে ওঠে নি, আশা করি?'

পাভেল জবাব দিল, 'একটু ফুলে উঠেছে পা দুটো।' তারপরে অনেকদিন আগে সে যে একটা জিনিস চেয়েছিল, সে কথা মনে পড়তেই সে ফিওদরের বাহু দুটো ধরে বলে উঠল, 'আমার পিস্তলটার জন্যে গোটাকতক কার্তুজ দিতে পার? আমার মোটে তিনটে ভালো কার্তুজ বাকি আছে দেখছি।'

ঝুখ্‌রাই দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। কিন্তু পাভেলের হতাশ

চাউনি লক্ষ্য করে সে তাড়াতাড়ি নিজের মোজার-পিস্তলওয়ালা চামড়ার খাপটা খুলে নিল, 'এই নাও, এটা উপহার দিলাম তোমাকে।'

অনেক কাল ধরে যে জিনিসটা সে মনে-প্রাণে একান্তভাবে কামনা করে আসছে, সেটা সত্যি সত্যিই পাচ্ছে দেখে যেন পাভেলের প্রথমে বিশ্বাসই হতে চাইল না। কিন্তু ঝুখ্‌রাই চামড়ার পটিটা তার কাঁধে পরিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এটা নাও! আমি জানি, অনেকদিন ধরেই তোমার এ জিনিসের ওপর নজর। কিন্তু সাবধান, আমাদের নিজেদের কোনো লোককে এটা দিয়ে গুলি করে বোসো না যেন। ওটার সঙ্গে পুরো তিন-ক্লিপ্‌ গুলি আছে।'

অন্য সবাই ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকে দেখল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, পাভকা, আমি ওটার বদলে একজোড়া বুট দেব তোমায়—সেই সঙ্গে একটা কোটও।'

পানক্রাতভ তার পিঠে একটা গুঁতো মেরে হেসে বলল, 'এসো, ওটার জন্যে আমি তোমাকে এক জোড়া ফেল্ট-এর বুট-জুতো দেব। এই গালোশ্‌-জুতো পরলে তুমি তো বড়োদিনের আগেই মরে যাবে।'

ট্রলিটার পাদানির ওপরে একটা পা ঠেকা রেখে ঝুখ্‌রাই পিস্তলটার জন্যে একটা পারমিট লিখে দিল।

পরের দিন ভোরে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন সিগন্যাল-পয়েন্টের উপর গড়গড়িয়ে এসে স্টেশনে থামল। এক ঝলক হাঁস-পালকের মতো শাদা বাষ্পের নিঃশ্বাস ছাড়ল ইঞ্জিনটা, স্বচ্ছ শীতার্ত বাতাসে মিলিয়ে গেল বাষ্পটা। ইস্পাত-মোড়া কামরাগুলো থেকে চামড়ার পোশাক পরা কতকগুলো মূর্তি বেরিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা বাদে, তিন জন বিস্ফোরণকর্মী

ট্রেন থেকে নেমে এসে ঢিবিটার মাটির নিচে দুটো বিরাট কালো তরমুজের মতো জিনিস বসিয়ে দিল। এই দুটো জিনিসের সঙ্গে লম্বা পলতে আটকানো। সাবধানী-সংকেত হিসেবে তারা একটা গুলি ছুঁড়ল। ঢিবিটা এখন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মানুষগুলো সেখান থেকে দূরে দূরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশলাই জ্বালিয়ে পলতেটার এক প্রান্তে ধরিয়ে দিতেই ছোট্ট একটা অনুপ্রভ শিখা জ্বলে উঠল।

কিছুক্ষণের জন্যে মানুষগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। দু-এক মুহূর্তের উৎকণ্ঠ অনিশ্চয়তা, আর তার পরেই কেঁপে উঠল মাটি, প্রচণ্ড একটা শক্তি ঢিবিটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিল, আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিরাট বিরাট মাটির চাঙড়। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা প্রথমটার চেয়েও জোরালো। ভীষণ বাজ পড়ার মতো তার শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে চারপাশের বনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিক ভরে তুলল নানারকমের এলোমেলো শব্দে।

ধুলো আর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে আসার পর দেখা গেল এখুনি যেখানে ঢিবিটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একটা গভীর গর্ত হাঁ করে রয়েছে, আর চারিদিকে বেশ কয়েক গজ জায়গা ঘিরে চিনির মতো শ্বেত বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি।

বিস্ফোরণের ফলে তৈরি এই গর্তটার দিকে মানুষগুলো ছুটে এল গাঁইতি-বেলচা নিয়ে।

ঝুখ্‌রাই চলে যাবার পর সর্ব প্রথম কাজ শেষ করার সম্মান অর্জনের জন্যে দলগুলির মধ্যে একাগ্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল।

ভোর হবার অনেক আগেই করচাগিন নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল

যাতে অন্যেরা না জেগে যায়। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর তার শীতে জমে যাওয়া পা বহুকষ্টে ফেলে রান্নাঘরের দিকে এল। সেখানে চায়ের জন্যে জল গরম করে তার দলকে জাগিয়ে তোলার জন্যে ফিরে এল।

অন্য সবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন পরিষ্কার দিনের আলো ফুটে গেছে।

সেদিন সকালে পানক্রাতভ কনুইয়ের গুঁতোয় ব্যারাক-ঘরের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল যেখানে দুবাভা আর তার দল সকালের খাবার খাচ্ছে।

উত্তেজিতভাবে সে বলল, 'শুনছ, মিতিয়াই? পাভকা তার দলের ছেলেদের সকাল হবার আগেই জাগিয়ে তুলেছে। এতক্ষণে ওরা পুরো কুড়ি গজ লাইন পেতে ফেলেছে ·· তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। সবাই বলছে, পাভেল তার রেল-কারখানার ছেলেদের মাতিয়ে তুলেছে যাতে ওরা পঁচিশ তারিখের মধ্যেই ওদের অংশটা শেষ করে ফেলতে পারে। আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে বোকা বানাতে চায়। কিন্তু, আমি বলছি — ওসব চলবে না!'

দুবাভা তিক্ত হাসি হাসল। রেল-কারখানার কর্মীরা যা করেছে, তার জন্যে বন্দরের কমসোমলের এই সম্পাদকটির যে কেন এতো আঁতে ঘা লেগেছে, সেটা দুবাভা বোঝে। বাস্তবিকপক্ষে, তার বন্ধু দুবাভাকেও পাভেল খুঁচিয়ে দিয়েছে — মুখে কিছু না বললেও সে গোটা দলটাকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছে।

পানক্রাতভ বলল, 'বন্ধুই হোক আর যাই হোক, এখানে লড়াই চলবে বৈকি।'

বেলা বারোটার কাছাকাছি করচাগিনের দল যখন খুব জোরে কাজ চালিয়েছে তখন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাত ঘটল।

রাইফেলগুলো যেখানে জড়ো করা রয়েছে, সেখানে যে শান্ত্রীটি পাহারায় ছিল, সে গাছের ফাঁকে একদল ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা বিপদ-সংকেতসূচক গুলির আওয়াজ করল।

'অস্ত্র নিয়ে নাও, ভাইসব! ডাকাতদল!' চেঁচিয়ে উঠল পাভেল। কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে গেল একটা গাছের দিকে যেখানে তার মোজার-পিস্তলটা ঝোলানো।

রাইফেলগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দলটি রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে সটান বরফের ওপরে শুয়ে পড়ল। সামনের সাবির ঘোড়সওয়াররা তাদের টুপি নাড়ল। তাদের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'সামলে, কমরেড, গুলি ছুঁড়ো না!'

উজ্জ্বল লাল তারা আঁটা বুদিওনি-টুপি মাথায় প্রায় পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার-সৈন্য রাস্তা বেয়ে এল।

রেল-লাইনের কাজের জায়গায় দেখাশোনা করতে এসেছে পুজিরেভ্স্কির রেজিমেন্টের একটা দল। এই দলের কম্যান্ডারের সুন্দর ধূসর রঙের মাদী ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করল পাভেল — কপালের ওপর খানিকটা জায়গা জুড়ে শাদা রঙ, একটা কানের প্রান্তটা তার কাটা। সওয়ারকে পিঠে নিয়ে সে অস্থিরভাবে পা ঠুকছে। পাভেল ছুটে গিয়ে তার লাগামটা চেপে ধরতেই সে ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে গেল।

'কি রে, লিস্কা, লক্ষ্মী আমার! ভাবতেও পারি নি যে তোর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে! তাহলে দেখছি বুলেট বিঁধতে পারে নি তোর গায়ে — কান-কাটা সুন্দরী আমার!'

পাভেল স্নেহের সঙ্গে ঘোড়াটার ছিমছাম গলাটা জড়িয়ে ধরে তার কেঁপে কেঁপে ওঠা নাকের প্রান্তে আদর করে চাপড় মারল। এক মুহূর্ত পাভেলের দিকে তাকিয়ে থেকে কম্যান্ডার বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! করচাগিন না? ঘোড়াটাকে

চিনতে পারলে, আর তোমার পুরনো বন্ধু সেরেদাকে একবার তাকিয়েও দেখলে না! ভালো আছ, ভাই?'

ইতিমধ্যে, রেল-লাইন পাতার কাজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়, তার জন্যে শহরে সর্ববিভাগে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাজের জায়গায় সেটা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যেতে লাগল। জেলা কমসোমল কমিটি থেকে একেবারে সমস্ত পুরুষ কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে ঝার্‌কি তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে বোয়ারকায়। সলোমেন্‌কায় রয়েছে শুধু মেয়েরা। রেলওয়ের কলেজ থেকে আরেক দল ছাত্র পাঠাবার ব্যবস্থাও সে করেছে।

তার কাজের ফলাফল আকিমের কাছে রিপোর্ট করার সময়ে সে ঠাট্টা করে বলল, 'আমি এখানে পড়ে রয়েছি শুধু নারী প্রলেতারিয়েত নিয়ে। ভাবছি — তালিয়া লাগুতিনাকে আমার জায়গায় এনে বসিয়ে, দরজার গায়ে 'মহিলা-বিভাগ' লেখা তক্তা ঝুলিয়ে দিয়ে, নিজে বোয়ারকায় কেটে পড়ব। এতগুলো মেয়ের মধ্যে আমি একমাত্র পুরুষ -- ভারি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার পক্ষে। কী বিশ্রীভাবে যে ওরা আমার দিকে তাকায়, যদি দেখতে একবার! ওরা নিশ্চয় বলাবলি করে: 'এই যে, ঘাগী অকর্মাটা, সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এখানে বসে আছে।' কিংবা এর চেয়ে খারাপ কিছুও বলে হয়তো। আমাকে যেতে দিতে হবে তোমায়।'

কিন্তু আকিম শুধু হাসল তার কথায়।

বোয়ারকায় নতুন নতুন কর্মিদল আসতে থাকল। এদের মধ্যে এল রেল-কারখানা ইস্কুল থেকে ষাটজন ছাত্র।

নতুন যারা এসেছে, তাদের থাকার জন্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের চারখানা কামরা পাঠাতে রেলওয়ের পরিচালনা বিভাগকে রাজি করাল ঝুখ্‌রাই।

দ্বাভার দলকে এখানকার কাজ থেকে খালাস দিয়ে প্শচা-ভোদিৎসায় পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ইঞ্জিন কটা আর পঁয়ষট্টিখানা সরু রেলপথের মালবাহী খোলা-গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে। এই কাজটাকে তাদের রেল-লাইন পাতার কাজের অংশ হিসেবেই গণ্য করা হবে।

ক্লাভিচেককে শহর থেকে ফিরিয়ে এনে বোয়ারকায় নতুনভাবে সংগঠিত কর্মিদলের ভার তার ওপরে দেবার জন্যে দুবাভা যাবার আগে তোকারেভকে পরামর্শ দিয়ে গেল। তাই করল তোকারেভ। দুবাভার এই অনুরোধের আসল কারণটা সে জানত না। সেটা হচ্ছে — সলোমেন্‌কা থেকে নতুন যারা এসেছে তাদের মারফত পাঠানো আন্নার একখানা চিঠি।

আন্না লিখেছে:

'দ্মিত্রি! ক্লাভিচেক আর আমি তোমাদের জন্যে একগাদা বই জোগাড় করেছি। তোমাকে, আর বোয়ারকায় সমস্ত তড়িৎকর্মীকে আমাদের অভিনন্দন। তোমরা সবাই চমৎকার! কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে আমরা তোমাদের শক্তি ও উদ্যম কামনা করছি। গতকাল এখানে জালানিকাঠের শেষ দফা বিলি করা হয়ে গেছে। ক্লাভিচেক তোমাদের তার শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে আমাকে লিখতে বলেছে। চমৎকার ছেলে সে। বোয়ারকায় পাঠাবার জন্যে সমস্ত রুটি সেই সেঁকে, ময়দা ঝাড়ে আর জল দিয়ে নিজেই ময়দা মেখে রাখে। রুটি কারখানার আর কাউকে এ কাজ করতে দিতে ভরসা পায় না ও। খুব ভালো ময়দা পাবার বন্দোবস্ত ও করে নিয়েছে, ওর রুটিগুলো দিব্যি হয়—আমি যেরকম রুটি পাই তার চেয়ে ঢের ভালো। সন্ধ্যের দিকে আমার এখানে

বন্ধুবান্ধবরা সব আসে -- লাগুতিনা, আরতিউখিন, ক্লাভিচেক এবং মাঝে মাঝে ঝারুকি। আমরা একটু-আধটু পড়ি, তবে বেশির ভাগই সবার সম্বন্ধে আর সব বিষয়েই গল্প করি — প্রধানত বোয়ারকায় তোমাদের কথাই বেশি বলাবলি করি। ওখানে কাজ করার জন্যে যেতে দেওয়া হয় নি বলে মেয়েরা সব ভীষণ চটে আছে তোকারেভের ওপর। এরা বলছে, কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ওরা কারুর চেয়ে কম যায় না। তালিয়া বলে দিয়েছে -- তার বাবার পোশাক পরে সে নিজেই বোয়ারকায় গিয়ে বাবার কাছে হাজির হবে, বলছে· 'দেখি, কি করে ও আমাকে তাড়ায়!'

'তালিয়া যদি ওর কথা মতো কাজ করে বসে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোমার সেই কালো-চোখ বন্ধুটিকে আমার নমস্কার জানিও। নমস্কার।

আন্না।'

তুষার-ঝড় শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। আকাশ ছেয়ে গেল ধূসর মেঘের নিচু স্তরে, আর তুষার পড়তে লাগল পুরু হয়ে। রাত্রিবেলায় চিমনির মুখে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে আর গাছের ফাঁকে কান্নার শব্দে বাতাস বইতে লাগল, পাক-খাওয়া তুষারের চিল্‌কেগুলোকে তাড়া করে ফিরল হাওয়া তার অশুভ গোঙানির আরণ্যক প্রতিধ্বনি জাগিয়ে।

সারারাত্রি ধরে দুরন্ত উন্মত্ততায় ঝড় বয়ে গেল। সারারাত্রি ধরে উনুনগুলো জ্বালিয়ে রাখা হলেও মানুষগুলো শীতে কেঁপেছে। ভাঙাচোরা স্টেশন-বাড়িটায় শীত আটকায় নি।

সকালে লোকগুলোকে কাজের জায়গায় যাবার সময় বরফের স্তূপের মধ্যে পথ কেটে যেতে হল। গাছগুলোর মাথায় অনেক উঁচুতে নীল আকাশের বুকে সূর্য জ্বলছে, তার

উজ্জ্বল ছটাকে ম্লান করার মতো এক টুকরো মেঘও কোথাও নেই।

করচাগিন আর তার কর্মদল তাদের কাজের জায়গায় এল তুষারস্তূপ সরাবার জন্যে। শীতে যে মানুষের কতোখানি কষ্ট হতে পারে, সেটা পাভেল এই এতক্ষণে উপলব্ধি করছে। ওকুনেভের ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তাটা তার শরীরকে মোটেই গরম করতে পারছে না। গালোশ্-জুতোটা অনবরত বরফে ভরে যাচ্ছে। বরফের মধ্যে আটকে গিয়ে গালোশ্‌টা প্রায়ই খুলে আসছে। তার বুট-জোড়ার অন্য পাটিটাও সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কাঁধের ওপরে তার বিরাট দুটো ফোঁড়া উঠেছে—ঠাণ্ডা মেঝের ওপরে শোবার ফল। মাফলারের বদলে পরার জন্যে তোকারেভ তাকে তার তোয়ালেটা দিয়েছে।

শীর্ণ দেহে লাল দুটো চোখ নিয়ে পাভেল তার বরফ-কাটা কাঠের বেলচাটা সবেগে চালাচ্ছে, এমন সময় একটা যাত্রীবাহী ট্রেন মন্থর নিঃশ্বাস ছেড়ে স্টেশনে এসে থামল। দম ফুরিয়ে আসা ইঞ্জিনটা এই পর্যন্ত কোনোক্রমে ট্রেনটাকে টেনে আনতে পেরেছে। তার জ্বালানিকাঠের বাক্সটায় একটা কাঠের গুঁড়িও নেই। বয়লারে শেষ কাঠের টুকরোগুলোর আগুনও মিইয়ে আসছে।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল স্টেশন-মাস্টারের উদ্দেশে, 'জ্বালানিকাঠ দাও, তবেই যেতে পারব আমরা। আর তা নইলে, যেটুকু চলার শক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু থাকতে থাকতে পাশের কোন লাইনে আমাদের 'শাণ্ট' করে আসতে দাও!'

পাশের একটা লাইনে সরিয়ে আনা হল ট্রেনটাকে। বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট যাত্রীদের কাছে ট্রেন থামিয়ে দেবার কারণটা

জানাতেই একটা আপত্তি আর গালাগালির ঝড় উঠল ভীড়াক্রান্ত কামরাগুলো থেকে।

তোকারেভ যাচ্ছিল প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর দিয়ে তার দিকে ট্রেনের গার্ডদের দেখিয়ে স্টেশনমাস্টার পরামর্শ দিল, 'ওই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে গিয়ে কথা বলো। ও এখানকার লাইন-পাতার কাজের প্রধান কর্তা। ও হয়তো স্লেজ-গাড়ি করে ইঞ্জিনের জন্যে জালানিকাঠ আনবার ব্যবস্থা করতে পারে। ওরা স্লিপারের জন্যে কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার করছে।'

গার্ডরা তার কাছে গিয়ে আবেদন জানাতে তোকারেভ বলল, 'কাঠ আমি দেব তোমাদের, তবে তোমাদেরও তার জন্যে কিছু দিতে হবে। ওই কাঠ তো আমাদের রেল-লাইন পাতার উপকরণ। আপাতত বরফ পড়ার ফলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। তোমাদের ট্রেনে নিশ্চয়ই প্রায় পাঁচ-ছ'শো যাত্রী আছে। মেয়েরা আর শিশুরা যেমন আছে থাকুক, কিন্তু পুরুষদের নেমে এসে বিকেল পর্যন্ত বরফ সাফ করার কাজে হাত লাগাতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের কাঠ দেব। যদি আসতে না চায়, তাহলে নতুন বছর না আসা পর্যন্ত ওরা যেখানে আছে, সেইখানেই থাকুক।'

করচাগিন তার পেছন দিকে একটা বিস্ময়ভরা উক্তি শুনল, 'দেখো, দেখো, কতো লোক আসছে এদিকে! মেয়েরা পর্যন্ত!'

ঘুরে দাঁড়াল সে।

তোকারেভ এসে বলল, 'এই এক-শো জন এসেছে তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে। ওদের কাজ দাও, আর দেখো যেন কেউ ফাঁকি না দেয়।'

আগন্তুকদের কাজে লাগিয়ে দিল করচাগিন। রেলওয়ে

অফিসারের কেতাদুরস্ত উর্দি গায়ে, লোমের কলার জড়ানো, আর মাথায় পশমের উঁচু টুপি-পরা লম্বা একজন লোক বিরক্তির সঙ্গে তার হাতের মধ্যে বেলচাটা ঘোরাতে ঘোরাতে তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরল। এই সঙ্গিনীটি একটি তরুণী, তার মাথায় সিল-মাছের চামড়ার টুপির ওপরে চটকদার পশমের ফুল বসানো।

'আমি বরফ কাটব না, আর জোর করে আমাকে দিয়ে এ কাজ করানোর অধিকার কারও নেই। ওরা যদি আমাকে বলে, তাহলে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়র হিসেবে আমি এ কাজটা পরিচালনা করার ভার নিতে পারি। কিন্তু তোমার বা আমার বেলচা দিয়ে বরফ কাটার কোনো দরকার পড়ে নি—ওটা রেলওয়ের কানুনের বিরোধী। ওই বুড়োটা আইন ভাঙছে। আমি ওকে আইনে অভিযুক্ত করতে পারি। তোমাদের কাজের সর্দার কোথায়?' লোকটা তার সবচেয়ে কাছাকাছি শ্রমিকটির দিকে ফিরে জানতে চাইল।

এগিয়ে এল করচাগিন।

'কাজ করছেন না কেন, মশাই?'

পাভেলের আপাদমস্তক অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল লোকটা।

'তা, আপনি কে বটেন?'

'আমি একজন মজুর।'

'তাহলে আপনাকে কিছু বলার নেই। আপনাদের সর্দারকে—কিংবা যাই বলুন আপনারা তাকে—পাঠিয়ে দিন এখানে...'

ভ্রূকুটি করল করচাগিন।

'যদি কাজ করতে না চান তো করবেন না। কিন্তু আপনার টিকিটে আমরা সই করে না দিলে আপনি ট্রেনে চাপতে পারবেন না। আমাদের বড়ো কর্তার এই হুকুম।'

মহিলাটির দিকে ফিরে পাভেল বলল, 'আর, আপনিও কি কাজ করতে চান না?' বলেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তনিয়া তুমানভা।

তনিয়ার যেন বিশ্বাসই হতে চায় না যে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা, অদ্ভুত জুতো-পায়ে, গলায় একটা নোংরা তোয়ালে জড়ানো, বহুদিনের না ধোয়া ময়লা-ভরা মুখ এই ভবঘুরে-চেহারার মানুষটিই হচ্ছে তার এককালের বন্ধু পাভেল করচাগিন। কেবল চোখ দুটো তার আগের মতোই তীব্র দীপ্তিতে জ্বলছে। এ সেই পাভেলের চোখ, যে-পাভেলকে তার মনে আছে। আর, যেন ভাবতেই পারা যায় না যে এই নিতান্ত হতশ্রী প্রাণীটিকেই সে অল্প কিছুকাল আগে ভালবেসেছিল। কী ভাবে যে বদলে গেছে সবকিছু!

তনিয়া সম্প্রতি বিয়ে করেছে; সে আর তার স্বামী চলেছে বড় শহরে। সেখানে রেলওয়ের পরিচালনা বিভাগে তার স্বামী একজন ওপরওয়ালা চাকুরে। কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে তার কিশোরী বয়সের ভালবাসার পাত্রটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এইভাবে? এমন কি সে পাভেলের দিকে তার হাতটা এগিয়ে দিতেও ইতস্তত করছে। কী ভাববে ভাসিলি? করচাগিন এতো নিচে নেমে গেছে—কী দুর্ভাগ্য! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বয়লারের কয়লা-জোগানদার ছেলেটি রেল-মজুরের বেশি উঁচুতে আর উঠতে পারে নি।

অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে আর তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে, এই ভবঘুরেটি যে তার স্ত্রীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, সেটাকে ঔদ্ধত্য বলে ধরে নিয়ে সেই রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়রটি ক্রুদ্ধ হয়ে তার বেলচাটা ফেলে দিয়ে তনিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল।

'চলো তনিয়া, আমরা যাই। এই লাৎসারোনিটাকে* আর দেখতে পারি না।'

করচাগিনের 'জ্বসেপে গ্যারিবল্ডি' বইটা পড়া ছিল, তাই ওই কথাটার মানে জানা ছিল তার।

কর্কশ গলায় সে বলল, 'আমি লাৎসারোনি হতে পারি, কিন্তু তুমি একটা ঘূণ-ধরা বুর্জোয়ার বেশি কিছু নও।' তনিয়ার দিকে ফিরে কঠিন স্বরে বলল সে, 'কমরেড তুমানভা, বেলচাটা তুলে নিয়ে কাজের সারিতে সামিল হন। এই নাদুসনুদুস ষাঁড়টির উদাহরণ অনুসরণ করবেন না... এখানে... মাপ করবেন, জানি না ওর সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ।'

তনিয়ার পশমী বুটজোড়ার দিকে একনজর তাকিয়ে পাভেল একটু নির্মম হাসি হেসে প্রসঙ্গক্রমে কথা বলার ভঙ্গীতে বলল, 'এখানে আপনার থেকে যাওয়ার পরামর্শটা আমি দিতে পারি না। সেদিন রাত্রে আমাদের ওপর ডাকাতদলের হামলা হয়েছিল।'

বলেই সে পেছন ফিরে চলে গেল তার গালোশ্-জুতোয় ঢপঢপ আওয়াজ তুলে।

রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়রটির ওপরে তার শেষ কথাগুলির ফল ফলল এবং এখানে কাজ করার জন্যে তাকে রাজি করাতে পারল তনিয়া।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে সারাদিনের কাজের শেষে লোকজন দলে দলে স্টেশনে ফিরছে, তনিয়ার স্বামী ট্রেনে জায়গা

* ইতালির নেপল্স শহরের অতি দুঃস্থ আর অকর্মণ্য এক শ্রেণীর লোককে 'লাৎসারোনি' (lazzarone) বলা হত। ইতালীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা জুসেপে গ্যারিবল্ডি এদের একটা বড়ো অংশকে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে সংগঠিত করে তুলেছিলেন। — অনুবাদক

পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। একদল শ্রমিককে বেরিয়ে যেতে দেবার জন্যে একটুখানি দাঁড়িয়ে পড়তেই তনিয়া দেখল পাভেল আর সবার পেছনে ক্লান্তভাবে পা ফেলে চলেছে তার বেলচাটার ওপরে ভর দিয়ে দিয়ে।

'এই যে, পাভ্‌লুশা,' তাব পাশে এসে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তনিয়া বলল, 'এতোটা দুঃস্থ অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব বলে ভাবি নি কিন্তু। কর্তৃপক্ষের অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে এই রেল-মজুরের কাজের চেয়ে তুমি আরও ভালো কিছুর যোগ্য। আমি ভেবেছিলাম—এতদিনে তুমি কমিশার কিংবা ওইরকম কিছু হয়েছে বুঝি। বড়ো দুঃখের কথা যে জীবন তোমার প্রতি এতোটা বিমুখ হয়েছে...'

পাভেল দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত হয়ে তনিয়াকে লক্ষ্য করল।

'আমিও তোমাকে এতোটা... এতোটা মরকুটে দেখব বলে আশা করি নি।' নিজের মনোভাব প্রকাশের জন্যে সবচেয়ে নরম কথাটা সে যা ভাবতে পারে তাই বেছে নিয়ে বলল পাভেল।

তনিয়ার কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

'তুমি ঠিক আগের মতোই অভদ্র আছ!'

করচাগিন তার বেলচাটা কাঁধের ওপর ফেলে এগিয়ে গেল। কয়েক পা গিয়েই সে থামল।

'কমরেড তুমানভা,' বলল সে, 'তোমাদের তথাকথিত ভদ্রতা মানুষকে যতোটা আঘাত দেয়, আমার এই অভদ্রতা তার অর্ধেক আঘাতও দিতে পারে না। আর, দয়া করে আমার জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো না। আমার জীবনের মধ্যে কোথাও কোনো গোলমাল নেই। তোমার জীবনটাই একদম গোলমাল হয়ে গেছে—যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ঢের

বেশি খারাপ দেখছি। দু'বছর আগে তুমি এর চেয়ে ভালো ছিলে, তখন তুমি কোনো শ্রমিকের সঙ্গে করমর্দন করতে লজ্জা পেতে না। কিন্তু এখন তোমার সর্বাঙ্গ দিয়ে পুরানো কালের গন্ধ বেরুচ্ছে। সত্যি বলতে কি, তোমার আমার মধ্যে এখন আর কোনো কথা বলার নেই।'

আরতিওমের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল পাভেল। সে বিয়ে করতে চলেছে জানিয়ে বিশেষ করে লিখেছে পাভেল সে উপলক্ষে যেন অবশ্যই আসে।

একটা দমকা বাতাস এসে পাভেলের হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল হাওয়ায় ভাসিয়ে। বিয়ের আনন্দ-উৎসব পাভেলের জন্যে নয়। এরকম সময়ে সে কাজ ছেড়ে যাবে কী করে? মাত্র গতকাল ওই ভালুক পানক্রাতভটা তার দলের চেয়ে কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ও হঠাৎ এতোটা কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে যে সবাই অবাক হয়ে গেছে। বন্দরের মাল-খালাসী ছেলেটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। সাধারণত তার মধ্যে যে একটা নিরুত্তাপ ভাব ছিল, সেটা কেটে গেছে এবং ছেলেদের পেছনে লেগে থেকে সে তাদের কাজের গতিবেগ প্রচণ্ড রকম বাড়িয়ে দিয়েছে।

লোকগুলো যে নিঃশব্দ একাগ্রতার সঙ্গে প্রাণপণে কাজ করে চলেছে, সেটা লক্ষ্য করে পাতোশ্‌কিন বিমূঢ়ভাবে তার মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে অবাক হয়ে ভাবল, 'এরা মানুষ না দৈত্য? এরা এই অবিশ্বাস্য রকমের শক্তি পায় কোথা থেকে? আর মাত্র আটটা দিন যদি আবহাওয়াটা এরকম থেকে যায়, তাহলে তো আমরা কাঠ-কাটাইয়ের জায়গায় পৌঁছেই যাব! সেই যে বলে, সারা জীবন ধরে খালি দেখো আর

শেখো! এই লোকগুলো তো সমস্ত হিসেব ভেস্তে দিয়ে আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে দিল দেখছি।'

ক্লাভিচেক তার সেঁকা রুটির শেষ বোঝাটা নিয়ে শহর থেকে এল। তোকারেভের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে বেরিয়ে পড়ল করচাগিনের খোঁজে। আন্তরিক খুশির সঙ্গে করমর্দন করল তারা দুজনে। একগাল হেসে ক্লাভিচেক তার ন্যাপস্যাকেটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল নিচের দিকে লোম বসানো সুইডেনের তৈরি অতি সুন্দর একটা চামড়ার কোর্তা।

নরম চামড়াটার ওপরে মৃদু চাপড় মেরে সে বলল, 'এটা তোমার জন্যে! বলো দেখি কে পাঠিয়েছে? সে কি জানো না? তুমি একটা বুদ্ধু! কমরেড উস্তিনোভিচ পাঠিয়েছে, যাতে তোমার ঠাণ্ডা না লাগে। ওকে ওল্‌শিনস্কি দিয়েছিল এটা। রিতা এটা গিয়ে তোমাকে পৌঁছে দেবার হুকুম দিয়ে সোজা আমার হাতে তুলে দিল। আকিম রিতাকে বলেছিল যে এখানে বরফে সব জমে যাচ্ছে আর তারই মধ্যে তোমার গায়ে একটা পাতলা কোর্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ওল্‌শিনস্কি এ ব্যাপারে বেশ একটু কান-মলা খেয়ে গেল। 'আমি ওই কমরেডটিকে একটা সামরিক কোট পাঠাবার জন্যে দিতে পারি,' বলেছিল সে। কিন্তু রিতা তার উত্তরে শুধু হেসে উঠে বলেছিল, 'ঠিক আছে, এই কোর্তাটা গায়ে দিয়েই ওর কাজ করতে বেশি সুবিধে হবে।'

বিস্মিত পাভেল এই শৌখিন কোর্তাটা নিয়ে একটু ইতস্তত করে জমে যাওয়া শরীরের উপর পরে নিল সেটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করল তার কাঁধ আর বুকের ওপরে নরম লোমের আস্তরণের উষ্ণতা।

রিতা তার রোজনামচায় লিখেছে:

২০এ ডিসেম্বর

তুষার-ঝড়ের একটা পালা চলছে আমাদের ওপর দিয়ে। বরফ পড়ছে আর ঝড় বইছে। বোয়ারকায় ওরা প্রায় ওদের লক্ষ্যে পেঁছবে, এমন সময়ে তুষার-ঝড় এসে ওদের থামিয়ে দিয়েছে। একরাশ বরফের মধ্যে পড়ে গেছে ওরা, বরফে জমে যাওয়া মাটি কেটে তোলাও সহজ নয়। আর মাত্র আধ-মাইলটাক এগুতে বাকি আছে ওদের, কিন্তু কাজের এই অংশটুকুই সবচেয়ে কঠিন।

তোকারেভ রিপোর্ট করছে—ওখানে টাইফাস দেখা দিয়েছে, তিন জন অসুখে পড়েছে।

২২এ ডিসেম্বর

প্রাদেশিক কমসোমল কমিটির সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা পূর্ণ অধিবেশন হয়ে গেছে, কিন্তু বোয়ারকা থেকে কেউ উপস্থিত ছিল না। বোযারকা থেকে বারো মাইল দূরে ডাকাতরা শস্য-বোঝাই একটা ট্রেন লাইনচ্যুত করে দিয়েছে এবং যারা লাইন-পাতার কাজে আছে, সেই সমস্ত কর্মীকে ঘটনাস্থলে পাঠাবার জন্যে হুকুম জারি করেছে খাদ্য জন-কমিশারের প্রতিনিধি।

২৩এ ডিসেম্বর

বোয়ারকা থেকে আরও সাতজন টাইফাসের-রুগীকে শহরে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে ওকুনেভ একজন। আজ স্টেশনে গিয়ে দেখলাম খারকভ থেকে আসা একটা ট্রেনের বাফারে

চেপে জনকতক লোক আসছিল, ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া তাদের মৃতদেহগুলো নামিয়ে নেওয়া হল। হাসপাতালগুলো গরম রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই হতচ্ছাড়া তুষার-ঝড়টা যে কবে থামবে?

২৪এ ডিসেম্বর

এইমাত্র ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। আগের রাত্রে ওর্‌লিক তার দলটা নিয়ে বোয়ারকা আক্রমণ করেছিল বলে যে কথাটা শোনা যাচ্ছে, সেটাকে সে ঠিক বলে জানাল। দুঘণ্টা ধরে লড়াই চলেছিল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ সকালের আগে পর্যন্ত ঝুখ্‌রাই সঠিক রিপোর্ট পায় নি। ডাকাতদলটাকে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোকারেভ আহত হয়েছে — একটা বুলেট সরাসরি তার বুকে বিঁধেছে। আজ তাকে শহরে নিয়ে আসা হবে। সেদিন রাত্রে পাহারার ভার ছিল ফ্রানৎস ক্লাভিচেকের ওপরে, সে নিহত হয়েছে। ডাকাতদলটাকে আসতে দেখে সেই সাবধান সংকেত জানায়। হামলাকারীদের উপরে সে গুলি চালাতে শুরু করে, কিন্তু ইস্কুল বাড়িটায় গিয়ে পেঁছিবার আগেই তাকে ওরা ধরে ফেলে। তলোয়ারের একটা চোটে ও কাটা পড়ে। কর্মীদের মধ্যে এগারোজন আহত হয়েছে। এতক্ষণে ওখানে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন আর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দুটো স্কোয়াড্রন গিয়ে পেঁছেছে।

লাইন-পাতার কাজের ভার নিয়েছে পানক্রাতভ। আজ গ্লুবোকি গ্রামে ডাকাতদলের একটা অংশকে পুজিরেভস্কি পাকড়াও করে একদম খতম করে দিয়েছে। পার্টি সভ্য নয়, এমন কিছু শ্রমিক ট্রেন আসার অপেক্ষায় না থেকে রেল-লাইন ধরে পায়ে হেঁটেই শহরের দিকে চলে গিয়েছে।

তোকারেভ আর অন্যান্য আহত লোকরা শহরে এসে পেঁছেছে; তাদের হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ডাক্তাররা। সে এখনও অচেতন হয়ে আছে। অন্যদের প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই।

আমাদের আর প্রাদেশিক পার্টি কমিটির উদ্দেশে লেখা একটা টেলিগ্রাম এসেছে বোয়ারকা থেকে:

'এই সভায় সমবেত আমরা — রেল-লাইন-কর্মীরা, 'সোভিয়েত রাজের জন্য' নামে সাঁজোয়া-ট্রেনের চালক-রক্ষিদল আর লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টের সৈন্যরা — ডাকাতদলের হামলার জবাবে তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পয়লা জানুয়ারির মধ্যেই শহর জালানিকাঠ পাবে। আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে আমরা কাজে নেমেছি। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের এই কাজে পাঠিয়েছে— কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ!

সভার সভাপতি **করচাগিন**
সম্পাদক **বেরজিন**।'

ক্লাভিচেককে সলোমেন্‌কায় সামরিক সম্মানের সঙ্গে গোর দেওয়া হয়েছে।

এতদিনের কামনার লক্ষ্যস্থল জালানিকাঠ দৃষ্টিপথে এসেছে, কিন্তু সেদিকে এগিয়ে চলার গতিটা যন্ত্রণাদায়কভাবে মন্থর হয়ে পড়েছে—কারণ, প্রতিদিন কর্মীদের মধ্যে থেকে ডজন ডজন করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লোককে টাইফাস এসে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

কাজ সেরে স্টেশনে ফেরবার পথে করচাগিন মাতালের মতো টলতে লাগল। তার পা দুটো যেন আর চলে না। বেশ কয়েকদিন ধরেই তার একটু জ্বর-জ্বর ভাব যাচ্ছে, কিন্তু আজ তাকে অসুখটা যেন নির্মমভাবে চেপে ধরেছে।

রেলপথ-তৈরির কর্মীদের সংখ্যাকে টাইফাস দিন দিন কমিয়ে আনছে। সেই টাইফাস আজ একটা নতুন শিকার ধরেছে। কিন্তু মজবুত শরীরের জোরেই পাভেল অসুখকে রুখছে। কংক্রিটের মেঝেয় পাতা খড়ের আস্তরণের ওপর থেকে নিজেকে পর পর পাঁচদিন টেনে তুলে এনেছে সে। আর সবার সঙ্গে কাজে যোগ দেবার মতো শক্তিটুকু তখনও তার শরীরে ছিল। কিন্তু এখন অসুখটা তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে — গরম কোর্তাটায় কিংবা বরফের ছোঁয়া লেগে ঘা হয়ে যাওয়া পায়ে পরা ফিওদরের উপহার ওই ফেল্টের বুটজোড়ায় আর কাজ হচ্ছে না।

প্রতি পদক্ষেপে একটা তীব্র যন্ত্রণা তার বুক দগ্ধে দিচ্ছে, দাঁত ঠকঠক করছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে — গাছপালাগুলো যেন অদ্ভুত রকমের পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

অতি কষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে এল স্টেশনে। একটা অস্বাভাবিক গোলমালে সে থেমে গিয়ে জ্বরের ঘোরে অস্পষ্ট হয়ে আসা চোখে কষ্ট করে চেয়ে দেখল — গোটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পর পর অনেকগুলো খোলা মালগাড়ি-জোড়া একটা ট্রেন। ট্রেনটায় যারা এসেছে, তারা লোহার রেল, স্লিপার-কাঠ আর ছোট রেল-লাইনে চলার মতো ইঞ্জিন ইত্যাদি নামিয়ে আনতে ব্যস্ত। টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই পা ফসকে গেল পাভেলের। মাথাটা তার মাটিতে ঠুকে যেতে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর তার জ্বরে-পোড়া

গালের ওপর বরফের আরামদায়ক একটা শীতলতা অনুভব করল।

কয়েক ঘণ্টা পরে তাকে সেই অবস্থায় পাওয়া গেল এবং ব্যারাক-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। সাঁজোয়া-ট্রেনটি থেকে ডাক্তারের সহকারীকে ডেকে আনা হল এবং সে পাভেলের নিউমোনিয়া আর টাইফাস রোগ নির্ণয় করল। জ্বরের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রিরও বেশি। পাভেলের ঘাড়ের ফোঁড়া দুটো আর তার শরীরের গিঁটের জায়গাগুলোর ফুলে-ওঠাটা ডাক্তারের সহকারী লক্ষ্য করল, কিন্তু জানাল যে নিউমোনিয়া আর টাইফাসের তুলনায় ওটা যৎসামান্য ব্যাপার—প্রথম দুটো রোগই তাকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

দুবাভা শহর থেকে এসেছে। সে আর পানক্রাতভ পাভেলকে বাঁচাবার জন্যে যথাসাধ্য করল।

আলিওশা কোখানস্কির বাড়ি পাভেলের শেপেতোভ্কা শহরেই। সেখানে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তার আত্মীয়দের কাছে পেঁছে দেবার জন্যে তার ওপরে ভার দেওয়া হল।

করচাগিনের দলের ছেলেদের সাহায্যে এবং প্রধানত খোলিয়াভার প্রভাবে পানক্রাতভ আর দুবাভা কোনোরকমে মানুষ-গাদাগাদি ট্রেনের কামরাটার মধ্যে আলিওশাকে আর অচেতন করচাগিনকে ঢুকিয়ে দিতে পারল। যাত্রীরা সবাই সংক্রামক টাইফাস সন্দেহ করে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল এবং মাঝপথে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলে শাসাল।

খোলিয়াভা তাদের নাকের ডগায় পিস্তল বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, 'এর অসুখ ছোঁয়াচে নয়! আর ও এই ট্রেনেই যাবে—যদি তার জন্যে তোমাদের সবাইকে এই

ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতে হয় তবুও! আর, মনে রেখো, শুয়োরের দল, যদি ওর গায়ে একটা আঙুলও ঠেকাও কেউ, তাহলে আমি এই রেল-পথের প্রত্যেকটি স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি—তোমাদের সবাইকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে জেলে পুরে দেবে। এই নাও, আলিওশা, পাভকার মোজার-পিস্তলটা ধরো—প্রথম যে লোকটা ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করবে।' নিজের কথায় খানিকটা বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে খোলিয়াভা এই বলে শেষ করল।

ট্রেনটা ধোঁয়া ছেড়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। নির্জন প্ল্যাটফর্মের ওপরে দুবাভা দাঁড়িয়ে আছে—তার কাছে এগিয়ে এল পানক্রাতভ।

'তোমার কি মনে হয়—ও সেরে উঠবে?'

প্রশ্নের জবাবটা অনুক্তই থেকে গেল।

'চলো, মিতিয়াই, কোনো উপায় তো নেই। এখন সব কিছুর দায়িত্ব আমাদের ওপরে। রাত্রির মধ্যে এই ইঞ্জিনগুলো আমাদের নামিয়ে ফেলতেই হবে, কাল সকালে ওগুলো চালাবার চেষ্টা করতে হবে।'

খোলিয়াভা রেল-পথের প্রত্যেকটি স্টেশনে তার 'চেকা'র বন্ধুদের কাছে টেলিফোন করে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল—মাঝপথে কোথাও ট্রেন থেকে করচাগিনকে যাতে নামিয়ে না দেওয়া হয় সেদিকে যেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখে। এটা যে করা হবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত সে ঘুমোতে গেল না।

রেলপথ বেয়ে আরও কিছুদূরে একটা জংশন-স্টেশনে চলতি যাত্রী-ট্রেনটা কিছুক্ষণের জন্যে যখন থামল, তখন

একটা কামরা থেকে একজন শণ রঙের চুলওয়ালা তরুণের দেহ নামিয়ে এনে রাখা হল প্ল্যাট্‌ফর্মে। কেউ জানে না সে কে বা কিসে সে মারা গেছে। স্টেশনে 'চেকা'র লোকজন খোলিয়াভার অনুরোধ স্মরণ করে কামরাটার কাছে ছুটে এল ছেলেটির নামিয়ে দেওয়াটা আটকাবার জন্য। কিন্তু তরুণটি মারা গেছে দেখে তারা মৃতদেহটিকে লাশ-ঘরে চালান দেবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বোয়ারকায় টেলিফোন করে খোলিয়াভাকে জানিয়ে দিল যে ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্যে সে এতো উৎকণ্ঠিত ছিল, সে মারা গেছে।

করচাগিনের মৃত্যুর খবর জানিয়ে বোয়ারকা থেকে একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল প্রাদেশিক কমসোমল কমিটির কাছে।

ইতিমধ্যে, আলিওশা কোখানস্কি কিন্তু অসুস্থ করচাগিনকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজে ঐ জ্বরে পড়ল।

৯ই জানুয়ারি

আমার মনে এতো যন্ত্রণা হচ্ছে কেন? লিখতে বসার আগে ভয়ানক কেঁদেছি। কে বিশ্বাস করবে যে রিতা কাঁদতে পারে এবং কাঁদতে পারে এমন যন্ত্রণাভরা কান্না? কিন্তু কান্না কি সবসময়েই দুর্বলতার লক্ষণ? আজ আমার এই চোখের জল বুক-জ্বলা দুঃখের কান্না। ঠাণ্ডার ভীষণতাকে জয় করা গেছে, রেল-স্টেশনগুলোয় মহামূল্য জালানিকাঠের স্তূপ জমে উঠেছে, শহর-সোভিয়েতের একটা বিজয় অনুষ্ঠান থেকে যখন ফিরে এসেছি—সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা বড়ো সভায় রেলপথ-কর্মী বীরদের সমস্ত রকম সম্মান জানানো হয়েছে সেখানে, আজকের এই বিজয়-উৎসবের দিনে দুঃখ-শোক এল কেন? — আমাদের জয় হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে

দু'জন মানুষ প্রাণ দিয়েছে— ক্লাভিচেক আর করচাগিন।

পাভেলের মৃত্যুতে আমার চোখে সত্যটা উদ্ঘাটিত হয়েছে— আমি যতোটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ঢের বেশি প্রিয় ছিল সে আমার।

আপাতত এই রোজনামচা লেখা শেষ করব। আর কখনও লিখব কি না সন্দেহ। ইউক্রেনীয় কমসোমলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাকে যে কাজ দেবার কথা ছিল সে কাজটা নেব জানিয়ে আমি কাল খারকভে চিঠি লিখব।

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্তু যৌবন জয়ী হল। পাভেল টাইফাসে মারা পড়ে নি। এই নিয়ে চারবার সে মৃত্যুর সীমান্তরেখা ছাড়িয়ে গিয়ে আবার জীবনের এলাকায় ফিরে এল। তার বিছানা ছেড়ে ওঠার সামর্থ্য ফিরে পেতে পুরো একমাস কেটে গেছে। শীর্ণ বিবর্ণ দেহে কাঁপন ধরা পায়ে দেয়াল-ঘেঁষে শরীরের ভর রেখে সে দুর্বলভাবে টলতে টলতে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। মায়ের সাহায্যে জানলাটার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে রাস্তাটার দিকে চেয়ে যেখানে বরফগলা জল জমে উঠে প্রথম বসন্ত সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। বছরের প্রথম উষ্ণ হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

জানলাটার ঠিক সামনেই চেরিগাছের ডালে বসে ধূসর বুকওয়ালা একটা চড়ুইপাখি ঠোঁট দিয়ে তার পালকগুলো আঁচড়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে দ্রুত চোখে অস্বস্তির সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল পাভেলের দিকে।

জানলাটার শার্সির গায়ে আঙুলের মৃদু চাপড় মেরে

পাভেল বলল, 'তাহলে দেখছি, তুই আর আমি শীতকালটা পেরিয়ে এসেছি।'

চমকে উঠে তার মা তাকাল তার দিকে।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস ওখানে?'

'চড়ুই একটা... এই যাঃ, উড়ে গেছে—ক্ষুদে শয়তানটা!' শীর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

পূর্ণ বসন্ত নেমে আসতেই পাভেল শহরে ফেরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে। সে এখন হেঁটে চলার মতো যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি যেন একটা রহস্যময় ব্যাধি তার শক্তি ক্ষইয়ে দিচ্ছে। একদিন যখন সে বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তখন শিরদাঁড়ায় হঠাৎ একটা নিদারুণ যন্ত্রণা হতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। অতি কষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। পরের দিন একজন ডাক্তারকে দিয়ে খুব ভালো করে সে নিজেকে পরীক্ষা করাল। পাভেলের পিঠের দিকটা পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার তার শিরদাঁড়ায় বেশ খানিকটা বসে যাওয়া একটা জায়গা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা হল কী করে?'

'রোভনোর কাছে লড়াইয়ে ওটা হয়েছিল। তিন ইঞ্চির একটা কামানের মুখ থেকে একটা গোলা এসে পড়ে আমাদের পেছনের রাস্তাটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা পাথর ছিটকে এসে আমার পেছনে লাগে।'

'কিন্তু আপনি এতদিন হাঁটাহাঁটি করতে পারলেন কি করে? এর জন্যে কোনো কষ্ট হয় নি কখনও?'

'না। ওই ঘটনাটার পর আমি দু'এক ঘণ্টার জন্যে উঠতে পারি নি। তারপরে যন্ত্রণাটা কেটে গিয়েছিল, আর আমিও ঘোড়ার জিনের ওপর চেপে বসে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে এই প্রথম যন্ত্রণাটা ফের জেগেছে।'

শিরদাঁড়ার বসে যাওয়া জায়গাটা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মুখখানা দারুণ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, ভাই, বড়ো বিশ্রী দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। শিরদাঁড়ায় এমন চোট সয় না। আশা করা যাক, সেরে যাবে।'

পাভেলের জামা পরে নেবার সময় ডাক্তার তাঁর এই রোগীটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন সহানুভূতি আর দুঃখের সঙ্গে, মনোভাবটাকে তিনি গোপন করতে পারলেন না।

আরতিওম থাকে তার স্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে। তার বউ স্তেশা খুব সাধারণ চেহারার চাষী মেয়ে। অতি গরিব পরিবারে তার জন্ম। পাভেল একদিন তার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এল। ময়লা চেহারার ট্যারা-চোখ একটা বাচ্চা নোংরা সংকীর্ণ উঠোনটায় খেলা করছিল, পাভেলের দিকে উদ্ধতভাবে তাকিয়ে থেকে নাক খুঁটতে খুঁটতে জবাব চাইল, 'কি চাই? চোর নও তো? কেটে পড়ো বরং, নইলে মায়ের কাছে জব্দ হয়ে যাবে!'

পুরনো নিচু কুটিরটার একটা ছোট্ট জানলা খুলে গেল, বাইরের দিকে তাকাল আরতিওম।

'ভেতরে চলে আয়, পাভেল,' ডাক দিল সে।

একটি বুড়ী উনুনটার কাছে কাজে ব্যস্ত — পুরনো পার্চমেণ্ট কাগজের মতো হলদে তার মুখ। তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে পাভেলের দিকে একটা বিরূপ দৃষ্টি হেনে বাসনপত্রগুলো নিয়ে আবার ঠুকঠাক শুরু করল।

ছোট বিনুনি বাঁধা দুটি মেয়ে উনুনটার ওপরে চড়ে বসে সেখান থেকে তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে, বর্বরসুলভ কৌতূহলে হাঁ হয়ে গেছে তাদের মুখ।

টেবিলের সামনে বসে আরতিওম কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হচ্ছিল। সে জানে যে তার মা আর ভাই কেউই এই বিয়ে সমর্থন করে নি। আরতিওমদের পরিবার পুরুষানুক্রমে শ্রমিক, রাজমিস্ত্রির সুন্দরী মেয়ে পেশাদার দর্জি গালিয়ার সঙ্গে তিন বছর ধরে বন্ধুত্ব করার পর কেন যে আরতিওম তাকে ছেড়ে স্তেশার মতো মামুলী একটা মেয়ের সঙ্গে গিয়ে বসবাস শুরু করল, আর পাঁচজন মানুষের একটা পরিবারের রুজি-রোজগারের ভার তুলে নিল, সেটা তারা বুঝতে পারে নি। ইদানীং তাকে রেল-কারখানায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর ফিরে এসে অচল একটা খামার আবার জীইয়ে তোলার চেষ্টায় লাঙল ঠেলতে হয়।

নিজের জগৎ ছেড়ে 'পেটি বুর্জোয়ার জগতে' আরতিওমের এসে যাওয়াটাকে পাভেল যে সমর্থন করে নি, তা আরতিওম জানে। তাই তার ভাই তার এই পরিবেশকে কী চোখে দেখছে সেটা লক্ষ্য করতে লাগল আরতিওম।

বসে বসে কিছুক্ষণ ধরে তারা খুব সাধারণ রকমের এটা-ওটা কথাবার্তা চালাল। একটু বাদেই পাভেল যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আরতিওম আটকাল তাকে, 'বোস একটু, যা হোক কিছু খেয়ে যা আমাদের সঙ্গে বসে। স্তেশা এখুনি দুধ নিয়ে এসে যাবে। তাহলে, তুই কালই আবার চলে যাচ্ছিস? গায়ে যথেষ্ট জোর ফিরে এসেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

স্তেশা ঢুকল। পাভেলকে অভিবাদন জানিয়ে সে আরতিওমকে বলল তার সঙ্গে গিয়ে গোলাঘর থেকে কী একটা জিনিস নিয়ে আসবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে। পাভেল বসে রইল সেই গোমড়ামুখো বুড়ীটার সঙ্গে। জানলার ফাঁকে

ভেসে এল গির্জার ঘণ্টার শব্দ। বুড়ীটা তার শিকেটা নামিয়ে রেখে বিরক্তিভরা গলায় বিড়বিড় করে উঠল, 'হায় ভগবান! ঘরদোরের এই হতচ্ছাড়া কাজকর্ম করে কি আর মানুষে একটু প্রার্থনা করারও সময় পায়!'

শালটা খুলে ফেলে আগন্তুকটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল ঘরের কোণে যেখানে দেবতা-সন্তদের বহুকালের কালো রঙের আইকনগুলো আছে। হাড়-জিরজিরে তিনটি আঙুল জড়ো করে সে নিজের বুকের ওপরে ক্রশ-চিহ্ন আঁকল।

জীর্ণ শুকনো ঠোঁটে ফিসফিসিয়ে বলল, 'হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক!'

বাইরের উঠোনে সেই বাচ্চাটা খেলা করতে করতে লাফিয়ে চেপে বসেছে একটা কালো রঙের কান-ঝোলা শুয়োরের পিঠে। ছোট ছোট খালি পা দুটো দিয়ে শুয়োরটার দুই পাশ চট করে আঁকড়ে ফেলে লোমগুলো চেপে ধরে সে চিৎকার করছে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দে ছুটে-চলা শুয়োরটার উদ্দেশে, 'জোরসে চালাও, হেঁইও! হট্ হট্, হেই!'

পিঠের ওপর ছেলেটাকে নিয়ে শুয়োরটা পাগলের মতো উঠোনে ছুটে বেড়াচ্ছে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে বেপরোয়া চেষ্টা করতে করতে। কিন্তু ট্যারা-চোখ ক্ষুদে শয়তানটা দিব্যি গদি বাগিয়ে বসে আছে।

বুড়ী প্রার্থনা থামিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে দিল তার মাথাটা।

'ওরে ও জাহান্নমের কুত্তা! নেমে পড়্ এক্ষুণি শুয়োরটার পিঠ থেকে, নইলে ছাল ছাড়িয়ে নেব তোর!'

শেষ পর্যন্ত শুয়োরটা অত্যাচারী ছেলেটাকে পিঠ থেকে

ফেলে দিতে সমর্থ হল। বুড়ী তাতে খুশি হয়ে ঘরের কোণে আইকনগুলোর কাছে ফিরে এসে চেহারায় একটা ভক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে ফের আরম্ভ করল, 'তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক...'

সেই মুহূর্তে ছেলেটা কান্নায় ফোলা মুখ নিয়ে দরজায় দেখা দিল। জামার হাতা দিয়ে তার ছড়ে যাওয়া নাকটা মুছতে মুছতে আর যন্ত্রণায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে নাকী সুরে বলল, 'একটা বড়া দাও, মা-আ-আ!'

প্রচণ্ড রাগে তার দিকে ফিরে তাকাল বুড়ী।

'দেখছিস নে আমি প্রার্থনা করছি, ট্যারা-চোখ শয়তান কোথাকার? দাঁড়া, দিচ্ছি তোকে বড়া বজ্জাত কোথাকার!..' বেঞ্চির ওপর থেকে একটা চাবুক তুলে নিল সে। চক্ষের পলকে উধাও হয়ে গেল ছেলেটা। উনুনের ওপরে বসে মেয়ে দুটো ফিকফিক করে হাসছে।

বুড়ী তার ধর্মকর্মে তৃতীয় বার মন বসাবার চেষ্টা করল।

পাভেল তার দাদার জন্যে আর অপেক্ষা না করে উঠে বেরিয়ে এল। বেড়ার দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দেবার সময় সে লক্ষ্য করল—বুড়ী বাড়ির শেষ জানলাটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

'আরতিওমের মাথায় এ কোন্ দুর্বুদ্ধি ভর করেছিল যার টানে সে এখানে এসে পড়ল? এখন তো সে তার বাকি জীবনটার মতো এখানেই বাঁধা পড়ে গেল। স্তেশা বছরে বছরে একটা করে ছেলে বিয়োবে। আর, আরতিওমকে এখানে সেঁটে থাকতে হবে গোবরগাদায় গুবরে পোকার মতো। এমন কি, হয়তো সে ডিপোয় চাকরিও ছেড়ে দেবে।' বিষণ্ণ মনে ভাবতে ভাবতে পাভেল ছোট্ট শহরটার নির্জন রাস্তা বেয়ে হেঁটে চলেছে। 'আর, আমি কিনা আশা করেছিলাম যে

রাজনীতিক কাজে ওর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারব।'

আগামী কাল যে সে এই জায়গা ছেড়ে বড়ো শহরে ফিরে যাবে, আর যারা তার এতো প্রিয় সেই বন্ধু আর কমরেডদের সঙ্গে মিলিত হবে—এই চিন্তায় আনন্দ পেল পাভেল। বিশাল ওই শহরের কর্মব্যস্ত মুখর জীবন, অসংখ্য মানুষের অন্তহীন স্রোত, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি আর মোটরগাড়ির গতিশব্দ যেন পাভেলকে চুম্বকের মতো টানছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে কামনা করছে ইঁটের তৈরি সেই বিরাট কারখানা-বাড়িটার ধোঁয়ায় মলিন কর্মশালাগুলোর যন্ত্রপাতি আর চাকা-ঘোরানো বেল্টগুলোর কাছে ফিরে যাবার জন্যে। বিরাট ফ্লাই-হুইলটা যেখানে উন্মত্তের মতো পাক খেয়ে ঘুরছে সেখানে ফিরে যাবার জন্যে, যন্ত্রে লাগানো তেলের ঘ্রাণ নেবার জন্যে, আর যে-সব জিনিস তার অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে উঠেছে সেই সবের সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে। এই নিস্তরঙ্গ মফস্বল শহর—যার পথ বেয়ে সে এখন চলেছে—সেটা কেমন একটা অস্পষ্ট বিষণ্ণতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে তুলল তার মন। এখন যে তার নিজেকে এখানে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে, এতে আশ্চর্য হল না সে। এমন কি, দিনের বেলাতেও এই শহরে একপাক ঘুরে আসাটা যেন রীতিমত অস্বস্তিকর লাগল। গিন্নি-মেয়েরা বাড়ির দাওয়ায় বসে গালগল্প করছে, তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওদের অলস মন্তব্যগুলো পাভেল শুনতে পেল।

'এই চোয়াড়ে চেহারার লোকটা আবার কে?'

'দেখে তো মনে হচ্ছে ক্ষয়রোগ হয়েছিল ওর—যাকে বলে, ফুসফুসের ব্যারাম।'

'সুন্দর কোর্তাখানা পরেছে তো—চুরি করা জিনিস নিশ্চয়...'

এই ধরনের আরও অনেক উক্তি। এ সবে ঘেন্না ধরে যায় পাভেলের।

বহুদিন আগেই সে নিজেকে শেকড়শুদ্ধ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এই সব থেকে। ওই বিরাট শহরের সঙ্গে সে নিজের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করল — যে শহরের সঙ্গে শ্রমের আর বন্ধুত্বের প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ যোগসূত্রে সে বাঁধা।

পাভেল পাইন-বনটার কাছে এসে পড়েছে। রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে সে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তার ডান দিকে পুরনো জেলখানা — চারিদিকে উঁচু উঁচু কাঠের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে বন থেকে আলাদা করা। তার পেছনে হাসপাতালের শাদা বাড়িগুলো।

এইখানে ওই চওড়া খোলা জায়গাটায় ফাঁসুড়ের দড়ির গেরোয় রুদ্ধশ্বাস হয়ে ভালিয়া আর তার কমরেডরা তাদের তাজা জীবন দিয়েছে। ফাঁসির মঞ্চটা যেখানে ছিল, সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল পাভেল। তারপরে খাড়াইটার ওখানে গিয়ে উৎরাই বেয়ে নেমে এল ছোট গোরস্থানটায় যেখানে সাধারণ একটা কবরের নিচে একসঙ্গে শুয়ে রয়েছে 'শ্বেতরক্ষী সন্ত্রাসের' সময়কার সেই শহীদরা।

কারা যেন সস্নেহ হাতে কবরটার ওপরে বিছিয়ে দিয়েছে ফারগাছের কচি ডাল আর চারিধারে সযত্নে তৈরি করে দিয়েছে সবুজ রঙের সুন্দর বেড়া। খাড়াটার মাথায় পাইনগাছগুলো উঠে গেছে খাড়া আর ঋজু হয়ে, ঢালু বেয়ে কচি ঘাসের রেশম-সবুজ গালিচা বিছানো।

শহরের বাইরের এইদিকটায় একটা বিষণ্ণ নিঃশব্দতা। গাছগুলোর মৃদু ফিসফিসানি আর নতুন প্রাণ-পাওয়া মাটির বুকে বসন্তের তাজা গন্ধ... এই জায়গায় পাভেলের ভাইয়েরা

বীরের মতো এগিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে, যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে তাদের জীবন যারা জন্ম নিয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যে।

ধীরে ধীরে পাভেল হাত তুলে টুপিটা খুলে নিল মাথা থেকে। নিবিড় একটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমগ্র সত্তা।

জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন সে পায় মাত্র একটি বার। তাই, এমন ভাবে বাঁচতে হবে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করার যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়, যাতে বিগত জীবনের গ্লানিভরা হীনতার লজ্জার দগ্ধানি সইতে না হয়; এমন ভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষটি বলতে পারে: আমার সমগ্র জীবন, সমগ্র শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে — মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে। পাছে হঠাৎ কোনো ব্যাধি বা কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জীবনে আকস্মিক ছেদ টেনে দেয় তাই জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে করচাগিন ফিরে চলল কবরখানা থেকে।

বাড়িতে তার মা বিষণ্ণ মনে ছেলের রওনা হবার ব্যবস্থা করছিল। মাকে লক্ষ্য করে পাভেল বুঝতে পারল যে সে তার চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করছে।

শেষে সাহস করে মা বলল, 'তুই থেকে যা না, পাভলুশা? এই বুড়ো বয়সে আমার একা পড়ে থাকা যে কী কষ্ট! ছেলেপুলে যতোই থাক না কেন, বড়ো হয়ে সবাই ছেড়ে চলে যায়। শহরে ছুটতেই কেন হবে তোকে, বলো তো? এখানেও তো দিব্যি থাকতে পারিস। নাকি, হয়তো কোনো

বব্-করা চুলওয়ালা ছোট্ট দোয়েল পাখি তোর মন টেনেছে সেখানে? তোরা ছেলেরা তোদের বুড়ো মাকে কখনও কিছু বলিস নে। আরতিওম আমাকে একটাও কথা না বলে চলে গিয়ে বিয়ে করল। আর, তুই তো এ দিক থেকে ওর চেয়েও খারাপ। অসুখ হয়ে যখন আর চলতে পারিস নে, শুধু তখনই আমি তোর দেখা পাই।' পাভেলের সামান্য কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার একটা থলেয় ভরতে ভরতে মা মৃদুস্বরে অনুযোগ করল।

পাভেল মার কাঁধ দুটো ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে নিল।

'দোয়েল-পাখি-টাখি আমার জন্যে নয়, মা! জানো না, পাখিরা তাদের নিজের নিজের জাত থেকেই সঙ্গী বেছে নেয়? আর, আমি দোয়েল-পাখি, তাই বলতে চাও না-কি?'

নিজের অজানতেই হেসে ফেলল তার মা।

'না, মা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি — দুনিয়ার সমস্ত বুর্জোয়াকে খতম না করা পর্যন্ত মেয়েদের কাছে ঘেঁষব না। তাহলে আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে বলে তোমার মনে হচ্ছে, না? না, মা, বুর্জোয়ারা এখন আর খুব বেশি দিন টিকতে পারবে না... শিগগিরই দুনিয়ার তামাম মানুষের জন্যে একটা মস্ত বড়ো লোকতন্ত্র গড়ে উঠবে। তোমরা বুড়ো মানুষরা, যারা জীবনভর খেটেছ, তারা সমুদ্রের ধারে সেই সুন্দর উষ্ণ দেশ ইতালিতে যাবে। সেখানে শীত নেই মা। বড়োলোকদের প্রাসাদগুলোয় আমরা তোমাদের নিয়ে গিয়ে তুলব সেখানে। তোমরা বসে বসে রোদ্দুর পোয়াবে আর বুড়ো হাড়গুলোকে তাজা করে তুলবে, আর আমরা ততক্ষণে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার বুর্জোয়াদের সাবাড় করে দিয়ে আসব।'

'ওসব ভারি সুন্দর রূপকথার গল্প, বাবা। কিন্তু আমি তো আর ওসব সত্যি হয়ে ওঠা পর্যন্ত বেঁচে থাকব না... তুই হয়েছিস ঠিক তোর জাহাজী ঠাকুরদার মতো, নানান ধরনের ধারণায় ভর্তি ছিল লোকটার মাথা। রীতিমত বোম্বেটে ছিল একটা --- ভগবান ক্ষমা করুন তাকে! সেভাস্তপোলের যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে একটা হাত আর একটা পা হারিয়ে, বুকের ওপরে দুটো ক্রশ আর ফিতেয় বাঁধা দুটো রুপোর মেডেল ঝুলিয়ে ঘরে এল। কিন্তু মারা গিয়েছিল গরিব অবস্থার মধ্যে। মেজাজটাও ছিল তার দারুণ তিরিক্ষি; চলে-ফিরে বেড়াবার ঠেকোলাঠিটা দিয়ে একবার একজন অফিসারের মাথায় মেরে বসেছিল। ফলে, বছরখানেক জেল হয়েছিল। তখন তার সামরিক ক্রশগুলো দেখিয়েও কোনো ফল হয় নি। হ্যাঁ, তুই ঠিক তোর ঠাকুরদার মতোই হয়েছিস, কোনো ভুল নেই এতে।'

'আমাদের এমন মন খারাপের মধ্যে দিয়ে বিদায় নেওয়া চলে না তো, মা, কি বলো? আমার অ্যাকর্ডিয়নটা দাও। অনেকদিন আমি ওটা ছুঁই নি পর্যন্ত।'

ঝিনুকের চাবিগুলোর ওপরে মাথাটা নুইয়ে সে বাজাতে আরম্ভ করল। শুনতে শুনতে তার বাজনায় একটা নতুন উপাদান লক্ষ্য করল মা।

ও তো কখনও এরকম বাজাতো না। সেই হালকা নাচের জলদ তালে সুরমূর্ছনা, সেই মন-মাতানো ছন্দ --- যার জন্যে এই তরুণ অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে বিখ্যাত ছিল - সেসব আর পাভেলের বাজনায় নেই। পাভেলের আঙুলগুলোর দক্ষতা বা শক্তি কিছুমাত্র কমে নি, কিন্তু সেই আঙুলগুলোর চাপে চাপে এখন যে সুরলহরী বেরিয়ে আসছে, তা হয়ে উঠেছে আরও ঐশ্বর্যময়, আরও গভীর।

স্টেশনে একাই এল পাভেল।

শেষ বিদায়ের মুহূর্তে মা বড়ো বেশি রকম বিচলিত হয়ে পড়বে বলে বুঝতে পেরে মাকে সে বাড়িতে থাকতে রাজি করিয়েছে।

অপেক্ষমাণ জনতার ভিড়। বিশৃঙ্খলভাবে মানুষে গাদাগাদি হয়ে উঠল ট্রেন। সবচেয়ে উঁচু একটা তাকে উঠে বসে পাভেল সেখান থেকে দেখতে থাকল নিচে উত্তেজিত যাত্রীদের চিৎকার, তর্কবিতর্ক আর হাতপা নাড়া।

যথারীতি প্রত্যেকের সঙ্গে বস্তা আর পোঁটলা-পুঁটলি — সেগুলোকে বসবার বেঞ্চির নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করার পর গোলমাল কিছুটা কমে আসল; যাত্রীরা সব খেয়ে পেট বোঝাই করার কাজে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল পাভেল।

কিয়েভে পৌঁছেই পাভেল সঙ্গে সঙ্গে শহরের মাঝখানে ক্রেশ্চাতিক স্ট্রিটের দিকে রওনা হল। ধীরে ধীরে উঠল সে সিঁড়িতে। সব কিছুই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিছুই বদলায় নি। মসৃণ রেলিংটার ওপর দিয়ে হাত টেনে টেনে উঠল পুলটায়। পুলটার ওপরে জনমানুষ নেই। নামতে শুরু করার আগে একটু দাঁড়াল। তার বিমুগ্ধ চোখের সামনে এক মহিমাময় সৌন্দর্যসমারোহ। অন্ধকারের মখমল আস্তরণে ঢাকা পড়েছে দিগন্ত। অসংখ্য উজ্জ্বল তারা নীলচে সবুজ আভায় জ্বলজ্বল করছে। আর দূরে নিচে যেখানে কোনো এক অদৃশ্য সীমারেখায় পৃথিবী গিয়ে মিশেছে আকাশের সঙ্গে, সেখানে অসংখ্য আলো জ্বালিয়ে শহরটা অন্ধকারকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে...

রাত্রির নিঃশব্দতা ভেঙে দিয়ে কথাবার্তার স্বর উঠল,

পাভেলকে জাগিয়ে দিল তার স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে। কয়েকজন লোক আসছে এদিকে। শহরের আলোগুলোর দিক থেকে চোখ দুটোকে টেনে এনে পাভেল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল।

অঞ্চলের বিশেষ বিভাগে যে লোকটি ডিউটিতে ছিল, সে পাভেলকে জানাল ঝুখ্‌রাই অনেক দিন আগেই শহর থেকে চলে গেছে।

এই তরুণটি যে সত্যিই ঝুখ্‌রাইয়ের একজন ব্যক্তিগত বন্ধু, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে সে পাভেলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত জানাল — তুর্কীস্তান ফ্রণ্টে তাশখন্দে কাজ করার জন্যে ফিওদরকে পাঠানো হয়েছে। খবরটা শুনে পাভেল এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সে আর কোনো কিছু বিস্তৃতভাবে জানতে না চেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে চলে এল। হঠাৎ একটা শ্রান্তির ভারে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে দরজার গোড়ায় বসে পড়তে হল বিশ্রাম করার জন্যে।

ঘর্ঘর শব্দে রাস্তাটাকে মুখরিত করে তুলে একটা ট্রামগাড়ি চলে গেল। জনতার অন্তহীন স্রোত চলেছে তার সামনে দিয়ে। বিচ্ছিন্নভাবে পাভেলের কানে ঢুকছে মেয়েদের খুশিভরা হালকা হাসি, গুরুগম্ভীর একটা গলার কথার টুকরো, ছোট ছেলের সরু চড়া-পর্দার স্বর, একজন বৃদ্ধের কাঁপন-ধরা খাদের গলা। দ্রুত চলমান ভিড়ের বিরতিহীন জোয়ার-ভাঁটা। উজ্জ্বল আলোকিত ট্রামগাড়ি, মোটর গাড়ির হেড-লাইটের ধাঁধাঁ-লাগানো দীপ্তি, কাছের একটা সিনেমা গৃহের প্রবেশমুখে বিজলি আলোর জ্যোতি... আর, সর্বত্র জনতা — অবিশ্রাম কথার গুঞ্জনে পথ মুখর করে তোলা জনতা। রাত্রির এই বিরাট শহর।

ফিওদরের চলে যাবার খবরে পাভেলের মনে যে বেদনা জেগেছিল, তার তীক্ষ্ণতা কিছুটা কমে এল রাস্তার কোলাহলে।

কোথায় যাবে সে এখন? যেখানে তার বন্ধুরা থাকে, সেই সলোমেন্‌কা এখান থেকে অনেক দূরে। এখান থেকে অনতিদূরে ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের বাড়িটার কথা পাভেলের হঠাৎ মনে পড়ল। সেখানেই যাবে সে। ফিওদরের পরেই যে-কমরেডের সঙ্গে দেখা করার কামনা পাভেলের মনে সবচেয়ে বেশি, সে তো রিতা। আর হয় তো আকিমের নাকি মিখাইলোর ঘরে রাতটা কাটানোর ব্যবস্থাও করতে পারবে পাভেল।

দূর থেকে সে শেষের জানলাটায় আলো দেখতে পেল। মনের আবেগচঞ্চলতাটুকু জোর করে সামলে নিয়ে সে বাইরের ওক-কাঠের ভারি দরজাটা ঠেলে খুলল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির চাতালে। রিতার ঘর থেকে গলার আওয়াজ আসছে। কেউ একজন গিটার বাজাচ্ছে।

'আরে, ও দেখছি আজকাল গিটার বাজাতে দেয় ওর ঘরে -- কড়াকড়ি শাসনটা একটু ঢিলে করেছে দেখছি,' মনে মনে ভাবল পাভেল। ভেতরের উত্তেজনাটা চাপা দেবার জন্যে সে ঠোঁট কামড়ে দরজার ওপরে মৃদু ঠুক-ঠুক আওয়াজ করল।

কোঁকড়ানো-চুল একটি তরুণী দরজাটা খুলে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল করচাগিনের দিকে।

'কাকে চাই?'

দরজাটা পুরোপুরি খুলে ধরেছিল মেয়েটি। ভেতরে একনজর তাকিয়েই পাভেল বুঝে নিল যে তার এখানে আসাটা নিষ্ফল হয়েছে।

'উস্তিনোভিচের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?'

'সে তো এখানে নেই। গত জানুয়ারি মাসে সে খারকভে গেছে। শুনেছি, এখন সে আছে মস্কোতে।'

'কমরেড আকিম কি এখনও এখানে থাকে? নাকি, সেও চলে গেছে?'

'কমরেড আকিমও এখানে নেই। সে এখন ওদেসা জেলা কমসোমলের সম্পাদক।'

ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই পাভেলের। শহরে ফিরে আসার আনন্দটা তার মিইয়ে এসেছে।

রাত্রি কাটাবার মতো একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া এখনকার মতো অব্যবহিত সমস্যা।

নৈরাশ্যটুকু হজম করে নিয়ে সে মনে মনে ঘোঁৎঘোঁৎ করে নিজেকেই বলল, 'পুরনো বন্ধুদের খোঁজে হেঁটে হেঁটে পা খোঁড়া করে আর লাভটা কী হবে, তারা যে আদপেই নেই এখানে!' তবু যা হোক, আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করবে বলে স্থির করে সে দেখতে চলল পানক্রাতভ এখনও শহরে আছে কি না। জাহাজের মালখালাসীটি থাকে জাহাজঘাটার অদূরে -- সেটা সলোমেন্‌কার চেয়ে কাছে।

পানক্রাতভের বাসায় এসে পৌঁছতে পৌঁছতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল পাভেল। দরজাটার ওপরে এককালে একপোঁচ হলদে রঙের জলুস ছিল, তার ওপরে ঠোকা দিতেই পাভেল মনে মনে স্থির করল, 'পানক্রাতভও যদি এখানে না থাকে, তাহলে খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দিয়ে ঘাটে গিয়ে একটা ডিঙির নিচে গুঁড়ি মেরে ঢুকে ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব।'

মাথার ওপর দিয়ে থুতনির নিচে রুমাল বাঁধা এক বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিল। পানক্রাতভের মা ইনি।

'ইগনাৎ বাড়ি আছে, মা?'

'এইমাত্র এসেছে ও।'

পাভেলকে চিনতে না পেরে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'ইগনাৎ, একজন ডাকছে তোকে!'

পাভেল তাঁর পেছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের ওপরে তার ন্যাপস্যাকটা রাখল। পানক্রাতভ টেবিলে বসে রাত্রির খাওয়া

সারছিল, পেছন ফিরে আগন্তুকের দিকে একনজর দেখে নিল।

'আমার কাছেই এসে থাকো যদি, তাহলে বসে বলে যাও যা বলার আছে,' বললে সে, 'আমি ততক্ষণে কিছু পুরে নিই পেটে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি আমার।' বলেই সে মস্ত বড়ো একটা কাঠের চামচ তুলে নিল।

একপাশে একটা নড়বড়ে চেয়ারে পাভেল বসল। টুপিটা খুলে নিয়ে তার একটা পুরনো অভ্যেস অনুযায়ী সেটা দিয়ে মুছে নিল কপালটা।

মনে মনে ভাবল, 'এতোই কি আমি বদলে গেছি যে ইগনাৎও আমাকে চিনতে পারছে না?'

দু'চামচ বর্শ্চ গিলে নিয়ে, আগন্তুকটি কিছু বলল না দেখে পানক্রাতভ মাথা ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

'আচ্ছা, বলে ফেল দিকি, কী বলতে চাও?'

এক টুকরো রুটি-ধরা হাতখানা তার মাঝপথে শূন্যে থেমে রইল। বিস্ময়ে চোখ দুটো মিটমিট করতে করতে সে তাকিয়ে রইল তার অতিথির দিকে।

'আরে... এ কি?... আচ্ছা! এমনটি তো কখনও...'

পানক্রাতভের লালচে মুখখানায় বিমূঢ় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখে পাভেল আর থাকতে না পেরে সশব্দে হেসে উঠল।

'পাভকা!' চিৎকার করে উঠল পানক্রাতভ, 'কিন্তু আমরা যে সবাই এদিকে জানি যে তুই মারা গেছিস! আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও এক মিনিট — আরেকবার নামটা বলো দিকি?'

তার চিৎকার শুনে পানক্রাতভের দিদি আর মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এল। ও যে পাভেল করচাগিন ছাড়া আর কেউ নয়, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা তিনজনে মিলে প্রশ্ন-বৃষ্টি করে চলল পাভেলের ওপর।

বাড়ির সবাই অনেকক্ষণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনও পর্যন্ত পানক্রাতভ গত চারমাসে যা যা ঘটেছে তার সমস্ত বিবরণ দিয়ে চলেছে পাভেলের কাছে।

'গেল শীতে ঝারকি, মিতিয়াই আর মিখাইলো খারকভে চলে গেল। কোথায় গেল জানিস নচ্ছারগুলো? কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্য কোথাও নয়! ঝারকি আর মিতিয়াই প্রাথমিক পাঠ নেবার ক্লাসে ঢুকল, এদিকে মিখাইলো সোজা প্রথম কোর্সে ঢুকল। গোড়ার দিকে আমরা ছিলাম পনের জন। আমিও মেতে উঠে দরখাস্ত করলাম। ভাবলাম, এবার একটু নিরেট মাথাটা সাফসুফ করে নেওয়া যাক। তবে পরীক্ষকমণ্ডলী আমাকে সোজা বাতিল করে দিলে!'

ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে ক্রুদ্ধভাবে সশব্দ একটা নিঃশ্বাস টেনে পানক্রাতভ বলে চলল, 'গোড়ার দিকে সব কিছুই বেশ দিব্যি চলছিল। আর সব দিক থেকেই আমি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলাম — আমার পার্টি কার্ড ছিল, কমসোমলে আমি অনেকদিন ছিলাম, আমার ব্যক্তিগত জীবন আর জন্মপরিচয়ে আমার এতোদিনে কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু রাজনীতিক জ্ঞানের ব্যাপারে এসে গাড্ডায় পড়লাম।

'পরীক্ষকমণ্ডলীর একজন কমরেডের সঙ্গে আমি একটা তর্কাতর্কির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে আমাকে এই ধরনের একটা বিদ্ঘুটে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা বলুন তো, কমরেড পানক্রাতভ, দর্শন সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?' আসলে দর্শন সম্বন্ধে আমি তো ঘোড়ার ডিম কিচ্ছু জানতাম না। কিন্তু জাহাজঘাটায় আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে কিছুদিন কাজ করেছিল — ইস্কুলের ছাত্র ছিল ছেলেটা, ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়ে এমনি দিনকতক লোক

দেখাবার জন্যে জাহাজের মাল-খালাসীর কাজ নিয়েছিল। হ্যাঁ, আমার মনে আছে — সেই ছেলেটা গ্রীসের জনকতক মাথাওয়ালা লোকের গল্প করেছিল, তারা নিজেদের কথা খুব বড় করে ভাবত, তাদের সবাই বলত দার্শনিক — ছেলেটার কাছে শুনেছিলাম। এই এদেরই একজন ছিল – এখন আর তার নামটা মনে করতে পারছি না — দিওজিনিস, না ওই ধরনের কিছু — লোকটা সারা জীবন কাটিয়েছিল একটা পিপের মধ্যে... এদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকস ছিল যে-লোকটা, সে চল্লিশ বার কালোকে শাদা আর শাদাকে কালো বলে প্রমাণ করতে পারত। যতো সব বুজরুকের দল, বুঝলি তো? ছাত্রটি যা বলেছিল, মনে পড়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবলাম, 'হুঁ, লোকটা আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাচ্ছে।' দেখলাম, পরীক্ষা যে নিচ্ছে সে আমার দিকে কৌতুক করে তাকাচ্ছে। আর, আমিও তাই ওর মুখের ওপর জবাব দিলাম, বললাম, 'দর্শন হচ্ছে স্রেফ বুজরুকি, চোখে ধুলো দেওয়া মাত্র। এবং, আমি ও জিনিসের পেছনে অনর্থক মাথা ঘামাতে চাই নে, কমরেড। পার্টি ইতিহাস যদি বলেন, হ্যাঁ, সেটা অন্য জিনিস। সে সম্বন্ধে জানবার-শোনবার সুযোগ পেলে আমি খুশি মনেই তা করব।' তারপরে ওরা উঠে-পড়ে লাগল আমার পেছনে — দর্শন সম্বন্ধে আমার এই অদ্ভুত ধারণাটা হল কোথা থেকে জানতে চাইল। তখন সেই ছাত্র ছেলেটার কথা ভেবে আরো কিছু বললাম ওদের, ও যা-যা বলেছিল আমায় তার কিছু কিছু বললাম, আর পরীক্ষা নিতে বসেছিল যারা প্রচণ্ড হাসির চোটে পেটে তো তাদের খিল ধরে গেল। হাসিটা আমাকে লক্ষ্য করেই। ভারি চটে গেলাম। 'মুখ্যু বলে ঠাউরেছে আমায়, না?' বলেই বেরিয়ে চলে এলাম।

'পরে প্রাদেশিক কমিটিতে সেই পরীক্ষকটি আমাকে পাকড়াও করে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা শোনাল। দেখা গেল, জাহাজঘাটার সেই ছাত্রটি সব ঘুলিয়ে ফেলেছিল। দর্শন জিনিসটা ভালো বলেই মনে হল, ভয়ানক দরকারী জিনিস বলতে গেলে।

'এদিকে দুবাভা আর ঝার্কি পরীক্ষায় পাশ করে গেল। মিতিয়াই তো বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো, কিন্তু ঝার্কি আমার চেয়ে বিশেষ দড়ো নয়। নিশ্চয়ই ওর মেডেলটাই ওকে পার পাইয়ে দিয়েছে। যাই হোক, আমি তো এখানেই পড়ে রইলাম। ওরা চলে যাবার পর আমাকে জাহাজঘাটায় ব্যবস্থা বিভাগের একটা কাজ দেওয়া হল -- মাল-বোঝাইয়ের ঘাটায় প্রধানের সহকারী। আগে তরুণদের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে ম্যানেজারদের ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল, এখন আমি নিজেই একজন ম্যানেজার হয়েছি। কাজের বেলায় কুঁড়ে বা হাঁদা যদি কাউকে আজকাল আমি দেখতে পাই, তাহলে তাকে আমি একই সঙ্গে ম্যানেজার হিসেবে আর কমসোমল সম্পাদক হিসেবে খুব একচোট নিই। আমার চোখে তো ধুলো দিতে পারবে না! আচ্ছা যাক, নিজের কথা তো ঢের বলা হল। আর কী খবর তোমায় দেবার আছে? আকিমের কথা তো জানোই। প্রাদেশিক কমিটিতে একমাত্র তুফতাই আছে পুরনদের মধ্যে থেকে। তার সেই পুরনো কাজই এখনও করছে। তোকারেভ সলোমেন্‌কায় পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক। তোমার সঙ্গে কমিউনে ছিল যে ওকুনেভ, সে আছে জেলা কমসোমল কমিটিতে। তালিয়া কাজ করছে রাজনীতিক শিক্ষা বিভাগে। স্‌ভেতায়েভ মেরামত কারখানায় তোমার কাজটা করছে। আমি তার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না। মাঝে মাঝে শুধু প্রাদেশিক কমিটিতে দেখা হয় -- বেশ

বুদ্ধিমান বলেই তো ওকে মনে হয়, কিন্তু একটু যেন আত্মগর্বী প্রকৃতির। আন্না বোরহার্ৎকে মনে আছে? সেও সলোমেন্‌কায় আছে — জেলা পার্টি কমিটির মহিলা বিভাগের প্রধান। বাকি সবার কথা তো বলেছি তোমায়। হ্যাঁ, পড়াশোনা করার জন্যে প্রচুর লোককে পার্টি পাঠিয়েছে, পাভলুশা। পুরনো সক্রিয় কর্মীরা সবাই আজকাল প্রাদেশিক সোভিয়েতে পার্টিস্কুলে যায়। আসছে বছর আমাকেও পাঠাবে বলে কথা দিয়েছে।'

বারোটা বেজে যাবার অনেক পরে তারা ঘুমোল। পরদিন সকালে যখন পাভেলের ঘুম ভাঙল, তখন পানক্রাতভ জাহাজঘাটায় চলে গেছে। তার বোন দুসিয়া — মজবুত গড়নের মেয়েটি, ভাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার ঘনিষ্ঠ মিল আছে — সমস্তক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে পাভেলকে চা খাওয়াল। পানক্রাতভের বাবা জাহাজের ইঞ্জিন-চালক, তিনি বাড়িতে নেই।

পাভেল বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন দুসিয়া তাকে মনে করিয়ে দিল, 'ভুলে যান না যেন. দুপুরে খাওয়ার সময় আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব!'

পার্টির প্রাদেশিক কমিটিতে সেই চিরাচরিত মুখর কর্মতৎপরতার দৃশ্য। সামনের দরজাটা অনবরত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। বারান্দা আর দপ্তর-ঘরগুলো ভীড়াক্রান্ত, পরিচালনা-বিভাগের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে টাইপ-রাইটারের চাপা শব্দ আসছে।

একটা কোনো চেনা মুখের সন্ধানে পাভেল বারান্দায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল, কিন্তু চেনা কাউকে না পেয়ে সে সরাসরি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকল। নীল রঙের

একটা রাশিয়ান শার্ট পরে সম্পাদক বসে আছে বিরাট একটা টেবিলের সামনে। পাভেল ঢুকতে একনজর তাকিয়ে নিয়ে লিখেই চলল সে।

পাভেল তার সামনে একটা চেয়ারে বসে আকিমের এই উত্তরাধিকারীটির চেহারা লক্ষ্য করতে লাগল।

লেখাটা শেষ করে রাশিয়ান শার্ট পরা সম্পাদক জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে পারি তোমার জন্যে, বলো?'

পাভেল তার বৃত্তান্ত জানিয়ে বক্তব্য শেষে বলল, 'এখন, এইটে করতে হবে, কমরেড: পার্টি সভ্যের তালিকায় আমাকে ফের ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর তারপরে রেল-কারখানায় আমাকে পাঠাতে হবে। দরকারী নির্দেশ যা দেবার তা দিয়ে দাও।'

সম্পাদক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

'আমরা অবশ্যই তোমাকে তালিকায় ঢুকিয়ে দেব, সে সম্বন্ধে বলার কিছু নেই।' একটু ইতস্তত করে বলল সম্পাদক, 'কিন্তু কারখানায় তোমাকে পাঠানোটা একটু খারাপ দেখাবে। ওখানে স্ভেতায়েভ কাজ করছে। সে প্রাদেশিক কমিটির সভ্য। তোমার কাজের জন্যে আমাদের অন্য কিছু দেখে দিতে হবে।'

চোখ দুটো কুঁচকালো করচাগিন।

'স্ভেতায়েভের কাজে হস্তক্ষেপ করার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই,' বলল সে, 'আমি আমার পেশায় ফিরে যেতে চাই — সম্পাদক হিসেবে নয়। আর তাছাড়া, আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলে তোমাকে অনুরোধ জানাতে চাই — অন্য কোনো কাজে আমাকে দেবে না।'

সম্মত হল সম্পাদক। একটুকরো কাগজে কয়েকটা কথা লিখে দিয়ে বলল, 'এটা কমরেড তুফতাকে দিও, সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

কর্মী বিভাগে গিয়ে পাভেল দেখে তুফতা তার সহকারীকে খুব একচোট ধমক দিচ্ছে। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কথা-কাটাকাটি শুনল সে। কিন্তু ব্যাপারটা বহুক্ষণ ধরে চলার আশঙ্কা দেখে সে ওদের কথার মধ্যেই বলল, 'আচ্ছা, তুফতা, তোমার তর্কটা পরে কোনো সময়ে শেষ কোরো এখন। আমার কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করে দেবার জন্যে তোমার নামে এই একটা চিরকুট।'

তুফতা কিছুক্ষণ ধরে একবার কাগজটার দিকে, একবার পাভেলের দিকে তাকাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে এল তার মাথায়।

'আরে! এ কি, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাহলে মরো নি তুমি? কি করা যায় তাহলে এখন? তালিকা থেকে তো তোমার নাম কাটা গেছে। আমি নিজেই তোমার কার্ড কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আরও কি জানো, তুমি পার্টির আদমশুমারি থেকে বাদ গেছ — কমসোমল কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশপত্রে আছে, যারা আদম-শুমারিতে তালিকাভুক্ত হয় নি, তারা বাদ যাবে। সুতরাং, তুমি আবার নতুন করে একটা দরখাস্ত দাও — এ ছাড়া তোমার আর কিছু করবার নেই।' তুফতার গলার স্বরে বোঝা গেল, আর কোনো তর্ক চলবে না।

ভুরু কুঁচকাল পাভেল।

'তোমার সেইসব পুরনো প্যাঁচ কষতে শুরু করেছ, অ্যাঁ? বয়সে তরুণ হলেও তুমি দেখছি আমাদের ওই মহাফেজখানার সবচেয়ে বুড়ো নোংরা ইঁদুরটার চেয়েও খারাপ। মানুষের মতো মানুষ হবে কবে, ভলোদ্‌কা?'

লাফিয়ে উঠল তুফতা — যেন বোলতায় কামড়েছে তাকে।

'আমার কাছে বক্তৃতা ঝাড়তে এসো না বলে দিচ্ছি। এই

বিভাগের ভার আমার ওপর। নির্দেশপত্র জারি করা হয় মানবার জন্যেই, অমান্য করার জন্যে নয়। আর, অভিযোগ করলে বলে তোমায় জবাবদিহি করতে হবে।'

শেষ কথাগুলো একটা শাসানির সুরে উচ্চারণ করে, পাভেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে এমন একটা ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে তুফতা খাম-না-খোলা চিঠিপত্রগুলো নিজের দিকে টেনে নিল।

ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল পাভেল। তারপরে, কি একটা কথা মনে পড়াতে টেবিলের কাছে ফিরে এসে তুফতার সামনে থেকে সম্পাদকের লেখা চিরকুটটা তুলে নিল। তুফতা সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করে যাচ্ছে পাভেলকে। কর্মী বিভাগের কেরানি এই তুফতার চেহারায় একই সঙ্গে কেমন যেন একটা বিশ্রী আর হাস্যকর ভাব মেশানো — বুড়ো মানুষের মতো খুঁতখুঁতে আর বদরাগী, বড়ো বড়ো কান দুটো তার যেন সব সময় উৎকর্ণ হয়ে আছে।

'বেশ,' ব্যঙ্গভরা শান্ত গলায় পাভেল বলল, 'যদি খুশি হয় তাহলে তোমার 'পরিসংখ্যানে তালগোল' পাকিয়ে ফেলার জন্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারো তুমি। কিন্তু, যারা আগে থাকতে কেতামাফিক নোটিশ না দিয়েই মরে, তাদের শাসন করবার মতো কী ব্যবস্থা তুমি করো, বলো দিকি? আর যাই হোক, চাইলে লোকে অসুখে পড়তে পারে তো, কিংবা তেমন তেমন মনে হলে মরতেও পারে যে কেউ -- কিন্তু, বাজি রেখে বলতে পারি, নির্দেশপত্রে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নেই।'

তুফতার সহকারীটি এতক্ষণে আর তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পেরে উচ্চকিত হেসে উঠল, 'ওঃ হোঃ হোঃ!'

তুফতার পেন্সিলের সীসটা ভেঙে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিল

সে পেন্সিলটা মেঝের ওপর। কিন্তু প্রতিপক্ষের কথার পাল্টা জবাব দেবার আগেই জনকতক লোক হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ওকুনেভ। পাভেলকে চিনতে পারার পর ওদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। অসংখ্য প্রশ্নের বাণ ছোঁড়া হল তার দিকে। কয়েক মিনিট বাদে আরেকদল তরুণতরুণীর সঙ্গে ঘরে ঢুকল ওলগা ইউরেনেভা। পাভেলকে আবার দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে কিন্তু আনন্দে ওলগা অনেকক্ষণ তার হাতখানা চেপে ধরে রইল।

পাভেলকে তার বৃত্তান্তটুকু ফের গোড়া থেকে সবটা বলতে হল। কমরেডদের আন্তরিক আনন্দ, তাদের মনখোলা বন্ধুত্ব আর দরদ, উষ্ণ করমর্দন আর পিঠের ওপর প্রীতিভরা চাপড় পাভেলকে সেই মুহূর্তের জন্যে তুফতার কথা ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু নিজের কথা বলার পরে সে যখন তুফতার সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছে সব বলল, তখন সমবেত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ মন্তব্যের একটা গুঞ্জন উঠল! ওলগা তুফতার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন তাকে ভস্ম করে ফেলবে। তারপরে সে ঢুকল সম্পাদকের দপ্তরঘরে।

ওকুনেভ চেঁচিয়ে বলল, 'এসো, সবাই আমরা নেঝদানভের কাছে যাই। সে ওর মগজ সাফ করে দেবে।' এই বলে পাভেলের কাঁধে হাত রাখল সে। ওলগার পিছু পিছু তরুণ বন্ধুদের পুরো দলটি এসে ঢুকল সম্পাদকের ঘরে।

'ওই তুফতাকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত, ওকে বরং বছরখানেকের জন্য পানক্রাতভের অধীনে জাহাজঘাটায় মাল-বোঝাইয়ের কাজ করতে দেওয়া হোক। ও একটা ঝানু আমলাতান্ত্রিক!' রাগে গরগর করে বলল ওলগা।

তুফতাকে কর্মী-বিভাগ থেকে খারিজ করে দেবার জন্যে

ওকুনেভ, ওলগা এবং আর সবাই দাবি তোলাতে মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হাসল প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক।

'করচাগিনকে যে ফের পার্টিতে নেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না,' ওলগাকে ভরসা দিয়ে বলল সে, 'ওকে এক্ষুণি একটা নতুন কার্ড দেওয়া হবে। তুফতা যে একটু বেশি রকম আচার-অনুষ্ঠানমাফিক চলে সে সম্বন্ধে আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত,' বলে চলল সে, 'ওইটে ওর প্রধান দোষ। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, নিজের কাজে সে তেমন মন্দ নয়। আমি যেখানেই কাজ করেছি, সর্বত্রই কমসোমল কর্মীদের সংখ্যার হিসেবনিকেশগুলো ছিল অবর্ণনীয় রকম বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কোনো হিসেবের ওপরে ভরসা করা যেত না। আমাদের এখানকার কর্মী-বিভাগে সংখ্যার হিসেবগুলো ঠিক অবস্থায় আছে। তোমরা নিজেরাই তো জানো, তুফতা প্রায়ই রাত জেগে কাজ করে। আমি তো ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখি: ওকে যে কোনো সময়েই সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওর জায়গায় যদি এমন একজন হালকা স্বভাবের সাদাসিধে ছেলেকে এনে বসানো যায় যে দলিল-হিসেবপত্র রাখার ব্যাপারে কিছুই জানে না, তাহলে আমাদের এখানে আমলাতন্ত্র বলে কিছু হয়ত থাকবে না বটে, কিন্তু কাজের শৃঙ্খলাও কিছু থাকবে না। ওকে ওর কাজেই থাকতে দেওয়া যাক। আমি ওর সঙ্গে এ বিষয়ে ভালো করে কথাবার্তা বলব। তাতে আপাতত সুবিধে হবে, না শোধরালে পরে দেখা যাবে।'

'বেশ, থাকুক ও,' সম্পাদকের সঙ্গে একমত হল ওকুনেভ, 'চল্ ক্লাবে পাভলুশা, সলোমেন্কায় যাই আমরা। আজ রাত্রে ওখানে সক্রিয় কর্মীদের একটা সভা আছে। এখনও কেউ জানে না যে তুই ফিরে এসেছিস। আমরা যখন ঘোষণা করব 'এবার

করচাগিন কিছু বলবে!' তখন সবাই কী রকম আশ্চর্য হয়ে যাবে, একবার ভাব দিকি! মারা না গিয়ে তুই বড়ো ভালো কাজ করেছিস রে পাভলুশা। মরে গেলে আর তুই শ্রমিক শ্রেণীর কি কাজে লাগতিস?' বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে ওকুনেভ তাকে বারান্দা বেয়ে নিয়ে এল।

'তুমি আসছ নাকি, ওলগা?'

'নিশ্চয় আসব!'

খাবার জন্যে পানক্রাতভদের ওখানে ফিরল না পাভেল। আসলে সে সারাদিনের মধ্যেই ওখানে ফেরে নি। 'সোভিয়েত ভবনে' তার নিজের ঘরে ওকুনেভ তাকে নিয়ে এল। যা-কিছু খাবার ছিল ওকুনেভ খাওয়াল তাকে। তারপরে একতাড়া খবরের কাগজ আর জেলা কমসোমল ব্যুরোর বিভিন্ন সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণের দুটো মোটা ফাইল তার সামনে রেখে ওকুনেভ বলল, 'এগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নে। যখন টাইফাস-রোগে সময় নষ্ট করছিলি, তখন এদিকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমি সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসব, তারপরে একসঙ্গে ক্লাবে যাওয়া যাবে। যদি ক্লান্ত হয়ে পড়িস, তাহলে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারিস।'

নানারকম দলিল আর কাগজপত্রে পকেট দুটো ঠেসে ভর্তি করে (ওকুনেভ নীতির দিক থেকে পোর্টফোলিও ব্যবহার করাটাকে ঘৃণা করে, পোর্টফোলিওটা অবহেলায় পড়ে থাকে তার বিছানার নিচে) বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল জেলা কমিটির সম্পাদক।

সন্ধ্যার দিকে যখন সে ফিরল, তখন ঘরের গোটা মেঝেটায় খবরের কাগজ ছড়ানো আর খাটের নিচ থেকে বের করে রাখা আছে একগাদা বই। কিছু বই টেবিলের ওপরে

স্তূপীকৃত। পাভেল বিছানায় বসে বন্ধুর বালিসের নিচ থেকে খুঁজে পাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির শেষ চিঠিগুলো পড়ছিল।

'আমার ঘরের একি বিশ্রী তছনছ অবস্থা করে তুলেছিস, লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার!' কৃত্রিম ক্রোধে বলল ওকুনেভ, 'এই, দাঁড়া কমরেড! এসব গোপনীয় দলিল তুই পড়ে ফেলছিস! তোর মতো গোলমালবাধানেওয়ালা ছেলেকে নিজের কুঠরিতে ঢুকতে দেবার এই ফল!'

পাভেল হাসিমুখে পাশে সরিয়ে রাখল চিঠিখানা।

'এই চিঠিখানা গোপনীয় নয়,' বলল সে, 'কিন্তু ওই যে ওটা তুমি বাতির ঘেরাটোপ হিসেবে লাগিয়েছ, ওটার গায়ে 'গোপনীয়' লেখা আছে। দেখো, চারধারে ঝলসে গেছে কাগজটা!'

ঝলসে-যাওয়া কাগজখানা নিয়ে শিরোনামাটার দিকে একনজর তাকিয়ে ওকুনেভ সক্ষোভে কপাল চাপড়াল, 'এই হতভাগা কাগজখানাকে আজ তিন দিন ধরে আমি খুঁজছি! কোথায় যে গেল কিছুতেই আর ভেবে পাই নে। এবার মনে পড়েছে: ভলিন্‌সেভ সেদিন এটা দিয়ে বাতিটার ঘেরাটোপ বানিয়েছিল— পরে আবার সে নিজেই এটা খুঁজল তন্নতন্ন করে।' দলিলখানা সযত্নে ভাঁজ করে ওকুনেভ সেটা গুঁজে রাখল তোশকের নিচে। ভরসা দিয়ে বলল, 'পরে সব ঠিকমতো গোছগাছ করে রাখব এখন। আপাতত কিছু খাওয়া যাক। তারপর ক্লাবে রওনা হয়ে যাব। আয় পাভেল, টেবিলে এসে বোস্‌।'

ওকুনেভ একটা পকেট থেকে টেনে বের করল খবরের কাগজে জড়ানো লম্বা একটা শুঁটকো রোচ্‌ মাছ আর অন্য পকেট থেকে দুটুকরো রুটি। খবরের কাগজটা টেবিলের ওপরে বিছিয়ে নিয়ে রোচটার মাথা চেপে ধরে নিপুণ হাতে সেটা টেবিলের ধারটায় আছাড় মেরে মেরে নরম করে নিল।

টেবিলের ওপরে বসে আর চোয়াল জোরসে চালাতে চালাতে হাসিঠাট্টা করতে করতে খোস্‌মেজাজী ওকুনেভ পাভেলকে সব খবরাখবর দিয়ে যেতে লাগল।

ক্লাবে এসে ওকুনেভ করচাগিনকে খিড়কিদরজাটা দিয়ে নিয়ে এল মঞ্চের পেছন দিকটায়। প্রশস্ত হল-ঘরটার এক কোণে মঞ্চের ডান দিকে পিয়ানোর কাছে একদল রেল-এলাকার কমসোমল সভ্যের সঙ্গে বসে আছে তালিয়া লাগুতিনা আর আন্না বোরহার্ৎ। ডিপোর কমসোমল সম্পাদক ভলিন্‌সেভ আন্নার সামনে বসে আছে। অগস্ট-মাসের আপেলের মতো তার মুখখানা টকটকে লাল, চুল আর চোখের ভুরুর রঙ পাকা ধানের মতো। তার অতি জীর্ণ চামড়ার কোর্তাটার রঙ এককালে কালো ছিল।

তার পাশেই, পিয়ানোর ঢাকনিটার ওপরে আলগোছে কনুইয়ের ভর রেখে বসে আছে স্‌ভেতায়েভ — তরুণ সুপুরুষ, বাদামী রঙের চুল আর যেন সুন্দর করে কুঁদে কাটা ঠোঁট দুটি। তার শার্টের গলার বোতাম খোলা।

দলটার কাছে আসতে ওকুনেভ শুনল আন্না বলছে, 'নতুন সভ্যদের ভর্তি করার ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলবার জন্যে কিছু লোক যতোদূর পারে চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে স্‌ভেতায়েভ একজন।'

একগুঁয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে পাল্টা জবাব দিল স্‌ভেতায়েভ, 'কমসোমলটা চড়ুইভাতি করার জায়গা নয়।'

ওকুনেভকে দেখতে পেয়ে তালিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকোলাইকে দেখো! ও আজ পালিশ করা সামোভারের মতো খুশিতে চকচক করছে!'

ওকুনেভকে দলটার মধ্যে টেনে এনে প্রশ্নের গোলাবর্ষণ চলল তার উপর:

'কোথায় ছিলে তুমি?'

'এসো, আরম্ভ করে দেওয়া যাক।'

ওদের চুপ করানোর জন্যে হাতটা তুলল ওকুনেভ, 'একটু দাঁড়াও, ভাইসব। তোকারেভ এলেই আমরা শুরু করে দেব।'

'ওই যে ও আসছে,' বলে উঠল আন্না।

সত্যিই এসে পড়েছে জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক। ওকুনেভ ছুটে গেল তার দিকে।

'এই যে, এসো খুড়ো। তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে একবার মঞ্চের পেছনে নিয়ে যাই চলো। স্তম্ভিত হয়ে যাবার জন্যে তৈরি হও!'

সিগারেট টানতে টানতে ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল বৃদ্ধ, 'ব্যাপার কি হে?' কিন্তু ওকুনেভ তৎক্ষণে জামার হাতটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

...ওকুনেভ সভাপতির টেবিলের ঘণ্টাটা এমন প্রচণ্ড জোরে বাজাল যে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে যারা সবচেয়ে বেশি বকবক করছিল তারা পর্যন্ত চুপ মেরে গেল।

তোকারেভের পেছনে, ফার গাছের সবুজ পাতা-ঘেরা একটা কাঠামোর মধ্যে থেকে সভার দিকে চেয়ে আছে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রচয়িতার সিংহের মতো মুখখানা। সভার কাজ শুরু করে ওকুনেভ যখন বক্তৃতা দিচ্ছে, তখন উইংস-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে ইশারার জন্যে অপেক্ষারত করচাগিনের দিক থেকে তোকারেভ তার চোখ দুটোকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

'কমরেডসব! আজকের বিষয়সূচীর সংগঠন সংক্রান্ত চলতি

প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে উপস্থিত একজন কমরেড কিছু বলতে চেয়েছে। আমি আর তোকারেভ প্রস্তাব করছি তাকে বলতে দেওয়া হোক।'

হল-ঘরে সমর্থনের গুঞ্জনধ্বনি উঠতেই ওকুনেভ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি পাভকা করচাগিনকে বলবার জন্যে আহ্বান করছি!'

হল-ঘরের এক-শো জনের মধ্যে অন্তত আশিজন করচাগিনকে চিনত। পরিচিত চেহারার এই লম্বা, ফ্যাকাশে রঙের তরুণটি যখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, তখন খুশির চিৎকার আর প্রচণ্ড হাততালির একটা ঝড় বয়ে গেল হল-ঘরের মধ্যে।

'প্রিয় কমরেডসব!'

করচাগিনের গলা অকম্পিত, কিন্তু মনের আবেগকে সে সামলাতে পারছে না।

'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের মধ্যে ফিরে এসেছি কর্মী হিসেবে আমার জায়গা নেবার জন্যে। ফিরে আসতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত। এই সভায় আমার অনেক বন্ধু রয়েছে দেখছি। জানতে পারলাম সলোমেন্‌কা কমসোমলে সভ্যের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে শতকরা তিরিশ জন বেড়েছে। ডিপোতে শ্রমিকরা যে আজকাল সিগারেট জ্বালাবার যন্ত্র তৈরি করা বন্ধ করেছে এবং যন্ত্রপাতির জঞ্জাল ঘেঁটে পুরনো ইঞ্জিন ইত্যাদি উদ্ধার করে এনে মেরামত করে তুলে ফের কাজে লাগানো হচ্ছে, তাও শুনেছি। তার মানে, আমাদের দেশে নতুন প্রাণের একটা জোয়ার আসছে, সমস্ত শক্তি সংহত করে আনছি আমরা। এই জন্যেই তো বেঁচে থাকা দরকার! এরকম সময়ে আমি কী করে মারা যেতে পারি!' আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল করচাগিনের চোখ।

হাততালি আর অভিনন্দনের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে সে মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে এল যেখানে আন্না আর তালিয়া বসে আছে। অভিনন্দন জানাবার জন্যে তাদের বাড়িয়ে ধরা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল সে। দুই বন্ধু সরে বসে নিজেদের মাঝখানে তার বসার জায়গা করে দিল। পাভেলের হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল তালিয়া।

আন্নার চোখ দুটো তখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত, চোখের পাতা কাঁপছে মৃদু মৃদু, তার চোখের দৃষ্টিতে পাভেলের প্রতি আন্তরিক সংবর্ধনার অভিব্যক্তি।

দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। তবু এই কেটে যাওয়ার মধ্যে একটুও একঘেয়েমি নেই: প্রতিদিনই নতুন কিছু ঘটে এবং রোজ সকালে সারাদিনের কাজটা ছকে নেবার সময়ে পাভেল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লক্ষ্য করে যে দিনটা বড়ো ছোট আর সে যা যা করবে বলে ভেবেছিল, তার অনেকগুলোই করে উঠতে পারে নি।

পাভেল ওকুনেভের সঙ্গেই আছে। রেলওয়ে-কারখানায় সহকারী ইলেকট্রিক্যাল ফিটার হিসেবে কাজ করছে সে।

কমসোমলে নেতৃত্বের কাজ থেকে পাভেল সাময়িকভাবে সরে থাকবে — এতে ওকুনেভকে রাজী করাবার জন্যে তাকে বহুক্ষণ তর্ক করতে হয়েছে।

'আমাদের লোকজন এতো কম যে তোকে রেলওয়ে-কারখানায় জিরিয়ে নেবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া চলে না,' আপত্তি জানিয়ে বলেছিল ওকুনেভ, 'তোর শরীর খারাপ — ও কথা বোলিস না। আমি নিজেই তো টাইফাসের পর পুরো একমাস লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি। আমাকে বোকা বোঝাতে পারবি না পাভকা। তোকে তো জানি, নিশ্চয়ই আরও গভীর কোনো

কারণ আছে। বলে ফেল্ দিকি -- ব্যাপারখানা কী।' পীড়াপীড়ি করতে লাগল ওকুনেভ।

'ঠিক বলেছ, কোলিয়া। হ্যাঁ, আছে। আমি পড়াশোনা করতে চাই।'

'তাই বলিস!' বিজয়ীর সুরে চিৎকার করে উঠল ওকুনেভ, 'আমি জানতাম কিছু একটা আছে। আমিও কি পড়াশোনা করতে চাই না ভাবিস? এটা তোর স্রেফ আত্মকেন্দ্রিকতা। ভাবছিস, আমরা চাকায় কাঁধ লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করে মরব, আর তুই ওদিকে দিব্যি গিয়ে পড়াশোনা করবি। ও সব চলবে না হে ছোকরা, কালকেই তুই সংগঠক হিসেবে কাজে লাগছিস।'

শেষ পর্যন্ত যা হোক, দীর্ঘ তর্কাতর্কির পর ওকুনেভ হার মানল।

'আচ্ছা বেশ, দু'মাসের মতো আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। আশা করি, আমার এই উদারতাটুকুর তারিফ করবি তুই! কিন্তু স্‌ভেতায়েভের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবি বলে আমার মনে হচ্ছে না — ও বেশ একটু আত্মাভিমানী।'

রেল-কারখানায় পাভেলের ফিরে আসাটা স্‌ভেতায়েভকে সচকিত করে তুলেছে। সে নিশ্চিত ছিল যে, করচাগিনের আসার ফলে নেতৃত্ব নিয়ে একটা লড়াই বাধবে। তার আত্মাভিমানে ঘা লাগল বলে সুদৃঢ় একটা প্রতিরোধ দেবার জন্যে সে তৈরি হল। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে তার ভুল হয়েছে। করচাগিন যখন জানতে পারল যে তাকে কমসোমল ব্যুরোর সভ্য করে নেবার জন্যে একটা পরিকল্পনা হয়েছে, তখন সে সরাসরি কমসোমল সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে বিষয়সূচী থেকে ওই আলোচনাটাকে বাতিল করে দেবার জন্যে তাকে রাজী করাল। ওকুনেভের

সঙ্গে তার যে বোঝাপড়া হয়েছে সেটাকে সে অজ্বহাত হিসেবে দেখাল। কারখানার কমসোমল সেলে পাভেল একটা রাজনীতিক পড়াশোনার ক্লাস নিচ্ছে বটে, কিন্তু ব্যুরোতে কাজ করতে চায় নি। তবু, নেতৃত্বের ব্যাপারে তার কোনো রকম অন্যমোদিত ভূমিকা না থাকলেও, কমসোমল সংগঠনের প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে তার প্রভাব সবাই অনুভব করছে। কমরেডস্থলভ সংযত ধরনে পাভেল একাধিকবার স্ভেতায়েভকে সাহায্য করে সমস্যা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

কারখানায় ঢুকে একদিন স্ভেতায়েভ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল কমসোমল সেলের সবাই আর ডজন তিনেক পার্টির বাইরের ছেলে মহা ব্যস্ত হয়ে জানলা ধুয়ে পরিষ্কার করছে, যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর থেকে বহু বছরের জমা ময়লা সাফ করছে, ঠেলাগাড়ি করে জঞ্জালের স্তূপ এনে ফেলছে বাইরের আঙিনায়। যন্ত্রের তেলে আঠায় আচ্ছন্ন সিমেণ্টের মেঝেটা পাভেল নিজেই প্রাণপণে ঘষছে বিরাট একটা বুরুশ দিয়ে।

'ঝাড়পোঁছের উপলক্ষ্যটা কি?' পাভেলকে জিজ্ঞেস করল স্ভেতায়েভ।

'এই নোংরার মধ্যে কাজ করে করে এলিয়ে পড়েছি আমরা। এক কুড়ি বছরের মধ্যে জায়গাটা সাফ হয় নি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা কর্মশালাটাকে দেখতে একেবারে নতুন করে তুলব,' সংক্ষেপে বলল পাভেল।

কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে স্ভেতায়েভ চলে গেল।

শুধু কর্মশালাটাকে পরিষ্কার করেই ওরা খুশি নয়, ইলেকট্রিশিয়ানরা কারখানার আঙিনাটার ব্যবস্থাও করল। বছরের পর বছর ধরে যতো রকমের সব বাতিল সরঞ্জামের আঁস্তাকুড় হিসাবে আঙিনাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। শত শত কামরার চাকা আর চাকার আল, মরচে পড়া লোহা, রেল,

স্প্রিং, আল-বাক্স ইত্যাদির পাহাড় কয়েক হাজার টন ধাতু খোলা আকাশের নিচে পড়ে মরচে ধরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারখানার ব্যবস্থাপনা বিভাগ তরুণ কর্মীদের এই কাজটা বন্ধ করে দিল।

'আরও বেশি দরকারী কাজে মন দিতে হবে আমাদের। আঙিনার ব্যবস্থাটা পরে করলেও চলবে,' বলা হল তাদের।

তখন ইলেকট্রিশিয়ানরা তাদের কর্মশালায় ঢোকার পথের বাইরে আঙিনাটার খানিকটা জায়গা ইটে বাঁধিয়ে নিয়ে দরজাটার সামনে একটা তারের মাদুর বিছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল। কিন্তু কর্মশালার ভেতরে সাফ করাটা তারা চালিয়ে গেল কাজের সময়ের পরে। প্রধান ইঞ্জিনিয়র স্ত্রিঝ্ সপ্তাহখানেক বাদে একদিন এসে দেখল, কর্মশালাটা আলোয় উজ্জ্বল। ধুলো আর তেলের পুরু স্তর উঠে গিয়ে বড়ো বড়ো লোহার গরাদে বসানো জানলাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো এসে ডিজেল-ইঞ্জিনগুলোর পালিশ করা তামার পাতের ওপরে ঠিকরে গিয়ে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ফেলছে। যন্ত্রপাতির ছাঁচে ঢালাই করা লোহার অংশগুলোর ওপরে সবুজ রঙের সদ্য লাগানো একটা পোঁচ ঝকঝক করছে। এমন কি, চাকার পাখ-ডান্ডাগুলোর গায়ে কে যেন হলদে তীর এঁকে দিয়েছে।

বিস্ময়ে বিড়্‌বিড়্ করল স্ত্রিঝ্, 'এ কী? আচ্ছা!..'

কর্মশালার এক প্রান্তে জনকতক শ্রমিক তাদের কাজ শেষ করছিল। স্ত্রিঝ্ সেদিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে মাঝপথে করচাগিনকে দেখতে পেল -- একটা রঙভর্তি টিন নিয়ে যাচ্ছে সে।

'এই যে, এক সেকেন্ড শোনো দিকি,' ইঞ্জিনিয়র থামাল তাকে, 'তোমাদের এই কাজে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে,

কিন্তু ওই রঙটা পেলে কোথায়? আমি খুব কড়া নির্দেশ দিয়েছিলাম না যে আমার অনুমতি ছাড়া কোনো রঙ খরচ করা চলবে না? এই ধরনের কাজে রঙ নষ্ট করা চলে না তো আমাদের। যেটুকু রঙ আমাদের আছে, তার সবটাই রেল-ইঞ্জিনে লাগাবার জন্যে দরকার পড়বে।'

'ফেলে দেওয়া রঙের টিনগুলোর তলা ঘষে ঘষে এই রঙটুকু উদ্ধার করা হয়েছে। দুদিন লেগেছে আমাদের এটা করতে, কিন্তু প্রায় পঁচিশ পাউন্ড রঙ আমরা এইভাবে ঘষে ঘষে তুলেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা কোনো রকম নিয়ম ভাঙি নি, কমরেড ইঞ্জিনিয়র।'

ইঞ্জিনিয়র আরেকবার ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ করল, কিন্তু দেখে মনে হল বেশ একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল সে।

'হ্যাঁ, তাহলে অবশ্য যা করছ করে যাও. তা, ব্যাপারটা তো বেশ আগ্রহ জাগাবার মতো মনে হচ্ছে... কীভাবে ব্যাপারটাকে ধরা যায়... মানে, নিজেদের উদ্যোগে একটা কর্মশালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে এই যে চেষ্টাটা, কী বলা যেতে পারে এটাকে? নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে এই সবটাই কাজের সময়ের পরে করা হয়েছে?'

ইঞ্জিনিয়রের গলার স্বরে সত্যিকারের একটা বিমূঢ়তার আভাস পেল করচাগিন।

'হ্যাঁ নিশ্চয়,' বলল সে, 'আপনি কী ভেবেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তবে...'

'অবাক হবার কিছু নেই এতে, কমরেড স্ত্রিঝ্। বলশেভিকরা নোংরা জমিয়ে রাখে — এ কথা কে বলেছে আপনাকে? দাঁড়ান না, এটা সব ঠিকঠাক করে নিই এখানটায়, তারপর দেখবেন, অবাক করে দেবার মতো আরও কিছুও আপনার জন্যে রয়েছে।'

এই বলে, যাতে ইঞ্জিনিয়রের গায়ে রঙ না লেগে যায় তার জন্যে সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল পাভেল।

রোজ সন্ধ্যায় পাভেল সাধারণ পাঠাগারে যায় আর অনেক রাত পর্যন্ত কাটায় সেখানে। তিনজন লাইব্রেরিয়ানের প্রত্যেকের সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে এবং অন্যকে কোনো-কিছুতে রাজী করাবার যতখানি ক্ষমতা তার আছে, তার সবটা ব্যবহার করে সে বইপত্র খুশিমতো ঘাঁটাঘাঁটি করার অধিকারটুকু এদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। উঁচু উঁচু বইয়ের তাকগুলোর গায়ে মইটা ঠেস দিয়ে তার ওপরে উঠে গিয়ে সে বইয়ের পর বই ধরে ধরে পাতা উল্টে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বেশির ভাগই পুরনো বই। ছোট্ট একটা বুককেস-ভর্তি আধুনিক সাহিত্য — গোটা কতক গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তিকা, মার্কসের 'পুঁজি', জ্যাক লণ্ডনের 'দি আয়রন হিল' এবং আরও গোটাকয়েক বই। পুরনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে 'স্পার্টাকাস' নামে একটা উপন্যাস পেয়ে গেল। দু'রাত্রের মধ্যে সে বইটা পড়ে ফেলল এবং শেষ করার পর বইটা তাকের ওপরে রেখে দিল ম্যাক্সিম গোর্কি'র রচনাবলীর পাশে। এইভাবে, তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আর আগ্রহজনক বইগুলোর একটা ক্রমিক মনোনয়ন চলল কিছুদিন ধরে।

লাইব্রেরিয়ানরা কোনো আপত্তি তোলে নি, তাদের কিছু এসে যায় না এতে।

রেল-কারখানায় কমসোমলের শান্ত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে হঠাৎ একটা গোলযোগ সৃষ্টি হল। উপলক্ষ্যটাকে প্রথমে নেহাত তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হয়েছিল: সেল ব্যুরোর সভ্য এবং মেরামত-বিভাগের মিস্ত্রি কোস্তিয়া ফিদিন এক টুকরো লোহার পাত ফুটো করতে গিয়ে বিদেশ থেকে আনা একটা

দামী ড্রিলিং-যন্ত্র ভেঙে ফেলেছিল -- চ্যাপ্টা নাক আর মুখে বসন্তের দাগ-ভরা অলস প্রকৃতির ছেলে এই ফিদিন। দুর্ঘটনা ঘটেছিল নিতান্তই অমনোযোগিতার ফলে, তার চেয়েও খারাপ: ঘটনাটা দেখে মনে হচ্ছিল, ফিদিনের পক্ষ থেকে প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনিষ্ট করার মনোভাবের ফলেই ব্যাপারটা ঘটেছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল সকালের দিকে। মেরামত-বিভাগের সিনিয়র ফোরম্যান খদোরভ একটা লোহার পাতের ওপরে গোটাকতক ফুটো করার জন্যে কোস্তিয়াকে বলেছিল। প্রথমে কাজটা করতে চায় নি কোস্তিয়া, কিন্তু ফোরম্যান জোর করে বলাতে সে লোহার পাতটা তুলে নিয়ে ড্রিল করতে শুরু করে। ফোরম্যান খদোরভ কাজ করিয়ে নেবার দিকে বড়ো কড়া নজর রাখে, তাই শ্রমিকদের মধ্যে সে জনপ্রিয় নয়। আগে সে ছিল মেনশেভিক, কারখানার সামাজিক জীবনে যোগ দেয় না এবং কমসোমলকে সমর্থনও করে না। কিন্তু নিজের কাজ সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে সে তার কাজ করে থাকে। খদোরভ লক্ষ্য করল -- কোস্তিয়া ড্রিলের মুখে তেল না লাগিয়েই লোহার পাতটা ফুটো করতে লেগেছে। তাড়াতাড়ি যন্ত্রটার কাছে এসে সেটাকে থামিয়ে দিল সে।

'কানা, না কি? ঠিকমতো কীভাবে ড্রিল করতে হয় তা জানো না?' চেঁচিয়ে উঠল সে কোস্তিয়ার উদ্দেশে। সে জানে, এভাবে চালালে যন্ত্রটা বেশি দিন টিঁকবে না।

কিন্তু কোস্তিয়া শুধু পাল্টা চিৎকার করে লেদটাকে আবার চালিয়ে দিল। খদোরভ অভিযোগ পেশ করার জন্যে গেল বিভাগীয় কর্তার কাছে। ইতিমধ্যে, কোস্তিয়া লেদটাকে চালু রেখেই চট করে একটা তেলের টিন জোগাড় করে আনার জন্যে গিয়েছিল, যাতে কিনা বিভাগীয় বড়ো কর্তা এসে পড়ার

আগেই সব ঠিকঠাক হয়ে থাকে। তেল নিয়ে ফিরে এসে দেখে ড্রিলটা ভেঙে গেছে। বিভাগীয় বড়ো কর্তা কোস্তিয়া ফিদিনকে বরখাস্ত করার দাবি করে রিপোর্ট পেশ করল। কিন্তু কমসোমল সভ্যদের ওপরে খদোরভের চাপ আছে — এই অজুহাতে কমসোমল সেলের ব্যুরো ফিদিনের পক্ষ সমর্থনের জন্যে উঠেপড়ে লাগল। কারখানার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ফিদিনকে বরখাস্ত করার মতটাকে চালু রাখল এবং গোটা কারখানার কমসোমল ব্যুরোর কাছে ব্যাপারটাকে উপস্থিত করা হল। লড়াই বেধে গেল।

ব্যুরোর পাঁচজন সভ্যের মধ্যে তিনজনের মত — কোস্তিয়াকে সরকারীভাবে কঠিন তিরস্কার করে অন্য কাজে বদলি করে দেওয়া হোক। এই তিনজনের মধ্যে একজন স্‌ভেতায়েভ। অন্য দুজন কোস্তিয়াকে আদৌ দোষী বলে মনে করে না।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে স্‌ভেতায়েভের দপ্তর-ঘরে ব্যুরোর সভা ডাকা হয়েছে। লাল কাপড়ে ঢাকা একটা বড়ো টেবিলের চারধারে সাজানো কতকগুলো বেঞ্চ আর টুল — ছুতোর-কর্মশালার কমসোমল কর্মীরা এগুলো বানিয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে নেতাদের ছবি আর টেবিলের পেছনের গোটা দেয়াল জুড়ে রেল-কারখানার ঝাণ্ডা টাঙানো।

স্‌ভেতায়েভ ইদানীং কমসোমলে 'সারাক্ষণের কর্মী'। পেশার দিকে থেকে সে কামার, কিন্তু তার সাংগঠনিক ক্ষমতার ফলে কমসোমলের নেতৃত্বের আসনে উঠে এসেছে। সে এখন কমসোমলের জেলা কমিটির ব্যুরোর একজন সভ্য, তাছাড়া প্রাদেশিক কমিটির সভ্য। যন্ত্রপাতি তৈরির একটা কারখানায় সে কামার ছিল, রেল-কারখানায় নতুন এসেছে। প্রথম থেকেই সে দৃঢ় হাতে ব্যবস্থাপনার লাগাম তুলে নিয়েছে। অতিরিক্ত মাত্রায় তার আত্মপ্রত্যয় — যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে

হুড়মুড় করে। গোড়া থেকেই সে অন্যান্য কমসোমল কর্মীদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে নামার প্রয়াসটাকে চেপে দিয়েছে। নিজেই সব কিছু করার দিকে তার ঝোঁক এমন কি, আপিস ঘরটা পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত ওদারকে সাজানো হয়েছে। সমস্ত কাজের তাল যখন একা সামলাতে পারে না, তখন সহযোগী কর্মীদের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতার অভিযোগ তুলে সে চেঁচামেচি করে।

এই ঘরের একমাত্র নরম গদি-আঁটা আরামকেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে সে বৈঠকের কাজ পরিচালনা করছে। আরামকেদারাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে ক্লাব-ঘর থেকে। শুধু ব্যুরোর সভ্যদের নিয়েই এই সভা। পার্টি সংগঠক খমুতোভ সবেমাত্র কিছু বলবার জন্যে অনুমতি চেয়েছে, এমন সময় দরজার গায়ে ঠকঠক আওয়াজ উঠল -- ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে বন্ধ করা ছিল দরজাটা। আলোচনায় বাধা পড়তে সুভেতায়েভ বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করল। ফের ঠকঠক আওয়াজ উঠল। কাতিয়া জেলেনোভা উঠে দরজা খুলে দিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে করচাগিন। কাতিয়া ঢুকতে দিল তাকে।

খালি একখানা চেয়ারে পাভেল বসতে যাবে, এমন সময়ে সুভেতায়েভ তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'করচাগিন, শুধু ব্যুরোর সভ্যদেব নিয়েই আমাদের আজকের এই বৈঠক।'

মুখ লাল হয়ে উঠল পাভেলের। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে সে টেবিলের দিকে তাকাল।

'তা জানি। ফিদিনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমাদের মতামত জানার আগ্রহ আছে আমার। এ সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে। ব্যাপারটা কী, আমার উপস্থিত থাকাতে কি তোমার আপত্তি আছে?'

'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার জানা উচিত এ ধরনের আলোচনা-সভায় শুধু ব্যুরোর সভ্যরাই উপস্থিত থাকতে পারে। যতো বেশি লোক থাকবে, ঠিকমতো ফয়সালা করার ব্যাপারটা ততোই কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি এসে গেছো যখন, তখন থাকতে পারো।'

করচাগিনকে এ ধরনের অপমান এর আগে কখনও সইতে হয় নি। তার কপালে একটা ভাঁজ দেখা দিল।

'এতো কেতা-কানুন কিসের জন্যে?' বিরক্ত হয়ে খমুতোভ বলে উঠতেই, করচাগিন হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল।

খমুতোভ তার বক্তব্য বলে চলল, 'আচ্ছা, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম: খদোরভ যে প্রাচীনপন্থী, সে কথা ঠিক। কিন্তু শৃঙখলা রক্ষার ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। কমসোমল কর্মীরা সবাই যদি এমনি ড্রিল ভেঙে ফেলতে শুরু করে, তাহলে কী দিয়ে কাজকর্ম চালাব আমরা? আরও বড়ো কথা, পার্টির বাইরেকার কর্মীদের সামনে আমরা খুব খারাপ উদাহরণ উপস্থিত করছি। আমার মতে, ছেলেটাকে শাসানি দেওয়া দরকার।'

তাকে শেষ করবার সুযোগ না দিয়েই, স্ভেতায়েভ আপত্তি তুলতে শুরু করল। দশ মিনিট কেটে গেল। ইতিমধ্যে পাভেল বুঝে নিয়েছে যে হাওয়াটা কোনদিকে বইছে। যখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে প্রস্তাবটাকে ভোটে দেওয়া হবে, তখন সে দাঁড়িয়ে উঠে কিছু বলতে চাইল। অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে বলার অনুমতি দিল স্ভেতায়েভ।

'কমরেডসব, আমি ফিদিনের ঘটনাটা সম্বন্ধে আমার মতামত আপনাদের জানাতে চাই,' শুরু করল পাভেল।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার গলার স্বরটা কর্কশ শোনাল।

'ফিদিনের ঘটনাটাকে একটা লক্ষণ বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে শুধু কোস্তিয়ার অপরাধটা সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয়। আমি কাল গোটাকতক তথ্য সংগ্রহ করেছি।' পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল পাভেল। 'কারখানার হাজিরা রাখে যে, তার কাছ থেকে আমি এই তথ্যগুলো পেয়েছি। বেশ মন দিয়ে শোনো: আমাদের কমসোমল সভ্যদের শতকরা তেইশ জন প্রতিদিন পাঁচ থেকে পনের মিনিট পর্যন্ত দেরিতে কাজে আসে। এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতি মাসে শতকরা সতের জন একদিন বা দুদিন করে আদৌ কাজে আসেই না। কমসোমলের বাইরেকার তরুণ কর্মীদের মধ্যে কাজ-কামাইয়ের সংখ্যা শতকরা চোদ্দ। কমরেডসব, এই হিসেবগুলো যেন চাবুকের চেয়ে কড়া চাবকানি লাগাচ্ছে আমাদের। আরও কয়েকটা তথ্য আমি লিখে এনেছি: পার্টি সভ্যদের মধ্যে শতকরা চারজন মাসে একদিন করে কামাই করে, আর শতকরা চারজন দেরি করে কাজে আসে। পার্টি সভ্য নয় যারা, সেই সব শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা এগারো জন মাসে একদিন করে কামাই করে, আর শতকরা তেরো জন নিয়মিতভাবে দেরি করে কাজে আসে। যন্ত্রপাতির ভাঙচুর যা হয়, তার মধ্যে শতকরা নব্বুইটার জন্যে দায়ী তরুণ শ্রমিকরা -- এদের মধ্যে শতকরা সাতজন নতুন কাজে ঢুকেছে। এই সব হিসেব থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, পার্টি সভ্য আর বয়স্ক শ্রমিকদের চেয়ে কমসোমলের তরুণ শ্রমিকদের কাজ অনেক খারাপ চলছে। কিন্তু অবস্থাটা সর্বত্রই একরকম নয়। ঢালাই বিভাগে কাজের হিসেব চমৎকার, ইলেকট্রিশিয়ানদের কাজও তেমন খারাপ নয়, কিন্তু বাদবাকিদের অবস্থা মোটামুটি একই। আমার মতে, কমরেড খমুতোভ শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যা বলেছে, সেটা যা বলা উচিত

তার একটা অতি সামান্য অংশ মাত্র। এই সব ঘোরপ্যাঁচগুলোকে সিধে করে দেওয়াই আমাদের আশু সমস্যা। এখানে বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলন চালাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু কাজে ঢিলেমি আর অমনোযোগিতা বন্ধ করতেই হবে আমাদের। পুরনো শ্রমিকরা খোলাখুলি স্বীকার করছে যে মালিকদের অধীনে, পুঁজিবাদীদের অধীনে, তারা এর চেয়ে ঢের ভালো কাজ করত। এখন কিন্তু আমরাই মালিক, তাই খারাপভাবে কাজ করার সপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই। কোস্তিয়া কিংবা আর কোনো শ্রমিকের দোষ ততোটা নয়। দোষটা আমাদের সবার। কারণ, দোষত্রুটিগুলোকে দূর করার জন্যে ঠিকভাবে লড়াই না চালিয়ে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোস্তিয়ার মতো শ্রমিকদের একটা না একটা ছুতো ধরে পক্ষ সমর্থন করেছি।

'সামোখিন আর বুতিলিয়াক্ এইমাত্র এখানে বলেছে যে ফিদিন আমাদেরই ছেলে, সক্রিয় কমসোমল কর্মী, ইত্যাদি; একটা ড্রিল ভেঙে ফেলেছে, তাতে আর হয়েছে কি, অন্য যে কোনো লোকের হাতেও তো ওটা ভাঙতে পারত; ও আমাদের একজন, কিন্তু ফোরম্যান তো তা নয়... কিন্তু খদোরভের সঙ্গে কেউ কখনও আলোচনা করে নি। সে সবসময় গজ্‌গজ্ করে বটে, কিন্তু তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথাটা ভুলে যেও না! আজকে আমরা তার রাজনীতিক মতামত নিয়ে আলোচনা করব না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার কাজটাকেই ঠিক বলব, কারণ, সে বাইরের লোক হয়েও রাষ্ট্রের সম্পত্তির দিকে নজর রেখেছে, আর আমরাই কিনা দামী দামী বিদেশী যন্ত্রপাতি ভাঙতে লেগে গেছি। এ ধরনের অবস্থাটাকে কি বলতে চাও তোমরা? আমি মনে করি, আমাদের এক্ষুণি প্রথম আঘাতটা হানা দরকার এবং কারখানায় কাজের এই গলতিটাকে

বন্ধ করার জন্যে এখুনি কোমর বেঁধে লাগা উচিত।

'আমি প্রস্তাব করছি‌ কাজে ঢিলেমির জন্যে এবং উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে ফিদিনকে কমসোমল থেকে বের করে দেওয়া হোক। দেয়াল-পত্রিকায় তার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত। আর, ফলাফলের কোনো ভয় না করে এই হিসাবগুলোও একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী, নির্ভর করার মতো সমর্থন আমাদের পেছনে আছে। কমসোমল সভ্যদের অধিকাংশই ভালো কর্মী। এদের মধ্যে ষাট জন বোয়ারকায় কাজ করে এসেছে এবং সেখানে তাদের প্রচন্ড রকমের একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এদের সাহায্যে আর সহযোগিতায় আমরা সমস্ত অসুবিধা দূর করতে পারি। শুধু গোটা ব্যাপারটার প্রতি আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীটা একেবারে বরাবরের মতো বদলে ফেলতে হবে।'

করচাগিন সাধারণত শান্ত আর গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এখন সে এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলল যে স্ভেতায়েভ বিস্মিত হয়ে গেল। আসল পাভেলকে সে এই প্রথম দেখল। পাভেল যে ঠিক বলেছে, সেটা উপলব্ধি করেছে সে, কিন্তু খোলাখুলি তার মতটাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সে বড়ো সাবধানী। করচাগিনের বক্তব্যটাকে স্ভেতায়েভ সাধারণভাবে সাংগঠনিক অবস্থার একটা তীব্র সমালোচনা হিসেবে আর তার নিজের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হিসেবেই ধরে নিল এবং তার প্রতিপক্ষকে তক্ষুণই জব্দ করবে বলে মনস্থ করল সে। মেনশেভিক খদোরভের পক্ষ সমর্থন করছে বলে পাভেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সে তার বক্তব্য শুরু করল।

তর্কের ঝড় বয়ে গেল তিন ঘণ্টা ধরে। সেদিন অনেক

রাত্রে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছল। তথ্যের অমোঘ যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে আর গরিষ্ঠ অংশ করচাগিনের পক্ষে চলে যাচ্ছে দেখে, সুভেতায়েভ একটা ভুল করে বসল। চূড়ান্ত ভোট নেওয়ার ঠিক আগে করচাগিনকে ঘর ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে গণতান্ত্রিক নিয়মটাকে লঙ্ঘন করল।

'আচ্ছা বেশ, আমি যাচ্ছি, যদিও তোমার ব্যবহারটা মোটেই তোমার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক নয় সুভেতায়েভ, তুমি যদি তোমার মতটাকে চালু রাখার জন্যে জেদ করতে থাকো তাহলে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—আমি কাল সাধারণ সভ্যদের সভায় সমস্ত ব্যাপারটা উপস্থিত করব এবং আমি নিশ্চয় জানি যে সেখানে তুমি অধিকাংশ ভোটে হেরে যাবে। তুমি ভুল করছ, সুভেতায়েভ। কমরেড় খমুতোভ, আমার মনে হয় সাধারণ সভার আগে পার্টি গ্রুপে তোমার এই আলোচনাটা তোলা উচিত।'

উদ্ধত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল সুভেতায়েভ, 'ভয় দেখাতে এসো না আমাকে। আমি নিজেই পার্টি গ্রুপের কাছে যেতে পারি--সেখানে তোমার সম্বন্ধেও আমার কিছু বলার আছে। নিজে যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে যারা করছে তাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসো না।'

বেরিয়ে এসে পাভেল দরজাটা বন্ধ করে দিল। গরম হয়ে ওঠা কপালটার ওপরে হাত বুলিয়ে নিয়ে ফাঁকা আপিসটা পার হয়ে বাইরে রাস্তায় এসে খোলা হাওয়ায় গভীর একটা নিঃশ্বাস নিল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রওনা হল বাতিয়েভা পাহাড়ের দিকে, যেখানে ছোট একটা বাড়িতে তোকারেভ থাকে।

এসে দেখে, বৃদ্ধ মিস্ত্রি তখন খেতে বসেছে।

তোকারেভ পাভেলকে টেবিলে এসে বসবার আমন্ত্রণ

জানিয়ে বলল, 'এসো, খবর-টবর শোনা যাক। দারিয়া, আরেক প্লেট মণ্ড এনে দাও ছেলেটার জন্যে।'

তোকারেভ যেমন ছোটখাটো রোগা মানুষটি, তার স্ত্রী দারিয়া ফর্মিনিচ্না ঠিক তেমনিই লম্বাচওড়া আর মোটাসোটা। এক প্লেট জোয়ারের মণ্ড এনে পাভেলের সামনে রেখে শাদা অ্যাপ্রনের খুঁটে ভিজে ঠোঁট দুটো মুছে নিয়ে সে সস্নেহে বলল, 'খাও, বাবা।'

তোকারেভ যখন মেরামত কারখানায় কাজ করত, তখন পাভেল তার বাড়িতে প্রায়ই এসেছে এবং এই বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে অনেক মধুর সন্ধ্যা কাটিয়েছে। কিন্তু শহরে ফিরে আসার পর এখানে সে এল এই প্রথম।

চামচ চালাতে চালাতে বৃদ্ধ মিস্ত্রিটি মন দিয়ে পাভেলের কাহিনীটা শুনে গেল, মাঝে মাঝে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করা ছাড়া কোনো মন্তব্য করল না। মণ্ডটা শেষ করে রুমাল দিয়ে গোঁফ মুছে খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল সে।

'ঠিক কথাই বলেছ তুমি,' বলল সে, 'প্রশ্নটাকে ঠিকমতো তোলার সময় হয়েছে। এই জেলায় অন্য যে কোনো উদ্যোগের চেয়ে এই কারখানায় মানুষের সংখ্যা বেশি, সুতরাং এখান থেকেই আমাদের শুরু করা উচিত। তাহলে, শেষ পর্যন্ত সুভেতায়েভের সঙ্গে তোমার ঘুষোঘুষি বেধে গেছে, অ্যাঁ? খুব খারাপ। ও ছেলেটার মেজাজ আছে বৈকি, কিন্তু তুমি তো সব ছেলেদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চলতে, তাই না? হ্যাঁ, ভালো কথা, কারখানায় তোমার কাজটা ঠিক কী?'

'আমি একটা কর্মশালায় কাজ করছি, আর সাধারণভাবে যা যা হয় তার সবকিছুর মধ্যেই আমি থাকি। আমার নিজের সেলে আমি একটা রাজনীতিক পড়াশোনার ক্লাস নিই।'

'আর, ব্যুরোর কাজ?'

ইতস্তত করল করচাগিন।

'শরীরটা সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত, আর কিছু পড়াশুনা করতে চাই বলে কিছুদিন ঠিক বিধিবদ্ধভাবে নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনোরকম অংশ নেব না বলেই ভেবে রেখেছি।'

'তাই বলো!' আপত্তির সুরে বলে উঠল তোকারেভ, 'শোনো বাপু, তোমার শরীরটা খারাপ না থাকলে একচোট ঝাড়তাম আমি তোমায়। আচ্ছা যাক, এখন কেমন বোধ করছ? একটু সেরে উঠেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তাহলে এবার মন দিয়ে কাজে লেগে যাও। আসল কাজটা এড়িয়ে গিয়ে এলোমেলো ঢুঁ-মারাটা বন্ধ করো। কোণঘেঁষে বসে থেকে কোনো লাভ হবে না। তুমি যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ, তা যে-কেউ বলবে। কাল থেকেই তোমাকে সব ঠিকমতো গুছিয়ে ফেলার জন্যে লাগতে হবে। আমি এ সম্বন্ধে ওকুনেভের সঙ্গে কথা বলব।' তোকারেভের গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল।

তাড়াতাড়ি আপত্তি জানাল পাভেল, 'না, খুড়ো, ওকে কিছু বলার দরকার নেই। আমাকে কোনো কাজ না দেবার জন্যে আমি নিজেই ওকে বলেছিলাম।'

তাচ্ছিল্যের চোটে হিসিয়ে উঠল তোকারেভ।

'তুমি বললে, অ্যাঁ, আর ও তোমাকে দিব্যি ছেড়ে দিল? তোমাদের এই কমসোমলীদের নিয়ে কী করা যায় বলো দিকি... কাগজটা একটু পড়ে শোনাবে বাবা, আগে যেমন পড়ে শোনাতে? আমার চোখের আর তেমন জোর নেই।'

কমসোমল ব্যুরোর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তটাকেই কারখানার পার্টি ব্যুরো বহাল রাখল এবং কাজে শৃঙ্খলার

গুরুত্বপূর্ণ আর আয়াসসাধ্য কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে পার্টির আর কমসোমলের দলগুলো উঠে পড়ে লাগল। ব্যুরোর সভায় সুভেতায়েভের কড়া সমালোচনা করা হল। প্রথম দিকটায় সে একটু ফোঁসফাঁস করার চেষ্টা করেছিল. কিন্তু সম্পাদক লপাখিনের কাছে কোণঠাসা হয়ে সমালোচনাটুকু মেনে নিয়ে সে নিজের ভুল কিছুটা স্বীকার করল। বয়েস হয়েছে লপাখিনের, মোমের মতো বিবর্ণ তার গায়ের রঙ দেখে বোঝা যায় যে ভেতরে ভেতরে সে যক্ষ্মায় ক্ষয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন দেয়াল-পত্রিকাগুলোয় কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে রেল-কারখানায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ল সবাই লেখাগুলো. দারুণ আলোচনা হল তাই নিয়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে তরুণ কর্মীদের সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে উপস্থিতের সংখ্যা অসাধারণ রকম বেশি দেখা গেল। দেয়াল-পত্রিকার প্রবন্ধে যে সব সমস্যার কথা তোলা হয়েছিল. সেই সভায় কেবল তাই নিয়েই আলোচনা হল।

ফিদিনকে কমসোমল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল এবং রাজনীতিক শিক্ষার ভার দিয়ে একজন নতুন সভ্যকে ব্যুরোয় নেওয়া হল-- করচাগিন।

এই নতুন অবস্থায় রেল-কারখানার কর্মীদের সামনে যে নতুন কর্তব্যগুলি দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে নেঝ্দানভ যখন একটা ছক দিয়ে গেল, তখন নিস্তব্ধতার মধ্যে হল-ঘরসুদ্ধ সবাই তা মনোযোগের সঙ্গে শুনল: সভা সাধারণত এত নিস্তব্ধ থাকে না।

সভার শেষে বাইরে এসে সুভেতায়েভ দেখে করচাগিন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

পাভেল বলল. 'চলো একসঙ্গে যাই. কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কী সম্বন্ধে?' একটু রূক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল স্ভেতায়েভ।

পাভেল তার হাত ধরে কয়েক গজ এসে থামল একটা বেঞ্চির কাছে।

'একটু বসা যাক এখানে, কেমন?' বলে সে নিজেই আগে বসে পড়ল।

স্ভেতায়েভের সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা মাঝে মাঝে লাল দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে নিভন্ত হয়ে আসছে।

'আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কী, স্ভেতায়েভ?'

দু'-এক মিনিট নিস্তব্ধতা।

'ও, এই ব্যাপার? আমি ভেবেছিলাম তুমি কোনো কাজের কথা বলতে চাও,' বিস্ময়ের ভান করে বলল স্ভেতায়েভ, কিন্তু তার গলাটা কেঁপে গেল।

পাভেল তার হাঁটুটা চেপে ধরল দৃঢ় হাতে।

'উঁচকপালে ভাবটা ছাড়ো, দিম্কা। ও ধরনের কথা কূটনীতিকদের মুখেই শোভা পায়। এইটে শুধু বলো দিকি: তুমি আমাকে এতো অপছন্দ করো কেন?'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল স্ভেতায়েভ।

'কী বলতে চাও তুমি? তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ কি থাকতে পারে? আমি নিজেই তো তোমাকে কাজ করার জন্যে বলেছিলাম, না কি? তুমি রাজী হলে না, আর এখন আমি তোমাকে কাজে ঢুকতে দিই নি বলে আমার ওপরেই দোষ চাপাচ্ছ?'

কিন্তু, তার এই কথার মধ্যে কোনো অকপটতা ছিল না। তাই স্ভেতায়েভের হাঁটুর ওপরে হাতখানা রেখেই পাভেল আবেগের সঙ্গে বলল, 'তুমি যদি না বলো তাহলে আমি বলছি কথাটা: তুমি ভাবছ আমি তোমার পথের কাঁটা, তুমি

ভাবছ আমি তোমার পদ কেড়ে নিতে চাই। তা যদি না ভাবতে, তাহলে কোস্তিয়া ফিদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ঝগড়া বাধত না। নিজেদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কের ফলে আমাদের সমস্ত কাজকর্মে ক্ষতি হয়। এটা যদি শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ব্যাপার হত, তাহলে কিছুমাত্র এসে যেত না—আমার সম্বন্ধে তুমি কী ভাবছ না-ভাবছ, তা আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু কাল থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এভাবে আমরা কাজ চালাব কী করে? শোনো: আমাদের মধ্যে কোনোরকম মনোমালিন্য থাকলে চলবে না। আমরা দু'জনেই মেহনতী মানুষ। যে আদর্শের জন্যে আমরা দু'জনেই লড়ছি, সেই আদর্শই যদি তোমার কাছে আর সব কিছুর চেয়ে বড়ো হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে, আর কাল থেকেই তাহলে আমরা বন্ধু হিসেবে কাজে লেগে যেতে পারব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই সব আজেবাজে ধারণা তোমার মাথা থেকে না তাড়াচ্ছ এবং প্যাঁচ কষা ছেড়ে সোজা পথে না আসছ, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে যতোবার অসুবিধা দেখা দেবে ততোবারই আমরা দু'জন কামড়াকামড়ি করব। এখনও তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্ব বজায় থাকতে থাকতে এই আমি আমার হাত বাড়িয়ে ধরছি তোমার দিকে, ধরো।'

সুভেতায়েভের কড়া-পড়া আঙুলগুলো যখন তার হাতখানা চেপে ধরল, তখন গভীর একটা পরিতৃপ্তির অনুভূতিতে ভরে উঠল পাভেলের সমস্ত মন।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। সেদিনকার মতো পার্টির জেলা কমিটিতে কাজকর্ম শেষ হয়ে আসছে। দপ্তর-ঘরগুলো নিস্তব্ধ। কিন্তু তোকারেভ তখনও তার ডেস্কের সামনে বসে আছে।

চেয়ারে বসে সে সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলো পড়ছে, এমন সময়ে দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ হল।

'ভেতরে এসো!'

ভেতরে ঢুকে করচাগিন সম্পাদকের ডেস্কে রাখল ভর্তি করা দুটো প্রশ্নমালার ফরম।

'এটা কি?'

'দায়িত্বহীনতাকে চুকিয়ে দেবার জন্যে এটা করা হয়েছে, খুড়ো। মনে হয় এটা করার সময়ও হয়েছে। তোমারও যদি তাই মনে হয়, তাহলে তোমার সমর্থন পেলে আমি কৃতজ্ঞ হব।'

শিরোনামাটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে এই তরুণটির দিকে তাকাল তোকারেভ। তারপর কলমটা তুলে নিল সে। যেখানে লেখা রয়েছে –'রাশিয়ার কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে পাভেল আন্দ্রেয়েভিচ করচাগিনকে যে সব কমরেড সুপারিশ করছেন, তাঁরা পার্টিতে কতোদিন ধরে আছেন' সেইখানটায় তোকারেভ দৃঢ় হাতে '১৯০৩' লিখে নিজের নাম সই করে দিল।

'এই নাও, বাবা। আমি জানি, তুমি কোনোদিন আমার এই বুড়ো পাকাচুলওয়ালা মাথার ওপরে লজ্জার বোঝা চাপাবে না।'

গুমটে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। সবার মনেই একটি চিন্তা সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করছে: যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সলোমেন্‌কার বাদামগাছের শীতল ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

স্‌ভেতায়েভ অনুনয় জানাল, 'শেষ করে দাও, পাভকা। এই গরম আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছি না।'

দারুণ ঘাম ঝরছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। কাতিউশা এবং অন্য সবাই স্ভেতায়েভকে সমর্থন করল। পাভেল বইটা বন্ধ করে দিতেই পড়াশোনার বৈঠকটা ভেঙে গেল।

একসঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে লটকানো পুরনো ধাঁচের এরিকসন-টেলিফোনের বাক্সটার মধ্যে থেকে ঝনঝন আওয়াজ উঠল। ঘরের মধ্যে চেঁচামেচির রোল ছাপিয়ে উঁচু পর্দায় গলা চড়িয়ে জবাব দিতে হল স্ভেতায়েভকে, যাতে অপর প্রান্তে তার গলা শোনা যায়।

রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে করচাগিনের দিকে ফিরল সে।

'পোলিশ দূতস্থানের দুটো কূটনীতিক রেল-কামরা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। কামরা দুটোর আলো নিভে গেছে—তারের কী একটা গোলমাল হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে যাবে। যন্ত্রপাতি জোগাড় করে নিয়ে ওখানে চট করে চলে যাও, পাভেল। জরুরী ব্যাপার।'

এক-নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রে ঘুমোবার কামরা দুটো। চকচকে পেতলের হাতলে আর জানলার কাচে ঝকঝক করছে গাড়িখানা। চওড়া জানলাওয়ালা বসবার কামরাটা আলোয় উজ্জ্বল। কিন্তু পাশের কামরাটা অন্ধকার।

এই জাঁকজমকের কামরাটায় ঢোকার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাভেল হাতলটা চেপে ধরতেই স্টেশনের দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মূর্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

'কোথায় যাচ্ছেন, মশাই?'

গলার স্বরটা চেনা। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেল তাকাল চামড়ার কোর্তা-পরা চওড়া কানাচওয়ালা টুপি মাথায় সরু আঁকশির মতো নাকওয়ালা মানুষটার দিকে। তার চোখে সন্দেহভরা দৃষ্টি।

লোকটি আরতিউখিন। পাভেলকে সে চিনতে পারে নি প্রথমে। কিন্তু এবার তার হাতখানা নেমে গেল পাভেলের কাঁধ থেকে আর তার মুখের ওপর থেকে গাম্ভীর্যটুকু কেটে গেল---যদিও যন্ত্রপাতির বাক্সটার ওপরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। তার গলার স্বরে কেতাদুরস্ত ভাবটা আরেকটু কমিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল সে, 'যাচ্ছ কোথায়?'

সংক্ষেপে তাকে তার উদ্দেশ্য জানাল পাভেল। গাড়িটার পেছন দিক থেকে আরেকটা মূর্তি এগিয়ে এল।

'আচ্ছা, এক সেকেন্ড। আমি এদের কন্ডাক্টরকে ডেকে আনছি।'

কন্ডাক্টরের পেছনে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পাভেল দেখে, সেলুন-কামরাটায় দামী দামী ভ্রাম্যমাণের পোশাক-পরা জনকতক লোক বসে আছে। রেশমের কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিলের কাছে একজন মেয়ে বসে আছে দরজার দিকে পেছন ফিরে। পাভেল যখন ঢুকল, তখন সে সামনে দাঁড়ানো একজন লম্বা অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল। ইলেকট্রিশিয়ানটি আসতেই তারা কথা বন্ধ করল।

তারের যোগাযোগটা দ্রুত পরীক্ষা করে নিল করচাগিন - এখানকার শেষ বাতিটা থেকে কামরার বারান্দাটার দিকে চলে গেছে তারটা। এখানে সেটা ঠিক আছে দেখে নিয়ে কোথায় গন্ডগোলটা হয়েছে খুঁজে বের করার জন্যে বেরিয়ে এল সে। তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে ফিরছে গাঁট্টাগোট্টা আর ষাঁড়ের মতো ঘাড়ওয়ালা কন্ডাক্টরটি। পোলিশ ঈগল-আঁকা বড়ো বড়ো পেতলের বোতাম লাগানো উর্দি গায়ে লোকটাকে খুব জাঁকালো দেখাচ্ছে।

'পরের কামরাটা দেখা যাক, এখানে তো সব ঠিক আছে। গোলমালটা নিশ্চয়ই বেধেছে ওই কামরাটায়।'

দরজার চাবিটা ঘোরাল কণ্ডাক্টর এবং দুজনে তারা বেরিয়ে এল কামরার অন্ধকার বারান্দাটায়। তারের ওপর দিয়ে বিজলি বাতির আলোটা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে পাভেল অল্পক্ষণের মধ্যেই তারটা যেখানে পুড়ে গেছে সেই জায়গাটা পেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কামরার বারান্দার প্রথম আলোটা জ্বলে উঠে জায়গাটাকে ভরে তুলল অনতিউজ্জ্বল আলোয়।

করচাগিন তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, 'কামরার ভেতরকার বালবগুলো বদলাতে হবে। পুড়ে গেছে ওগুলো।'

'তাহলে আমাকে একবার ওই মহিলাটিকে ডাকতে হবে, ওঁর কাছে চাবি আছে।' ইলেকট্রিশিয়ানটিকে এখানে একা রেখে যাবার ইচ্ছে না থাকায় সে তাকে সঙ্গে আসতে বলল।

মেয়েটি প্রথমে ঢুকল কামরায়, তারপরে পাভেল। ঢোকার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল কণ্ডাক্টর। ভ্রমণের উপযোগী চটকদার চামড়ার ব্যাগ, বসবার জায়গাটার ওপরে অযত্নে পড়ে থাকা সিল্কের জোব্বা, সুগন্ধির শিশি আর জানলার পাশে টেবিলের ওপরে রাখা ছোট্ট পাউডারের কৌটা লক্ষ্য করল পাভেল। গদি-আঁটা আসনের এক কোণে বসল মেয়েটি, শণ রঙের চুলগুলো নাড়াচাড়া করে নিয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল সে।

কণ্ডাক্টরটি অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলল, 'পানী, যদি আমাকে দু-এক মুহূর্তের জন্যে যেতে অনুমতি দেন। মেজর একটু ঠাণ্ডা বিয়ার চেয়েছেন।' ষাঁড়ের মতো ঘাড়টা নোয়াবার সময় বেশ একটু কষ্ট করতে হল তাকে।

কৃত্রিম সুরেলা গলায় বলল মেয়েটি, 'তুমি যেতে পারো।' কথাবার্তা হল পোলিশ ভাষায়।

কামরার বারান্দাটা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে

মেয়েটার কাঁধে। প্যারিসের সবচেয়ে ভালো দর্জিদের হাতে বানানো সূক্ষ্ম রেশমী গাউনটায় তার কাঁধ আর হাত দুটো ঢাকা পড়ে নি। কমনীয় তার কর্ণপুট দুটিতে হীরের দুটি বিন্দু জ্বলে জ্বলে উঠছে। করচাগিন শুধু তার গজদন্তের মতো শুভ্র একটা কাঁধ আর বাহু দেখতে পাচ্ছিল। মুখটা অন্ধকারে। দ্রুত স্ক্রু-ড্রাইভারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাভেল কামরার ছাদের বালবটা বদলে দিতেই এক মুহূর্তের মধ্যে ভেতরের আলোগুলো জ্বলে উঠল। এখন তাকে শুধু একবার অন্য বালবটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে—ওটা আটকানো রয়েছে সোফার ওপরে যেখানে মেয়েটি বসে রয়েছে তারই মাথায়।

মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল করচাগিন, 'এই বালবটা একবার আমার পরীক্ষা করা দরকার।'

খাঁটি রাশিয়ান ভাষায় উত্তর দিল মহিলাটি, 'ও, হ্যাঁ, আমি পথ আটকে রেখেছি।' হালকাভাবে উঠে পড়ে সে করচাগিনের পাশে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। এবারে পাভেল তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পেল। চোখের বাঁকা ভুরু আর অবজ্ঞায় ভরা ঠোঁট দুটো পাভেলের পরিচিত। কোনো সন্দেহ নেই: নেলি লেশ্চিনস্কি, সেই উকিলের মেয়েটা। পাভেলের বিস্ময়ভরা চাউনিটা নেলি লক্ষ্য না করে পারল না। কিন্তু পাভেল তাকে চিনতে পারলেও, এই ইলেক্ট্রিশিয়ান ছেলেটিই যে তার সেই এককালের ডানপিটে প্রতিবেশী, সেটা নেলির পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়—কারণ, পাভেলের চেহারা এই চার বছরে অনেকখানি বদলে গেছে।

পাভেলের বিস্ময়ভরা চাউনি দেখে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে নেলি কামরাটার দরজার কাছে এগিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ে অধৈর্যের সঙ্গে তার পেটেণ্ট-চামড়ার জুতোর গোড়ালিটা ঠুকতে লাগল। দ্বিতীয় বালবটার দিকে মনোযোগ দিল

পাভেল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে নিয়ে সেটাকে আলোর দিকে তুলে ধরে পোলিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করে বসল, 'ভিক্তরও এই গাড়িতে আছে না কি?'

মাথাটা না ঘুরিয়েই প্রশ্ন করেছিল পাভেল। নেলির মুখটা দেখতে পায় নি সে। কিন্তু প্রশ্নটা করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত যে সে নিরুত্তর হয়ে রইল, তার থেকেই নেলির বিমূঢ়তাটুকু বোঝা গেল।

'কেন, আপনি তাকে চেনেন না কি?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনি। আমরা পড়শী ছিলাম যে।' মুখটা ফিরিয়ে পাভেল তাকাল তার দিকে।

'আপনি... আপনি পাভেল, আমাদের ওই...' হতবুদ্ধি হয়ে থেমে গেল নেলি।

'...বাঁধনীর ছেলে।' তাকে খেই ধরিয়ে দিল করচাগিন।

'কিন্তু কতো বড়ো হয়ে গেছেন আপনি! আমি আপনাকে যখন দেখেছিলাম, তখন তো আপনি ছিলেন একটা দুর্দান্ত ছোঁড়া!'

অসংকোচে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করল নেলি।

'ভিক্তরের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার যতদূর মনে পড়ছে---তার সঙ্গে আপনার ঠিক বন্ধুত্ব ছিল বলা যায় না,' সুরেলা গলায় বলল নেলি। পাভেলের সঙ্গে তার এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবার ফলে এই একঘেয়েমির মধ্যে কিছুক্ষণের মতো একটু মুখরোচক বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে বলে আশা জেগেছে নেলির মনে।

স্ক্রুটা দ্রুত বসে গেল দেয়ালের গায়ে।

'ভিক্তরের একটা দেনা আছে আমার কাছে, এখনও সেটা শোধ দেয় নি সে। দেখা হলে তাকে বলে দেবেন, হিসেবটা চুকিয়ে নেবার আশা আমি ছাড়ি নি।'

'আপনার পাওনাটা কতো বলুন তো, আমিই না হয় ভিক্তরের হয়ে মিটিয়ে দিচ্ছি।'

করচাগিন যে কোন্ দেনার কথা বলছে, তা নেলি খুব ভালো করেই জানে। পেৎলিউরা-শান্ত্রীদের নিয়ে ঘটনাটা নেলি জানত। কিন্তু এই 'ইতর'টাকে নিয়ে মজা করার লোভ সে সামলাতে পারল না।

কোনো উত্তর দিল না করচাগিন।

'আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে নাকি লুটপাট হয়ে গেছে, সব ভেঙেচুরে পড়েছে, সত্যি নাকি? কুঞ্জটা আর ফুলের কেয়ারিগুলো সব তছনছ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল নেলি বিষণ্ণ গলায়।

'ও বাড়িটা এখন আর আপনাদের নয়, আমাদের। আর, আমাদের নিজেদের জিনিস আমরা নিজেরা নষ্ট করব— এমন সম্ভাবনা নেই।'

বিদ্রূপের সঙ্গে অল্প একটু হেসে উঠল নেলি।

'হ্যাঁ, শিক্ষাটা তো বেশ ভালোই হয়েছে দেখছি! তা প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, এই গাড়িটা পোলিশ মিশনের, আমি হচ্ছি এখানকার কর্ত্রী আর আপনি চাকর মাত্র—ঠিক যেমনটি আপনি বরাবরই ছিলেন। দেখতেই পাচ্ছেন, আপনি আলোটা ঠিক করে দেবার জন্যে খাটছেন, যাতে কিনা আমি আরাম করে ওই সোফাটায় শুয়ে বই পড়তে পারি। আপনার মা আমাদের কাপড়চোপড় কাচত আর আপনি জল বয়ে দিতেন। ঠিক সেই একই অবস্থার মধ্যে আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।'

বিদ্বেষ-ভরা একটা জয়ের সুর ধ্বনিত হল তার গলায়। ছুরিটা দিয়ে তারের ওপরকার রবারের আস্তরণটা চেঁচে তুলে পাভেল মেয়েটির দিকে সুস্পষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল।

'আপনার জন্যে হলে আমি একটা মরচে ধরা পেরেকও ঠুকতে যেতাম না। কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়ারা কূটনীতিক বলে একটা জিনিস উদ্ভাবন করেছে, তাই আমরাও খেলাটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা তাদের মাথা কেটে ফেলি না—এমন কি, আমরা বাস্তবিক পক্ষে তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করে থাকি, যেটা আপনাদের কাছ থেকে মোটেই আশা করা যায় না।'

নেলির গাল দুটো লাল হয়ে উঠল।

'ওয়ারস যদি দখল করে নিতে পারতেন, তাহলে আমাকে নিয়ে কী করতেন আপনি? বোধহয় থেংলে কিমা বানিয়ে ফেলতেন, কিংবা হয়তো আমাকে আপনার উপপত্নী হিসেবে রাখতেন?'

দরজাটায় কমনীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে নেলি। তার কোমল টিকলো নাক মৃদু মৃদু কাঁপছে—বোঝা যায়, ও নাকের সঙ্গে কোকেন-এর পরিচয় আছে। সোফার ওপরে আলোটা জ্বলে উঠল। খাড়া হয়ে দাঁড়াল পাভেল।

'আপনাকে? আপনার মতো লোকদের মারার জন্যে মাথা ঘামাতে যাবে কে! আমাদের কিছু করতে হবে না, কোকেন টানার ফলেই আপনি মারা পড়বেন। আর, উপপত্নী হিসেবেও আপনি কারও পক্ষে গ্রহণযোগ্য নন।'

যন্ত্রপাতির বাক্সটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল সে। তাকে যেতে দেবার জন্যে সরে দাঁড়াল নেলি। পাভেল যখন কামরার বারান্দাটার শেষে এসে পড়েছে, তখন পেছন দিকে তীব্রস্বরে নেলিকে গালাগাল দিয়ে উঠতে শুনল সে: 'হতভাগা বলশেভিক!'

পরের দিন বিকেলে লাইব্রেরিতে যাবার পথে পাভেলের সঙ্গে কাতিউশা জেলেনোভার দেখা। পাভেলের জামার হাতাটা

তার ছোট্ট হাতে চেপে ধরে কাতিউশা হাসতে হাসতে পাভেলের পথ রুখে দাঁড়াল।

'কোথায় ছুটে চলেছে, রাজনীতিক আর জ্ঞানবুড়ো?'

'লাইব্রেরিতে যাচ্ছি, খুড়ী, সরো, যেতে দাও,' তারই মতো কৌতুকভরা গলায় জবাব দিল পাভেল। মৃদুভাবে তার কাঁধ চেপে ধরে তাকে পাশে সরিয়ে দিল পাভেল। ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাতিউশা তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকল।

'শোনো, পাভলুশা! দিনরাত তোমার পড়াশোনা করা চলবে না। বলছিলাম কি--আজ রাত্রে চলো একটা পার্টিতে যাই। জিনা গ্লাদিশ-এর ওখানে আসবে সবাই। মেয়েরা প্রায়ই আমাকে বলে তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু তুমি তো আজকাল রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই ভাবে না দেখি। মাঝে মাঝে একটু আমোদ-টামোদ কি একেবারেই করতে চাও না? এক আধবার পড়াশোনা বাদ দেওয়াটা ভালোই হবে তোমার পক্ষে।' পাভেলকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল কাতিউশা।

'কী ধরনের পার্টি? কী করব সেখানে গিয়ে?'

'কী করব সেখানে গিয়ে!' টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল কাতিউশা। 'প্রার্থনার শ্লোক উচ্চারণ করব না নিশ্চয়ই, একটু মজা জমিয়ে সময় কাটাব আর কি! তুমি না অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পারো? আমি একবারও তোমার বাজনা শুনি নি! আজ সন্ধ্যায় এসে আমাদের বাজিয়ে শোনাও, কেমন? আমার জন্যেই না হয় বাজালে একবার। জিনার মামার একটা অ্যাকর্ডিয়ন আছে, কিন্তু একদম বাজাতে পারে না সে। মেয়েদের ভারি আগ্রহ তোমার সম্বন্ধে, কিন্তু তুমি তো বইয়ের পোকা একটা। কমসোমল সভ্যদের আমোদ-আহ্লাদ করতে

নেই—এ কথা কে বলেছে তোমায়? এসো বলছি, তা নইলে তোমাকে রাজী করাতে গিয়ে এমন রাগ ধরে যাবে যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে একমাস কথা বলব না তোমার সঙ্গে।'

বাড়িঘর রঙ করে কাতিয়া—ভালো কমরেড সে, প্রথম সারির কমসোমল কর্মী। পাভেল তার মনে আঘাত দিতে চায় না বলেই রাজী হয়ে গেল, যদিও ওই ধরনের আসরে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে সে, বেজায়গায় এসে পড়ছে বলে মনে হয় তার।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার গ্লাদিশ-এর বাড়িতে একদল তরুণ-তরুণী ভিড় জমিয়ে তুলে গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। বড়োরা আরেকটা ঘরে চলে এসেছে। ছোট বাগানটার সামনে বারান্দাওয়ালা বড়ো ঘরের মধ্যে গোটা পনের ছেলেমেয়ে। বাগানের পথ বেয়ে কাতিউশা যখন পাভেলকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে উঠল, তখন 'পায়রাদের খাওয়ানো' নামে একটা খেলা চলছিল। বারান্দার মাঝখানে পিঠাপিঠি দুটো চেয়ার বসানো। গৃহকর্ত্রী খেলাটা পরিচালনা করছে--তার ডাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে চেয়ার দুটোয় বসেছে পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে। সে যেই বলছে: 'এবার পায়রাদের খাওয়াও!' অমনি ছেলেমেয়ে দুটি পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে সবাইকার সামনে পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে। এর পরে ওরা খেলা শুরু করল— 'আঙটি' আর 'ডাকপেয়াদা'—দুটোই চুমো-খাওয়ার খেলা, যদিও এই শেষের খেলাটায় খেলোয়াড়রা আলোয় উজ্জ্বল বারান্দায় প্রকাশ্যে চুমো-খাওয়াটা এড়িয়ে গিয়ে আলো-নেভানো ঘরের মধ্যে ঢুকে চুমো খাচ্ছে। যারা এই সব খেলায় বিশেষ উৎসাহী নয়, তাদের জন্যে এক কোণে ছোট্ট একটা গোল টেবিলের ওপর রাখা আছে নানারকম ফুলের ছবি

আঁকা এক প্যাকেট তাস--এই তাসের খেলাটাকে বলে 'ফুল-পিরীতি'। পাভেলের পাশ থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এল -বছর ষোলো বয়েস, চোখের রঙ হাল্কা নীল, নাম বলে জানাল নিজের পরিচয়—মুরা,—চটুল চোখে পাভেলের দিকে একনজর তাকিয়ে তার হাতে একটা তাস তুলে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'ভায়োলেট ফুল।' কয়েক বছর আগে পাভেল এই ধরনের পার্টিতে উপস্থিত থেকেছে এবং এসব চপলতায় সরাসরি যোগ না দিলেও সে এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু এখন সে মফঃস্বল শহরের এই সব পেটি বুর্জোয়াসুলভ হালচাল থেকে নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাই আজকের এই পার্টিটা তার কাছে ন্যক্কারজনক আর নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপাতত তার হাতে ধরা রয়েছে ওই 'ফুল-পিরীতি'র তাসখানা।

ভায়োলেট-ফুলের উল্টো দিকে তাসখানার গায়ে লেখা আছে: 'তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে।'

মেয়েটির দিকে তাকাল পাভেল। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে সে পাল্টা তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে।

'কেন ?'

কেমন যেন ভোঁতা শোনাল পাভেলের প্রশ্নটা। কিন্তু খেলার নিয়ম অনুসারে মুরার উত্তরও তৈরি আছে।

'গোলাপ-ফুল,' বলে সে তার হাতে আরেকটা তাস তুলে দিল।

গোলাপ-ফুল আঁকা তাসটার গায়ে লেখা আছে: 'তুমিই আমার আদর্শ।'

পাভেল মেয়েটির দিকে ফিরে গলার স্বরটাকে নরম

শোনাবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, 'এই সব বাজে ব্যাপারের মধ্যে কেন যাও?'

মুরা এমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল যে সে কি বলবে ভেবে পেল না।

অভিমানের ভঙ্গীতে ঠোঁট ফুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'বিরক্ত হলে নাকি?'

প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিল না পাভেল। কিন্তু এই মেয়েটির সম্বন্ধে আরও জানার আগ্রহ জেগেছে তার মনে। কতকগুলো প্রশ্ন করল সে মেয়েটিকে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই উত্তর দিল মুরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাভেল জেনে ফেলেছে যে সে মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করছে, তার বাবা মেরামত কারখানায় কাজ করে, পাভেলকে সে অনেকদিন ধরে জানে এবং তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেও ছিল তার।

'তোমার পদবীটা কি?' জিজ্ঞেস করল পাভেল।

'ভলিনৎসেভা।'

'তোমার ভাই তো ডিপোর একটি বিভাগীয় কমসোমল সেলের সম্পাদক, না?'

'হ্যাঁ।'

পাভেল স্পষ্টই দেখতে পেল — এই জেলার কমসোমল কর্মীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কর্মঠ, ভলিনৎসেভ তাদের একজন হওয়া সত্ত্বেও, নিজের বোনটিকে একটি অজ্ঞ আর নিতান্ত হালকা স্বভাবের মেয়ে হিসেবে সে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে। গত এক বছর ধরে মুরা তার বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে এই ধরনের পার্টিতে এসে অসংখ্যবার এরকম চুমো-খাওয়া-খেলায় যোগ দিয়েছে। মুরা জানাল, সে তার ভাইয়ের ওখানে কয়েকবার পাভেলকে দেখেছে।

মুরা বুঝতে পেরেছে যে পাভেল তার হালচালকে ঠিক

সমর্থন করছে না। তাই তার যখন খেলায় ডাক পড়ল, তখন পাভেল করচাগিনের মুখে উপহাসের হাসিটা লক্ষ্য করে মুরা 'পায়রাদের খাওয়ানো'র জন্যে আসতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল।

কয়েক মিনিট বসে বসে কথাবার্তা বলল ওরা দু'জনে, মুরা তার নিজের সম্বন্ধে আরও খবরাখবর জানাল। তারপর জেলেনোভা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'অ্যাকর্ডিয়নটা এনে দেব?' জিজ্ঞেস করেই মুরার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে সে বলল, 'তোমরা দু'জনে খাতির জমিয়ে ফেলেছ দেখছি?'

পাভেল নিজের পাশে কাতিউশাকে বসিয়ে চারদিকে যে গোলমাল আর হাসাহাসির রোল উঠেছে তারই অজুহাতে বলল, 'আর বাজাব না, থাক। আমি আর মুরা চলি।'

'ওঃ হো! তুমি তাহলে পটেছ ওর সঙ্গে?' ঠাট্টা করল জেলেনোভা।

'হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা কাতিউশা, এখানে আমরা ছাড়া আর কোনো কমসোমল সভ্য আছে কিনা বলো তো? নাকি, শুধু আমরাই এই 'পায়রা খাওয়ানো' ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি?'

'এ সব বাজে ব্যাপারে আর না,' বলল কাতিউশা পাভেলকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে, 'এবার নাচব আমরা।'

উঠে দাঁড়াল পাভেল।

'আচ্ছা বেশ, তাহলে নাচো তোমরা। মুরা আর আমি চললাম কিন্তু।'

আন্না বোরহার্ৎ একদিন বিকেলের দিকে ওকুনেভের ঘরে এসে দেখে পাভেল সেখানে একা রয়েছে।

'খুব ব্যস্ত আছ নাকি, পাভেল? শহর সোভিয়েতের সভায়

চলো না? আমি ঠিক একা যেতে চাচ্ছি না, বিশেষ করে ফিরতে রাত হবে বলেই।'

পাভেল তৎক্ষণাৎ রাজী হল। বিছানার ওপরে পেরেকে ঝোলানো তার মোজার-পিস্তল নিতে গিয়ে, বড়ো ভারি হবে বলে পাভেল সেটা না নিতেই মনস্থ করল। তার বদলে দেরাজটার ভেতর থেকে ওকুনেভের পিস্তলটা বের করে পকেটে গুঁজে নিল। ওকুনেভের জন্যে একটা চিরকুট লিখে রেখে চাবিটা একটা আগে স্থির করা জায়গায় রেখে দিল।

থিয়েটার বাড়িতে যেখানে সভা বসেছে, সেখানে এসে পানক্রাতভ আর ওলগা ইউরেনেভার সঙ্গে ওদের দেখা হল। হলের মধ্যে সবাই একসঙ্গে বসল, সভার কাজের বিরতির সময়ে দল বেঁধে তারা ঘুরে বেড়াল সামনের ময়দানে। আন্না যা ভেবেছিল তাই — সভা শেষ হল অনেক রাত্রিতে।

ওলগা জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রিটা বরং আমার এখানেই থেকে যাও? অনেক রাত হয়ে গেছে, যেতেও তো হবে বহু দূর।'

কিন্তু আন্না রাজী হল না। 'পাভেল আমাকে বাড়ি পেৌঁছে দেবে বলেছে,' বলল সে।

পানক্রাতভ আর ওলগা বড়ো রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল, আর ওরা দুজনে চলল সলোমেন্কার চড়াই রাস্তাটা ধরে।

অন্ধকার, গুমোট রাত্রি। সভায় যোগ দিতে এসেছিল যারা, তারা যখন বিভিন্ন রাস্তা বেয়ে বাড়িমুখো রওনা হল, তখন গোটা শহরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের কথাবার্তা আর পায়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। শহরের কেন্দ্র থেকে দূরের পথে আন্না আর পাভেল দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে। বাজারের জায়গায় একজন টহলদার পাহারাওয়ালা তাদের থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করে তারপর যেতে দিল। দুধারে গাছের সারি বসানো চওড়া রাস্তাটা পার হয়ে তারা এসে পড়ল

একটা অন্ধকার নিস্তব্ধ রাস্তায়, যেটা চলে গেছে একটা ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে। বাঁয়ে ঘুরে তারা দু'জনে চলল রেলের বড়ো গুদাম-বাড়িগুলোর সমান্তরাল সড়কটা বেয়ে -- রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিটের লম্বা বিষণ্ন বিদ্ঘুটে চেহারার গুদাম-বাড়িগুলো। কিসের যেন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় ভরে উঠেছে আন্নার মন। উদ্বিগ্ন চোখে অন্ধকার ভেদ করে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে সে, সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তরে ঘাবড়ে-যাওয়া গলায় ভাঙা-ভাঙা জবাব দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর একটা ছায়াকে যখন লক্ষ্য করে দেখা গেল যে সেটা টেলিফোনের একটা খুঁটি মাত্র, তার চেয়ে ভয়ানক কিছু নয়, তখন জোরে হেসে উঠল আন্না, পাভেলকে তার মানসিক উদ্বেগের কথাটা খুলে বলল। পাভেলের বাহুটা চেপে ধরল সে, তার কাঁধে চাপ পড়ায় ভরসা বোধ করল।

'মোটে বাইশ বছর বয়েস আমার, কিন্তু বুড়ির মতো স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগি আমি। আমাকে ভীতু বলে ভাবলে কিন্তু তোমার ভুল হবে। কিন্তু আজ রাত্রে আমার স্নায়ুগুলো সব কেমন যেন টান টান হয়ে আছে। অবশ্য তুমি সঙ্গে থাকাতে আমার নিজেকে দিব্যি নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, ভয় পাচ্ছি বলে লজ্জা হচ্ছে আমার।'

সত্যিই, রাত্রির অন্ধকার, জায়গাটার নির্জনতা আর এইমাত্র সভায় শুনে আসা আগের রাত্রে শহরতলীর একটা বীভৎস হত্যার ঘটনা আন্নার মনে যে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল, সেটা পাভেলের ধীর শান্ত ভাব দেখে কেটে গেল- জ্বলন্ত সিগারেটের আভায় পাভেলের মুখের একটা পাশ এক মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল, তার চোখের ভুরু দুটোর বলিষ্ঠ বাঁকা টান দেখে সাহস পেল আন্না।

মাল-গুদামের বাড়িগুলো পেছনে পড়ে গেছে। ছোট একটা

নদীর ওপর দিয়ে সাঁকোটা পার হয়ে ওরা সড়কটা ধরে এসে পড়ল রেল-লাইনের বাঁধের নিচে সুড়ঙ্গটার কাছাকাছি, যেটা শহরের এই দিকটার সঙ্গে রেলওয়ে অঞ্চলের যোগসূত্র।

এতক্ষণে ওদের ডান দিকে অনেক পেছনে পড়ে গেছে রেল-স্টেশনের বাড়িগুলো। সুড়ঙ্গটা এসে পড়েছে একটা কানা গলিতে, ডিপোর ওদিকে। ওরা দু'জনে পরিচিত জায়গায় এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই।

রেল-লাইনের গায়ে দূরে অন্ধকারে দপ দপ করছে সিগন্যাল-সংকেতের রঙীন আলোগুলো, ডিপোর পাশে একটা শাণ্টিং ইঞ্জিন রাত্রির মতো ডিপোয় ফিরে যাবার পথে ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

সুড়ঙ্গের মুখটার উপরে মরচে-ধরা আঁকশির গায়ে ঝুলছে রাস্তার আলোটা। বাতাসে দুলছে সেটা অল্প অল্প, তার ঘোলাটে হলদে আলোটা সুড়ঙ্গের এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে সরে সরে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গের মুখটা থেকে গজ দশেক দূরে সড়কটার পাশে ছোট একটা নিঃসঙ্গ কুটির। দু'বছর আগে একটা বিরাট গোলা এসে ওটার গায়ে লেগে ভেতরটা একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ধসে পড়েছে সামনের অংশটা, ফলে এখন কুটিরখানা একটা বিরাট গর্তের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, পথের ধারে ভিখিরি যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তার অঙ্গহানির প্রদর্শনী খুলে। বাঁধের ওপর দিয়ে সশব্দে একটা ট্রেন বেরিয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আন্না বলল, 'এবার প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা।'

পাভেল আলগোছে তার বাহুটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে একবার চেষ্টা করল।

কিন্তু আন্না ছাড়ল না তার হাত।

ভেঙে-পড়া বাড়িটাকে ছাড়িয়ে এল তারা।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ হল তাদের পেছনে। ছুটে চলা পায়ের শব্দ, ঘোঁৎঘোঁৎ নিঃশ্বাসের শব্দ। তারা এসে পড়ল ওদের কাছে।

পাভেল একটা ঝাঁকুনি দিল হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে আন্না প্রাণপণে চেপে ধরেছে তাকে। পাভেল হাতটা ছিনিয়ে নিল যখন, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সাঁড়াশির মতো একটা চাপে আটকা পড়ে গেছে তার ঘাড়টা। আর এক মুহূর্ত পরে একটা পাক খেয়ে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হল আক্রমণকারীর মুখোমুখি। সেই হাতটা উঠে এসেছে পাভেলের গলার ওপরে, শার্টের কলারটা এমনভাবে মুচড়ে ধরেছে যাতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে, চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে একটা পিস্তলের নলের মুখোমুখি, চোখের ওপরে পিস্তলের নলটা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

অতিমানুষিক একটা স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে পাভেলের চোখ দুটো সম্মোহিতভাবে পিস্তলের নলটার ঘুরে যাওয়াটাকে অনুসরণ করছে। ওই নলটার ফাঁক দিয়ে মৃত্যু চেয়ে আছে তার দিকে, কিন্তু নিজের চোখ দুটোকে ওখান থেকে সরিয়ে নেবার মতো শক্তি তার নেই। শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু আক্রমণকারীটা গুলি করল না। বিস্ফারিত চোখে পাভেল ডাকাতটার মুখখানা দেখল — বিরাট মাথা, ভারি চোয়াল, গোঁফ আর না-কামানো দাড়ির কালো ছায়া। কিন্তু টুপিটার চওড়া বেড়ের নিচে তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না।

পাভেল আড়চোখে এক নজর আন্নার খড়ির মতো শাদা মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল — তাকে ততক্ষণে

আক্রমণকারীদের তিনজনের মধ্যে একজন কুটিরটার দেওয়ালে হাঁ করা গর্তের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। নির্মমভাবে তার হাত দুটো মুচড়ে ধরে লোকটা তাকে মাটিতে ফেলে দিল। আরেকটা কালো মূর্তি লাফিয়ে এগিয়ে এল তাদের দিকে। পাভেল শুধু সুড়ঙ্গের গায়ে তার ছায়াটা দেখতে পেল। পেছনে ভাঙা ঘরটার মধ্যে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল সে। বেপরোয়া হয়ে যুঝছে আন্না — মুখের মধ্যে একটা টুপি গুঁজে দিতেই দমবন্ধ হয়ে আসা তার চিৎকারটা হঠাৎ থেমে গেল। বিরাট মাথাওয়ালা যে দুর্বৃত্ত পাভেলকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে, সে আন্নার ওপরে ধর্ষণের জায়গাটায় যেতে চাইল — জানোয়ার যেমন তার শিকারের দিকে এগিয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা গেল — এই লোকটাই দলের সর্দার এবং এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাটা ঠিক তাকে সাজে না। এই যে ছোঁড়াটাকে সে কাবু করে রেখেছে, ওটা একটা আনাড়ি মাত্র, দেখে মনে হয় ওই 'ডিপোর চ্যাংড়া'দের একটা। ওরকম একটা পোঁটা-নাক বাচ্চার কাছ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। 'ওটার মাথার ওপরে বেশ গোটা কতক গোঁত্তা বসিয়ে দিয়ে ওই মাঠটার ওপর দিয়ে কেটে পড়তে বললেই পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ও শহর পর্যন্ত গোটা পথটা ছুটে চলে যাবে,' ভাবল ডাকাতটা।

পাভেলকে চেপে ধরা মুঠোটায় ঢিল দিয়ে সে বলল, 'পা চালাও হে, এই!.. যে পথে এসেছিলে সেই দিকে কেটে পড়, কিন্তু খবরদার, চেঁচালেই একটি গুলি গিয়ে ঢুকবে মাথায়।'

পাভেলের কপালের ওপরে পিস্তলের নলটাকে চেপে ধরল সে।

'যা, দৌড়ে পালা!' কর্কশ স্বরে ফিসফিসিয়ে বলে পিস্তলটা

নামিয়ে নিল সে, যাতে ছেলেটা পেছন দিক থেকে পিঠে গুলি এসে বিঁধবে বলে ভয় না পায়।

টলতে টলতে পিছু হটে গেল পাভেল, আক্রমণকারীর ওপরে চোখ রেখে পাশ ফিরে দৌড়তে লাগল সে।

দুর্বৃত্তটা ভাবল যে সে গুলি করবে বলে ছোঁড়াটা এখনও ভয় খাচ্ছে, তখন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাঙা-বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

পাভেলের হাতখানা মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে গেল তার পকেটের মধ্যে। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে তাকে! ঘুরে দাঁড়াল সে, বাঁ হাতখানা টান করে বাড়িয়ে ধরল, দ্রুত নিশানা ঠিক করে নিয়েই গুলি ছুড়ল।

ডাকাতটা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারল, তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। হাতখানা তুলবার আগেই গুলিটা তার পাশ ফুঁড়ে বিঁধে গেছে।

গুলির ধাক্কায় একটা গোঙানির শব্দ করে লোকটা সুড়ঙ্গের দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, দেয়ালটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে পড়ল সে। বাড়িটার মধ্যে থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এসে নিচে নালিটার দিকে ছুটে গেল। তার দিকে ধাওয়া করে পাভেল আরেকটা গুলি ছুড়ল। দ্বিতীয় একটা ছায়া নিচু হয়ে গুঁড়ি মেরে এক দৌড়ে ছুটে গেল সুড়ঙ্গটার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। গুলির আওয়াজ হল আর একটা। দেয়ালের গা থেকে গুলি লেগে ঝরে পড়া কংক্রিটের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে কালো মূর্তিটা একপাশে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরেকবার ব্রাউনিং-পিস্তলের আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। দেযালের গায়ে বিরাট মাথাওয়ালা সেই ডাকাতটার দেহ মৃত্যুযন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে।

আন্নাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল পাভেল। বিহ্বল হয়ে পড়েছে আন্না; বিপদটা কেটে গেছে বলে বিশ্বাস করতে পারছে না সে—বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ডাকাতটার দেহের খিঁচুনির দিকে।

পাভেল তাকে সুড়ঙ্গের ওপরকার আলোর বৃত্তটার বাইরে অন্ধকারের দিকে ধরে ধরে নিয়ে এসে ফিরে চলল শহরের দিকে। রেল-স্টেশনের দিকে যখন তারা ছুটে চলেছে, তখন সুড়ঙ্গের কাছে বাঁধটার ওপরে গোটাকতক আলো মিটমিট করছে, রেল-লাইনের ওপর দিয়ে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

আন্নার ঘরে এসে যখন তারা পৌঁছল, তখন বাতিয়েভা পাহাড়ে কোথাও মোরগ ডাকছে। আন্না শুয়ে পড়ল বিছানায়। পাশের টেবিলে বসে পাভেল সিগারেট টানতে টানতে ওপর দিকে উঠে-যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো লক্ষ্য করছে... এই নিয়ে জীবনে চারবার সে মানুষ খুন করল।

সাহস বলে কোনো জিনিস আছে নাকি—অবাক হয়ে ভাবছে সে—এমন জিনিস যা সব সময়ে একেবারে নিখুঁতভাবে প্রকাশ পায়? ঘটনাটার সমস্ত অনুভূতিগুলিকে মনে মনে আরেকবার অনুভব করে নিয়ে সে স্বীকার করল যে পিস্তলের নলটার ভয়ঙ্কর কালো চোখটা যখন তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন সেই প্রথম কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার হৃৎপিণ্ডটাকে হিমশীতল মুঠোয় চেপে ধরেছিল আতঙ্ক। আর, ঐ যে ছায়ামূর্তি দুটো পালিয়ে যেতে পারল, সেটা কি শুধুই তার দুর্বল দৃষ্টিশক্তির জন্যে, আর তাকে বাঁ হাতে গুলি করতে হয়েছে বলেই? না। ওই কয়েক পা দূর থেকে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। স্নায়বিক উত্তেজনার

ফলে আর তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই তার হাত কেঁপে গেছে—এই দুটোই ঘাবড়ে যাবার লক্ষণ।

টেবিল-ল্যাম্পটার আলো পড়েছে তার মুখে। তাকে লক্ষ্য করতে করতে আন্না তার মুখে প্রত্যেকটি অদলবদল লক্ষ্য করছে। পাভেলের চোখের দৃষ্টি শান্ত, শুধু ভুরুর কুঁচকানিতে তার মনের একাগ্রতা ফুটে উঠেছে।

'কী ভাবছ, পাভেল?'

আলোর বৃত্তের বাইরে ধোঁয়াটা যেমন মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি এই আকস্মিক প্রশ্নে তার চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল এবং প্রথমেই যে কথাটা তার মাথায় এল সেইটেই সে বলল, 'একবার কম্যান্ড্যাণ্টের দপ্তরে যেতে হবে আমাকে। এই ব্যাপারটা এখুনি রিপোর্ট করা দরকার।'

ভয়ানক একটা ক্লান্তির চেতনায় সে অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

একলা থাকার চিন্তায় একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল আন্না, পাভেলের হাতখানা চেপে ধরে রইল সে। তারপরে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে, রাত্রির অন্ধকারে সে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। এখন বড় আত্মীয় হয়ে উঠল পাভেল তার কাছে।

রেলওয়ের পাহারাওয়ালারা এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছিল, পাভেল করচাগিনের রিপোর্ট পাবার পর সমস্ত ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মৃতদেহটাকে 'মড়ামাথা ফিম্‌কা' নামে একজন কুখ্যাত বদমাইশের বলে সনাক্ত করা গেল, লোকটা দীর্ঘকাল জেল-খাটা একজন খুনী ডাকাত।

সুড়ঙ্গের কাছের ওই ঘটনাটা নিয়ে পরের দিন সবাই বলাবলি করতে লেগে গেল। এদিকে পাভেল আর

স্ভেতায়েভের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াল ঘটনাটা।

শিফটের মাঝখানে কর্মশালায় এসে স্ভেতায়েভ পাভেল করচাগিনকে একবার বাইরে আসতে বলল। নিঃশব্দে সে পাভেলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বারান্দাটার দূরে প্রান্তের এক কোণে। দারুণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, কীভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সে হঠাৎ বলে উঠল, 'কাল কী ঘটেছিল বলো।'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি জানো।'

অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল স্ভেতায়েভ। সুড়ঙ্গের ঘটনাটা সম্বন্ধে স্ভেতায়েভের যে আর সবার চেয়ে বেশি আগ্রহ থাকতে পারে, পাভেল তা জানত না। বাইরের দিক থেকে সে যতোই ঔদাসীন্য দেখাক, আন্না বোরহার্ৎ-এর প্রতি এই কামার-ছেলেটির মনে একটা গভীর আকর্ষণ জন্মেছে, তা সে জানত না। মেয়েটির প্রতি যে সে একাই আকৃষ্ট, তা নয়, কিন্তু সে ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই লাগুতিনা তাকে গত রাত্রের সুড়ঙ্গের ঘটনাটার কথা বলেছিল। শোনার পর থেকেই সে একটি জবাব না পাওয়া প্রশ্নের যন্ত্রণায় মনে মনে জর্জরিত হচ্ছে। পাভেলের কাছে সে সরাসরি প্রশ্নটা তুলতে পারছে না, অথচ উত্তরটা তার জানাই চাই। তার চেতনার খোঁচায় সে বুঝতে পারল যে তার এই প্রশ্নটা হীন আর স্বার্থপ্রণোদিত, কিন্তু তার মনের মধ্যে যে সব বিরোধী আবেগের সংঘাত চলেছে, সেই সংঘাতে বর্বর আর আদিম মানুষটিই জয়ী হল।

'শোনো, করচাগিন,' চাপা গলায় বলল সে, 'এটা শুধু তোমার-আমার মধ্যে। আমি জানি, আন্নার কথা ভেবেই তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইবে না, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই

আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমাকে শুধু বলো, তোমাকে যখন ডাকাতটা পিস্তল ধরে আটকে রেখেছিল তখন অন্য দু'জন আন্নার ওপরে বলাৎকার করেছে কি না?' বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে কথাটা শেষ করবার আগেই চোখ নামিয়ে নিল।

অস্পষ্টভাবে ক্রমশ করচাগিন বুঝতে থাকল—স্ভেতায়েভকে পীড়িত করছে কোন প্রশ্নটা। 'আন্নার জন্যে যদি ওর কিছুমাত্র ভাবনা না থাকত, তাহলে ও এতোটা বিহ্বল হয়ে পড়ত না। কিন্তু আন্নাকে যদি ও ভালোবাসেই, তাহলে...' ভাবতে ভাবতে পাভেল আন্নার হয়ে অপমানিত বোধ করল।

'এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

স্ভেতায়েভ জড়িয়ে কতকগুলো অসংলগ্ন কথা বলল। তার আসল প্রশ্নটা যে পাভেল বুঝতে পেরেছে, সেটা অনুভব করে সে চটে উঠল। বলল, 'আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কোর না। আমি শুধু সরাসরি জবাব চাই।'

'আন্নাকে ভালবাসো তুমি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জোর করে নিজেকে দিয়ে বলাল স্ভেতায়েভ, 'হ্যাঁ।'

চেষ্টা করে রাগটাকে চেপে গিয়ে করচাগিন ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল বারান্দা বেয়ে, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

একদিন রাত্রের দিকে ওকুনেভ তার বন্ধুর বিছানাটার আশেপাশে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর শেষ পর্যন্ত একধারে বসে পড়ে পাভেল যে বইটা পড়ছিল, সেটার ওপরে হাতখানা রাখল।

'শোন্, পাভলুশা, একটা কথা বলে মনের বোঝাটা নামিয়ে

ফেলতে চাই। একদিক থেকে অবশ্য এটাকে তেমন গুরুতর বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু আরেক দিক থেকে আবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তালিয়া লাগুতিনা আর আমার মধ্যে একটা কান্ড ঘটেছে। বুঝলি কিনা, প্রথম প্রথম আমার ওকে বেশ ভালো লাগত।' ওকুনেভ বোকার মতো মাথাটা চুলকোতে থাকল, কিন্তু বন্ধুর মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই দেখে, ভরসা পেয়ে সে বলে চলল, 'কিন্তু তারপরে, তালিয়া... মানে বুঝতেই পারছিস। আচ্ছা যাক, অতো সব খুঁটিনাটি বলার দরকার নেই, ওসব না বললেও ব্যাপারটা বেশ বোঝা যায়। আমি আর তালিয়া একসঙ্গে থাকব বলে গতকাল ঠিক করেছি, দেখা যাক কেমন চলে। আমার বয়েস বাইশ বছর, আমরা দু'জনেই সাবালক। আমরা দু'জনে সমান সমান অধিকারের ভিত্তিতে সংসার পাততে চাই। কী মনে হয় তোর?'

প্রশ্নটা একটু ভেবে দেখল পাভেল।

'আমি আর কী বলব, কোলিয়া? তোমরা দু'জনেই আমার বন্ধু, একই গোষ্ঠীভুক্ত, আর সব কিছুতেই তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল আছে। তালিয়া ভারি চমৎকার মেয়ে। সব কিছু বেশ বোঝা যায়।'

পরের দিন করচাগিন শ্রমিকদের হোস্টেলে এসে উঠল এবং আরও দিন কতক বাদে তালিয়া লাগুতিনা আর নিকোলাই ওকুনেভের সম্মানে আন্না বোরহার্ৎ একটা পার্টি দিল—কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের অনাড়ম্বর পার্টি, তাতে পান-ভোজনের ব্যবস্থা নেই। পরস্পরে মিলে অতীত দিনের স্মৃতিমন্থন করে আর প্রিয় লেখকদের বই থেকে জায়গা বিশেষ পড়ে শুনে কাটল সন্ধ্যেটা। অনেকগুলো গান গাইল তারা, সুন্দর গাইল সবাই। প্রাণমাতানো সুর অনেকদূর পর্যন্ত

প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। তারপরে কাতিউশা জেলেনোভা আর ভলিন্‌সেভা একটা অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে এল—মোটা তারের খাদের মসৃণ আওয়াজের সঙ্গে মিহি তারের রুপোলি ঝঙ্কার মিশে গিয়ে সুরের লহরী ঘর ভরিয়ে তুলল। সেদিন সন্ধ্যেয় পাভেল অন্যদিনের চেয়েও ভালো অ্যাকর্ডিয়ন বাজাল। আর, সবার খুশির মধ্যে পানক্রাতভ যখন তার বিরাট দেহটা নিয়ে নাচতে শুরু করে দিল, তখন পাভেল অ্যাকর্ডিয়ন বাজানোর নতুন শেখা ভঙ্গীটা ভুলে গিয়ে আগেকার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বাজানো আরম্ভ করল:

রাস্তা, আমার রাস্তা রে!
দেনিকিন সেথা খাস্তা রে,
আহা, সাইবেরিয়ার 'চেকা'য়
সেথা খতম করল কলচাকে হায়!

অতীত দিনের গান গেয়ে উঠল তার অ্যাকর্ডিয়ন, সেই আগুনে সব দিনগুলোর গান, আর আজকের মৈত্রী আর সংগ্রাম আর আনন্দের গান। কিন্তু তারপরে যখন যন্ত্রটা ভলিন্‌সেভকে এগিয়ে দেওয়া হল আর সে ঘূর্ণি-মাতান 'ইয়াব্‌লোচ্‌কো' নাচের ছন্দ বাজাতে শুরু করে দিল, তখন করচাগিন সবাইকে অবাক করে উদ্দাম ট্যাপ নাচ জুড়ে দিল—জীবনে এই তৃতীয় এবং শেষবারের মতো নাচল সে।

চতুর্থ অধ্যায়

এখানে সীমান্ত। মৌন শত্রুতায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটো খুঁটি, প্রত্যেকটা দাঁড়িয়েছে তার নিজস্ব জগতের সপক্ষে। একটা খুঁটি চাঁচাছোলা, পালিশ করা। পাহারাদার

পুলিশের চৌকির গায়ে যেমন থাকে তেমনি শাদায়-কালোয় রঙ-করা, মাথার ওপরে শক্ত শক্ত পেরেক ঠুকে আটকানো একটা এক-মাথাওয়ালা ঈগল পাখি: দুই পাখা ছড়িয়ে, ডোরা-কাটা খুঁটিটা থাবা দিয়ে চেপে, বাঁকানো ঠোঁট সামনের দিকে তীক্ষ্ণভাবে বাড়িয়ে ধরে শিকারী পাখিটা বিদ্বেষভরা চোখে তাকিয়ে আছে উল্টো দিকে—খুঁটিটার গায়ে আটকানো ঢালাই-করা লোহার বর্মের ওপরে খোদাই করা কাস্তে-হাতুড়ির চিহ্নটার দিকে। ভারি, গোল, ওক-কাঠের এই খুঁটিটা মাটির বুকে শক্ত করে গেড়ে বসানো। খুঁটি দুটো পোঁতা আছে সমতল জমির বুকে পরস্পর থেকে পনর ফুট দূরে, কিন্তু এই দুটো খুঁটির মধ্যে গভীর একটা ব্যবধান—দুই জগতের ব্যবধান। প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে এদের মাঝখানকার এই ছ'পা জমির ব্যবধান পার হওয়া যাবে না।

সীমান্ত।

কৃষ্ণ সাগর থেকে দূর উত্তরে সুমেরু সাগর পর্যন্ত শত শত মাইল জুড়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রহরায় এই মৌন নিশ্চল শান্ত্রীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের লোহার বর্মের বুকে আঁকা শ্রমের মহৎ নিদর্শন কাস্তে-হাতুড়ির চিহ্ন নিয়ে। হিংস্র ঈগল-পাখিটাকে মাথায় নিয়ে যেখানে ওই খুঁটিটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটা সোভিয়েত ইউক্রেন আর বুর্জোয়া পোল্যান্ডের সীমান্তরেখাকে চিহ্নিত করছে। ছোট্ট বেরেজ্‌দভ্‌ শহর থেকে এটা দশ কিলোমিটার দূরে—ইউক্রেনের উপান্তে যেন হারিয়ে গেছে শহরটা। আর এর উল্টো দিকে ছোট্ট পোলিশ শহর কোরেৎস। স্লাভুতা থেকে আনাপোল পর্যন্ত সীমান্ত-অঞ্চলটাকে পাহারা দেয় সীমান্তরক্ষী ফৌজের একটা ব্যাটালিয়ন।

সীমান্ত চিহ্নিত করে এই খুঁটিগুলো চলে গেছে বরফ

ঢাকা মাঠের বুকের ওপর দিয়ে, বনের মধ্যে জঙ্গল কেটে সাফ করা জায়গার ফাঁকে ফাঁকে, উপত্যকার উৎরাই ভেঙে, আর পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে চুড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে একটা নদীর উঁচু পাড়ের ধারে— সেখানে দাঁড়িয়ে বরফের আস্তরণে ঢাকা ভিন্‌দেশী মাঠপ্রান্তরকে লক্ষ্য করছে।

কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ফেল্টবুটের তলায় জমাট বরফ যখন খচখচ-কড়মড় করে সেই রকম একটা দিন। দৈত্যের মতো বিরাট একজন লাল ফৌজের লোক পুরাকাহিনীর অসুরের মাথার উপযোগী একটা মস্ত বড়ো শিরস্ত্রাণ মাথায় চাপিয়ে ভারি পা ফেলে ফেলে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা বর্ম-আঁটা একটা খুঁটির কাছ থেকে এগিয়ে রোঁদ দিচ্ছে। কলারে আব বোতামের মধ্যে সবুজ পটি লাগানো ধূসর রঙের একটা ওভারকোট তার গায়ে, পায়ে ফেল্টের বুট। ওভারকোটের ওপরে আবার গোড়ালি পর্যন্ত নামানো বিরাট কলারওয়ালা ভেড়ার চামড়ার জোব্বা—এই জোব্বা প্রচণ্ডতম তুষার-ঝড়েও মানুষের শরীরকে গরম রাখে। তার মাথায় পশমী কাপড়ের শিরস্ত্রাণ, হাত দুটো ভেড়ার চামড়ার দস্তানায় ঢাকা। সে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। রোঁদে চলতে চলতে বরফের বুকে তার ওভারকোটের প্রান্তটা দাগ কেটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়িতে তৈরি তামাকের একটা সিগারেট টানছে—দেখে বোঝা যায় ভারি ভাল লাগছে। সোভিয়েত সীমান্ত-প্রহরীরা ওরকম খোলা জায়গায় এক কিলোমিটার অন্তর একজন করে থাকে, যাতে প্রত্যেকে তার পরবর্তী শান্ত্রীকে সব সময়ে দেখতে পায়। সীমান্তের পোলিশ অঞ্চলে দু-এক কিলোমিটার অন্তর একজন করে শান্ত্রী।

একটি পোলিশ পদাতিক সৈন্য থপথপ করে পা ফেলে

রোঁদ দিতে দিতে এগিয়ে আসছে লাল ফৌজের সৈনিকটির দিকে। তার পায়ে মোটা চামড়ার ফৌজী বুট, পরনে ধূসর সবুজ রঙের উর্দির ওপরে দুই সারি চকচকে বোতাম লাগানো একটা কালো কোট। মাথায় সাদা ঈগল-চিহ্নিত চার কোণায় ভাঁজ করা ফৌজী ক্যাপ। কাঁধে কাপড়ের পটিতে আর কলারে আরও গোটা কতক শাদা ঈগল আটকানো-- কিন্তু তাতে সে একটুও বেশি উষ্ণতা বোধ করছে না। সাংঘাতিক ঠাণ্ডায় তার হাড় পর্যন্ত জমে আসছে, চলতে চলতে সে অসাড় কান দুটোকে অনবরত ঘষছে আর গোড়ালি দুটো ঠুকছে। পাতলা দস্তানায় তার হাত দুটো ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। পোলিশ সৈন্যটি এক মুহূর্তের জন্যেও হাঁটা বন্ধ করার ঝুঁকি নিতে পারে না। মাঝে মাঝে সে দৌড়াচ্ছে—নইলে এক মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাবে তার গাঁটগুলো। রোঁদ দিতে দিতে শান্ত্রী দু'জন যখন কাছাকাছি আসছে, তখন পোলিশ জোল্নের ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল ফৌজের সৈন্যটির পাশাপাশি হাঁটছে।

সীমান্ত-অঞ্চলে কথা বলা বারণ। কিন্তু এক কিলোমিটারের মধ্যে যখন আর কোথাও কেউ নেই, তখন দু'দিকে দু'জন মানুষ নিঃশব্দে টহল দিচ্ছে, না, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে, কে আর ধরতে যাবে।

পোলিশ সৈন্যটির একটা সিগারেট খাওয়ার একান্ত ইচ্ছে, কিন্তু ব্যারাক-ঘরে সে তার দেশলাইটা ফেলে এসেছে, এদিকে বাতাসটা সোভিয়েত অঞ্চলের ওধার থেকে তামাকের লোভ-জাগানো সুগন্ধ বয়ে আনছে। পোলিশ সৈন্যটি কান-রগড়ানো থামিয়ে পেছন ফিরে একনজর তাকিয়ে নিল—কে জানে, আবার ক্যাপ্টেন-মশাই কিংবা স্বয়ং পান্ লেফটেন্যাণ্ট হয়তো একদল টহলদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে তদারকী রোঁদে বেরিয়ে

হঠাৎ একটা ঢিবির আড়াল থেকে এসে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু রোদ ঠিকরানো চোখ ধাঁধানো বরফের শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না। আকাশের বুকে মেঘের লেশমাত্র নেই।

'দেশলাই আছে, কমরেড?' রুশ আর পোলিশ ভাষা মিশিয়ে আইনের পবিত্র নির্দেশটিকে প্রথম লঙ্ঘন করল পোলিশ সৈন্যটি এবং তলোয়ারের মতো বেঅনেটের ফলা-আটকানো ফরাসী ফৌজী রাইফেলটা একটু কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সে তার কোটের পকেটের তলা থেকে আড়ষ্ট আঙুলে হাতড়ে হাতড়ে টেনে বের করল এক প্যাকেট শস্তা দামের সিগারেট।

লাল ফৌজের সৈন্যটি তার কথা শুনতে পেয়েছে, কিন্তু ফৌজী কানুনে সীমান্তের পারাপারে কথা বলা বারণ। তাছাড়া, সৈন্যটা কী বলতে চায় সেটাও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি সে। তাই সে ভারি ভারি পা ফেলে উষ্ণ নরম ফেল্ট-বুটের নিচে বরফ কচকচিয়ে টহল দিয়েই চলল।

এবারে পোলিশ সৈন্যটি রুশ ভাষায় বলল, 'কমরেড বলশেভিক, দেশলাই আছে? ছুঁড়ে দাও না?'

লাল ফৌজের লোকটি তার প্রতিবেশীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভালো করে দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, 'বরফ-ঝরা এই শীতে 'পানটি' বেশ ঘায়েল হয়ে পড়েছে দেখছি। হতভাগাটা বুর্জোয়া সৈন্য হলেও, বড়ো কষ্টের জীবন বেচারির। ভাবো দিকি—ওই বস্তাপচা পোশাকে এই ঠাণ্ডায় বেরুতে হয়েছে লোকটাকে, খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওকে চলে বেড়াতে হচ্ছে তাতে আর এমন অবাক হবার কী আছে। একটা সিগারেট খাওয়া তো চাইই।' ঘুরে না দাঁড়িয়েই লাল ফৌজের লোকটি দেশলাইয়ের একটা বাক্স ছুঁড়ে দিল

তার দিকে। লুফে নিল সেটা পোলিশ সৈন্যটি, বারকতক ব্যর্থ চেষ্টার পর সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুঁড়ে দিল দেশলাইটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। লাল ফৌজের লোকটি নিয়মকানুন ভেঙ্গে বলে ফেলল, 'রেখে দাও, আমার আরও আছে।'

সীমান্তের ওপার থেকে জবাব এল, 'ধন্যবাদ। তবে, না রাখাই ভালো। আমার পকেটে এই বাক্সটা যদি দেখতে পায় ওরা, তাহলে আমার দু'বছর জেল খাটতে হবে।'

লাল ফৌজের লোকটি ভালো করে দেখল দেশলাইয়ের বাক্সটি। লেবেলের ওপরে ছাপা একটা বিমান, সেটার সামনের হাওয়া-কেটে-চলা পাখনাটার জায়গায় একটা বলিষ্ঠ মুঠো-বাঁধা হাত, আর তার নিচে 'চরমপত্র' কথাটা লেখা।

'তাই তো, এ কি আর ওদের রাখা চলে!'

লাল ফৌজের লোকটির পাশাপাশি পা মিলিয়ে হেঁটে চলেছে পোলিশ সৈন্যটি। এই নির্জন প্রান্তরে বড়ো একা ঠেকছে তার।

সমান মসৃণ গতিতে ঘোড়া দুটো পা ফেলে পাশাপাশি এগিয়ে চলছে, তাদের পিঠের জিনগুলো থেকে তালে তালে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে। শীতার্ত বাতাসে ঘোড়া দুটোর নিঃশ্বাস জমে গিয়ে দু'-এক মুহূর্তের জন্যে শাদা বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। কালো মদ্দা-ঘোড়াটার নাকের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু বরফ জমে উঠেছে। কমনীয় ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চলেছে ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারের রঙচঙে ফোঁটা-কাটা মাদীটা মুখে আটকানো লাগামটা দোলাতে দোলাতে। ঘোড়সওয়ার দু'জনেরই গায়ে কোমর-বন্ধনী জড়ানো ফৌজী ওভারকোট, হাতার ওপরে তিনটে লাল কাপড়ের চৌখুপি

আঁটা। তফাৎ শুধু এই যে ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার গাব্রিলভের কলারে পটিগুলো সবুজ, আর তার সঙ্গীর কলারে সেগুলো লাল। গাব্রিলভ রয়েছে সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীতে—সত্তর কিলোমিটার জুড়ে এই সীমান্ত-অঞ্চলটায় তার ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা পাহারা দেয়। সীমান্তরেখার এই অঞ্চলটুকু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার ওপর। তার যে সঙ্গীটি বেরেজ্‌দভ্‌ শহর থেকে এই সীমান্ত-অঞ্চলটা দেখতে এসেছে সে হল সর্বজনীন সামরিক ট্রেনিং কেন্দ্রের ব্যাটালিয়ন কমিশার পাভেল করচাগিন।

আগের রাত্রে বরফ পড়েছিল। তাজা আর শাদা নরম তুষার-আস্তরণের ওপর মানুষ বা জন্তুর পায়ের ছোঁয়া লাগে নি এখনও। ঘোড়া কদমে হাঁকিয়ে ওরা বন থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, প্রায় চল্লিশ পা দূরে ফের দুটো খুঁটি।

এমন সময়ে গাব্রিলভ হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে করচাগিন দেখে--জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে গাব্রিলভ বরফের ওপরে একটা অদ্ভুত দাগ লক্ষ্য করছে। দাগটাকে দেখে মনে হয়, কেউ যেন খাঁজ-কাটা একটা ছোট্ট চাকা গড়িয়ে নিয়ে গেছে বরফের ওপর দিয়ে: এই জটিল আর হঠাৎ ধাঁধাঁ-লাগানো নক্সার দাগ কেটে ধূর্ত কোনো এক ছোট্ট জন্তু এখান দিয়ে চলে গেছে। জন্তুটা কোন্‌ দিক থেকে কোন্‌ দিকে গেছে বোঝা মুশকিল। কিন্তু ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার থেমে পড়েছে এই দাগটা দেখে নয়। দু'পা দূরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের একটা পাতলা আস্তরণের নিচে আরেক সারি দাগ—মানুষের পায়ের ছাপ। এগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই—সরাসরি বনের দিকে চলে গেছে

পায়ের দাগগুলো, সীমান্তের পোলিশ অঞ্চল থেকেই যে অনধিকার-প্রবেশকারী এই লোকটি এদিকে ঢুকেছিল, সে সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার লাগামটা টেনে ঘোড়া চালিয়ে পায়ের ছাপটাকে অনুসরণ করে শান্ত্রীর টহল দেবার পথটা পর্যন্ত চলে এল। পোলিশ অধিকারভুক্ত জায়গাটায় প্রায় দশ পা পর্যন্ত পায়ের দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'কেউ একজন কাল রাত্রে সীমান্ত পার হয়ে ঢুকেছিল,' বিড়বিড় করে বলল ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার, 'তিন-নম্বর পল্টনটা দেখছি ফের ঘুমুতে শুরু করেছে—সকালের রিপোর্টে এই ব্যাপারটার কোনো উল্লেখ নেই।'

গাভ্রিলভের গোঁফে পাক ধরেছে, সেই গোঁফের ওপরে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নিঃশ্বাসের জলবিন্দুর একটা রুপোলি স্তর। ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া সেই গোঁফে তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখাল।

দূর থেকে দুটো মূর্তি এগিয়ে আসছিল। একজন ছোটখাটো, কালো জামা গায়ে, তার ফরাসী বেয়নেটের ফলাটা রোদ্দুরে চিকচিক করছে; অন্যজন লম্বা-চওড়া অসুরের মতো, গায়ে ভেড়ার চামড়ার হলদে কোট। পেটের নিচে পাশের দিকে জুতোর একটা ধাক্কা খেয়ে ফোঁটা-কাটা মাদীটা জোরে দৌড়তে শুরু করল। ঘোড়সওয়ার দু'জন দ্রুত এসে পড়ল এগিয়ে-আসা মূর্তি-জোড়ার দিকে। ওরা এসে পড়লে লাল ফৌজের লোকটি কাঁধের ওপরে ঝোলানো তার রাইফেলটা টেনে ধরে মুখ থেকে সিগারেটের প্রান্তটা থুৎকে ছুঁড়ে দিল বরফের ওপরে।

'হ্যালো, কমরেড। আপনাদের এলাকায় সব খবর-টবর কী?' লাল ফৌজের সৈন্যটির দিকে ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার হাত

বাড়িয়ে দিতে সে তাড়াতাড়ি একটা দস্তানা খুলে ফেলে করমর্দন করল। সীমান্তের এই প্রহরীটি এতো লম্বা যে তার হাত ধরবার জন্যে কম্যান্ডারকে তার জিনের ওপর থেকে একটুও ঝুঁকে পড়তে হয় নি বললেই হয়।

দূর থেকে তাকিয়ে রইল পোলিশ সৈন্যটি। লাল ফৌজের দু'জন অফিসার একজন সাধারণ সৈন্যকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে যেমন জানায়। এক মুহূর্তের জন্যে কল্পনা করার চেষ্টা করল যে সে যেন করমর্দন করছে মেজর জাক্রিয়াজেভ্স্কির সঙ্গে—কিন্তু সে চিন্তাটাও এতোই অদ্ভুত যে, সৈন্যটি চমকে উঠে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিল।

লাল ফৌজের লোকটি জানাল, 'আমি এইমাত্র পাহারায় হাজির হয়েছি, কমরেড কম্যান্ডার।'

'ওখানে ওই দাগটা দেখেছেন?'

'না তো, এখনও দেখি নি।'

'রাত্রে দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত এখানে পাহারায় ছিল কে?'

'সুরাতেঙ্কো, কমরেড ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার।'

'ঠিক আছে, কিন্তু চোখ খোলা রাখবেন।'

ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাবার আগে কম্যান্ডার কড়া গলায় একটা সাবধানবাণী ঘোষণা করল, 'ওসব লোকের থেকে দূরে দূরে থাকলেই ভালো হয়।'

সীমান্ত থেকে বেরেজ্দভের দিকে চওড়া রাস্তাটা বেয়ে তাদের ঘোড়া দুটো যখন কদমে এগিয়ে চলেছে তখন কম্যান্ডার তার সঙ্গীকে বলল, 'এই সীমান্ত-অঞ্চলে সব সময়ে চোখ খোলা রাখা দরকার। সামান্য ত্রুটি হলেই তার জন্যে পরে দারুণ পস্তাতে হতে পারে। আমাদের এ ধরনের কাজে চোখটি বুজবার সময় নেই। খোলাখুলি দিনের আলোয়

সীমান্ত টপকে আসাটা ততো সহজ নয়, কিন্তু রাত্রে সমস্তক্ষণ সচকিত থাকতে হবে। নিজেই ভেবে দেখুন, কমরেড করচাগিন। আমার এই এলাকায় সীমান্ত-রেখা চারটে গ্রামের মাঝখান দিয়ে গেছে। এর ফলে ব্যাপারটা বেশ কিছুটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোই কাছাকাছি শান্ত্রীদের দাঁড় করানো হোক না কেন, সীমান্তের এক ধারের যতো আত্মীয়স্বজন আরেক ধারের প্রত্যেকটা বিয়ে বা উৎসবে যোগ দেবেই। এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই—সীমান্তের পারাপারে কুটিরগুলোর মধ্যে দূরত্ব তো মাত্র বিশ-পঁচিশ পা, আর নদীতেও জল এত কম যে মুরগীর ছানাও হেঁটে পার হতে পারে। তাছাড়া, কিছু বেআইনী মাল-চালাচালিও হয়ে থাকে। এর বেশির ভাগটাই যে খুব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে, তা ঠিক—কোনো বুড়ী হয়ত সীমানা পার করে দু'-এক বোতল পোলিশ ভোদকা পাচার করল, কিংবা ওই রকম কিছু। কিন্তু বড়ো রকম বেআইনী চালানও বেশ কিছু চলে—বিরাট টাকাওয়ালা সব লোক এইসব কারবার চালায়। সীমান্তের সব গ্রামে পোলিশরা দোকান খুলেছে, সেখানে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়—শুনেছ তো? ওদের নিজেদের গরিব নিঃস্ব চাষীদের জন্যে যে ওসব দোকান খোলা হয় নি, তা নিশ্চয় জেনো।'

ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারের কথা শুনতে শুনতে পাভেলের মনে হচ্ছিল: সীমান্ত-অঞ্চলের এই জীবন যেন সমস্তক্ষণ একটা সতর্ক প্রহরা।

'বেআইনী মাল-চালাচালি ছাড়াও আরও গুরুতর কিছুও হয়তো ঘটে থাকে, কি বলো কমরেড গাভ্রিলভ?'

'সেই তো মুশকিল,' বিষণ্নভাবে বলল ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার।

পাণ্ডববর্জিত ছোট্ট শহর এই বেরেজ্‌দভ্‌। ইহুদীরা যেসব জায়গায় আগে বসবাস করত সেই রকম একটা জায়গা। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো দু'-শো কি তিন-শো ঘর-বাড়ি আর মাঝখানে ডজন দুয়েক দোকানওয়ালা মস্ত বড়ো একটা বাজারখোলা। গোবরে ভর্তি নোংরা বাজারের চত্বরটা। খাস শহরের আশপাশ ঘিরে চাষীদের কুঁড়ে-ঘর। কসাইখানায় যাবার পথে ইহুদী-পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ইহুদীদের পুরনো একটি প্রার্থনা-মন্দির—জীর্ণশীর্ণ একটা বাড়ি। এখনও প্রতি শনিবারে এই প্রার্থনা-মন্দিরে লোকের ভিড় জমে বটে, কিন্তু এর সে ফালাও দিন আর নেই। র‍্যাবিকে যেভাবে দিন চালাতে হয়, সেটা মোটেই তার মনঃপূত নয়। ১৯১৭ সালে যেটা ঘটে গেছে, সেটা নিশ্চয়ই একটা পাপাচার,—এই যে বেরেজ্‌দভ্‌ শহর, যার কথা স্বয়ং ভগবানও ভুলে বসে আছেন, এখানকার তরুণরাও আর তাকে মর্যাদা অনুযায়ী সম্মানটুকু দেয় না। বুড়ো-বুড়িরা অবশ্য এখনও পর্যন্ত শাস্ত্রসম্মত খাবার ছাড়া আর-কিছু খায় না, কিন্তু তরুণদের অনেকেই তো দিব্যি শুয়োরের মাংসের সসেজ্‌ খায়—যে-শুয়োরের মাংসের ওপরে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন। কথাটা ভাবতেই ঘেন্নায় মন শিউরে ওঠে! ভাবতে ভাবতে র‍্যাবি বোরুখ রাগের চোটে একটা শুয়োরের গায়ে লাথি ঝেড়ে বসল—শুয়োরটা খাবারের খোঁজে অভিনিবেশের সঙ্গে একটা গোবরগাদা খুঁড়ছিল। বেরেজ্‌দভ্‌ যে একটা জেলা সদর হয়ে উঠেছে, এতে র‍্যাবিটি মোটেই খুশি নয়। আর কমিউনিস্টরা যে কোথা থেকে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসল তা শয়তানই জানে—সমস্ত বিধি ব্যবস্থাকে যে ওরা একেবারে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে, এটাও মোটেই তার মনঃপূত নয়। রোজই নতুন কোনো একটা অপ্রীতিকর

ঘটনা ঘটছে। যেমন, গতকাল সে পাদ্রীর বাড়ির ফটকে একটা লেখা দেখেছে:

ইউক্রেন যুব কমিউনিস্ট লীগের
বেরেজ্‌দভ্‌ জেলা কমিটি

এই লেখাটা থেকে মন্দ ছাড়া আর কিছু হবে বলে আশা করাটাই বৃথা--মনে মনে ভাবছিল র‍্যাবি। নিজের চিন্তায় সে এতো আচ্ছন্ন ছিল যে, অলক্ষ্যে সমস্ত পথটা পার হয়ে তারই প্রার্থনা-মন্দিরের দরজার ওপরে সাঁটা একটা কাগজের গায়ে ছোটো ঘোষণাটুকু চোখে পড়ার আগে তার হুঁশ ফিরে আসে নি। ঘোষণাটা এই:

আজ ক্লাব-ঘরে শ্রমজীবী-তরুণদের জনসভা।
বক্তা: কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি লিসিৎসিন এবং
জেলা কমসোমল কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক করচাগিন।
সভার শেষে ইস্কুলের ছাত্রদের যন্ত্র সংগীতের অনুষ্ঠান।

প্রচণ্ড রাগে র‍্যাবিটি টেনে ছিঁড়ে ফেলল কাগজখানা।

'এই শুরু হল কাণ্ডটা!'

স্থানীয় গির্জার গা ঘেঁষে বড়ো বাগানটার মাঝখানে পুরনো একটা বাড়ি, এটা আগে ছিল পাদ্রীর। বাড়িটার পুরনো নোংরা ঘরগুলোর শূন্যতা জুড়ে রয়েছে বুক-চাপা একটা একঘেয়েমির আবহাওয়া। এই ঘরগুলোয় এতোদিন পর্যন্ত ছিল পাদ্রী আর তার স্ত্রী—এই বাড়িটার মতোই জীর্ণ আর ভোঁতা স্বভাবের দুটি মানুষ, যারা নিজেরা পরস্পরের কাছে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। এখন যারা এই বাড়িটার নতুন মালিক হয়ে এল, তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার রুদ্ধশ্বাস নিরানন্দ আবহাওয়াটা কেটে গেল। আগেকার এই ধর্মপরায়ণ বাসিন্দা দু'জন কেবল ধর্মোৎসব উপলক্ষে যে

বড়ো হল-ঘরটায় অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করত, সেটা এখন সব সময়েই লোকে ভরতি থাকে--এখন বাড়িটা হয়েছে বেরেজ্‌দভ্‌ কমিউনিস্ট পার্টি কমিটির সদর দপ্তর। প্রধান ফটকের ডান দিকে যে ছোট্ট ঘরখানা, তার দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা আছে, 'জেলার কমসোমল কমিটি'। পাভেল করচাগিন তার দৈনিক কাজের কিছুটা সময় এখানে কাটায়। সার্বিক সামরিক ট্রেনিং-এর দু'-নম্বর ব্যাটালিয়নের সামরিক কমিশার ছাড়াও সে সেই সঙ্গে সদ্যসংগঠিত জেলা কমসোমল কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করছে।

আন্না বোর্‌হার্ৎ-এর ঘরে সেই জমায়েতটার পর আট মাস কেটে গেছে, তবু মনে হয় যেন সেটা গতকালকের ঘটনা। কাগজের স্তূপটা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে পাভেল করচাগিন নিজের চিন্তায় ডুবে গেল...

নিঝুম হয়ে এসেছে বাড়িটা। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। পার্টি কমিটির অফিসটা ফাঁকা। কমিটি সম্পাদক ত্রিফিমভ কিছুক্ষণ আগে বাড়ি চলে গেছে, গোটা বাড়িটায় করচাগিন এখন একা। জানলার গায়ে বরফের একটা অদ্ভুত নক্সা বুনে উঠেছে, কিন্তু ঘরের ভেতরটা উষ্ণ। টেবিলের ওপরে জ্বলছে একটা প্যারাফিনের আলো। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাভেলের মনে পড়ছে। মনে পড়ছে--অগস্ট মাসে রেল-কারখানার কমসোমল সংগঠন থেকে যুব সংগঠক হিসেবে তাকে একটা মেরামতী ট্রেনের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল ইয়েকাতেরিনস্লাভে; শরৎকাল শেষ হয়ে আসা পর্যন্ত দেড়-শো জন যুবক ওই ট্রেনে চেপে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন ঘুরে বেড়িয়েছে, যুদ্ধ-পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করে তুলেছে, ভাঙা-চোরা আর পুড়ে

যাওয়া রেল-গাড়ির কামরাগুলোকে সরিয়ে সাফ করে দিয়েছে। সিনেলনিকোভো থেকে তাদের যেতে হয়েছে পোলোগ পর্যন্ত অঞ্চলটার মধ্যে দিয়ে, যেখানে এক সময়ে ডাকাত মাখ্নো-র দল লুঠপাট চালিয়েছিল। গোটা এলাকা জুড়ে বেপরোয়া লুঠপাট আর ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে তারা। গুলিয়াই-পোলে শহরে জলের জন্যে ইঁটের বুরুজ্টাকে মেরামত করতে আর ডিনামাইটে ভেঙে-পড়া জলের ট্যাঙ্কটাকে লোহার পাত জুড়ে ঠিক করতে পুরো এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। ফিটার-মিস্তির কাজের কলাকৌশল তার জানা নেই এবং এ ধরনের খাটুনির কাজেও সে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর সবার সঙ্গে রেঞ্চ-সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে কতো যে হাজার হাজার মর্চে-ধরা বল্টু সেঁটেছে তা মনে নেই পাভেলের।

শরতের শেষ দিকে ট্রেনটা ফিরে এল তার নিজের জায়গায়, রেল-কারখানায় আবার দেড়-শো জন কাজের লোক বাড়ল...

আন্নার ওখানে পাভেল আগের চেয়ে এখন বেশি যায়। তার কপালের ওপর কোঁচকানিটা মসৃণ হয়ে এসেছে। তার সংক্রামক হাসির আওয়াজ এখন আবার শোনা যায়।

রেল-কারখানার বন্ধুর দল আবার আগেকার মতো পাভেলকে ঘিরে জড়ো হতে শুরু করেছে: তারা শোনে অতীত দিনের সংগ্রামের কথা, দেশের বুকের ওপরে চেপে-বসা মাথায় রাজ-মুকুট পরা সেই রাক্ষসটাকে উৎখাত করার জন্যে শেকলে-বাঁধা বিদ্রোহী রাশিয়ার চাষীদের নানা চেষ্টার কাহিনী, স্তেপান রাজিন আর পুগাচভের অভ্যুত্থানের বর্ণনা।

একদিন সন্ধ্যের সময় আন্নার ওখানে যখন অন্য দিনের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে, তখন পাভেল ঘোষণা করল, সিগারেট-খাওয়া ছেড়ে দেবে সে—এই

অস্বাস্থ্যকর বদ-অভ্যেসটাতে বলতে গেলে শিশু বয়েস থেকেই সে অভ্যস্ত।

'আমি আর সিগারেট খাব না,' অনমনীয় একটা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল সে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। উপস্থিত একজন তরুণ বলেছিল যে অভ্যেস--যেমন ধরা যাক, সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস—ইচ্ছাশক্তির চেয়েও জোরালো। মতভেদ দেখা দিল। প্রথমে পাভেল কিছু বলে নি, কিন্তু তালিয়া তার মতামত জিজ্ঞেস করাতে সে শেষ পর্যন্ত তর্কের মধ্যে ভিড়ে গেল।

'মানুষই তার অভ্যেস নিয়ন্ত্রিত করে, উল্টোটা নয়। উল্টোটাই যদি হত, তাহলে কী দাঁড়াত?'

'কথাটা শুনতে চমৎকার বটে, অ্যা?' এককোণ থেকে বলে উঠল সুভেতায়েভ। 'বড়ো বড়ো কথা বলতে ভালোবাসে করচাগিন। কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্তটি ও নিজের ওপর খাটায় না কেন? ও তো সিগারেট খায়, না কি? ও জানে যে ওটা একটা অতি বাজে অভ্যেস। অবশ্যই জানে। কিন্তু অভ্যেসটা ছেড়ে দেবার মতো শক্তি ওর নেই।' তারপর গলার স্বরটা বদলে কঠিন অবজ্ঞার সঙ্গে সে বলল, 'এই তো অল্পদিন আগে ও আমাদের পড়াশোনার আলোচনা-বৈঠকে 'সংস্কৃতির প্রসারে' ভারি ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তাতে কি ওর বিশ্রী গালাগাল দেওয়াটা আটকে ছিল? পাভকাকে যারা জানে তারা সবাই স্বীকার করবে যে ও খুব ঘন ঘন গালাগাল করে না তা বটে, কিন্তু যখন করে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। নিজে সাধু হওয়ার চেয়ে অন্যের কাছে বক্তৃতা ঝাড়াটা ঢের সোজা।'

কিছুক্ষণের জন্যে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

স্ভেতায়েভের গলার তীক্ষ্ণতায় একটা অপ্রীতিকর ভাব নেমে এল উপস্থিত সবার মনে। করচাগিন সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। ঠোঁট দুটোর ফাঁক থেকে ধীরে ধীরে সিগারেটটা সরিয়ে নিয়ে শান্ত স্বরে সে বলল, 'আমি আর সিগারেট খাব না।'

তারপরে কিছুক্ষণ থেমে সে বলল, 'দিম্‌কার কথা শুনে যতোটা নয়, তার চেয়েও বেশি আমার নিজের জন্যেই আমি এই অভ্যেসটা ছেড়ে দিচ্ছি। যে মানুষ একটা বদ অভ্যেস ছাড়তে পারে না, সে কোনো কাজের নয়। এবার শুধু ওই গাল-পাড়াটার দিকে নজর দিতে হবে। আমি জানি, এই নিতান্ত লজ্জাকর অভ্যেসটা আমি ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে পারি নি। কিন্তু, এমন কি দিম্‌কাও স্বীকার করছে যে খুব ঘন ঘন খারাপ কথা ও আমাকে বলতে শোনে নি। সিগারেট খাওয়াটা বন্ধ করার চেয়ে মুখ দিয়ে একটা খারাপ কথা বেরিয়ে আসাটা বন্ধ করা বেশি কঠিন। সুতরাং এই মুহূর্তেই আমি ওই বদ অভ্যেসটাও ছেড়ে দেবার কথাটা ঠিক বলতে পারছি না। তবে, ছেড়ে দেব নিশ্চয়ই।'

বরফ পড়া শুরু হবার ঠিক আগে নদীর স্রোত বেয়ে নেমে আসা জালানিকাঠের স্তূপ জমে উঠে খালটাকে একদম আটকে দিল। তারপরেই শরৎ-শেষের বন্যা এসে জলের তোড়ে সেই অতি প্রয়োজনীয় জালানিকাঠের স্তূপ এলোমেলো করে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আরেকবার বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সলোমেন্‌কা থেকে লোক পাঠানো হল — ওই মহামূল্যবান জালানিকাঠ বাঁচানো এবারকার কাজ।

সেই সময় বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা লেগে কয়েকদিন থেকে ভুগছিল পাভেল, কিন্তু অন্য সকলের পেছনে পড়ে থাকবার

ইচ্ছে ছিল না তার। এক সপ্তাহ লেগে গেল নদীর ধারে ধারে জ্বালানিকাঠের স্তূপ জড়ো করে তুলতে — ততদিন পর্যন্ত সে তার ঠান্ডা লাগার কথাটা চেপে গিয়েছিল। এতোদিন শত্রুটা তার দেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে মিশে ছিল, এখন বরফের মতো ঠান্ডা জলে আর শরতের কনকনে ভিজে হাওয়ায় সেই শত্রুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—ভীষণ জ্বরে পড়ে গেল পাভেল। দু'সপ্তাহ ধরে কঠিন গিঁঠেবাতের যন্ত্রণায় সারা শরীরটা যেন তার ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর, কারখানায় এসে বাইস্-যন্ত্রটা চালাবার সময়ে পাভেলকে বেঞ্চটার উপর ভর দিতে হত। ফোরম্যান তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ত। কিছুদিন বাদে চিকিৎসা বোর্ড তাকে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করল। কারখানা থেকে মাইনে-খালাস দিয়ে দেওয়া হল তাকে এবং যাতে সে পেনশন পায় তার জন্যে বিশেষ পত্র দেওয়া হল। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে অবশ্য এটা নিতে গররাজি হয়েছিল।

ভারী মন নিয়ে রেল-কারখানা ছেড়ে এল সে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়ায়, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার দারুণ যন্ত্রণা হতে থাকে। মায়ের কাছ থেকে কতকগুলো চিঠি এসেছে, বাড়িতে একবার যাবার জন্যে লিখেছে মা। মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে সেবারকার বিদায় নেবার সময়ে মার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে গেল, 'তোরা তো অসুখে ভুগে কাবু না হয়ে পড়লে আমার কাছে আসিস নে!'

প্রাদেশিক কমিটি থেকে তাকে তার কমসোমল দলিল আর পার্টি সভ্যভুক্তির দলিল দু'খানা দিয়ে দেওয়া হল। বিদায় নেবার আগে বন্ধুদের সঙ্গে যতোটা কম দেখা করা সম্ভব

তাই করল। শহর ছেড়ে চলে এল মার কাছে। দু'সপ্তাহ ধরে মা তার ফোলা-পা দুটোয় সেক দিল আর মালিশ করল। তারপর, একমাস বাদে লাঠির সাহায্য ছাড়াই চলে-হেঁটে বেড়াতে থাকল পাভেল। আরেকবার আনন্দে মন ভরে উঠল তার, আবার অন্ধকার চিরে এল আলো। শিগগিরই সে ফিরে এল প্রাদেশিক কেন্দ্রে। তিন দিন বাদে সেখানকার সাংগঠনিক বিভাগ তাকে পাঠাল আঞ্চলিক সামরিক বিভাগে — তাকে সামরিক ট্রেনিং-এর কোনো একটা ইউনিটে রাজনীতিক কর্মী হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে।

আরও এক সপ্তাহ বাদে পাভেল তুষারাচ্ছন্ন একটা ছোট্ট শহরে এসে পেঁছিল দু'-নম্বর ব্যাটালিয়নে সামরিক কমিশার হিসেবে। কমসোমলের আঞ্চলিক কমিটিও তার ওপরে একটা কাজের ভার দিল: এখানকার ছড়িয়ে-পড়া কমসোমল সভ্যদের জড়ো করে স্থানীয় একটা কমসোমল সংগঠন গড়ে তোলার কাজ। এইভাবে তার জীবনের নতুন পদক্ষেপ শুরু হল।

*

বাইরে দম-আটকানো গরম। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির আপিস-ঘরের খোলা জানলাটা দিয়ে একটা চেরিগাছের ডাল ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। রাস্তার ওপারে পোলিশ গির্জাটার গথিক ধাঁচের ঘণ্টাঘরের ওপরে সোনালি ক্রুশটা রোদে জ্বলজ্বল করছে। জানলার সামনে নিচের আঙিনায় খাবারের খোঁজে ভারি ব্যস্ত চারপাশের ঘাসের মতোই সবুজ রঙের ছোট রাজহাঁসের বাচ্চাগুলো — কার্যনির্বাহক কমিটির এই বাড়িটা দেখাশোনা করে যে মেয়েটি তারই সম্পত্তি এগুলো।

কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি এইমাত্র যে রিপোর্টটা পেয়েছে সেটা পড়ে শেষ করল। মুখের ওপর দিয়ে একটা

ছায়া খেলে গেল তার, লম্বা ঘন চুলের ফাঁকে আঙুল চালাতে চালাতে থেমে গেল তার একখানা বিরাট থাবাওয়ালা গিঁঠে-পড়া হাত।

বেরেজ্‌দভ্‌ কার্যনির্বাহক কমিটির সম্পাদক নিকোলাই নিকোলায়েভিচ লিসিৎসিন-এর বয়েস মোটে চব্বিশ বছর, কিন্তু তার সহযোগী কর্মীদের মধ্যে কিংবা স্থানীয় পার্টি কর্মীদের মধ্যে কেউই তা জানে না। লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষটার গম্ভীর আর মাঝে মাঝে ভয়ানক রকম রাশভারি চেহারাটা দেখে তার বয়েস অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর বলে মনে হয়। বলিষ্ঠ শরীরখানা তার, মোটা ঘাড়ের ওপর বিরাট মাথাটা দৃঢ়ভাবে বসানো, কটা চোখের তীব্র চাউনিতে ইস্পাত-কঠিন উজ্জ্বলতা, শক্ত চোয়াল দেখে বোঝা যায় অত্যন্ত কর্মঠ প্রকৃতির লোক। তার পরনে নীল ব্রীচেজ্‌ এবং পুরনো ধূসর রঙের কোর্তা, তার বাঁ দিকে বুক-পকেটের ওপরে 'লাল পতাকার অর্ডার' আটকানো।

তার বাবা আর ঠাকুর্দার মতোই লিসিৎসিনও বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই ছিল ধাতু-শ্রমিক। অক্টোবর বিপ্লবের আগেই সে তুলা শহরের যুদ্ধোপকরণ তৈরির কারখানায় একটা লেদ যন্ত্র চালিয়েছে।

শরতের সেই রাত্তিরে যেদিন এই কামান-কারিগরটি কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে নিয়ে শ্রমিকের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করতে যায়, সেদিন থেকে সে ঘটনার ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে গেছে। বিপ্লবের আর পার্টির ডাকে কোলিয়া লিসিৎসিন একটা সংগ্রামের কেন্দ্র থেকে আরেকটা সংগ্রামের কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে — লাল ফৌজের একজন সাধারণ সৈন্য থেকে অত্যন্ত গৌরবজনক বীরত্ব দেখিয়ে সে উঠে এসেছে একটা রেজিমেন্টের অধিনায়ক এবং কমিশারের পদে।

যুদ্ধের আগুন আর কামানের আওয়াজ আজ অতীতের ঘটনা। নিকোলাই লিসিৎসিন এখন সীমান্ত-অঞ্চলের একটা জেলায় কাজ করছে। শান্ত আর নির্দিষ্ট গতিতে এখানে বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ইদানীং তার দপ্তরে বসে রাত্রির পর রাত্রি অনেকক্ষণ জেগে ফসল সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়ে। অবশ্য এখন যে-রিপোর্টটা সে পড়ছে সেটা অব্যবহিত অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল তার মনে। টেলিগ্রাফের সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা এটা একটা হুঁশিয়ারি:

> 'বিশেষ গোপনীয়। বেরেজ্‌দভ্‌ কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি লিসিৎসিনের কাছে।
>
> 'সীমান্ত-এলাকায় ইদানীং পোলিশদের বিশেষ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সীমান্ত-জেলাগুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে পোলিশরা সীমানা পারে বড়ো একটা দল পাঠাবার চেষ্টা করছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিন। সংগৃহীত করসুদ্ধ অর্থ-বিভাগের দামী সমস্ত জিনিসপত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তাব করুন।'

জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির এই দপ্তর-বাড়িটায় কেউ ঢুকলে তাকে এই জানলাটা দিয়ে লিসিৎসিন দেখতে পায়। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই সে সামনের বারান্দাটায় সিঁড়িতে পাভেল করচাগিনকে দেখতে পেল এবং এক মুহূর্ত পরেই তার দরজার ওপরে ঠুকঠাক শব্দ উঠল।

পাভেলের সঙ্গে করমর্দন করার পর লিসিৎসিন বলল, 'বোসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

পুরো একঘণ্টা ধরে দপ্তর-ঘরে নিভৃতে বসে বসে কথাবার্তা বলল দু'জনে।

পাভেল যখন দপ্তর থেকে বেরিয়ে এল তখন বেলা দুপুর। বাইরে বেরুতেই লিসিৎসিনের ছোট্ট বোনটি আনিউৎকা বাগানের দিক থেকে ছুটে এল তার কাছে। ভীরু স্বভাবের বাচ্চা মেয়েটি তার বয়সের তুলনায় দারুণ গম্ভীর। করচাগিনকে দেখেই সে সবসময়ে খুশির হাসি হাসে। এবারও পাভেলকে দেখে সে তার কপালের ওপর এসে-পড়া ছাঁটা চুলের একটা গোছা আলগোছে সরিয়ে দিয়ে সলজ্জ খুশির হাসি হাসল।

'কোলিয়া খুব ব্যস্ত নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে, 'মারিয়া মিখাইলভনা অনেকক্ষণ থেকে তার খাবার তৈরি করে বসে আছেন।'

'ভেতরে চলে যাও, আনিউৎকা, ও একাই আছে।'

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে তিনটে গাড়ি এসে থামল কার্যনির্বাহক কমিটির বাড়িটার সামনে। হৃষ্টপুষ্ট সব ঘোড়া জোতা আছে গাড়িগুলোর সঙ্গে। গাড়িগুলোর সঙ্গে যে কয়েকজন লোক ছিল তারা নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলাবলি করল, তারপর অর্থ বিভাগের ঘর থেকে গোটাকতক সীলমোহর করা বস্তা বের করে এনে গাড়িতে চাপানো হল এবং কয়েক মিনিট বাদে বড়ো রাস্তার বুক বেয়ে মিলিয়ে গেল চাকার ঘর্ঘর শব্দ। করচাগিনের নেতৃত্বে একটা শান্ত্রীদল এই গাড়িগুলো পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র অবধি চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা (তার মধ্যে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পথ বনের মধ্যে দিয়ে গেছে) তারা নিরাপদে পার হয়ে এল এবং দামী জিনিসগুলো পেঁছে গেল আঞ্চলিক অর্থ বিভাগের সিন্দুকে।

এর কয়েক দিন বাদে সীমান্তের দিক থেকে একজন

ঘোড়সওয়ার দারুণ জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে ঢুকল বেরেজ্দভ্ শহরে। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলার সময়ে পথের ধারের আড্ডাবাজ স্থানীয় লোকেরা বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কার্যনির্বাহক কমিটির বাড়ির দেউড়িতে এসে ঘোড়সওয়ারটি লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে, এক হাতে তার তলোয়ারটা চেপে ধরে ভারি বুটের আওয়াজ তুলে সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। দুর্ভাবনায় ভ্রূকুঞ্চিত করে লিসিৎসিন তার হাত থেকে আঁটা চিঠিখানা নিল। কয়েক মিনিট পরেই বার্তাবহটি জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে।

কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ছাড়া আর কেউ জানল না কী লেখা ছিল ঐ চিঠিতে। কিন্তু এই রকমের খবর কী করে যেন ছড়িয়ে পড়ে — বিশেষত স্থানীয় দোকানদারদের মধ্যে, এদের অধিকাংশই অল্পস্বল্প চোরাই চালান করে থাকে। এই কারবার করতে করতে তাদের যেন একটা সহজ প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছে যাতে কোথাও কোনো বিপদ আসন্ন হয়ে উঠলে সেটা তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে।

সর্বজনীন সামরিক ট্রেনিং ব্যাটালিয়নের সদর-দপ্তরের দিকে রাস্তার পাশে বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে দুজন। এদের একজন পাভেল করচাগিন, তার কোমরে পিস্তল ঝুলছে। কিন্তু তা দেখে পথচারী দর্শকদের মনে বিস্ময় জাগল না — কারণ, ওটা তার থাকে সব সময়েই। কিন্তু তার সঙ্গে পার্টি কমিটির সম্পাদক ত্রফিমভের কোমরেও যে পিস্তল বাঁধা, সেইটেই কেমন যেন দুর্লক্ষণ বলে মনে হল।

কয়েক মিনিট বাদে বেয়নেট-লাগানো রাইফেল এবং পিস্তল হাতে সদর-দপ্তর থেকে বেরিয়ে পড়ল জন বারো লোক,

চৌমাথার মোড়ে ময়দা-কলের বাড়িটার কাছে ছুটে এল তারা। পার্টি কমিটির দপ্তরে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমসোমল সভ্যদের বাকি সবাইকে অস্ত্র দেওয়া হল। কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল, তার মাথায় কসাক টুপি, তার কোমরবন্ধনীতে যথারীতি ঝুলছে মোজার-পিস্তলটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। বড়ো ময়দানটা আর আশেপাশের রাস্তাগুলো নির্জন হয়ে গেল। জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না কোথাও। চক্ষের পলকে ছোট্ট ছোট্ট দোকান-ঘরগুলোর দরজায় বিরাট আকারের মধ্যযুগীয় কুলুপ পড়ে গেল আর জানলার ওপরে হুড়কো আটকে খড়খড়ি বন্ধ করে দেওয়া হল। শুধু নির্ভীক মুরগি আর শুয়োরগুলো জঞ্জালের স্তূপে ঘেঁটে চলেছে।

শহরের প্রান্তে বাগানগুলোর আড়ালে আড়ালে পাহারা মোতায়েন করে দেওয়া হল। সেখান থেকে ফাঁকা মাঠগুলো আর দূরে মিলিয়ে-যাওয়া সোজা রাস্তাটা তারা বেশ ভালোরকম দেখতে পাচ্ছে।

লিসিৎসিনের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে যে খবরটা এসেছিল, তা খুব সংক্ষিপ্ত:

> 'গত রাত্রে পোদ্দুবেৎসি এলাকায় একটা সংঘর্ষের পর প্রায় এক-শো জন ঘোড়সওয়ার সৈন্য দুটো হাল্কা মেশিনগান নিয়ে সোভিয়েত অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিন। ঘোড়সওয়ার দলটা কোন দিকে গেছে তার চিহ্নটা স্লাভুতার বন পর্যন্ত গিয়ে হারিয়ে গেছে। দলটাকে খুঁজে বের করার জন্যে লাল ফৌজের একটা কসাক-কম্পানি পাঠানো হয়েছে। আজ দিনের বেলায় কোনো এক সময়ে ঐ কসাক বাহিনী

বেরেজ্‌দভের মধ্যে দিয়ে যাবে — এদের শত্রু বলে ভুল করবেন না।

গাভ্রিলভ

স্বতন্ত্র সীমান্তরক্ষী ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার।'

ঘণ্টাখানেকও কাটে নি, শহরমুখো সড়কটার ওপর একজন ঘোড়সওয়ার দেখা দিল। তার প্রায় এক কিলোমিটার পেছন পেছন একদল ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। পাভেল কর্চাগিন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। যে-ঘোড়সওয়ারটি একা এগিয়ে আসছে সে লাল ফৌজের সাত-নম্বর কসাক রেজিমেণ্টের একটি তরুণ সৈনিক, শত্রুপক্ষের ঘাঁটি সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কাজে বেরিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের কাজে সে এখনও আনাড়ি, তাই, পথের ধারে বাগানের গাছগাছালির আড়াল থেকে যখন সশস্ত্র লোকের দল রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে তাকে তখন তাদের কোর্তার ওপরে কমসোমলের চিহ্ন দেখে বোকার মতো হাসল সে। সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা বলে নিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে দ্রুত ফিরে গেল পেছনের ঘোড়সওয়ার দলটার দিকে, তারা ততক্ষণে দুলকি চালে এগিয়ে আসছে। পাহারার কাজে যারা আছে তারা লাল ফৌজের কসাক দলটাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে ফের বাগানের মধ্যে ঢুকে পাহারাদারির কাজে লেগে গেল।

কয়েকটা উদ্বিগ্ন দিন কেটে যাবার পর লিসিৎসিন খবর পেল যে ওই ঘোড়সওয়ার দলটার হানা ব্যর্থ হয়েছে। লাল ফৌজের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কাছ থেকে তাড়া খেয়ে তাদের হুড়মুড় করে সীমান্তের ওপারে পালাতে হয়েছে।

মুষ্টিমেয় জনকতক বলশেভিক — সংখ্যায় তারা মোটে

উনিশ জন—এই জেলায় নতুন সোভিয়েত জীবন গড়ে তোলার কাজে উৎসাহের সঙ্গে উঠে-পড়ে লেগে গেল। এটা একটা নতুন প্রশাসনিক এলাকা, সুতরাং, সমস্ত কিছুই একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া, সীমান্তের কাছাকাছি হবার ফলে সদাসতর্ক প্রহরার দিকে নজর রাখার দরকার পড়ল।

লিসিৎসিন, ত্রফিমভ, করচাগিন আর সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে যে ছোট দলটি তারা গড়ে তুলেছে তাদের প্রত্যেককেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারাদিন খাটতে হয় — সোভিয়েত সংগঠনগুলির পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়, ডাকাতদলগুলোকে রুখবার জন্যে লড়তে হয়, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম গড়ে তুলতে হয়, বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হয়, সামরিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হয়, তাছাড়া, পার্টির এবং কমসোমলের সব কাজের দায়িত্বও তাদের উপর।

ঘোড়ার জিন থেকে লেখার ডেস্কে আর ডেস্ক থেকে ময়দানে, যেখানে তরুণ সামরিক শিক্ষার্থীরা ধৈর্যের সঙ্গে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, ঘোরাঘুরি করাব পর ক্লাবে আর স্কুলে এবং তার উপর আবার দু'-তিনটে কমিটির সভা — এই হচ্ছে দু'-নম্বর ব্যাটালিয়নের সামরিক কমিশারের দৈনিক কাজের তালিকা। রাত্রিগুলো তার প্রাযই ঘোড়ার পিঠেই কাটে, মোজার-পিস্তলটা থাকে কোমরে। সেসব রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে তীক্ষ্ণ আওয়াজ ওঠে: ‘থামো! কে যায়?’ আর সীমান্তের ওপার থেকে বেআইনীভাবে চালান-দেওয়া মালে বোঝাই দ্রুতগতি একটা গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

বেরেজ্‌দভের জেলা কমসোমল কমিটিতে আছে পাভেল করচাগিন, লিদা পলোভিখ্ — ভলগা এলাকার মেয়ে, মহিলা-

বিভাগের নেত্রী, আর ঝেন্‌কা রাজ্‌ভালিখিন -- লম্বা, সুন্দর চেহারার তরুণ, মাত্র অল্প কিছু দিন আগেও সে ছিল হাই-স্কুলের ছাত্র। লোমহর্ষক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্পের প্রতি রাজ্‌ভালিখিনের একটা দুর্বলতা আছে, শার্লক হোম্‌স্‌ আর লুই বুসেনার সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ। ইতিপূর্বে সে পার্টির জেলা কমিটির দপ্তর ম্যানেজার ছিল এবং মাত্র চার মাস আগে কমসোমলে যোগ দিলেও সে নিজেকে একজন 'পুরনো বলশেভিক' বলে জাহির করত। বেশ খানিকটা ইতস্তত করার পর আঞ্চলিক কমিটি তাকে বেরেজ্‌দভে পাঠিয়েছিল রাজনীতিক শিক্ষার কাজের ভার নেবার জন্যে — কারণ, সেখানে এ কাজে লোক দরকার, অথচ, আর কাউকে পাঠাবার মতো পাওয়া যায় নি।

সূর্য মাথার ওপরে উঠেছে। সবকিছু আড়াল ভেদ করে তাপ ঢুকছে সর্বত্র। সমস্ত প্রাণী ছায়ার আশ্রয় খুঁজছে। কুকুরগুলো পর্যন্ত চালার নিচে ঢুকে হাঁফ ছাড়ছে আর ঝিম-ধরা অবস্থায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। কুয়োর পাশেই একটা কাদার গর্তে একটা শুয়োর আরামে লুটোপুটি খাচ্ছে — গোটা গ্রামটায় এইটেই একমাত্র জীবনের চিহ্ন।

পাভেল করচাগিন তার ঘোড়ার বাঁধনটা খুলে নিয়ে হাঁটুর যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে জিনের ওপর চেপে বসল। স্কুল-বাড়ির সিঁড়িটার ওপরে শিক্ষয়িত্রীটি দাঁড়িয়েছিল হাতের তেলোয় রোদ্দুর থেকে চোখ আড়াল করে।

'আবার শিগগিরই আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি, কমরেড সামরিক কমিশার,' হেসে বলল সে।

অধৈর্যভাবে পা ঠুকল ঘোড়াটা, ঘাড় বাড়িয়ে ধরে লাগামে টান লাগাল।

'আচ্ছা চলি, কমরেড রাকিতিনা। তাহলে, ওই ঠিক থাকল: কাল থেকেই আপনি পড়ানো শুরু করে দেবেন।'

লাগামের টানটা কমেছে অনুভব করতেই ঘোড়াটা দ্রুত কদমে চলা শুরু করে দিল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত চিৎকার পাভেলের কানে এল। গ্রামে আগুন লাগলে মেয়েরা যেমন চিৎকার করতে থাকে, সেইরকম শোনাল আওয়াজটা। হেঁচ্‌কা একটা টানে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাভেল দেখে একটি অল্পবয়সী চাষী মেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে গ্রামের দিকে। রাস্তার মাঝখানে ছুটে এগিয়ে এসে রাকিতিনা থামাল তাকে। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে আশপাশের কুটিরগুলো থেকে মুখ বের করে তাকাল প্রতিবেশীরা--এদের বেশির ভাগই বুড়োবুড়ী, কারণ জোয়ান চাষীরা সবাই মাঠের কাজে গেছে!

'হায়, হায়! ভালোমানুষের বাছারা সব শিগগির এসো গো, শিগগির ছুটে এসো! ওরা ওদিকে খুনোখুনি করে মরছে গো!'

এক ছুটে ঘোড়া হাঁকিয়ে যখন এই জায়গাটায় এসে পড়ল পাভেল তখন মেয়েটিকে ঘিরে বেশ কিছু লোকের ভিড় জমে উঠেছে—কেউ বা তার শাদা ব্লাউজটা ধরে টানছে, কেউ বা উদ্বিগ্ন প্রশ্নবৃষ্টি করে চলেছে, কিন্তু তার অসংলগ্ন কথার কোনো মানে কেউ বের করতে পারছে না। শুধু বলে চলেছে, 'খুন! কেটে ফেলছে ওরা সবাইকে..'

তখন লম্বা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো এলোমেলোভাবে পা ফেলে ফেলে তার ঘরে-বোনা কাপড়ের পাৎলুনটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে দৌড়ে এল। বিকারগ্রস্ত মেয়েটাকে উদ্দেশ করে, চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এই! প্যানপ্যানানি থামা শিগগিব! কে খুন হল? আরে, ব্যাপারখানা কি? চ্যাঁচানিটা থামা হতভাগী!

'আমাদের আর ওই পোদ্দুবেৎসির লোকজন... জমির

চৌহদ্দি নিয়ে মারামারি বাধিয়েছে আবার। আমাদের লোকজনদের কেটে ফেলছে ওরা!'

এইটুকুতেই সব বুঝে গেল সবাই। মেয়েরা তারস্বরে কান্নাকাটি করতে লাগল, বুড়োরা রাগে গজরাতে লাগল। সারা গ্রামজুড়ে ঘরে ঘরে উঠোনে-আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা: 'পোদ্দুবেৎসির লোকজন এসে কাস্তে দিয়ে আমাদের লোকজনদের গলা কেটে ফেলছে... আবার ওই জমির চৌহদ্দি নিয়ে বেধেছে!' রোগে শয্যাশায়ী যারা শুধু তারাই ঘরে পড়ে রইল। বাকি সবাই কোদাল-কুড়ুল নিয়ে কিংবা বাড়ির ছিটেবেড়ার গা থেকে বাতা তুলে নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে ছুটে চলল মাঠের দিকে, যেখানে দুই গ্রামের লোকজন জমির সীমানা নিয়ে তাদের বাৎসরিক রক্তাক্ত শক্তিপরীক্ষায় নেমেছে।

করচাগিন একটা চাবুক হাঁকাতেই ঘোড়াটা দারুণ জোরে ছুটে চলল। ছুটে চলা গ্রামবাসীদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলল ঘোড়াটা। পেছন দিকে কান দুটো টান করে ধরে, মাটির বুকে প্রচণ্ড শব্দে খুর ঠুকে ঠুকে ঘোড়াটা হাওয়ার বেগে ক্রমশই দ্রুত ছুটে চলল। সামনের ঢিবির ওপরে একটা বায়ুচালিত জাঁতাকল বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন পথ আটকাবার উদ্দেশ্যেই। ডান দিকে নদীর পাড়ে নিচু প্রান্তর, আর বাঁ দিকে একটা রাই-খেত উঠে গিয়ে আবার নেমে দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে। পাকা শস্যের শীষের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলিয়ে চলেছে। পথের ধারে পপি ফুলের উজ্জ্বল লাল লাল ছিটে। জায়গাটা নিস্তব্ধ আর অসহ্য গরম। কিন্তু দূরে নদীর রুপোলী ফিতের ফালিটুকু যেখানে রোদে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে লড়াইয়ের চিৎকার।

উন্মত্ত বেগে খেতের দিকে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা। বিদ্যুতের মতো একটা ভাবনা খেলে গেল পাভেলের মনে, 'ঘোড়াটার পা যদি হড়কায়, তাহলে আমরা দু'জনেই খতম হয়ে যাব।' কিন্তু এখন থামার অবসর নেই, জিনের ওপর নিচু হয়ে বসে কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাবার সোঁ-সোঁ শব্দ শোনা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।

ঘূর্ণির বেগে পাভেল ছুটে এসে পড়ল মাঠের মধ্যে, যেখানে চলেছে সেই রক্তাক্ত হাঙ্গামা। ইতিমধ্যেই জনকতক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে আছে।

অল্পবয়েসী একটি ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, তাকে তাড়া করেছে একটা কাস্তের হাতল বাগিয়ে ধরে একজন দাড়িওয়ালা চাষী—ঘোড়াটা এসে পড়ল তার ওপরে। পাশেই রোদে-পোড়া মুখ বিরাট শরীর একটা লোক তার মস্ত বড়ো আর ভারি বুটসুদ্ধ পা তুলে সাংঘাতিক লাথি ঝাড়তে যাচ্ছে মাটিতে পড়ে-যাওয়া তার শিকারের ওপরে।

লড়াইয়ে মত্ত মানুষগুলোর মধ্যে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ে পাভেল তাদের চারদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। মানুষগুলো তাদের বিস্ময়টা কাটিয়ে ওঠার আগেই সে এদের একবার এর, একবার ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া হাঁকাতে থাকল। সে বুঝেছে যে ওদের প্রত্যেকের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলাই এই জানোয়ার বনে-যাওয়া তালগোল-পাকানো মানুষগুলোকে আলাদা করে দেবার একমাত্র উপায়।

'সরে যা, শুয়োরের দল!' ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'নইলে প্রত্যেককে ধরে ধরে গুলি করব, শয়তান ডাকাত যতসব!'

পাশবিক ক্রোধে বিকৃত পাশ-ফেরানো একটা মুখ দেখে পাভেল তার পিস্তলটা বের করে নিয়ে লোকটার মাথার

উপর দিয়ে গ্নলি ছ্নড়ল। আরেকবার ঘ্নরে দাঁড়াল ঘোড়াটা, আরেকবার গর্জন করে উঠল পিস্তলটা। লড়নেওয়ালাদের মধ্যে জনকতক হঠে গেল তাদের কাস্তে ফেলে দিয়ে। মাঠের ওপর দিয়ে চারদিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছ্নটতে ছ্নটতে অনবরত গ্নলি ছ্নঁড়ে কমিশার শেষে অবস্থাটাকে আয়ত্তে এনে ফেলল। পালিয়ে যেতে আরম্ভ করল চাষীরা। মারামারি করে রক্তপাত ঘটাবার দায়িত্ব এড়াবার জন্যে এবং এই ক্রোধোন্মত্ত ভয়ংকর ঘোড়সওয়ারটির অবিশ্রান্ত গ্নলিচালনার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তারা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যক্রমে মারা পড়ে নি কেউ, জখম হয়েছিল যারা তারা সেরে উঠল। কয়েক দিন বাদে মামলাটার শ্ননানির জন্যে পোদ্দ্নবেৎসিতে জেলা আদালত বসল, কিন্তু ওই মারামারির ব্যাপারে পাণ্ডা ছিল যারা তাদের বের করার জন্যে বিচারকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। সত্যিকারের বলশেভিকের ধৈর্য আর একাগ্রতা নিয়ে বিচারক অপ্রসন্ন-ম্নখ চাষীদেব ব্নঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল তাদের কাজটা কতোখানি বর্বরোচিত হয়েছে। এ ধরনের মারামারি যে কিছ্নতেই আর সহ্য করা হবে না, এ কথাটাও সে তাদের জানিয়ে দিল।

চাষীরা বলল, 'যতো দোষ ওই জমির চৌহদ্দির, কমরেড বিচারক। কীভাবে যেন ওগ্নলো সব গ্নলিয়ে যায়—প্রতি বছর আমাদের লড়াই করে ওর ফয়সালা করতে হয়।'

যাই হোক, জনকতক চাষীকে মারামারি ঘটনাটার জন্যে শাস্তি পেতে হল।

যে ঘাসের জমিগ্নলোকে নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল সেখানে সপ্তাহখানেক বাদে জনকতক লোকের একটা কমিশন গিয়ে

খেতের ফালিগুলোর ধারে ধারে খুঁটি পুঁতে সীমানা নির্দিষ্ট করতে লেগে গেল।

কমিশনের সঙ্গে যে বৃদ্ধ আমিন এসেছিল সে তার ফিতেটা জড়াতে জড়াতে করচাগিনকে বলল, 'তিরিশ বছর ধরে আমি এই জমি-জরিপের কাজ করছি, সব সময়ে দেখেছি এই দুই জমির মাঝখানকার আল্ নিয়েই যতো গণ্ডগোল বাধে।' গরম, আর তার উপর পায়ে হেঁটে অনেকখানি ঘোরাঘুরি করার ফলে বৃদ্ধের দারুণ ঘাম ঝরছে।

'ঘাসের জমিগুলো যে কীভাবে ভাগ করা হয়েছে তা দেখলে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। মাতাল লোকেও বোধহয় এতোটা আঁকাবাঁকা লাইন টানে না। আর, আবাদী-খেতগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। তিন-পা চওড়া এক-একটা ফালি, একটার ওপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে—প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে নেবার চেষ্টা করতে গেলে পাগল হয়ে যেতে হয়। প্রতি বছর আবার এই জমিগুলো আরও বেশি বেশি সংখ্যায় ভাগাভাগি হয়ে যায়—ছেলেরা বড়ো হয়ে ওঠে আর বাপেরা তাদের জমি ভাগ করে আলাদা করে দেয়। বিশ্বাস করুন. কুড়ি বছর পরে আর আবাদ করার মতো জমি বাকি থাকবে না, সব আল্ হয়ে যাবে। এখনই তো এইভাবে শতকরা দশ ভাগ জমি নষ্ট হয়।'

হাসল করচাগিন, 'কুড়ি বছর পরে একটা আল্ও থাকবে না, কমরেড আমিন।'

প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল বৃদ্ধ আমিন।

'কমিউনিস্ট সমাজের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো হল গিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের কথা, তাই না?'

'বুদানোভ্কা যৌথখামারের কথা আপনি শোনেন নি?'

'ও, বুঝেছি, কি বলতে চাচ্ছেন।'

'তা হলে?'

'আমি বুদানোভ্কায় গিয়েছি। কিন্তু সেটা তো হল গিয়ে একটা ব্যতিক্রম, কমরেড করচাগিন।'

খেত-জমির টুকরোগুলো মাপ-জোখ করে চলল কমিশনের লোকজন। দুটি ছেলে হাতুড়ির ঘায়ে খুঁটি পুঁতে চলল। আর, দুধারের চাষীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল—আগেকার সীমানার লাইন বরাবর যেখানে ঘাসের ফাঁকে আধ-পচা খুঁটিগুলো দেখা যাচ্ছে, ঠিক সেই সেই জায়গায় এই নতুন খুঁটিগুলো পোঁতা হচ্ছে কি না।

হাড় জিরজিরে ঘোড়াটার ওপরে চাবুক কষিয়ে অতিভাষী গাড়োয়ানটি ঘুরে বসল গাড়ির সওয়ারদের দিকে।

'এই কমসোমলের ছেলেগুলো যে কোথা থেকে এসে জুটল কি জানি!' অনর্গল বকবক করে চলল সে, 'এ ধরনের ব্যাপার আগে কখনও ঘটেছে বলে তো মনে পড়ে না। ইস্কুলের ওই মাস্টারনী মেয়েটাই এ সব শুরু করেছে নিশ্চয়। রাকিতিনা ওর নাম, বোধহয় চেনো ওকে তোমরা? নেহাত ছুঁড়ি একটা, কিন্তু গোলযোগ বাধাচ্ছে! গাঁয়ের যতো মেয়েমানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, যতো সব আজেবাজে ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওদের মাথায়, আর তারই ফলে নানান গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। এতোদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা যে আজকাল আর লোকে তাদের বউদের মারধোর করতে পারে না! আগেকার দিনে মেজাজ বিগড়ে গেলে বুড়ি বউটাকে এক-আধটা চড়চাপড় মারত, আর সেও তাতে গুটিসুটি মেরে যেত, হয়তো একটু মুখ গোমড়া করে থাকত, কিন্তু ইদানীং মারলে ওরা এমন সোরগোল তোলে যে গায়ে হাত না তুললেই ভালো হত বলে মনে হয় তখন। জন-আদালতের

কথা বলে শাসায়, আর অল্পবয়েসী বউগুলো তো তালাক দেবার কথা তোলে, যতোসব আইনের বুলি আওড়ায়। আমার এই গান্‌কাকেই দেখো না—ভাবতেই পারবে না কী ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে ছিল সে—আজকাল একদম বিগড়ে গেছে, কি যেন প্রতিনিধি না কি হয়েছে- তার মানে হল গিয়ে বোধহয়—মেয়েদের মধ্যে মাতব্বর গোছের আর কি। সারা গাঁয়ের মেয়েরা ওর কাছে এসে জোটে। কথাটা শোনার পর আমি তো ওকে চাবুক মেরে বসতে গিয়েছিলাম আর কি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবলাম—মরুক গে যাক। চুলোয় যাক ওরা! বকবক করুক না! ও কিন্তু সংসারের কাজেকর্মে খারাপ মেয়ে নয়।'

ঘরে-বোনা শার্টের খোলা বোতামের ফাঁক দিয়ে গাড়োয়ানের লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে। বুকটা চুলকে নিয়ে সে ঘোড়াটার পেটের নিচে একটা চাবুক হাঁকাল। গাড়িতে দু'জন সওয়ার—রাজ্‌ভালিখিন আর লিদা। পোদ্দুবেৎসিতে কাজে চলেছে তারা দু'জনেই। মেয়ে-প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল লিদার। আর, রাজ্‌ভালিখিনকে পাঠানো হচ্ছে সেখানকার সেলের কাজকর্ম সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে।

'তাহলে আপনি দেখছি কমসোমলদের পছন্দ করেন না?' লিদা কৌতুক করে জিজ্ঞেস করল গাড়োয়ানকে।

ছোট দাড়ি টানতে টানতে একটু চুপ করে থেকে পরে সে উত্তর দিল, 'না, এতে কী আছে... আমার বিশ্বাস, ছেলেমেয়েদের একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে দেওয়া উচিত। নাটক অভিনয় করতে চায় বা ওই রকম কিছু করতে চায় তো করুক না। আমি নিজে হাসির নাটক দেখতে বড়ো

ভালবাসি - অবশ্য যদি ভালো নাটক হয়। গোড়ার দিকে আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম যে ছেলেমেয়েরা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, কিন্তু এখন দেখছি একদম অন্যরকম দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। আমি এর-ওর মুখে শুনেছি—মদ খাওয়া, মারপিট করা, এসব ব্যাপারে ভয়ানক কড়াকড়ি নিয়ম ওদের। লেখা-পড়ার দিকেই ওদের বেশি নজর। কিন্তু ধর্মে ওদের একেবারেই মতি নেই, গির্জাটাকে নিয়ে ক্লাব-ঘর হিসেবে ব্যবহার করার দিকে ওদের সবসময়ে চেষ্টা। ওটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না—বুড়োবুড়িরা এর ফলে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মোটের ওপর ওরা ততো খারাপ নয়। অবশ্য, কথাটা তুললে যখন তখন বলতে পারি--গাঁয়ের ওই যতোসব নিতান্তই গরিব আর বেকার লোক, যারা দিন-মজুরি খাটে বা নিজের নিজের খেত-খামার চালাতে পারে না, তাদের ওরা দলে ভিড়িয়ে নিয়ে একটা মস্ত বড়ো ভুল করছে। ধনী চাষীদের ছেলেদের সঙ্গে ওরা কোনো সম্পর্ক রাখে না।'

ঘর্ঘর শব্দ তুলে টিলাটা বেয়ে নেমে এসে গাড়িটা ইস্কুল-বাড়ির সামনে থামল।

ইস্কুল-বাড়িটার দেখাশোনা করে যে মেয়েটি সে ঘরখানায় আগন্তুকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে শুতে গেল খড় রাখার চালাটায়। লিদা আর রাজ্‌ভালিখিন এইমাত্র একটা সভা থেকে ফিরেছে, বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে সভাটা ভাঙতে। কুটিরটার ভেতরে অন্ধকার। জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে লিদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক বাদে রাজ্‌ভালিখিনের হাতের স্থূল স্পর্শে লিদার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, হাতখানা তার দেহের ওপর এমনভাবে নড়াচাড়া করছে যে রাজ্‌ভালিখিনের মতলব সম্বন্ধে লিদার মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না।

'কী চাও?'

'আস্তে, লিদা, অতো চেঁচিয়ো না। একা একা ওখানে শুয়ে থাকতে আর পারছি না। নাক-ডাকানোর চেয়ে উত্তেজক আর কিছু কি তোমার করবার নেই?'

তাকে একটা ধাক্কা মেরে ঠেলে দিতে দিতে লিদা বলল, 'আমার গায়ে থাবা মারা বন্ধ করে এখুনি নেমে যাও এই বিছানা থেকে!' রাজ্ভালিখিনের কামাসক্ত হাসিটা লিদার কোনোদিনই ভালো লাগে নি। অত্যন্ত অপমানজনক কিছু একটা বলার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুজল সে।

'হয়েছে, হয়েছে, থাক্! তুমি তো আর খৃস্টান সন্ন্যাসিনীদের মঠে মানুষ হও নি। সরল কচি খুকীটির মতো ভাব দেখিয়ে এই ছেলেটিকে বোকা বানাতে পারবে না। যদি সত্যিই আধুনিকা হও, তবে আমার কামনার দাবি মেটাবার পর যতো পারো ঘুমোও।'

লিদা ব্যাপারটা বুঝে গেছে ধরে নিয়ে রাজ্ভালিখিন এগিয়ে এসে ফের বসল তার বিছানার প্রান্তে, হাতখানা বাড়িয়ে চেপে ধরল লিদার কাধ।

'চুলোর দুয়োরে যা, হতভাগা!' এবারে লিদা সম্পূর্ণ জেগে গেছে, 'কালই আমি করচাগিনকে বলে দেব সব কথা।'

লিদার হাতখানা চেপে ধরে রাজ্ভালিখিন রাগে দাঁত চেপে খিটখিটিয়ে বলল, 'তোমার ওই করচাগিনকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি নে। বাধা দেবার চেষ্টা কোর না, তাহলে জোর খাটাব বলে দিচ্ছি।'

অল্প একটু ধস্তাধস্তির শব্দ, আর তারপরেই রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল দুটো চড় মারার আওয়াজ...

লাফিয়ে একপাশে সরে গেল রাজ্‌ভালিখিন। হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল লিদা, ঠেলে খুলে ফেলল দরজাটা, ছুটে বেরিয়ে এল আঙিনায়। দাঁড়িয়ে রইল চাঁদের আলোয়। রাগে ঘৃণায় সে হাঁফাচ্ছে।

রাজ্‌ভালিখিন ক্রুদ্ধ গলায় লিদার উদ্দেশে বলল, 'ভেতরে যাও, আহাম্মক!'

সে তার নিজের বিছানাটা ঘরের বাইরে চালাটার নিচে তুলে নিয়ে এসে বাকি রাতটুকু সেখানে কাটাল। লিদা দরজাটায় খিল আটকে বন্ধ করে দিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে বাড়ি যাবার সময়ে রাজ্‌ভালিখিন বুড়ো গাড়োয়ানের পাশে বসে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকে চলেছে।

'ছুঁচিবাইওয়ালা মেয়েটা হয়তো সত্যিই করচাগিনের কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে, হতচ্ছাড়ী কোথাকার! ও যে এতোটা দেমাক দেখিয়ে বসবে তা কে জানত। আসলে এমন কিছু দেখতে নয়, এদিকে হাবভাব এমন দেখায় যে মনে হয় যেন কতোই সুন্দরী। কিন্তু ওর সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলাই ভালো, নইলে ফ্যাসাদ বাধবে। এমনিতেই তো করচাগিনের নজর আছে আমার ওপরে।'

লিদাব কাছে এসে বসল সে। যেন কতোই অনুশোচনা হয়েছে তার—এমনি একখানা ভাব দেখিয়ে মনমরা হয়ে পড়ার ভান করে ক্ষমা চেয়ে এলোমেলো কতকগুলো কথা বলল।

খেটে গেল ফন্দিটা। গাড়িটা শহরের প্রান্তে পেঁছনোর আগেই লিদা তাকে কথা দিল যে রাত্রের ঘটনাটার কথা সে কাউকে বলবে না।

সীমান্ত-অঞ্চলের গ্রামগুলোয় একে একে কমসোমল সেল গড়ে উঠছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই নবজাত অংকুরগুলিকে যত্নের সঙ্গে লালন করে চলেছে জেলা কমিটির সভ্যেরা। পাভেল করচাগিন আর লিদা পলোভিখ্ বিভিন্ন অঞ্চলে কমসোমলের সভ্যদের সঙ্গে কাজে অনেক সময় দেয়।

রাজ্ভালিখিন গ্রামাঞ্চলে যাওয়াটা বিশেষ পছন্দ করে না। চাষী ছেলেদের বিশ্বাস কী করে অর্জন করতে হয় তা তার জানা নেই, সমস্ত ব্যাপারে তালগোল পাকাতেই শুধু পারে সে। চাষী তরুণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলার ব্যাপারে লিদা আর পাভেলের কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গেই লিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়, নিজেদের একজন বলেই তাকে গ্রহণ করে এবং ক্রমশ কমসোমল আন্দোলন সম্বন্ধে সে তাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। আর করচাগিনকে তো জেলার সমস্ত তরুণতরুণীই চেনে। সামরিক বিভাগে কাজের জন্যে যে এক হাজার ছ'শো জন তরুণের ডাক পড়ার কথা, তারা সবাই পাভেলের ব্যাটালিয়নে প্রাথমিক ট্রেনিং পেয়ে গেছে। এখানে গ্রামে গ্রামে প্রচারের ব্যাপারে তার অ্যাকর্ডিয়ন বাজনা যতোটা কাজে লেগেছে এমনটি আর কখনও নয়। এই বাজনাটা পাভেলকে এখানকার তরুণদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছে। গ্রামের পথে সন্ধ্যের দিকে ওরা জড়ো হয় গানবাজনা উপভোগ করার জন্যে। এই সব শৌখিন ঝাঁকড়া-চুলো তরুণদের অনেকের পক্ষেই এই অ্যাকর্ডিয়নের মন-মাতানো সুর শুনতে শুনতে কমসোমলে ঢোকার পথ শুরু হল এখান থেকেই — কখনও আবেগভরা সুরে মনকে নাড়া দিয়ে, কখনও দীপ্ত উদ্দীপনায়, আবার কখনও মধুর কোমলতায় সুর বেজে চলে — এমন সুর আছে শুধু ইউক্রেনের এই বিষণ্ণ বিধুর গানগুলিতেই।

ওরা অ্যাকর্ডিয়নের বাজনা শোনে, আর যে-তরুণটি এই অ্যাকর্ডিয়ন বাজায় তার কথাগুলিও শোনে—সে ছিল রেল-কারখানার একজন শ্রমিক আর এখন সে সামরিক কমিশার আর কমসোমলের সম্পাদক। তরুণ এই কমিশার যে কথাগুলি তাদের বলে সেই কথাগুলির সঙ্গে তার অ্যাকর্ডিয়নের সুর যেন একটি ঐকতানে মিশে যায়। নতুন নতুন গানে মুখরিত হয়ে উঠছে গ্রামগুলো, কুটিরগুলোয় বাইবেল আর প্রার্থনাগানের বইয়ের পাশাপাশি নতুন নতুন বই দেখা দিচ্ছে।

বেআইনী মাল চালান করে যারা তাদের এখন সীমান্তপ্রহরীদের ছাড়াও আরও অনেকের তাল সামলাতে হয়। সোভিয়েত সরকার কমসোমল সভ্যদের পেয়েছে অতি বিশ্বস্ত বন্ধু আর উৎসাহী সহযোগী হিসেবে। মাঝে মাঝে সীমান্ত-অঞ্চলের এই শহরগুলোয় কমসোমল সেলের সভ্যেরা উৎসাহের ঝোঁকে শত্রু-শিকারে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, আর করচাগিনকে তখন আসতে হয় তার তরুণ কমরেডদের সাহায্য করার জন্যে। পোদ্দুবেৎসির কমসোমল সেলের সম্পাদক গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কো—নীল-চোখ, মাথা-গরম, তর্কবাগীশ এই ছেলেটা ধর্মবিরোধী আন্দোলনে দারুণ উৎসাহী, সে একবার ব্যক্তিগত সূত্রে খবর পেল যে সেদিন রাত্রে গোপনে সীমান্ত পার করে আনা কিছু চোরাই মাল গ্রামের ময়দা-কলে নিয়ে আসা হবে। সমস্ত কমসোমল সভ্যদের জাগিয়ে তুলে সে সামরিক শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত একটা রাইফেল আর দুটো বেয়নেট নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল; ময়দা-কলের বাড়িটার আশেপাশে দলের ছেলেদের নিঃশব্দে বসিয়ে দিয়ে ওৎ পেতে রইল তাদের শিকারের আসার অপেক্ষায়। সীমান্তের ফাঁড়ি এই চোরাকারবারিদের ব্যাপারটা জানতে পেরে তাদের নিজেদের

লোকের একটা দল পাঠিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেল। সীমান্তরক্ষীরা যদি সজাগ দৃষ্টি না রাখত আর ধৈর্য্য না দেখাত তাহলে এই লড়াইয়ে কমসোমলের তরুণদের মধ্যে অনেক হতাহত হত। ছেলেদের শুধু অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে চার কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে নিয়ে আটকে রাখা হল।

করচাগিন সেই সময়ে গাভ্রিলভের ওখানে এসে পড়েছিল। পরের দিন সকালে ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার যখন তাকে খবরটা জানাল তখন পাভেল ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল তার ছেলেদের উদ্ধার করার জন্যে।

সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত লোকটি হেসে পাভেলকে সব কথা বলল, 'আচ্ছা, আমরা যা করব বলছি, কমরেড করচাগিন। ছেলেগুলো ভারি চমৎকার, ওদের আমরা বিপদে ফেলব না। কিন্তু তোমায় বেশ ভালো করে সমঝে দেওয়া চাই ওদের— যাতে ওরা আর ভবিষ্যতে আমাদের কাজ নিজেরা করার চেষ্টা না করে।'

শান্ত্রী চালাটার দরজা খুলে দিতে এগারোটি ছেলে উঠে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক-পা থেকে আরেক পায়ে তাদের শরীরের ভর রাখতে লাগল।

সীমান্তের লোকটি চেষ্টা করে মুখে-চোখে একটা কড়া ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'দেখো একবার তাকিয়ে এদের দিকে। কী বিশ্রী গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে। এখন আমাকে এদের পাঠিয়ে দিতে হবে এলাকার সদর-দপ্তরে।'

এবার গ্রিশুৎকা উত্তেজিতভাবে কথা বলল, 'কিন্তু কমরেড সাখারভ্, অপরাধটা কি করেছি আমরা? ওই বদমায়েশটার ওপরে অনেকদিন থেকেই আমরা নজর রেখেছিলাম। আমরা

তো শুধু সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম, আর আপনারা কিনা ডাকাত কয়েদ করার মতো আমাদের আটক করে রেখেছেন!' আহত ভঙ্গীতে সে ঘুরে দাঁড়াল।

খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ আলাপআলোচনা চলল কিছুক্ষণ, অবশ্য এটা চালাবার সময় করচাগিন আর সাখারভের পক্ষে গাম্ভীর্য বজায় রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল শাস্তি যা পাবার তা যথেষ্ট ছেলেরা পেয়েছে।

পাভেলের উদ্দেশে বলল সাখারভ, 'তুমি যদি ওদের জামিন হয়ে কথা দাও যে ওরা আর সীমান্তের দিকে পা বাড়াবে না, তাহলে আমি ওদের ছেড়ে দিতে রাজী আছি। ওরা অন্যান্য উপায়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে।'

'বেশ, আমি ওদের জামিন হলাম। আশা করি, ওরা আমাকে আর অপদস্থ করবে না।'

ছেলেরা গান গাইতে গাইতে কুচকাওয়াজ করে ফিরে এল পোদ্দুবেৎসিতে। ব্যাপারটা চেপে দেওয়া হল। এবং, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ময়দা-কলের মালিককে গ্রেপ্তার করা হল— এবার আইনসঙ্গতভাবেই করা হল কাজটা।

মাইদান-ভিলার বনে কয়েক খামার ধনী জার্মান চাষীর বসবাস। এই কুলাকদের খামারগুলো একটা থেকে আরেকটা প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে দূরে। একেকটা ছোটোখাটো কেল্লার মতোই মজবুত করে বানানো। এই মাইদান-ভিলা থেকেই আন্তোনিউক আর তার দলবল কাজ চালায়। এককালে জারের সৈন্যবাহিনীতে সার্জেণ্ট-মেজর ছিল এই আন্তোনিউক, সে নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে সাতজন গলা-কাটা খুনীকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুলেছে, পিস্তল নিয়ে সশস্ত্র হয়ে তারা গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় রাস্তায় চলতি লোকজনের উপর

রাহাজানি চালায়। রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না, পয়সাওয়ালা ফাটকাবাজদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতেও তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সোভিয়েত কর্মীদেরও রেহাই দেয় না। আন্তোনিউকের কাজের আসল নীতিটা হচ্ছে চটপট কাজ সেরে ফেলা। আজ হয়তো সে সমবায় ভাণ্ডারের দু'জন কেরানীর কাছ থেকে টাকাকড়ি লুটে নিল, আবার পরের দিনই হয়তো উনিশ-বিশ কিলোমিটার দূরে কোনো গ্রামে ডাক বিভাগের কোনো কর্মচারীকে নিরস্ত্র করে ফেলে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত যথাসর্বস্ব লুটে নিল। আরেকজন সহযোগী লুটেরা গোর্দেই-র সঙ্গে আন্তোনিউকের প্রতিযোগিতা। এরা দু'জন কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না। দু'জনে মিলে এই এলাকার মিলিশিয়া আর সীমান্তরক্ষী কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। আন্তোনিউক লুঠতরাজ চালায় ঠিক বেরেজ্‌দভের উপান্তে। শহরমুখো রাস্তাগুলো দিয়ে যাতায়াত করাটা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধরা পড়ার হাত এড়িয়েই চলেছে ডাকাতটা। অবস্থাটা যখন তার পক্ষে বড়ো বেশি রকম সঙ্গীন হয়ে ওঠে তখন সীমান্তের ওপারে সরে পড়ে আর কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকে। তারপরে ফের দেখা দেয় এমন একটা সময় বুঝে, যখন তার এসে পড়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে কম বলে সবাই ধরে নয়। তার এই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার ক্ষমতার ফলেই সে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোবার এই লুটেরাটার নতুন কোনো অত্যাচারের রিপোর্ট লিসিৎসিনের কাছে এসে পেঁছিয় ততোবারই সে রাগে ঠোঁট কামড়ায়। ·

'এই সাপটার ছোবলানো বন্ধ হবে কবে? হারামজাদাটা যদি এখনও সাবধান না হয় তাহলে ওকে খতম করার

কাজটা আমাকেই করতে হবে দেখছি,’ দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড়িয়ে বলে লিসিৎসিন। জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি নিজে দু’বার করচাগিনকে আর অন্য তিনজন কমিউনিস্টকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতটার পিছু ধাওয়া করেছিল, কিন্তু দু’বারই আন্তোনিউক পালিয়ে গেছে।

ডাকাতগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে একটা বিশেষ বাহিনী পাঠানো হল। ফিলাতভ নামে একটি অতি ফ্যাশনদুরস্ত ছেলে এই দলটার কম্যান্ডার। সীমান্তের নিয়ম অনুসারে কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির কাছে রিপোর্ট না করেই তরুণ মোরগের মতো গুমোরভরা এই ছেলেটি সরাসরি সেমাকি নামে সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রামটায় চলে এল। গভীর রাত্রে পৌঁছে সে গ্রামের প্রান্তে একটা বাড়িতে এসে উঠল তার লোকজনদের নিয়ে। সশস্ত্র কতকগুলো লোকের এই রহস্যজনকভাবে এসে পড়াটা লক্ষ্য করেছিল পাশের বাড়ির একজন কমসোমল সভ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে খবর দিল গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতির কাছে। সে এই বিশেষ দলটা পাঠানোর খবরটা কিছু জানত না, এদের ডাকাতদল বলে ধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কমসোমল সভ্যটিকে পাঠিয়ে দিল জেলা কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চাইবার জন্য। ফিলাতভের এই গোঁয়াতুর্মির ফলে অনেকগুলো মানুষ প্রায় মরতে বসেছিল আর কি। লিসিৎসিন মাঝরাত্রে মিলিশিয়ার লোকজনকে জাগিয়ে তুলে সেমাকি গ্রামের এই ‘ডাকাতদল’টির ব্যবস্থা করার জন্যে জন বারো লোক সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল। ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়িটার কাছে এসে নেমে পড়ে বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকেই ওরা চারধারে ঘিরে ফেলল বাড়িটা। দরজার কাছে একজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল, সে নেতিয়ে পড়ল মাথার ওপরে পিস্তলের কুঁদোর একটা

ঘা খেয়ে। কাঁধ লাগিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলল লিসিৎসিন, লোকজনসুদ্ধ সে সবেগে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। ছাদ থেকে ঝোলানো একটা তেলের আলোয় ঘরটা অস্পষ্টভাবে আলোকিত। একহাতে একটা হাত-বোমা ধরে আর অন্য হাতে পিস্তল বাগিয়ে লিসিৎসিন এমন প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল যে জানলার শার্সিগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল, 'আত্মসমর্পণ কর, নইলে উড়ে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে!'

মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ঘুমে ঝিমন্ত মানুষগুলো, আর এক মিনিট দেরি হলেই এক ঝাঁক বুলেট এসে ছিঁড়েখুঁড়ে দিত ওদের। কিন্তু হাত-বোমাটা ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গিতে এই মানুষটাকে এমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে যে তারা দুই হাত তুলে দাঁড়াল। কয়েক মিনিট বাদে অন্তর্বাস-পরিহিত এই 'ডাকাত'গুলোকে যখন বাইরে এনে জড়ো করা হল, তখন লিসিৎসিনের কোর্তার ওপরে মেডেলটা দেখে ফিলাতভ তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

ভয়ানক ক্ষেপে গেল লিসিৎসিন। নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে থুথু ফেলে শুকনো গলায় বলল, 'আহাম্মক কোথাকার!'

জার্মানির বিপ্লবের খবর এসে পেঁছাতে লাগল! হামবুর্গ-এর রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ-ব্যুহে রাইফেলের গুলি-ছোঁড়াছুঁড়ির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এসে পেঁছাচ্ছে এই সীমান্ত-অঞ্চলে। সীমান্ত-এলাকায় একটা উত্তেজনার আবহাওয়া। আগ্রহের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ে লোকে, পশ্চিম দিক থেকে বিপ্লবের হাওয়া বইছে। জেলা কমসোমল কমিটির কাছে কমসোমল-সভ্যেরা সব অনবরত দরখাস্ত পাঠাচ্ছে - লাল ফৌজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে চায় তারা। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শান্তির কর্মনীতি অনুসরণ করে

চলেছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধে নামবার কোনো ইচ্ছে যে তার নেই—এই কথাটা বিভিন্ন কমসোমল সেলের তরুণ সভ্যদের করচাগিনকে অনবরত বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে। কিন্তু এর ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে না। প্রতি রবিবারে পাদ্রীর বাড়ির বড়ো বাগানটায় গোটা জেলার সমস্ত কমসোমল সভ্যেরা জড়ো হয়ে সভা করে। একদিন দুপুরে পোদ্দুবেৎসির কমসোমল সেলের সভ্যেরা রীতিমত ফৌজী কায়দায় কুচকাওয়াজ করে জেলা কমিটির আঙিনায় এসে হাজির। জানলার ফাঁকে এদের দেখেই পাভেল বেরিয়ে এল বারান্দাটায়। গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কোর নেতৃত্বে এগারোটি ছেলে দেউড়ির কাছে এসে থামল—তাদের সকলের পায়ে উঁচু-বুট, কাঁধে ঝোলানো ক্যাম্বিসের বড়ো বড়ো ন্যাপস্যাক।

বিস্মিত হয়ে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, গ্রিশা?'

জবাব না দিয়ে খরোভদ্‌কো পাভেলের দিকে চোখের ইশারা করে বাড়িটার ভেতরে চলে এল তাকে সঙ্গে নিয়ে। লিদা, রাজভালিখিন আর অন্য দু'জন কমসোমল সভ্য এই আগন্তুকটির চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দাবি করল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খরোভদ্‌কো তার ফ্যাকাসে ভুরু দুটো কুঁচকে জানাল, 'কমরেড, এটা হল গিয়ে একটা পরীক্ষামূলক ফৌজী সমাবেশ। পরিকল্পনাটা আমার নিজের। আজ সকালে আমি ছেলেদের জানাই যে জেলা থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় টেলিগ্রাম, তাতে বলা হয়েছে জার্মান বুর্জোয়াদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধে নামছি এবং ওই পোলিশ পানদের সঙ্গেও আমরা শিগগিরই লড়ব। মস্কোর নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কমসোমল সভ্যের তলব পড়েছে। আমি বলি, ওদের যদি কেউ লড়াইয়ে নামতে ভয় পায় তাহলে সে একটা দরখাস্ত দিক, তাকে ঘরে থাকতে

দেওয়া হবে। আমি ওদের নির্দেশ দিই – কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে যুদ্ধের কথাটা না বলে, আর শুধু একটা পাঁউরুটি আর এক টুকরো নোনা চর্বি নিয়েই যেন প্রত্যেকে চলে আসে যাদের ঘরে নোনা চর্বি নেই তারা পেঁয়াজ বা রসুন আনতে পারে। ঠিক হল – গ্রামের বাইরে গোপনে সবাই একজায়গায় এসে মিলব আমরা, জেলা কেন্দ্রে যাব, তারপর সেখান থেকে যাব আঞ্চলিক কেন্দ্রে, সেখানে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে। কথাটা শুনে ছেলেদের ভাবখানা যা হল তা যদি দেখতে! আমাকে দারুণ জেরায় ফেলার চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু আমি ওদের বললাম বেশি প্রশ্ন-টশ্ন না করে কাজে লেগে যেতে। যারা যেতে চায় না, তারা সে কথা লিখুক। আমরা চাই শুধু স্বেচ্ছাসেবক। যা হোক, আমার সেলের ছেলেরা তো সব চলে গেল, আর আমি এদিকে রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। যদি কেউ আর হাজির না হয়? তা যদি হয়, তাহলে আমি গোটা সেলটাকে ভেঙে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় বদলি হয়ে যাব। গ্রামের বাইরে এসে বসে আছি আর আমার তো বুক ঢিপ ঢিপ করছে বুঝি কেউ আর এলো না শেষ পর্যন্ত। কিছুক্ষণ বাদে ওরা এসে জুটতে লাগল একে একে। দু'-এক জন একটু-আধটু ফুঁপিয়েছে, লুকোতে চেষ্টা করলেও ওদের মুখ দেখে সেটা বোঝা যায়। দশজনের প্রত্যেকেই এসে হাজির হল, একজনও দলত্যাগী নেই। এই হচ্ছে আমাদের পোন্দুবেৎসি সেল!' বিজয়গর্বের সঙ্গে বক্তব্য শেষ করল গ্রিশুৎকা।

ব্যাপারটা শুনে ভয়ানক চটে গিয়ে লিদা পলেভিখ্ যখন তাকে বকতে আরম্ভ করল, তখন গ্রিশুৎকা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী বলছ তুমি? এই হচ্ছে ওদের পরখ করার সবচেয়ে ভালো উপায়, আমি বলে রাখছি।

এর মধ্যে দিয়ে ওদের প্রত্যেককে পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া গেল। এর মধ্যে তো কোনো ছলনা নেই। শুধু ওদের যা বলেছি সেটা যে সত্যি, তা বোঝাবার জন্যে আমি ওদের আঞ্চলিক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে যেতাম, কিন্তু বেচারি ছেলেগুলো বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তোমাকে একবার ওদের সামনে এসে ছোটো একটা বক্তৃতা দিতে হবে, করচাগিন। দেবে, কেমন তো? একটু কিছু বক্তৃতা ওদের না শোনালে ভালো দেখায় না। বলো যে কোনো একটা কারণে ফৌজী তলবটা আপাতত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা অমনি অন্যকিছু, কিন্তু এ কথাও বোলো যে, তা হলেও, ওদের জন্যে আমরা সত্যিই গর্ব বোধ করছি।'

করচাগিন ক্বচিৎ কখনও আঞ্চলিক কেন্দ্রে যায়, কারণ ওখানে যাতায়াত করতে কয়েকদিন লেগে যায়, অথচ জেলার কাজে তার এখানেই সব সময়ে থাকার দরকার পড়ে। পক্ষান্তরে, রাজ্‌ভালিখিন যে-কোনো ছুতোয় গাড়ি চেপে শহরে যাবার জন্যে প্রস্তুত। আপাদমস্তক সশস্ত্র হয়ে, নিজেকে ফেনিমোর কুপারের উপন্যাসের কোনো নায়ক হিসেবে কল্পনা করতে করতে সে শহরমুখো রওনা হয়। বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে কাকগুলোর দিকে কিংবা ছুটন্ত কোনো কাঠবেড়ালির দিকে বন্দুক উঁচোয়; পথচল্‌তি একলা লোকদের থামিয়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করে—তারা কারা, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে। শহরের কাছাকাছি এসে সে অস্ত্রগুলো খুলে নেয়, গাড়ির খড়ের মধ্যে রাইফেলটা গুঁজে রাখে, পকেটে লুকিয়ে ফেলে পিস্তলটা, তারপর আঞ্চলিক কমসোমল কমিটির দপ্তরে ঢোকে স্বাভাবিক চেহারায়।

দপ্তরে ঢুকতেই সেখানকার সম্পাদক ফেদোতভ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, বেরেজ্‌দভের খবর-টবর কী?'

ফেদোতভের দপ্তরে সব সময়েই লোকের ভিড়, আর সবাই একসঙ্গে কথা বলে। এরকম অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাওয়াটা বড়ো সহজ নয় — একই সঙ্গে চারজন লোকের কথা শুনতে হয়, পঞ্চম জনের কথার জবাব দিতে হয়, আবার কিছু একটা লিখতেও হয় সেই সঙ্গে। ফেদোতভের বয়েস খুব কম হলেও সে ১৯১৯ থেকে পার্টি সভ্য। শুধু সেই সব ঝোড়ো দিনেই পনেরো বছর বয়েসী ছেলের পক্ষে পার্টি সভ্য হওয়া সম্ভব ছিল।

'খবর তো অনেক আছে,' নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল রাজ্‌ভালিখিন, 'অতো খবর এককথায় বলা যায় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা কাজের ঠেলা। কতদিকে যে দেখাশোনা করতে হয়। আমাদের একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে, জানো তো। আমি দুটো নতুন সেল গড়ে তুলেছি। আচ্ছা, আমাকে ডেকেছিলে কেন বলো তো?' কাজের মানুষের ভঙ্গীতে সে একখানা চেয়ারে বসল।

অর্থনীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্রিম্‌স্কি তার ডেস্কের ওপর কাগজের স্তূপ থেকে এক মুহূর্তের জন্যে মাথা তুলে বলল, 'আমরা তো করচাগিনকে আসতে বলেছিলাম, তোমাকে নয়।'

তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ঘন একটা মেঘের সৃষ্টি করে রাজ্‌ভালিখিন বলল, 'করচাগিন এখানে আসাটা পছন্দ করে না, তাই আর সব কাজের ওপর আমাকেই আসতে হল... সাধারণত দেখা যাচ্ছে, সম্পাদকদের মধ্যে কিছু লোক বেশ দিব্যি আছে। তারা নিজেরা কিছু করে না, আমার মতো গর্দভদেরই যতো বোঝা বইতে হয়। করচাগিন যখনই সীমান্তে যায়, দু'-তিন

সপ্তাহের মধ্যে আর ফেরে না, আর সমস্ত কাজকর্ম আমার ওপরে এসে পড়ে।'

সে-ই যে জেলা সম্পাদকের পদের পক্ষে যোগ্যতর লোক -- রাজ্‌ভালিখিনের এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু তার শ্রোতারা যে ধরতে পারে নি তা নয়।

সে চলে যাবার পর ফেদোতভ অন্যদের কাছে মন্তব্য করল, 'এই লোকটাকে আমার ভালো লাগে না।'

রাজ্‌ভালিখিনের চালিয়াতিটা দৈবক্রমে একদিন ফাঁস হয়ে গেল। লিসিৎসিন একদিন ফেদোতভের দপ্তরে এসেছিল ডাকে-আসা কাগজপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাবার জন্যে। জেলা থেকে যারা আসে, এই হচ্ছে তাদের সবারই দস্তুর। ফেদোতভের সঙ্গে লিসিৎসিনের কথাবার্তা-প্রসঙ্গে রাজ্‌ভালিখিনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে গেল।

লিসিৎসিনের বিদায় নেবার সময় ফেদোতভ তাকে বলল, 'যাই হোক, করচাগিনকে একবার পাঠিয়ে দিও এখানে। আমরা তো তাকে প্রায় চিনিই না বলতে গেলে।'

'বেশ তো। কিন্তু দেখো, ওকে যেন আবার আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবার চেষ্টা কোরো না। সেটা আমরা হতে দেব না।'

এ বছর এই সীমান্ত-অঞ্চলে অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব অন্যান্য বারের চেয়েও বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। সীমান্তের গ্রামগুলিতে যে উৎসব হবে, সেটার ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি মনোনীত হল পাভেল করচাগিন। পোদ্দুবেৎসিতে সভার শেষে পাশাপাশি তিনটি গ্রামের পাঁচ হাজার চাষী আধ কিলোমিটার লম্বা এক মিছিল করে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ফৌজী বাজনা বাজিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত গেল।

মিছিলের সামনে ছিল শিক্ষার্থী ব্যাটালিয়নটা। সীমান্তের সোভিয়েত এলাকার ধার ঘেঁষে খুঁটিগুলোর সমান্তরাল রেখায় সুশৃঙ্খল মিছিলটা এগিয়ে গেল; যে গ্রামগুলির মাঝখান দিয়ে সীমা-নির্দেশক রেখাচিহ্নটা চলে গেছে গ্রামগুলিকে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে সেই গ্রামগুলির দিকে গেল মিছিলটা। পোলিশরা তাদের সীমানা-এলাকায় এ ধরনের দৃশ্য আগে কখনও দেখে নি। মিছিলের সামনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার গাভ্রিলভ আর পাভেল করচাগিন, তাদের পেছনে বাজনা বাজছে, হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে ঝাণ্ডাগুলো, গলা মিলিয়ে গান ধরেছে সবাই, বহুদূরে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সেই গানের সুর। ছুটির দিনের সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে এসেছে খুশি-ভরা-মন চাষী ছেলেরা, কিচিরমিচির করছে, খিলখিল করে ফুর্তির হাসি হাসছে গ্রামের মেয়েরা, বড়োরা গম্ভীর মুখে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, বৃদ্ধেরা চলেছে একটা পবিত্র বিজয়-অভিযানের ভাব নিয়ে। চোখ যতদূর যায় শুধু মানুষের স্রোত। সীমান্তের একধার ঘেঁষে বয়ে চলেছে সেই মিছিলের স্রোত, কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রেখাচিহ্নটির ওপরে কেউ একবার পা-ও ফেলল না। করচাগিন দেখল জনসমুদ্রের এই কুচকাওয়াজের গতি। কমসোমল সভ্যেরা গান ধরেছে:

গহন অরণ্য থেকে বৃটেন-সাগর জুড়ে
সবচেয়ে বলীয়ান এই লাল ফৌজ।

তার জায়গায় মেয়েদের গলা-মেলানো গান সুরু হল:

'ওই যে পাহাড়তলীর কোলে মেয়েরা ফসল কাটে...'

সোভিয়েত শান্ত্রীরা খুশির হাসি হেসে মিছিলটাকে

অভ্যর্থনা জানাল। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পোলিশ প্রহরীরা। সীমান্ত দিয়ে এই মিছিল করে যাওয়ায় পোলিশ এলাকায় বেশ একটা সচকিত ভাবের সৃষ্টি হল --- যদিও পোলিশ বাহিনীর কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই এই মিছিলের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার চৌকীদার সৈন্যগুলো অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকল, সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচগুণ এবং জরুরী অবস্থার জন্যে প্রস্তুত রিজার্ভ সৈন্যদের কাছাকাছি খাদের মধ্যে আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু মিছিলটা গানের সুরে আকাশ মুখরিত করে তুলে খুশির তালে পা ফেলে ফেলে নিজেদের এলাকার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেল।

একটা ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল একজন পোলিশ শান্ত্রী। তালে তালে পা ফেলে মানুষের সারিটা এগিয়ে আসছে। কুচকাওয়াজের একটা সংগীতের প্রথম কলি বেজে উঠতেই পোলিশ সৈন্যটি ফৌজী কেতায় তার রাইফেলটা পাশে নামিয়ে এনে সামরিক সেলাম জানাল, করচাগিন স্পষ্ট শুনতে পেল, 'কমিউন জিন্দাবাদ!'

সৈনিকটির চোখের দিকে তাকিয়েই পাভেল বুঝল যে সে-ই বলেছে ওই কথাগুলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল পাভেল।

ও আমাদের বন্ধু! সৈনিকের উর্দির নিচে ওর হৃদয়ে এই মিছিলের তালে তালে সাড়া জেগেছে। পাভেল পোলিশ ভাষায় নিচুগলায় বলল, 'অভিবাদন জানাই, কমরেড!'

মিছিলটা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সামনে দিয়ে গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত সৈনিকটি ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পাভেল বারকতক পেছন ফিরে দেখল কালো ছোট মূর্তিটার দিকে। এই আর একজন পোলিশ। গোঁফ-জোড়ায় তার পাক ধরেছে, টুপিটার

চকচকে চুড়োর নিচে তার চোখের চাউনি ভাবলেশহীন। পাভেল এইমাত্র যা শুনেছে, তখনও সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পোলিশ ভাষায় বিড়বিড় করে বলল যেন আপন মনেই, 'অভিবাদন জানাই, কমরেড!'

কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

মৃদু হাসল গাব্রিলভ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সে।

'বড়ো বেশি আশা করছ তুমি,' মন্তব্য করল সে, 'এরা সবাই সাধারণ পদাতিক সৈন্য নয়, বুঝলে? কিছু কিছু পুলিশও আছে এদের মধ্যে। ওর উর্দির হাতায় পটিটা লক্ষ্য করো নি? ও নিশ্চয়ই পুলিশ।'

মিছিলের সামনের দিকটা ইতিমধ্যে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করেছে গ্রামের মুখে। এই গ্রামটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সীমারেখাটা। গ্রামের সোভিয়েত এলাকাভুক্ত অর্ধাংশ সমারোহের সঙ্গে এই মিছিলের অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। ছোট নদীটার এক পাড়ে সীমান্তের সাঁকোটার কাছে সমস্ত গ্রামবাসী এসে অপেক্ষা করছে। রাস্তাটার দু'পাশে তরুণতরুণীরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। পোলিশ এলাকায় কুঁড়ে-ঘর আর খামারবাড়িগুলোর চালে চালে লোক ভর্তি হয়ে গেছে, একাগ্র আগ্রহের সঙ্গে তারা নদীর অন্য তীরের ঘটনাগুলো লক্ষ্য করছে। কুঁড়ে-ঘরের দাওয়ায় আর বাগানের বেড়ার পাশে পাশে চাষীদের ভিড়। দু'পাশে সারিবাঁধা মানুষগুলোর মাঝখানে মিছিলটা ঢুকতেই 'আন্তর্জাতিক'এর সুর বেজে উঠল। সবুজ পাতায় সাজানো একটা মঞ্চের ওপর থেকে পরে বক্তৃতা হতে থাকল। জনতাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিল তরুণ বক্তারা আর সাদাচুল অভিজ্ঞ প্রবীণরা। পাভেলও তার ইউক্রেনীয় মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিল। সীমান্ত ডিঙিয়ে তার

কথাগুলো নদীর অপর পারে শোনা যেতে লাগল এবং পাছে তার অগ্নিগর্ভ কথাগুলো পোলিশ এলাকার শ্রোতাদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় ওদিককার পুলিস গ্রামবাসীদের হটিয়ে দিতে থাকল। চাবুকগুলো সপাসপ শব্দে ওঠানামা করতে লাগল, বন্দুকের গুলির ফাঁকা আওয়াজ উঠল।

ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তাগুলো। পুলিশের গুলি ছোড়ার আওয়াজে ভয় পেয়ে তরুণেরা চালের ওপর থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখে সোভিয়েত এলাকার লোকেদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। একজন বুড়ো রাখাল সব দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মঞ্চের ওপর উঠে এল জনকতক ছেলের সাহায্যে। দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে সে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিল, 'তোমরা, যারা আমাদের ছেলেমেয়ে, তারা সবাই ঘটনাটা দেখলে তো! আমাদের সঙ্গেও ঠিক এইরকম ব্যবহারই করা হত। কিন্তু আর নয়। কৃষকদের চাবুক মারার সাহস আর কারও নেই। অভিজাতদের আর তাদের চাবুক-মারা আমরা খতম করেছি। এখন ক্ষমতা আমাদের হাতে; বাবারা, এই ক্ষমতা জোরসে ধরে রাখা তোমাদেরই কাজ। বুড়ো মানুষ আমি, বক্তৃতা তেমন করতে পারি না। যদি পারতাম, তাহলে অনেক কিছু আমার বলার ছিল তোমাদের। বলতাম জারদের অধীনে বলদের মতো কেমন খেটে মরেছি... ওই হতভাগ্যদের জন্যে কষ্ট হয় সেইজন্যেই!..' জীর্ণ একটা হাত বাড়িয়ে ধরল নদীর অপর পারে, তারপরে আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলল সে — শিশু আর অতিবৃদ্ধেরা যেরকম কেঁদে ওঠে।

তারপরে বক্তৃতা দিল গ্রিশুৎকা খরোভদ্‌কো। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে শুনতে গাভ্রিলভ তার ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে

নদীর অপর পারে চারিদিকে একবার দেখে নিল — সেখানে কেউ তার বক্তৃতা লিখে নিচ্ছে কি-না। কিন্তু ওপারে নদীর তীর জনশূন্য। সাঁকোর কাছের শান্ত্রীটিকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে যেন পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কমিশারিয়েটে কোনো প্রতিবাদ-পত্র পাঠানো হবে না,' ঠাট্টা করল গাভ্রিলভ।

শরতের শেষ দিকে এক বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে আন্তোনিউক আর তার সাতজন সহযোগীর রক্তাক্ত গতিবিধি শেষ হয়ে গেল। মাইদান-ভিলার জার্মান-বসতিটায় একজন ধনী চাষীর বাড়িতে একটা বিয়ের ভোজসভায় বাহাজানরা ধরা পড়ল। খ্রোলিনের কমিউনের চাষীরা পিছু ধরে গিয়ে তাকে পাকড়াও করে ফেলল।

মাইদান-ভিলায় আন্তোনিউক-দলের নিমন্ত্রিত হয়ে আসার খবরটা ছড়িয়েছিল স্থানীয় মেয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে কমসোমলের বারো জন সভ্য জড়ো হয়ে হাতের কাছে যা কিছু জুটল তাই নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গাড়িতে চেপে রওনা হয়ে গেল মাইদান-ভিলায়। তার আগে খবর পাঠিয়ে দিল বেরেজ্‌দভে — একটা লোক খবর নিয়ে চলে গেল দারুণ জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে। তার যাওয়ার পথে সেমাকি গ্রামে ফিলাতভের ফৌজী দলটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল; ফিলাতভ তার দলবল নিয়ে ঘোড়া হাঁকাল মাইদান-ভিলার দিকে। খ্রোলিনের ছেলেরা খামারবাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, আন্তোনিউকের দলের সঙ্গে তাদের রাইফেল ছোড়াছুড়ি চলছে। খামারের একটা ছোট বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আন্তোনিউকের দল বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যে আসছে তার দিকেই গুলি ছুড়ছে। হঠাৎ একটা পাল্টা আক্রমণ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল

তারা, কিন্তু দলের একজন লোককে খুইয়ে এখন বাড়িটার ভেতরে হঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। আন্তোনিউক এই রকম কোণঠাসা অবস্থায় এর আগেও অনেকবার পড়েছে এবং প্রতিবারই হাত-বোমার সাহায্যে আর অন্ধকারের সুযোগে সে পথ কেটে বেরিয়ে গেছে। এবারেও সে হয় তো এইভাবে পালাতে পারত, কারণ, খ্রোলিনের কমসোমলের ছেলেদের মধ্যে ইতিমধ্যেই দু'জন মারা পড়েছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলাতভ এসে পড়ল। আন্তোনিউক বুঝতে পারল যে এবারে আর তার পার নেই। বাড়িটার সমস্ত জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে সে সকাল পর্যন্ত পাল্টা গুলি চালিয়ে গেল। কিন্তু ভোরবেলায় ওরা তাকে পাকড়াও করল। সাতজনের একজনও আত্মসমর্পণ করল না। এই সাপের বাসাটা ধ্বংস করতে গিয়ে চারজন লোক মারা পড়ল। নিহতদের মধ্যে তিনজন সদ্য-সংগঠিত খ্রোলিনের কমসোমল গ্রুপের সভ্য।

আঞ্চলিক বাহিনীর শরৎকালীন মহলার জন্যে পাভেল করচাগিনের ব্যাটালিয়নের ডাক পড়েছে। দারুণ বৃষ্টির মধ্যে একদিনে পুরো চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে তার ব্যাটালিয়ন এসে পেঁছাল ডিভিশনের ফৌজী শিবিরে। ভোরবেলায় বেরিয়ে তারা গন্তব্যস্থলে এসে পেঁছাল অনেক রাত্রে। ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার গুসেভ আর তার কমিশার এল ঘোড়ায় চেপে। আট-শো জন শিক্ষার্থী যখন ব্যারাকে এসে পেঁছাল, তখন ক্লান্তিতে তাদের দম ফুরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে গেল তারা। পরের দিন সকালেই মহলা আরম্ভ হবার কথা — আঞ্চলিক ডিভিশনের সদর-ঘাঁটি থেকে এই ব্যাটালিয়নটাকে ডেকে পাঠাতে দেরি হয়েছিল। পরিদর্শনের জন্যে ব্যাটালিয়নটা যখন উর্দি পরে আর রাইফেল নিয়ে

সামিল হয়ে দাঁড়ালো তখন তার চেহারাটা একেবারে বদলে গেল। গুসেভ এবং করচাগিন দুজনেই এই তরুণদের শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে যথেষ্ট সময় আর শক্তি ব্যয় করেছে, তারা যে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল। সরকারী পরিদর্শনের পরে এবং ব্যাটালিয়নের ছেলেদের সামরিক কলাকৌশলে পারদর্শিতা দেখানো শেষ হবার পরে কম্যান্ডারদের মধ্যে থেকে একজন করচাগিনের দিকে এগিয়ে এল। লোকটা সুপুরুষ, কিন্তু মুখখানা একটু মাংসল। তীক্ষ্ম গলায় কৈফিয়ত চাইল সে, 'আপনি ঘোড়ায় চেপে রয়েছেন কেন? আমাদের শিক্ষার্থী ব্যাটালিয়নগুলোর কম্যান্ডার আর কমিশারদের ঘোড়ায় চাপার এক্তিয়ার নেই। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে জিম্মা করে দিয়ে কুচকাওয়াজের জন্যে পায়ে হেঁটে আসুন।'

পাভেল জানে, ঘোড়া থেকে নেমে গেলে সে আর মহলায় যোগ দিতে পারবে না, কারণ পায়ে হেঁটে এক কিলোমিটারও যেতে পারবে না সে। কিন্তু এই বাহারে চামড়ার বেল্ট-লাগানো শৌখিন আর উচ্চকণ্ঠ ফুল বাবুটিকে সে অবস্থাটা খুলে বোঝাবে কী করে?

'পায়ে হেঁটে তো আমি এই মহলায় যোগ দিতে পারব না।'

'কেন পারবেন না?'

কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে হবে বুঝতে পেরে পাভেল নিচু গলায় বলল, 'আমার পা দুটো ফুলে গেছে, এক সপ্তাহ ধরে হাঁটাহাঁটি আর দৌড়ানো আমার সহ্য হবে না। কিন্তু, কমরেড, আপনি কে জানতে পারি?'

'প্রথমত, আপনার ব্যাটালিয়ন যে-সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, আমি তার সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক। দ্বিতীয়ত, আমি আপনাকে আরেকবার হুকুম করছি ঘোড়া থেকে নেমে যাবার

জন্যে। আপনি যদি পঙ্গুই হন, তাহলে ফৌজে থাকা উচিত হয় নি।'

মুখের ওপর যেন একটা চাবুকের ঘা খেয়েছে বলে মনে হল পাভেলের। লাগামটায় নাড়া লাগাল সে, কিন্তু গুসেভের বলিষ্ঠ হাত তাকে নিরস্ত করল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আহত আত্মসম্মান আর আত্মসংযমের একটা লড়াই চলল তার মনের মধ্যে কোন্‌টা জয়ী হবে। কিন্তু পাভেল করচাগিন এখন আর লাল ফৌজের সেই সৈন্য নয় যে একটা দল থেকে আরেকটা দলে হাল্কা মনে বদলি হয়ে আসবে। সে এখন ব্যাটালিয়ন কমিশার, আর তার ব্যাটালিয়নটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেছনেই। হুকুমটাকে যদি সে অমান্য করে, তাহলে নিজের সৈনিকদের সামনে সে সামরিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিশ্রী একটা উদাহরণ তুলে ধরবে! এই পদমর্যাদা-গর্বিত গর্দভটার জন্যে সে তো আর তার ব্যাটালিয়নটাকে গড়ে তোলে নি। রেকাব থেকে পা সরিয়ে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এল সে, হাঁটু দুটোর কাছে নিদারুণ যন্ত্রণাটাকে চাপতে চাপতে ডান দিকের সৈন্যসারির দিকে এগিয়ে গেল।

দিন কয়েক ধরে আবহাওয়াটা খুব ভালো— এমনটা সাধারণত হয় না। ফৌজী মহলা শেষ হয়ে এল প্রায়। পাঁচ দিনের দিন ফৌজী দলগুলো এসে গেল শেপেতোভ্‌কার কাছাকাছি— সেখানেই মহলা শেষ হবার কথা। বেরেজ্‌দভ্‌ ব্যাটালিয়নটার ওপরে ভার দেওয়া হয়েছে— ক্লিমেন্তোভিচি গ্রামের দিক থেকে গিয়ে রেল-স্টেশনটাকে দখল করে নিতে হবে।

পাভেল এখন তার নিজের দেশের মাটিতে এসে পড়েছে। স্টেশনটার দিকে এগুবার সমস্ত পথঘাট দেখিয়ে দিল সে

গুসেভকে। ব্যাটালিয়নটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা তফাত দিয়ে পথ ঘুরে এসে 'শত্রু'র পেছনের ঘাঁটির ওপরে হঠাৎ এসে পড়ে প্রচণ্ড জয়ধ্বনির সঙ্গে স্টেশন বাড়িটাকে দখল করে নিল। এই সামরিক পরিকল্পনাটা সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেল। বেরেজ্‌দভের সৈন্যরা স্টেশনটা দখল করে রইল, আর যে ব্যাটালিয়নটার ওপরে স্টেশনটার প্রতিরক্ষার ভার ছিল, তাদের শতকরা পঞ্চাশ জন 'নিহত' হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তারা বনের দিকে হঠে গেল।

বেরেজ্‌দভ্‌ ব্যাটালিয়নের দুটো দলের মধ্যে একটার ভার নিল পাভেল। নিজের সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াবার হুকুম দিয়ে পাভেল রাস্তার মাঝখানে তিন-নম্বর কম্পানির কম্যাণ্ডার আর রাজনীতিক নেতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে তার কাছে দৌড়ে এল একজন লাল ফৌজের লোক।

'কমরেড কমিশার,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সে, 'ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার জানতে চাচ্ছেন—মেশিনগান-বাহিনীর সৈন্যরা রেলওয়ে-ক্রসিংটা দখল করে আছে কি না। কমিশনটা এদিকে আসছে।'

পাভেল আর কম্যাণ্ডাররা একসঙ্গে একটা রেল-ক্রসিংয়ের কাছে এল।

রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার আর তার সহকারীরা সবাই ছিল সেখানে। স্টেশন দখল করে নেবার পরিকল্পনাটাকে সফলভাবে কার্যকরী করার জন্যে গুসেভ্‌কে অভিনন্দন জানানো হল। পরাজিত ব্যাটালিয়নের প্রতিনিধিরা নিরীহভাবে চেয়ে রইল, এমন কি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টাও তারা করল না।

গুসেভ বলল, 'এর জন্যে কৃতিত্বটা আমার প্রাপ্য নয়।

করচাগিনই আমাদের পথঘাট দেখিয়ে দিয়েছিল। ও এই অঞ্চলের লোক।'

সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়কটি পাভেলের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে নাক সিঁটকে বলল, 'আপনি তো দেখছি দিব্যি দৌড়াতে পারেন, কমরেড। তাহলে ঘোড়াটা খালি চাল বাড়াবার জন্যেই, না কি?' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু করচাগিনের মুখ আর চোখের চাউনি দেখে সে থেমে গেল।

উচ্চপদস্থ কম্যাণ্ডাররা সবাই চলে যাবার পর পাভেল গুসেভকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওর নামটা জানো না কি?'

গুসেভ তার কাঁধ চাপড়ে দিল, 'ওই ভুঁই-ফোঁড়টার কথায় কান দিয়ো না। নাম ওর চুঝানিন। আমি যতদূর জানি, আগে ও ছিল একজন এনসাইন।'

সেদিন সারাদিন ধরে পাভেল বারকতক মাথা খুঁড়ে মনে করবার চেষ্টা করল সে কোথায় এই নামটা আগে শুনেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

ফৌজী মহলা শেষ হয়ে গেছে। পাভেলদের ব্যাটালিয়ন উচ্চ প্রশংসা পাবার পর ফিরে গেছে বেরেজদভে। ভীষণ ক্লান্ত পাভেল দু'-একদিন বাড়িতে বিশ্রাম করবার জন্যে থেকে গেল। পাভেল দু'দিন ধরে রোজ একটানা বিশ ঘণ্টা করে ঘুমোল। তৃতীয় দিনে সে গেল রেল-কারখানায় আরতিওমের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এই ধোঁয়ায় কালো বিষণ্ণ বাড়িটায় ঢুকে পাভেলের মনে হল যেন সে তার নিজের বাড়িতেই এসেছে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কয়লার ধোঁয়াভরা বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল। এইখানকারই মানুষ সে, এইখানেই সে থাকতে চেয়েছিল। অত্যন্ত প্রিয় কোনো কিছুকে যেন

হারিয়েছে বলে তার মনে হল। কতো মাস হয়ে গেল সে একটা ইঞ্জিনের সিটির শব্দ শোনে নি। সেই চিরপরিচিত পরিবেশটুকু ফিরে পাবার জন্যে এই এককালের কয়লা-জোগানদার আর ইলেক্‌ট্রিশিয়ানের মনে তীব্র কামনা জাগল— ডাঙার ওপরে দীর্ঘ দিন কাটানোর পরে নাবিকের মনে যেমন নিঃসীম সমুদ্র-বিস্তারের মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে কামনা জাগে। অনেকক্ষণ লেগে গেল তার এই অনুভূতিটাকে কাটিয়ে উঠতে। দাদার সঙ্গে কথাবার্তা সামান্যই বলল সে। আরতিওম এখন একটা হাপরযন্ত্রে কাজ করছে। পাভেল লক্ষ্য করল—আরতিওমের কপালে নতুন একটা কুঞ্চন জেগেছে। সে এখন দুটি সন্তানের বাপ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বেশ কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হচ্ছে তাকে। সে অবশ্য কোনো অভিযোগ তোলে নি, কিন্তু পাভেল নিজেই বুঝতে পারল।

তারা দু'জনে দু'-এক ঘণ্টা পাশাপাশি কাজ করল। তারপরে চলে এল পাভেল। রেল-লাইনটা পার হবার জায়গাটায় এসে পাভেল তার ঘোড়াটাকে রাশ টেনে থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল স্টেশনটার দিকে। তারপরে চাবুক মেরে ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকিয়ে চলল বনের ভিতর দিয়ে।

বনের পথগুলো আজকাল সম্পূর্ণ নিরাপদ। ছোট-বড়ো সমস্ত রাহাজান দলগুলিকে বলশেভিকরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা এখন শান্তিতে বসবাস করছে।

দুপুরের দিকে পাভেল এসে পেঁছিল বেরেজ্‌দভে। লিদা পলোভিখ জেলা কমিটির দপ্তর-বাড়ির দাওয়ায় ছুটে বেরিয়ে এল তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। খুশির হাসি হেসে সে বলল, 'এই যে, এসো! আমরা এখানে তোমার অভাব

বোধ করছিলাম।' দুই হাত দিয়ে পাভেলকে জড়িয়ে ধরল সে। দু'জনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

কোটটা খুলতে খুলতে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'রাজ্‌ভালিখিন কোথায়?'

একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লিদা জবাব দিল, 'জানি না। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আজ সকালে ও বলেছিল যে তোমার বদলে সে-ই সমাজতত্ত্বের ক্লাসটা নেবার জন্যে ইস্কুলে যাচ্ছে। ও বলছে যে ওটা ওরই কাজ, তোমার নয়।'

কথাটা শুনে পাভেল একটু বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময় বোধ করল। রাজ্‌ভালিখিনকে তার কোনদিনই ভালো লাগে নি। বিরক্তির সঙ্গে মনে মনে ভাবল, 'ইস্কুলের ব্যাপারে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসতে পারে।'

লিদাকে বলল, 'ওর কথা গ্রাহ্য কোরো না। আচ্ছা, এখানকার ভালো খবরগুলো আগে সব বলো তো। গ্রুশেভ্‌কায় গিয়েছিলে নাকি? ওখানকার বাচ্চাদের সব খবরটবর কী?'

লিদা সব খবর বলে গেল, ততক্ষণে পাভেল কৌচে ছড়িয়ে বসল--হাত-পাগুলো ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে তার।

'গত পরশু রাকিতিনাকে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী কর্মী হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের পোদ্দুবেৎসি সেল অনেকটা জোরালো হয়ে উঠল। রাকিতিনা বেশ মেয়ে, আমার ভারি ভালো লাগে ওকে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের পক্ষে চলে আসতে শুরু করেছে, জনকতক তো ইতিমধ্যেই চলে এসেছে।'

পাভেল আর জেলা পার্টি কমিটির নতুন সম্পাদক লিচিকভ্‌ প্রায়ই সন্ধ্যের পর লিসিৎসিনের ঘরে গিয়ে মেলে।

তিনজনে মিলে বড়ো ডেস্ক্‌টার ধারে বসে রাত্রি একটা-

দুটো পর্যন্ত পড়াশোনা করে। লিসিৎসিনের স্ত্রী আর বোন শোবার ঘরে ঘুমোয় আর ওই ঘরের দরজাটা আঁট করে বন্ধ থাকে। আর এঘরে তারা তিনজনে কোনো একটা বই পড়ে। লিসিৎসিন পড়াশোনা করার সময় পায় শুধু রাত্রে। তা সত্ত্বেও, পাভেল তার ঘন ঘন গ্রামান্তর-যাত্রা থেকে ফিরে এসে প্রত্যেক বারই হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে তার কমরেডরা তার চেয়ে ঢের এগিয়ে গেছে।

পোদ্দুবেৎসি থেকে একদিন একজন এসে খবর দিল—আগের রাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে গ্রিশুৎকা খরোভদ্কো খুন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের যন্ত্রণা ভুলে ছুটে গেল পাভেল কার্যনির্বাহক কমিটির দপ্তর-বাড়ির আস্তাবলে, তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘোড়ায় জিন এঁটে প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল সীমান্তের দিকে।

গ্রাম সোভিয়েতের প্রশস্ত কুটীরে সবুজ পাতার মধ্যে একটা টেবিলের ওপরে শোয়ানো আছে গ্রিশুৎকার দেহ··সোভিয়েতের লাল ঝাণ্ডায় ঢাকা। একজন সীমান্তরক্ষী প্রহরী আর একজন কমসোমল সভ্য দরজায় পাহারা দিচ্ছে, কর্তৃপক্ষ না আসা পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। পাভেল করচাগিন কুটীরটায় ঢুকে টেবিলটার কাছে এসে সরিয়ে দিল লাল ঝাণ্ডাটা।

গ্রিশুৎকার মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছে, মুখখানা তার মোমের মতো বিবর্ণ, বিস্ফারিত চোখ দুটোয় মৃত্যুর যন্ত্রণা। মাথার পেছন দিকটা ফাঁক হয়ে গেছে তীক্ষ্ন কোনো অস্ত্রের আঘাতে, একটা কচি ডালে জায়গাটা ঢাকা রয়েছে।

কে নিয়েছে এই তরুণটির প্রাণ? বিধবা খরোভদ্কোর একমাত্র ছেলে সে। তার বাবা ছিল ময়দা-কলের মজুর,

পরে সে গরিব চাষীদের কমিটির একজন সভ্য হয়ে বিপ্লবের পক্ষে লড়াই করে মারা যায়।

ছেলের মৃত্যুর আঘাতে বৃদ্ধা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, পড়শীরা এসে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এদিকে তার ছেলে শুয়ে রয়েছে আড়ষ্ট শীতল দেহে, এই অকালমৃত্যুর রহস্যটা তার মনের মধ্যেই গোপন থেকে গেল।

গ্রিশুৎকার হত্যার ঘটনাটা সমস্ত গ্রামবাসীর মনে এক নিদারুণ ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। দেখা গেল, এই গ্রামে গরিব চাষীদের স্বার্থরক্ষক এই তরুণ কমসোমল নেতাটির শত্রুর চেয়ে বন্ধুর সংখ্যাই ঢের বেশি।

খবরটা পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাকিতিনা তার ঘরে জ্বালাভরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। পাভেল ঘরে ঢোকার পর সে মুখ তুলে তাকাল না।

ধুপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ভাঙা গলায় বলে উঠল পাভেল, 'ওকে কে খুন করেছে বলে তোমার মনে হয়, রাকিতিনা?'

'ওই ময়দা-কলের দলটা নিশ্চয়ই। গ্রিশা বরাবরই ওই বেআইনী মাল-চালানদারদের পথের কাঁটা হয়ে ছিল।'

গ্রিশুৎকা খরোভদ্কো-কে গোর দেওয়া উপলক্ষে দুটো গাঁয়ের মানুষ এসে জড়ো হল। করচাগিন তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে এল, কমসোমল সংগঠনের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এল তাদের কমরেডের উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। গ্রাম সোভিয়েতের দপ্তরের সামনের ময়দানটায় গাভ্রিলভ আড়াই-শো সীমান্তরক্ষী সৈন্য সামিল করল। সামরিক অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার বিষণ্ণ সুরের তালে তালে লাল কাপড়ে মোড়া শবাধারটি বয়ে নিয়ে এসে ময়দানের মাঝখানে রাখা হল। গৃহযুদ্ধের সময়ে

যে-সব বলশেভিক পার্টিজান নিহত হয়েছিল, তাদের কবরের পাশে একটা নতুন কবর খোঁড়া হয়েছে সেখানে।

গ্রিশুৎকা যাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, তারা সবাই তার মৃত্যুর ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। তরুণ খেত-মজুর আর গরিব চাষীরা কমসোমলকে সমর্থন করবার সংকল্প গ্রহণ করল। যারা এই অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষে বক্তৃতা দিল, তারা সবাই ক্রুদ্ধ দাবি জানাল -- হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হোক, তারা যাকে খুন করেছে তারই কবরের পাশে এইখানে তাদের ধরে এনে বিচার করা হোক, যাতে সবাই চিনে রাখতে পারে শত্রুরা কারা।

তিন ঝাঁক গুলির গর্জন উঠল পর পর। ফারগাছের কচি তাজা ডাল বিছিয়ে দেওয়া হল কবরের ওপর। সেদিন সন্ধ্যায় পোদ্দুবেৎসি সেলের সভ্যেরা একজন নতুন সম্পাদক নির্বাচিত করল -- রাকিতিনাকে। সীমান্ত-ফাঁড়ি থেকে করচাগিনের কাছে খবর এল যে তারা খুনীদের খুঁজবার সূত্র পেয়েছে।

এক সপ্তাহ বাদে শহরের থিয়েটার-বাড়িতে সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় জেলা কংগ্রেস শুরু হলে সেখানে লিসিৎসিন বিজয়ীর গাম্ভীর্য নিয়ে ঘোষণা করল:

'কমরেডসব, গত এক বছরে আমরা যে অনেক কিছু করতে পেরেছি, একথা এই কংগ্রেসের সামনে ঘোষণা করতে পারছি বলে আমি আনন্দিত। এই জেলায় সোভিয়েত ক্ষমতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ডাকাত-রাহাজান দলগুলোকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি প্রায় সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে গরিব চাষীদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠছে, কমসোমল সংগঠনগুলি

আগের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং পার্টি সংগঠনগুলি সম্প্রসারিত হয়েছে। পোদ্দুবেৎসিতে যে কুলাকরা কিছুদিন আগে উস্‌কানি দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল— যার ফলে আমাদের কমরেড খরোভদ্‌কোকে হারাতে হয়েছে — সেই কুলাকদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। খুনী দু'জন—ময়দা-কলের মালিক আর তার জামাই— গ্রেপ্তার হয়েছে। জেলা আদালতে কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বিচার হবে। কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলির কাছে কয়েকটি গ্রামের জনকতক প্রতিনিধি এই রাহাজান-সন্ত্রাসবাদীদের চরম শাস্তির দাবি তুলেছেন।'

সমর্থনসূচক উল্লাসের ঝড়ে কেঁপে উঠল হল-ঘরটা:

'ঠিক, ঠিক! সোভিয়েত রাজের শত্রুদের মৃত্যু চাই!'

পাশের একটা দরজায় দেখা গেল লিদা পলোভিখ্‌কে। পাভেলের দিকে ইশারা করল সে।

বাইরের বারান্দায় পাভেলকে সে একখানা চিঠি দিল। খামের ওপরে 'জরুরী' লেখা। চিঠিখানা খুলে পাভেল পড়ল:

'বেরেজ্‌দভ্‌ জেলা কমসোমল কমিটির কাছে। এই চিঠির একটি প্রতিলিপি পার্টির জেলা কমিটির কাছে পাঠানো হল। প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমরেড পাভেল করচাগিনকে দায়িত্বপূর্ণ কমসোমল কাজের ভার নেবার জন্যে জেলা কমিটি থেকে প্রাদেশিক কমিটিতে তলব করা হল।'

এই জেলায় সে গত এক বছর ধরে কাজ করেছে—এখান থেকে পাভেল বিদায় নিল। তার যাওয়ার আগে পার্টির

জেলা কমিটির যে সভা হল তার আলোচনা-সূচীতে দুটো বিষয় ছিল: ১) কমরেড পাভেল করচাগিনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদভুক্তি; ২) জেলা কমসোমল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে তাকে খালাস দেবার উপলক্ষে তার কাজকর্মের বিবরণী-পত্রের অনুমোদন।

বিদায়ের সময় লিসিৎসিন আর লিদা পাভেলের হাত জোরে চেপে ধরল, সৌভ্রাত্র আর প্রীতির সঙ্গে আলিঙ্গন করল। তারপর পাভেলের ঘোড়াটা যখন আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে এসে পড়ল, তখন বারোটা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে তাকে বিদায়-অভিবাদন জানানো হল।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রামগাড়িটা অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে উঠছে ফুন্দুক্লেয়েভস্কায়া স্ট্রীট বেয়ে। বোঝার টানে তার মোটরগুলো গোঙাচ্ছে। অপেরা-বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামতেই তার ভেতর থেকে নেমে এল একদল তরুণ-তরুণী। গাড়িখানা চড়াই বেয়ে উঠতে থাকল।

আর-সবাইকে তাগিদ দিল পানক্রাতভ, 'চলো, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটা যাক, নইলে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

থিয়েটারের প্রবেশপথে ওকুনেভ তাকে ধরে ফেলল, 'এই একই ধরনের একটা সম্মেলনের ব্যাপারে তিন বছর আগে আমরা এখানে এসে জড়ো হয়েছিলাম, তোমার মনে আছে, গেন্কা? সেটা হয়েছিল যখন দুবাভা এলো 'বিরোধী শ্রমিকপক্ষের' কথা নিয়ে। বিরাট সভা হয়েছিল সেবার! আজ রাত্রে আবার ওর সঙ্গেই আমাদের লড়াই করতে হবে!'

প্রবেশপত্র দেখিয়ে তারা হল-ঘরে ঢোকার পর পানক্রাতভ

তার কথার জবাবে বলল, 'হুঁ, সেই একই জায়গায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখছি।'

তাদের চুপ করিয়ে দিল সবাই স্-স্ শব্দ করে। সম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে, সামনেই যে চেয়ার পেল সেখানেই বসে পড়ল তারা দু'জনে। বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে একজন তরুণী সভাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তাটি তালিয়া।

'ঠিক মুহূর্তটিতে এসে গেছি আমরা। এবার চুপ করে বসে শোন তোমার গিন্নি কী বলছে,' ফিসফিসিয়ে বলল পানক্রাতভ গুকুনেভের পাঁজরায় একটা খোঁচা মেরে।

'...এই আলোচনায় আমরা যে অনেকখানি সময় আর উদ্যম ব্যয় করেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় এর থেকে আমরা সবাই শিখেছিও অনেক কিছু। আমাদের সংগঠনে ত্রৎস্কির অনুগামীদের যে হার হয়েছে, এটা লক্ষ্য করে আজ আমরা সকলেই খুব আনন্দিত। তাদের বলতে দেওয়া হয় নি—এ অভিযোগ তারা আনতে পারবে না। বরং নিজেদের মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ তারা পেয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাদের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা আমরা দিয়েছিলাম, তারা সেটার অপব্যবহার করেছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্থূলভাবে তারা পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তালিয়া। বক্তৃতা দেবার সময় সে যেভাবে বারবার তার চোখের ওপর এসে-পড়া একগোছা চুল পেছনে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, তাই দেখেই তার উত্তেজনাটা বোঝা যায়।

'বিভিন্ন এলাকার বহু কমরেড এখানে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ত্রৎস্কিপন্থীদের কাজকর্মের পদ্ধতি

সম্বন্ধে বলেছেন। এই সম্মেলনে বেশ কিছু সংখ্যক ত্রৎস্কিপন্থী উপস্থিত আছেন। এলাকা পার্টি সংগঠনগুলি তাঁদের ইচ্ছে করেই এখানে পাঠিয়েছে যাতে এই শহর পার্টি সম্মেলনে আর একবার তাঁদের বক্তব্য শুনবার সুযোগ আমরা পাই। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি তাঁরা না করেন, তাহলে সেটা আমাদের দোষ নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এলাকাগুলিতে আর সেলগুলিতে সম্পূর্ণভাবে হেরে যাবার ফলে কিছু শিক্ষা তাঁদের হয়েছে। মাত্র গতকাল তাঁরা যা যা বলেছেন, এই সম্মেলনে ফের দাঁড়িয়ে উঠে সেইসব কথা আবার বলবার মতো জোর তাঁদের আছে বলে মনে হয় না।'

হল-ঘরের ডান দিকের কোণ থেকে একটা রুক্ষ গলা তালিয়াকে বাধা দিল, 'আমরা এখনও আমাদের বক্তব্য বলি নি!'

গলার স্বরটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে তালিয়া বলল, 'ঠিক আছে, দুবাভা, এখনই এখানে উঠে এসে বলো তোমার যা বলবার আছে, আমরা শুনব।'

দুবাভা ক্রোধ-গম্ভীর চোখে ফিরে তাকাল তালিয়ার দিকে, রাগে কুঁচকে গেছে তার ঠোঁট দুটো। চেঁচিয়ে পাল্টা জবাব দিল সে, 'সময় এলেই বলব আমরা!' আগের দিন নিজের এলাকায় যে তার দারুণ হার হয়েছে সেই কথাটা সে ভাবছিল। ঘটনার স্মৃতিটা তখনও তাকে খোঁচাচ্ছে।

হলের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল। পানক্রাতভ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফের বুঝি পার্টিকে একটা ধাক্কা মারবার চেষ্টায় আছ, অ্যাঁ?'

দুবাভা গলার স্বরটা চিনতে পারল, কিন্তু ফিরে তাকাল না সেদিকে। সে শুধু নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মাথাটা নামিয়ে নিল।

তালিয়া বলে চলল, 'ত্রৎস্কিপন্থীরা যে কীভাবে পার্টি শৃঙ্খলা ভাঙে দুবাভা নিজেই তার একটা লক্ষণীয় উদাহরণ। কমসোমলে সে দীর্ঘদিন কাজ করেছে, আমাদের অনেকেই তাকে জানে -- বিশেষ করে অস্ত্রাগারের কর্মীরা। খারকভের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে; তা সত্ত্বেও সে যে গত তিন সপ্তাহ ধরে এখানে শ্কোলেঙ্কোর সঙ্গে রয়েছে, তাও আমরা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ক্লাস চলতে থাকার মাঝামাঝি সময়ে সে কিসের টানে এখানে এসেছে? শহরের এমন কোনো এলাকা বাকি নেই, যেখানে ওরা দু'জনে বক্তৃতা করে বেড়ায় নি। একথা অবশ্য ঠিক যে, গত কয়েকদিনে শ্কোলেঙ্কোর বুদ্ধিশুদ্ধি যে খানিকটা ফিরে এসেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ওদের এখানে পাঠিয়েছে কারা? ওরা ছাড়াও, অন্য কতকগুলি সংগঠন থেকেও বেশ কিছু ত্রৎস্কিপন্থী এসেছে। এরা সবাই এখানে আগে কোনো-না-কোনো সময়ে কাজ করেছে। এবারে ওরা ফিরে এসেছে পার্টির মধ্যে গন্ডগোল পাকিয়ে তোলবার জন্যে। ওদের পার্টি সংগঠনগুলি কি জানে যে তারা এখানে এসেছে? নিশ্চয়ই না! সম্মেলনে উপস্থিত সবাই আশা করছে যে ত্রৎস্কিপন্থীরা এগিয়ে এসে তাদের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করবে।'

এটা তাদের করতে রাজী করাবার আশায় তালিয়া আন্তরিক আবেদন জানাল। সে সরাসরি তাদের উদ্দেশ করে বলল, যেন ঘরোয়া কোনো বিতর্কে কমরেডসুলভ ভঙ্গিতেই বলছে, 'এই থিয়েটার-ঘরেই তিন বছর আগে দুবাভা আমাদের কাছে সেই আগেকার 'বিরোধী শ্রমিকপক্ষকে' নিয়ে ফিরে আসে। মনে পড়ছে? সেবারে কী বলেছিল সে, মনে আছে তো? বলেছিল: 'পার্টির ঝান্ডাকে আমরা কখনও আমাদের মুঠি থেকে খুলে পড়ে যেতে দেব না।' কিন্তু তিন বছর যেতে

না যেতেই দুবাভা ঠিক সেই কাজটাই করেছে। হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, পার্টির ঝাণ্ডাকে সে তার মুঠো থেকে খুলে পড়ে যেতে দিয়েছে। এক্ষুণি সে বলেছে, 'আমরা এখনও আমাদের বক্তব্য বলি নি!' এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে আর তার সহযোগী ত্রৎস্কিপন্থীরা আরও কিছুদূর যেতে চায়।'

পেছন দিকের আসনগুলো থেকে একটা গলার স্বর শোনা গেল, 'হাওয়াটা কোন্ দিকে বইছে সে সম্বন্ধে তুফ্‌তা আমাদের কিছু বলুক, সে-ই তো ওদের আবহতত্ত্ববিদ।'

ক্রুদ্ধ বিরক্ত কতকগুলো গলায় এর জবাব এল:

'বাজে রসিকতা করার সময় এটা নয়!'

'পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই এরা বন্ধ করবে কি-না — এ কথার জবাব ওরা দিক!'

'ওই পার্টিবিরোধী ঘোষণাপত্রটা কে লিখেছিল—ওরা বলুক!'

উত্তেজনাটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সবাইকে চুপ করতে বলার জন্যে সভাপতি তার ঘণ্টাটা অনেকক্ষণ ধরে অবিরাম বাজিয়ে চলেছে।

গোলমালের মধ্যে ডুবে গেছে তালিয়ার গলা। তারপর ঝড়টা থামতে তার কথাগুলো ফের শোনা গেল:

'শহরের বাইরের এলাকাগুলোর কমরেডদের কাছ থেকে আমরা যে চিঠিপত্র পাই তার থেকে বোঝা যায়, তারা আমাদেরই পক্ষে এবং এটা খুবই উৎসাহজনক। এই রকম একটা চিঠি, যা আমাদের হাতে এসেছে, তার থেকে খানিকটা পড়ে শোনাবার অনুমতি চাচ্ছি। ওলগা ইউরেনেভার কাছ থেকে এই চিঠিটা এসেছে। এখানকার অনেকেই তাকে চেনে। কমসোমলের একটা এলাকা কমিটির সাংগঠনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সে।'

তালিয়া তার সামনের এক তাড়া কাগজের মধ্যে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপরে চোখ বুলিয়ে পড়া আরম্ভ করল:

'প্রত্যক্ষ সমস্ত কাজে অবহেলা করা হয়েছে। গত চারদিন ধরে ব্যুরোর সভ্যেরা সব বেরিয়ে পড়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে ত্রৎস্কিপন্থীরা আগের চেয়েও জোরালো রকমের ক্ষতিকর প্রচারে নেমেছে। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে—সেটা সমগ্র সংগঠনের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। শহরের একটা সেলেও ভোটের সংখ্যায় জিততে না পেরে বিরোধীপক্ষ তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে আঞ্চলিক সামরিক কমিশারিয়েট সেলে লড়াইয়ে নামবে স্থির করেছে। আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিশনে এবং শিক্ষা বিভাগে যে কমিউনিস্টরা কাজ করে তারাও এই সামরিক কমিশারিয়েট সেলের অন্তর্ভুক্ত। এই সেলে বিয়াল্লিশজন সভ্য আছে, কিন্তু ত্রৎস্কিপন্থীরা সবাই এখানে জোট বেঁধে এসে জড়ো হয়। এই সভায় যেরকম সব পার্টিবিরোধী বক্তৃতা করা হয়েছে, সে রকমটি এর আগে আর আমরা কখনও শুনি নি। সামরিক কমিশারিয়েট সভ্যদের মধ্যে থেকে একজন উঠে সরাসরিই বলল, 'পার্টি যন্ত্র যদি আমাদের কথা না মেনে নেয় তাহলে আমরা সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেব।' বিরোধীপক্ষের সবাই তার এই কথায় হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। এর পরে করচাগিন বলতে উঠল। 'নিজেদের পার্টি সভ্য বলে ঘোষণা করার পরেও তোমরা কী করে এই ফাশিস্টকে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছ?' বলল সে; কিন্তু ওরা চিৎকার করে চেয়ার

চাপড়ে এমন হৈ-হল্লা সৃষ্টি করল যে সে আর এগুতে পারল না। এই কুৎসিত ব্যবহারে সেল সভ্যরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারা দাবি জানাল--করচাগিনকে বলতে দেওয়া হোক। কিন্তু করচাগিন যেই ফের বলা আরম্ভ করল অমনি চেঁচামেচি শুরু হল আবার। গোলমালের ওপরে গলা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'একেই বুঝি তোমরা গণতন্ত্র বলে থাকো! যতোই চেঁচাও, আমি আমার বক্তব্য বলেই যাব।' সেই মুহূর্তে জনকতক লোক তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল। উদ্দাম গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। পাভেল পাল্টা বাধা দিয়ে বলেই যেতে লাগল, কিন্তু ওরা তাকে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে পাশের একটা দরজা খুলে সিঁড়ির ওপরে ছুঁড়ে দিল—তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। এর পর প্রায় সমস্ত সেল সভ্যই সভা থেকে উঠে চলে গেল। এই ঘটনাটা অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছে...'

বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে গেল তালিয়া।

সেগাল গত দু'-মাস ধরে জেলা পার্টি কমিটির প্রচার-আন্দোলন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। সে সভাপতিমণ্ডলীর জায়গায় তোকারেভের পাশেই বসে প্রতিনিধিদের বক্তৃতাগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছে শুধু তরুণরাই, যারা এখনও রয়েছে কমসোমল সংগঠনের মধ্যে।

'গত কয়েক বছরে এরা কতো সুপরিণত হয়ে উঠেছে।' ভাবছিল সেগাল। তোকারেভের কাছে সে মন্তব্য করল, 'বিরোধীপক্ষ ইতিমধ্যেই খুব জোর মার খেতে লেগেছে।

এখনও তো তবু তোপ-কামান দাগা শুরু হয় নি। অল্পবয়েসীরাই ত্রৎস্কিপন্থীদের ঘায়েল করে তুলছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে তুফ্‌তা লাফিয়ে উঠে এল মঞ্চে। সংক্ষিপ্ত একটা হাসির আওয়াজ আর তার প্রতি বিরুদ্ধতার একটা উচ্চকিত গুঞ্জনধ্বনি উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এ ধরনের অভ্যর্থনা পেয়ে তুফতা প্রতিবাদ জানানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সভাপতিমণ্ডলীর দিকে, কিন্তু ততক্ষণে হল-ঘরটা শান্ত হয়ে এসেছে।

'এখানকার কেউ একজন আমাকে আবহতত্ত্ববিদ বলেছে। তোমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কমরেড, তারা এইভাবে আমার রাজনীতিক মতামতকে ব্যঙ্গ করতে চাও দেখছি!' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল সে কথাগুলো।

এক দমক হাসির গর্জন উঠল তার কথার জবাবে। ক্রোধ-বিরক্তির সঙ্গে তুফতা সভাপতির কাছে আবেদন জানাল, 'তোমরা হাসতে পারো, কিন্তু আমি আরেকবার বলছি তোমাদের — তরুণরাই আবহাওয়ার দিকনির্দেশক বটে। লেনিন একাধিকবার একথা বলেছেন।'

এক মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল হল-ঘর।

'কি বলেছেন লেনিন?' শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল।

তুফতা কিছুটা সজীব হয়ে উঠল।

'অক্টোবর অভ্যুত্থানের জন্যে যখন প্রস্তুতি চলেছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর দৃঢ়মনা তরুণদের ঐক্যবদ্ধ আর সশস্ত্র করে তুলে জাহাজীদের সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে তাদের পাঠাবার জন্যে লেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি চাও, তাহলে সেই জায়গাটা পড়ে শোনাতে পারি। বিভিন্ন কার্ডে আমার সমস্ত উদ্ধৃতিগুলো টোকা আছে।'

তুফতা তার চামড়ার থলেটার মধ্যে হাত চালিয়ে দিল।

'থাক, ঠিক আছে, আমরা জানি কথাটা!'

'কিন্তু লেনিন ঐক্য সম্বন্ধে কী লিখেছেন?'

'আর পার্টি শৃঙ্খলা সম্বন্ধে?'

'লেনিন আবার কোন্‌কালে প্রবীণ পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে তরুণদের লাগিয়েছেন?'

চিন্তার খেই হারিয়ে তুফতা চট করে আরেকটা প্রসঙ্গে চলে এল, 'লাগুতিনা এখুনি ইউরেনেভার একটা চিঠি পড়ে শুনিয়েছে। তর্কাতর্কির সময়ে যদি কোথাও একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্যে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে বলে আশা করা যায় না।'

শ্‌কোলেঙ্কোর পাশেই বসেছিল স্‌ভেতায়েভ, সে দারুণ ক্রোধে হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল, 'মূর্খেরাই নাক ঢোকাতে যায় যেখানে...'

'হ্যাঁ,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল শ্‌কোলেঙ্কো, 'আহাম্মকটা আমাদের স্রেফ ডুবিয়ে ছাড়বে।'

তুফতার খ্যানখেনে চড়া পর্দার গলা শ্রোতাদের কানে যেন ঝাঁঝরা পিটিয়ে চলল, 'তোমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপ সংগঠিত করে তুলতে পারো তাহলে আমাদেরও সংখ্যালঘু গ্রুপ সংগঠিত করে তোলার অধিকার আছে।'

চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল হল-ঘরের মধ্যে। চারিদিক থেকে তুফতার ওপরে ক্রুদ্ধ প্রশ্নের বৃষ্টি নামল:

'এ আবার কী? ফের সেই বলশেভিক আর মেনশেভিকের বৃত্তান্ত!'

'রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি একটা পার্লামেণ্ট নয়!'

'ওরা মিয়াস্‌নিকভ থেকে মার্তভ পর্যন্ত সমস্ত রকমের দল-ভাঙিয়ের হয়েই কাজ করছে দেখছি!'

তুফতা তার দুই বাহু বিক্ষিপ্ত করল, যেন এখুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপরে দ্রুত গুলি ছোঁড়ার মতো করে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে চলল, 'হ্যাঁ, গ্রুপ তৈরি করার স্বাধীনতা আমাদের নিশ্চয়ই থাকা চাই। নইলে, আমরা যারা অন্যরকম মত পোষণ করি, তারা কী করে এরকম একটা সংগঠিত সুশৃঙ্খল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে নিজেদের মতের সপক্ষে লড়াই চালাবে?'

হৈ-হল্লাটা বেড়ে চলল। পানক্রাতভ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, 'ও বলুক। ওর কী বলার আছে শোনা যাক। অন্যেরা যে সব কথা না বলাটাই ভালো বলে মনে করবে, তুফতা হয়তো ঠিক সেই কথাগুলোই ফস্ করে বলে বসবে।'

শান্ত হয়ে এল হল-ঘর। তুফতা বুঝতে পেরেছে যে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এ কথাটা বোধ হয় তার এখনই বলা উচিত হয় নি। নিজের মনের কথাগুলোকে সে একেবারে হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা দ্রুত উচ্চারণে বলে নিয়ে বক্তব্য শেষ করল, 'তোমরা অবশ্য আমাদের পার্টি থেকে বের করে দিয়ে এক ধাক্কায় উল্টে ফেলে দিতে পারো। এ ধরনের ব্যাপার তো শুরু হয়েই গেছে। ইতিমধ্যেই তোমরা আমাকে কমসোমলের প্রাদেশিক কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। শিগগিরই দেখা যাবে কাদের কথাটা ঠিক।' এই বলেই সে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে হলের মধ্যে নেমে গেল।

স্‌ভেতায়েভ একটা চিরকুট চালান করে দিল দুবাভার দিকে, 'মিতিয়াই, এরপরে তুমি বলতে ওঠো। তাতে অবশ্য অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা নিতান্তই ঘায়েল হয়ে গেছি। তুফতাটাকে

আমাদের সামলাতেই হবে। ও একটা নিরেট মূখ্যু, বক্তৃতার ধোঁয়ায় ভরা ফানুষ মাত্র।'

দুবাভা বলতে চেয়ে অনুরোধ জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হল।

মঞ্চের ওপরে সে উঠতেই হল-ঘরে একটা প্রত্যাশার নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউ বক্তৃতা শুরু করার আগে সাধারণত যে নিস্তব্ধতা নামে, এটা তাই নয়। দুবাভার পক্ষে এই নিস্তব্ধতাটুকু প্রচ্ছন্ন বিরোধিতায় ভরা। সেল মিটিংগুলোয় সে যে-উৎসাহ নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে তা ইতোমধ্যে মিইয়ে এসেছে। দিনে দিনে তার উদ্দীপনাটা কমে এসেছে এবং ভূতপূর্ব কমরেডদের কাছে নিদারুণ পরাজয় আর কঠিন পাল্টা ঘা খাবার পর তার মনের অবস্থাটা এখন জল-ঢেলে নেভানো আগুনের মতো—আহত আত্মাভিমানের জ্বালাভরা ধোঁয়ায় সে এখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার যে ভুল হয়েছে সে কথাটা গোঁয়ারের মতো অস্বীকার করতে চেয়ে তার মনের জ্বালাটা আরও বেড়ে গেছে। সরাসরি ঝাঁপ দেবে বলে স্থির করল সে, যদিও সে জানে যে এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে সে নিজেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বলার সময়ে তার গলার আওয়াজটা শোনাল চাপা, কিন্তু স্পষ্ট।

'দয়া করে আমাকে বলার সময়ে বাধা দিয়ো না কিংবা প্রশ্ন তুলে তুলে জেরা করে বিরক্ত কোরো না। আমি আমাদের মতামতটা সম্পূর্ণ খোলসা করে বলে নিতে চাই, যদিও আগে থেকেই জানি যে তাতে কিছুমাত্র ফল হবে না। তোমরাই সংখ্যায় বেশি।'

শেষ পর্যন্ত যখন সে বলা শেষ করল, তখন অবস্থাটা দেখে মনে হল যেন হল-ঘরে বোমা ফেটে পড়েছে। ক্রুদ্ধ

চিৎকারের একটা ঘূর্ণি ঘিরে ধরল তাকে, চাবুকের মতো যেন সেগুলো কেটে বসছে তার গায়ে। ধিক্কার-ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে তার উদ্দেশে চিৎকার উঠল

'ছি, ছি!'

'দল-ভাঙিয়েরা নিপাত যাক!'

'খুব তো কাদা ছুঁড়লে হে!'

ব্যঙ্গের হাস্যরোলের মধ্যে দুবাভা তার চেয়ারে এসে বসল। সেই হাসি তাকে একেবারে ধসিয়ে দিয়েছে। এরা যদি চেঁচামেচি করে তার উদ্দেশে গাল পাড়ত তাহলে সে খুশি হত, কিন্তু তার বদলে তাকে এরা বিদ্রূপ করছে—কোনো অভিনেতার কৃত্রিম সুরে আবৃত্তি করতে গিয়ে গলা ভেঙে গেলে দর্শকরা যেমন বিদ্রূপ করে ওঠে।

'এবার শ্কোলেঙ্কো বলবে,' ঘোষণা করল সভাপতি।

শ্কোলেঙ্কো উঠে দাঁড়াল, 'আমি বলতে চাই না।'

এবার পেছনের সারি থেকে পানক্রাতভের গম্ভীর খাদের গলা গমগম করে উঠল, 'আমি বলতে চাই!'

তার গলার স্বরটা শুনেই দুবাভা বুঝেছে যে পানক্রাতভ মনে মনে উত্তেজনায় টগবগ করছে। যখনই সে মর্মান্তিক অপমানিত বোধ করে তখনই তার গম্ভীর গলাটা এই রকম গম-গম করে ওঠে। সামান্য একটু নুয়ে-পড়া লম্বা মূর্তিটার দ্রুত পা ফেলে বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা বিষণ্ণ-গম্ভীর চোখে লক্ষ্য করতে করতে একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল দুবাভার মন। পানক্রাতভ কী বলবে তা সে জানে। আগের দিন সলোমেন্কায় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সে যে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হয়েছিল এবং তারা যে তাকে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্যে নানারকম যুক্তি দেখিয়েছিল—সে ঘটনাটা তার মনে পড়ল। তার সঙ্গে

ছিল শ্‌কোলেঙ্কো আর স্‌ভেতায়েভ। তোকারেভের ঘরে তারা জড়ো হয়েছিল। পানক্রাতভ, ওকুনেভ, তালিয়া, ভালিন্‌সেভ, জেলেনোভা, স্তারোভেরভ আর আর্‌তিউখিন উপস্থিত ছিল। ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই চেষ্টায় একেবারেই কান দেয় নি দুবাভা। আলোচনার মাঝখানে স্‌ভেতায়েভের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে নিজের ভুলটাকে স্বীকার করার অনিচ্ছাটুকু আরও প্রকট করে তুলেছিল। শ্‌কোলেঙ্কো থেকে গিয়েছিল। আর এখন সে বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করে বসল। 'মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবী! নিশ্চয়ই ওরা ওকে নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে,' ভাবল দুবাভা জ্বালাভরা ক্ষোভের সঙ্গে। এই উন্মত্ত লড়াইয়ে সে একে একে তার সমস্ত বন্ধুদের হারাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝার্‌কির সঙ্গে তার বন্ধুত্বে ভাঙন ধরেছে। পার্টি ব্যুরোর একটা আলোচনা-বৈঠকে ঝার্‌কি 'ছেচল্লিশ জন'এর ঘোষণাপত্রটার তীব্র নিন্দা করেছিল এবং পরে সংঘর্ষটা আরও তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুবাভা তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এর পরে ঝার্‌কি বারকয়েক আন্নার সঙ্গে দেখা করতে তার ওখানে এসেছে। বছরখানেক হতে চলল আন্না আর দুবাভার বিয়ে হয়েছে। ওরা আলাদা আলাদা ঘরে থাকে এবং আন্না দুবাভার সঙ্গে একমত নয়। দুবাভার বিশ্বাস—আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে ইদানীং যে বনিবনাওয়ের অভাব দেখা দিয়েছে, সেটা ঝার্‌কির ঘন ঘন যাতায়াতের ফলেই আরও বেড়ে গেছে। দুবাভার দিক থেকে এটা ঈর্ষা নয়। কিন্তু এই অবস্থায় ঝার্‌কির সঙ্গে আন্নার বন্ধুত্বটা দুবাভার মনের মধ্যে একটা অন্তর্দাহের সৃষ্টি করেছে। আন্নার সঙ্গে সে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিল, এবং তার ফলে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্পর্কের উন্নতি

ঘটে নি বিন্দুমাত্র। কোথায় যাচ্ছে আন্নাকে কিছুই না বলেই সে এই সম্মেলনে এসেছে।

তার মনের দ্রুত চিন্তায় বাধা পড়ল পানক্রাতভের বক্তৃতায়।

'কমরেডসব!' বক্তা একেবারে মঞ্চের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেই কথাটার উচ্চকিত আওয়াজ কানে এল। 'কমরেডসব! ন'দিন ধরে আমরা বিরোধীদের বক্তৃতা শুনেছি এবং খুব খোলাখুলিই আমি বলছি, তারা যা বলেছে সেটা মোটেই সহযোদ্ধা হিসেবে, বিপ্লবী হিসেবে, শ্রেণীসংগ্রামে আমাদের কমরেড হিসেবে বলে নি। তাদের বক্তৃতাগুলো শত্রুতা, নিদারুণ বিদ্বেষ আর মিথ্যা কুৎসায় ভরা। হ্যাঁ, কমরেডসব, কুৎসাই গেয়েছে তারা। আমাদের — বলশেভিকদের — ওরা এমনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে যেন আমরা পার্টির মধ্যে একটা জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করার পক্ষে, যেন আমরা এমন একদল লোক যারা শ্রেণীস্বার্থের প্রতি আর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে যারা গড়ে তুলেছে, জারের জেলখানায় যারা কষ্ট সয়েছে, কমরেড লেনিনকে পুরোভাগে নিয়ে যারা বিশ্ব-মেনশেভিকবাদ আর ত্রৎস্কিবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে গেছে, আমাদের পার্টির সেই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন আর সবচেয়ে পরীক্ষিত অংশটিকে, বলশেভিকদের গৌরব সেই সব প্রবীণ আর অভিজ্ঞ পার্টি সভ্যদের এরা আমলাতান্ত্রিক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। শত্রু ছাড়া আর কেউ কি এ ধরনের কথা বলতে পারে? পার্টি এবং সেই পার্টির কাজকর্ম যারা পরিচালনা করে তারা কি অভিন্ন সমগ্র সত্তা নয়? তাহলে এতো সব কথা কিসের জন্যে, জানতে চাই। যে সব লোক লাল ফৌজের তরুণ সৈন্যদের তাদের কম্যান্ডার, কমিশার আর ফৌজী সদর-ঘাঁটির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চায়,

এবং সেটা এমন একটা সময়ে যখন তাদের দলটিকে শত্রুসৈন্যরা ঘিরে ধরেছে, তাহলে সেই সব লোককে কী বলা উচিত আমাদের? এই সব ত্রৎস্কিপন্থীদের মতে - আমি যতক্ষণ একজন মিস্ত্রি হিসেবে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ঠিক আছি', কিন্তু কালই যদি আমি কোনো একটা পার্টি কমিটির সম্পাদক হই, অমনি আমি হয়ে দাঁড়াব 'আমলাতান্ত্রিক উপরওয়ালা' আর 'গদি-গরম-করনেওয়ালা'! কমরেডসব, এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর গণতন্ত্রের সপক্ষে যারা লড়াই করছে সেই বিরোধীপক্ষের মধ্যেই, ধরা যাক, তুফতার মতো একজন লোক আছে যাকে সম্প্রতি আমলাতান্ত্রিক বলে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে, এটা কি একটু অদ্ভুত ব্যাপার নয়? কিংবা স্‌ভেতায়েভ, যে কিনা সলোমেন্‌কার লোকদের কাছে তার 'গণতন্ত্রের' জন্যে সুপরিচিত; কিংবা আফানাসিয়েভ--পদোল্‌স্ক এলাকায় কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে যাকে তার পদ থেকে প্রাদেশিক কমিটি তিন-তিনবার অপসারিত করেছিল? দেখা যাচ্ছে, পার্টি যাদের যাদের শাস্তি দিয়েছে তারাই সবাই মিলে পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে একজোট হয়েছে। প্রবীণ বলশেভিকরা আমাদের ত্রৎস্কির 'বলশেভিকবাদ' সম্বন্ধে বলুন—বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ত্রৎস্কির লড়াইয়ের ইতিহাস এবং এক শিবির থেকে আরেক শিবিরে তাঁর অনবরত দল-পরিবর্তনের কথাটা আমাদের তরুণদের পক্ষে জেনে রাখাটা খুবই প্রয়োজনীয়। বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমাদের সাধারণ সভ্যদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে এবং মতাদর্শের দিক থেকে আমাদের তরুণদের শক্তিশালী করে তুলেছে। পেটি বুর্জোয়া ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বলশেভিক পার্টি আর কমসোমল পোড় খেয়ে

খেয়ে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়ে উঠেছে। বিরোধীপক্ষের বিকারগ্রস্ত আতঙ্ক-সৃষ্টিকারীরা ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে আমাদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ভিত সম্পূর্ণ ধসে পড়বে। এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য কতটুকু তা আগামী দিনই প্রমাণ করবে। এরা দাবি তুলেছে যে ভোকারেভ বা তাঁর মতো সব প্রবীণ বলশেভিকদের পেছনে হটিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় এনে বসাতে হবে দুবাভার মতো কোনো সুবিধাবাদীকে, যে লোকটা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করাটাকে একটা মস্ত বড়ো বীরত্বের কাজ বলে মনে করে। না, কমরেডসব, এতে আমরা রাজী হতে পারি না। প্রবীণ বলশেভিকদের জায়গায় নতুন নতুন লোক আসবে ঠিকই। কিন্তু যখনই আমরা কোনো একটা বাধার বিরুদ্ধে লড়ছি, ঠিক সেই সময়েই এসে যারা তীব্রভাবে পার্টিকে আক্রমণ করে, সেই সব লোককে আমরা তাদের জায়গায় এনে বসাতে পারি না। আমাদের এই মহান পার্টির ঐক্যে ভাঙন ধরাতে দেব না আমরা। প্রবীণ আর তরুণ পার্টি কর্মীরা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। লেনিনের পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে পেটি বুর্জোয়া প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা বিজয়ের পথে এগিয়ে যাব!'

সমর্থনসূচক তুমুল হাততালির মধ্যে মঞ্চ থেকে নেমে গেল পানক্রাতভ।

পরের দিন জনা দশেক লোকের একটা দল তুফতার ঘরে এসে জড়ো হল।

'শুকোলেঙ্কো আর আমি আজ খারকভে রওনা হচ্ছি,' বলল দুবাভা, 'এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই। তোমাদের এককাট্টা হয়ে থাকার চেষ্টা করতেই হবে। এখন আমরা শুধু অপেক্ষা করে থেকে দেখে যেতে পারি কীরকম

ঘটে ব্যাপারখানা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সারা রাশিয়া সম্মেলনে আমাদের নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হবে; কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, এতো শিগগির আমাদের বিরুদ্ধে কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সংখ্যাগুরুরা আমাদের আরেকটা সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন, বিশেষ করে এই সম্মেলনের পরেই, খোলাখুলি লড়াই চালানোর মানেটা হচ্ছে পার্টি থেকে লাথি খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এটা আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে এখন বলা কঠিন। আমার আপাতত এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।' দুবাভা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

ক্ষীণ-দেহ, পাতলা-ঠোঁট স্তারোভেরভও উঠে দাঁড়াল।

'আমি তোমার কথা বুঝলাম না, মিতিয়াই,' বলল সে। কথার মধ্যে 'র'গুলোকে সে 'র্র্র্' শব্দে উচ্চারণ করছে আর অল্প একটু তোৎলাচ্ছে, 'তার মানে কি এই যে, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে চলার ব্যাপারে আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই?'

স্ভেতায়েভ তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'দস্তুর অনুযায়ী—আছে। না মেনে চললে তোমাকে পার্টি কার্ডখানি হারাতে হবে। কিন্তু আমরা এখন অপেক্ষা করে থেকে দেখে যাব হাওয়াটা বইছে কোন্ দিকে এবং ইতিমধ্যে আমরা আলাদা আলাদা হয়ে যাব।'

তুফতা অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে-চড়ে বসল তার চেয়ারে। বিবর্ণ মুখে দমে যাওয়া মন নিয়ে জানলাটার পাশে বসে নখ কামড়াতে লাগল শ্কোলেঙ্কো—তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। স্ভেতায়েভের কথায় সে তার এই বিষণ্ণ আনমনা ভাবটা ছেড়ে সভার দিকে ফিরে বসল।

'আমি এই ধরনের ছল-কৌশল খাটানোর বিরুদ্ধে,' হঠাৎ-

ক্রোধে বলে উঠল সে, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে আমরা বাধ্য। আমাদের মতবাদের পক্ষে আমরা লড়েছি, কিন্তু এখন অধিকাংশ ভোটে যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা মেনে নিতেই হবে আমাদের।'

স্তারোভেরভ তার দিকে সমর্থনসূচক চাউনিতে তাকাল।

'আমিও এই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম,' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে।

দুবাভা স্থিরদৃষ্টিতে শ্‌কোলেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকে বলল, 'কেউ তোমাকে কিছু করতে বলছে না। প্রাদেশিক সম্মেলনে গিয়ে 'অনুতাপ' প্রকাশ করার সুযোগ তোমার এখনও আছে।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল শ্‌কোলেঙ্কো।

'তোমার বলার ভঙ্গিটায় আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি, দ্‌মিত্রি। আর, খোলাখুলি বলতে গেলে, তোমার বক্তব্যটা আমার কাছে অত্যন্ত কদর্য বলে মনে হচ্ছে এবং তোমার ওই কথায় আমি আমার অবস্থাটা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বাধ্য হচ্ছি।'

দুবাভা হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল, 'তুমি ঠিক এইটেই করবে বলে আমি ভাবছিলাম। ছুটে যাও, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই আফসোস জানাও গিয়ে।'

কথাটা বলেই দুবাভা তুফতা আর অন্যাদের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেল।

শ্‌কোলেঙ্কো আর স্তারোভেরভও একটু বাদেই চলে গেল।

ইতিহাসের পাতায় উনিশ শ' চব্বিশ সালটা অতি নিদারুণ শীতের বছর বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। বরফ-ঢাকা দেশটাকে জানুয়ারি তার তুহিন-মুঠোর মধ্যে আরও জোরে চেপে

ধরল—মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সোঁ সোঁ হাওয়া আর তুষার-ঝড় বইতে থাকল প্রবল বেগে।

দক্ষিণ পশ্চিম রেলপথের লাইনগুলো বরফে চাপা পড়ে গেছে, আর প্রকৃতির সেই উন্মত্ত বাধার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেছে মানুষের লড়াই।

স্তূপীকৃত বরফের রাশির মধ্যে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে বরফ-কাটা লাঙলের ইস্পাতের দাঁতগুলো, ট্রেন-চলাচলের জন্যে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বরফের ভারে নুয়ে-পড়া টেলিগ্রাফের তার শীতে জমে গিয়ে তুষার-ঝড়ের দমকা ঝাপটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বারোটা টেলিগ্রাফ লাইনের মধ্যে মোটে তিনটে লাইনে কাজ চলেছে: একটি যোগাযোগের লাইন ইন্দো ইউরোপীয়, অন্য দুটি সরকারী।

শেপেতোভকা স্টেশনের টেলিগ্রাফ দপ্তরে তিনটি যন্ত্র অবিরাম টরেটক্কা আওয়াজ করে চলেছে—কেবল অভ্যস্ত কানেই তার অর্থ বোধগম্য।

মেয়ে অপারেটররা এ কাজে নতুন। তারা এতদিনে যত তারবার্তা ধরেছে তার ফিতের দৈর্ঘ্যটা দাঁড়াবে বিশ কিলোমিটারের বেশি নয়। কিন্তু তাদের পাশে বসে যে বুড়ো টেলিগ্রাফার কাজ করে, তার ফিতের দৈর্ঘ্য ইতিমধ্যে দু'শো কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেছে। তার অল্পবয়েসী সহযোগীদের মতো তাকে আর খবরটা উদ্ধার করার জন্যে ফিতেটা পড়ে দেখতে হয় না, ভুরু কুঁচকে কঠিন কঠিন শব্দ আর বাক্যাংশের মানে বের করার জন্যেও তাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। যন্ত্র থেকে টরেটক্কা আওয়াজ বেরুতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সে শুধু শব্দগুলো একে একে টুকে যায়। এবারে তার কানে এই কথাগুলো বাজল, 'সবাইকে জানানো যাচ্ছে। সবাইকে জানানো যাচ্ছে। সবাইকে জানানো...'

'নিশ্চয়ই ওই বরফ সাফ করার ব্যাপারে আরেকটা কোনো নির্দেশ,' কথাগুলো লিখে নিতে নিতে বুড়ো টেলিগ্রাফার ভাবল মনে মনে। বাইরে তুষার-ঝড় বইছে প্রচণ্ড বেগে, তুষার এসে আছড়ে পড়ছে জানলার গায়ে। জানলায় কেউ ধাক্কা মারছে মনে করে টেলিগ্রাফারের দৃষ্টিটা সরে এল শব্দের উৎসটার দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে তার চোখ দুটো আটকে গেল শার্সির গায়ে তুষার-চিহ্নিত জটিল নক্সাটার দিকে। এমন অপরূপ ডাল-পাতা-কাটা নক্সার সঙ্গে কোনো শিল্পীর রচনা পাল্লা দিতে পারবে না!

আপন চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে টেলিগ্রাফের আওয়াজের দিকে তার কান আর রইল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে তাকিয়ে ফিতেটা টেনে নিয়ে যে-শব্দের আওয়াজগুলো তার কান এড়িয়ে গেছে সেগুলো পড়তে আরম্ভ করল।

যন্ত্রটা থেকে বেরিয়ে-আসা কথাগুলো এই:

'২১এ জানুয়ারি সন্ধ্যে ৬টা ৫০ মিনিটে...'

তাড়াতাড়ি এই কথাগুলো টুকে নিয়ে ফিতেটা ছেড়ে দিয়ে টেলিগ্রাফার হাতের ওপর মাথাটা রেখে ফের শুনতে থাকল।

'...গতকাল গার্কিতে মারা গেছেন...'

ধীরে ধীরে সে অক্ষরগুলো টুকে নিতে লাগল কাগজের বুকে। দীর্ঘ জীবনে এ রকম কতো খবর সে টুকেছে—আনন্দের খবর আর মর্মান্তিক দুঃখের খবর—অন্যের আনন্দ কিংবা বেদনার সংবাদ—সে যে আর-সবার আগে কতোবার পেয়েছে তার হিসেব নেই! এই সব কাটাছাঁটা সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর মানে নিয়ে ভাবতে বসার অভ্যাসটা সে অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে শুধু আওয়াজটা শুনে যায় আর যান্ত্রিকভাবে অক্ষরগুলো লিখে চলে কাগজের বুকে।

এবারও কেউ একজন মারা গেছে, এবং সেই ঘটনাটা আর-কাউকে জানানো হচ্ছে। টেলিগ্রাফার বৃদ্ধটি গোড়ার কথাগুলো ভুলে গেছে: 'সবাইকে জানানো যাচ্ছে! সবাইকে জানানো যাচ্ছে! সবাইকে জানানো যাচ্ছে!' টরেটক্কা আওয়াজে যন্ত্রটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অক্ষরগুলো: 'ভ্লা-দি-মি-র্ ই-লি-চ্', আর বৃদ্ধ টেলিগ্রাফারটি কানে-শোনা সেই টকাটক আওয়াজগুলোকে লিখিত হরফে অনুবাদ করে চলেছে। নিরুদ্বেগ মনে বসে আছে সে, সামান্য একটু ক্লান্তিও বোধ করছে। ভ্লাদিমির ইলিচ নামে কেউ একজন কোনো এক জায়গায় মারা গেছে—এই বেদনাতুর সংবাদটি কেউ একজন পাবে, তার হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসবে একটা ব্যথাভরা যন্ত্রণার আর্তস্বর—কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে টেলিগ্রাফারের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ সে তো এই ঘটনার পেছনে একজন আকস্মিক দর্শক মাত্র। যন্ত্রের মুখে বেরিয়ে এল একটা বিন্দু-চিহ্ন, তারপরে একটা ড্যাশ্-চিহ্ন, তারপরে আরও কয়েকটা বিন্দু, আরেকটা ড্যাশ্... পরিচিত আওয়াজগুলোর মধ্যে দিয়ে সে প্রথম অক্ষরটা বুঝে নিল, টেলিগ্রামের ফরমটার ওপরে লিখে ফেলল **'ে'** অক্ষর-চিহ্নটা। তারপরে শোনা গেল দ্বিতীয় অক্ষরের আওয়াজ—**'ল'**। এর পাশেই সে পরিষ্কার হাতে লিখে ফেলল **'ি'** অক্ষর-চিহ্নটা। খাড়া সোজা রেখার টানটি দিয়েই তাড়াতাড়ি বসাল একটি **'ন'**। তারপরে অন্যমনস্কভাবে যন্ত্রের আওয়াজ শুনে শেষ অক্ষরটি বসাল—আরেকটি **'ন'**।

যন্ত্রটার মুখ থেকে একটা বিরতির চিহ্ন বেরিয়ে এল এবং মুহূর্তের জন্যে টেলিগ্রাফারের দৃষ্টি পড়ল তার লেখা এই শব্দটার ওপরে: **'লেনিন'**।

টরেটক্কা আওয়াজ করেই চলেছে যন্ত্র- কিন্তু এতক্ষণে এই

অতি-পরিচিত নামটি টেলিগ্রাফারের চেতনা চিরে ঢুকে পড়ল। খবরটার শেষ শব্দটার ওপরে সে আরেক নজর তাকাল — **'লেনিন'**। এ কী! লেনিন? টেলিগ্রামের সমস্ত কথাগুলো তার মনের পটে ঝিলিক মেরে গেল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সে টেলিগ্রাম ফরমটার ওপর--টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে তার বত্রিশ বছরের কর্মজীবনে সে এই প্রথম নিজের হাতে লেখা অক্ষরগুলোকে বিশ্বাস করতে পারল না।

লাইনগুলোর ওপরে তিনবার সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল, কিন্তু অক্ষরগুলো কিছুতেই বদলে যাবে না বলে গোঁ ধরেছে. 'মারা গেছেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন'। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বৃদ্ধ টেলিগ্রাফার, পাক খেয়ে পেঁচিয়ে যাওয়া ফিতেটাকে এক হেঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে তার গায়ের চিহ্নগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। যে কথাটা সে বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না, সেই কথাটা সুস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে প্রায় দু'মিটারের লম্বা এই ফালিটার গায়ে। মড়ার মতো মুখ নিয়ে ফিরে তাকাল সে সহকর্মীদের দিকে, তাদের কানে বাজল বৃদ্ধের আর্ত চিৎকার, 'লেনিন মারা গেছেন!'

এই মর্মান্তিক বিয়োগ-বেদনার খবরটা টেলিগ্রাফ অফিসের চওড়া খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘূর্ণির গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র — স্টেশন পার হয়ে তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে রেল-পথ বেয়ে সিগন্যাল-ঘরে, বরফ-ঝরে-পড়া হাওয়ার ঝাপটায় রেল-কারখানার লোহার দেউড়ি ভেঙে কারখানা-ঘরের ভেতরে।

এক-নম্বর মেরামতি-ঘরের খোঁদলের ওপরে বসানো একটা ইঞ্জিন সারানোর কাজে ব্যস্ত ছিল মামুলী মেরামতির কাজ যারা করে সেই মিস্ত্রিদের একটা দল। বুড়ো পলেন্তভ্স্কি

নিজে তার ইঞ্জিনটার পেটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেছে -- জখম জায়গাগুলো। সে মিস্ত্রিদের দেখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। জাখার ব্রুঝাক আর আরতিওম করচাগিন ইঞ্জিনের চুল্লির ঝাঁঝরাটার বেঁকে-যাওয়া ডাণ্ডাগুলো পিটিয়ে সোজা করছে। জাখার ঝাঁঝরাটাকে ধরে আছে নেহাইয়ের ওপরে, আর আরতিওম হাতুড়ি পিটছে।

বুড়িয়ে গেছে জাখার। গত কয়েকটি বছর তার কপালে এঁকে দিয়ে গেছে একটা গভীর কুঞ্চন-চিহ্ন, রুপোলি রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেছে তার রগের চুলে, পিঠটা বেঁকে গেছে, বসে-যাওয়া চোখের কোণে কালিমা।

দরজাটার ওপারে একটা মানুষের কালো মূর্তি এক মুহূর্তের জন্যে দেখা দিল, তারপরেই রাত্রির অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। লোহার ঝাঁঝরাটার ওপরে হাতুড়ির আওয়াজে প্রথমবার তার গলার স্বরটা শোনা গেল না। কিন্তু ইঞ্জিনের কাছে কাজে ব্যস্ত লোকগুলোর পাশে সে এসে পৌঁছতেই আরতিওম তার হাতুড়িটা নেহাইয়ের ওপর নামিয়ে আনার আগে থেমে গেল।

'কমরেড! লেনিন মারা গেছেন!'

হাতুড়িটা আরতিওমের কাঁধের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে গেল, নিঃশব্দে তার হাতটা হাতুড়িটাকে নামিয়ে দিল কংক্রিটের মেঝের ওপর।

'সে কী? কী বলছ তুমি?' যে-মানুষটা এই সাংঘাতিক খবর নিয়ে এসেছে তার চামড়ার কোর্তাটাকে আরতিওমের মুঠো একটা প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনায় আঁকড়ে ধরল।

তুষারে ঢেকে গেছে লোকটার সারা দেহ, দম নেবার জন্যে হাঁফাতে হাঁফাতে সে নিচু ভাঙা গলায় আরেকবার বলল, 'হ্যাঁ, কমরেড, লেনিন মারা গেছেন...'

লোকটা যে চেঁচামেচি করে কথাটা বলে নি, তার থেকেই আরতিওম বুঝতে পারল যে এই সাংঘাতিক খবরটা সত্যি। এতক্ষণে সে মানুষটাকে চিনেছে—স্থানীয় পার্টি সংগঠনের সম্পাদক সে।

খোঁদলটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সবাই নিঃশব্দে শুনল; যে-মানুষটির নাম গোটা দুনিয়া জুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে শুনল সেই মানুষটির মৃত্যুর খবর।

দেউড়ির বাইরে কোথায় যেন একটা ইঞ্জিন চিৎকার করে উঠল, মানুষগুলো হঠাৎ চমকে উঠল আওয়াজটা শুনে। স্টেশনের দূর প্রান্ত থেকে আরেকটা ইঞ্জিন সিটি বাজিয়ে আগেকার ইঞ্জিনের যন্ত্রণাভরা আওয়াজটার প্রতিধ্বনি তুলল, তারপরে আর একটা ইঞ্জিন... ইঞ্জিনগুলোর এই জোরালো সমবেত আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হল বিদ্যুৎ স্টেশনের সাইরেনটার গোলার টুকরো উড়ে চলার মতো সুতীক্ষ্ন আর চড়া পর্দার আওয়াজ। তারপরে, অন্য আওয়াজগুলোকে চেপে দিয়ে কিয়েভগামী যাত্রীবাহী ট্রেনটার অতি সুন্দর 'এস্' ইঞ্জিনটির গভীর চড়া-ঝঙকার উঠল।

শেপেতোভ্কা থেকে ওয়ারস পর্যন্ত যে পোলিশ এক্সপ্রেস ট্রেনটি যায়, সেই ট্রেনের ইঞ্জিন-চালক এই দুঃসংবাদের সিটি বাজবার কারণটা জেনে দু'-এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, তারপর ধীরে ধীরে হাতটা তুলে ইঞ্জিনের সিটি বাজাবার দড়িটায় টান দিল। সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগের একজন লোক এই শব্দটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। পোলিশ ইঞ্জিন-চালকটি জানে যে এই শেষবার তার ইঞ্জিন-চালনা, আর কখনও তাকে আর এই ইঞ্জিন চালাতে দেওয়া হবে না, কিন্তু তবু সে ওই দড়িটা থেকে সরিয়ে নিল না তার হাতখানা। পোলিশ কূটনীতিক আর রাষ্ট্রীয়

প্রতিনিধিরা তাদের ইঞ্জিনের এই আর্ত চিৎকার শুনে নরম গদিগুলোর ওপরে চমকে নড়েচড়ে উঠে বসল।

রেল-কারখানায় লোকের ভিড় জমে উঠেছে। সমস্ত প্রবেশপথগুলো দিয়ে দলে দলে এসে তারা জড়ো হয়েছে। তারপর বিরাট কারখানা-বাড়িটায় যখন আর লোকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা রইল না তখন গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শোক-সভা শুরু হল।

পার্টির শেপেতোভ্‌কা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক প্রবীণ বলশেভিক শারাব্রিন সমবেত সকলের উদ্দেশে বলল, 'কমরেডসব! বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর নেতা লেনিন মারা গেছেন। পার্টির এ এক অপূরণীয় ক্ষতি ·বলশেভিক পার্টির স্রষ্টা যিনি এবং যিনি এই পার্টিকে শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম, অনমনীয় হতে শিখিয়েছেন, তিনি আর নেই... আমাদের পার্টির এবং আমাদের শ্রেণীর নেতার এই মৃত্যু শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আহ্বান জানাচ্ছে—আমাদের সঙ্গে এক সারিতে এসে তারা সামিল হোক...'

শোক-যাত্রার সুর বেজে উঠল, শত শত মানুষ টুপি নামিয়ে নিল তাদের মাথা থেকে, আর আরতিওম যে গত পনেরো বছরের মধ্যে কোনোদিন কাঁদে নি, সে তার গলার কাছে যেন একটা দলা আটকে গেছে বলে অনুভব করল, তার বলিষ্ঠ কাঁধটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

মানুষের ভিড়ের চাপে রেলওয়ে-কর্মীদের ক্লাব-ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত যেন গোঙাচ্ছে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, হল-ঘরের ঢোকার মুখে দু'-পাশের লম্বা ফারগাছ দুটো তুষারে আচ্ছন্ন, জমাট বরফের সূচীমুখগুলো ঝুলছে তাদের ডালপালা থেকে। কিন্তু ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছে চুল্লির আগুনের গরমে আর ছ'শো লোকের নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় —

এরা এসে জড়ো হয়েছে পার্টি সংগঠন যে-স্মৃতিসভার ব্যবস্থা করেছে সেই সভায় যোগ দেবার জন্যে।

সভায় সাধারণত কথাবার্তার যে গুঞ্জনধ্বনি উঠে থাকে, সেটা এখন নেই। দুঃখের বিহ্বলতায় গলার স্বর চাপা পড়ে গেছে মানুষগুলোর, ফিসফিসিয়ে কথা বলছে সবাই, শত শত লোকের চোখের চাউনিতে বেদনা আর উদ্বেগ। এরা যেন সবাই একটা জাহাজের একদল মাল্লা যারা ঝড়ের সময় তাদের কর্ণধারকেই হারিয়ে বসেছে।

নিঃশব্দে পার্টি ব্যুরোর সভ্যেরা মঞ্চের ওপরে এসে বসল। গাঁট্টাগোট্টা সিরোতেঙ্কো সাবধানে ঘণ্টিটা তুলে ধরে মৃদুভাবে একবার বাজিয়েই ফের রেখে দিল টেবিলের ওপরে। গোটা হল-ঘর জুড়ে একটা যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতা নেমে আসার পক্ষে এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

মূল বক্তৃতাটা হয়ে যাবার পর পার্টি সংগঠনের সম্পাদক সিরোতেঙ্কো বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। যে-ঘোষণাটা সে করল সেটা স্মৃতিসভার পক্ষে একটু অনন্যসাধারণ হলেও, কেউ আশ্চর্য হল না।

সে বলল, 'পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে একদল শ্রমিক একটা দরখাস্ত দিয়েছে এবং তারা এই সভাকে অনুরোধ জানিয়েছে তাদের দরখাস্তটা বিবেচনা করে দেখবার জন্যে। সাঁইত্রিশ জন কমরেড সই করেছে এটায়।' এই বলে সে পড়ে গেল দরখাস্তখানা:

> 'দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের অন্তর্ভুক্ত শেপেতোভ্কা স্টেশনের বলশেভিক পার্টির রেলওয়ে সংগঠন সমীপে।
>
> আমাদের নেতার মৃত্যু আহ্বান জানিয়েছে বলশেভিক কর্মীদের সারিতে আমাদের সামিল হবার জন্যে। লেনিনের

পার্টিতে যোগ দেবার মতো যোগ্যতা আমাদের আছে কি-না সেটা বিচার করে দেখবার জন্যে আমরা এই সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

এই ছোট্ট বিবৃতিটুকুর নিচে দু'-সারি নামের স্বাক্ষর। জোরে জোরে এই নামগুলো পড়ে গেল সিরোতেঙ্কো··-- প্রত্যেকটা নাম বলার পর কয়েক মুহূর্ত থেমে রইল, যাতে নামগুলো সকলের মনে থাকে:

'স্তানিস্লাভ জিগমুন্দোভিচ পলেন্তভ্স্কি, ইঞ্জিন-চালক, কাজের অভিজ্ঞতা--ছত্রিশ বছর।'

হল-ঘরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল সমর্থনসূচক গুঞ্জনের একটা ঢেউ।

'আর্তিওম আন্দ্রেয়েভিচ করচাগিন, মিস্ত্রি, কাজের অভিজ্ঞতা —সতের বছর।'

'জাখার ভাসিলিয়েভিচ্ ব্রুঝাক, ইঞ্জিন-চালক, কাজের অভিজ্ঞতা—একুশ বছর।'

প্রবীণ আর অভিজ্ঞ এইসব রেল শ্রমিকদের নামগুলো --- একে একে বলে চলল সিরোতেঙ্কো এবং তার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হল-ঘরের গুঞ্জনটাও বেড়ে চলল।

তারপরে আরেকবার নিস্তব্ধতা নেমে এল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল পলেন্তভ্স্কি, যার নামটা আছে এই তালিকায় গোড়ায়।

বৃদ্ধ এই ইঞ্জিন-ড্রাইভার তার জীবন কাহিনী বলবার সময়ে মনের উত্তেজনাটা কিছুতেই চাপতে পারল না।

'...আমি আর কী বলতে পারি তোমাদের, কমরেড? আগেকার দিনে মজুরের জীবন যে কী ধবনের ছিল, তা তো তোমরা সবাই জানো। সারা জীবন খেটে মরেছি কেনা

গোলামের মতো আর এই বুড়োবয়সে ভিখিরির অবস্থা। এ কথা স্বীকার করছি যে, যখন বিপ্লব এল তখন আমার নিজেকে মনে হয়েছিল সংসারের ভাবনাচিন্তার বোঝায় নুয়ে-পড়া একজন বুড়ো মানুষ, তাই তখন পার্টির ভেতরে আসার পথ আমি খুঁজে পাই নি। আমি কখনও শত্রুপক্ষকে সমর্থন করি নি, তা ঠিক, তবু নিজে লড়াইয়েও বড়ো একটা যোগ দিই নি। উনিশ শ' পাঁচ সালে ওয়ারস-র রেল-কারখানায় ধর্মঘট কমিটির আমি একজন সভ্য ছিলাম এবং বলশেভিকদেরই পক্ষে ছিলাম। আমি তখন ছিলাম তরুণ আর দারুণ জঙ্গী। কিন্তু অতীতের কথা টেনে এনে কী লাভ! ইলিচের মৃত্যু আমার বুকের মধ্যে এসে বিঁধেছে। আমাদের বন্ধুকে আর অভিভাবককে আমরা হারিয়েছি। আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, সে প্রসঙ্গটা এই শেষবারের মতো তুললাম। কীভাবে যে কথাটা পাড়ব তা ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ, আমি কোনদিনই বক্তৃতা করার ব্যাপারে বিশেষ পোক্ত নই। কিন্তু এই কথাটাই শুধু আমি বলতে চাই: অন্য কোনো পথ নয়, বলশেভিকদের পথই আমার পথ।'

ইঞ্জিন-চালকটি তার শাদা মাথাটা নাড়ল, শাদা ভুরুর নিচে তার চোখ দুটো স্থিরদৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে রইল সভার সবার দিকে--যেন অপেক্ষা করে রয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত জানবার জন্যে।

ছোটোখাটো এই শাদা-চুল মানুষটির দরখাস্তের বিরুদ্ধে একটা আওয়াজও উঠল না এবং ভোট নেবার সময়ে একজন লোকও বিরত রইল না। পার্টি সভ্য নয় যারা তাদেরও এ প্রশ্নে ভোট দিতে বলা হয়েছিল। তারাও কেউ পলেন্তভস্কির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাল না।

সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের কাছ থেকে যখন পলেন্তভস্কি

চলে এল তখন সে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

অত্যন্ত অসাধারণ কিছু-একটা যে ঘটছে, সে সম্বন্ধে সবাই সচেতন। ইঞ্জিন-চালকটি এখুনি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এবার দেখা দিল আরতিওমের বিরাট দেহখানা। মিস্ত্রি-মানুষটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে হাত দুখানা নিয়ে কী করবে, ঘাবড়ে-যাওয়া ভঙ্গিতে সে চেপে চেপে ধরছে তার লোমওয়ালা চামড়ার টুপিটা। একটু জীর্ণ ভেড়ার চামড়ার কোর্তার বোতামগুলো খোলা, কিন্তু গলার কাছে উঁচু বেড়-লাগানো ধূসর রঙের ফৌজী কোটের পিতলের বোতামগুলো সাঁটা থাকার ফলে তার চেহারায় যেন এক ধরনের ছুটির দিনের ছিমছাম ভাব এসে গেছে। হল-ঘরের মুখোমুখি আরতিওম ঘুরে দাঁড়াতেই এক মুহূর্তের জন্যে তার নজরে পড়ল — রাজমিস্ত্রির মেয়ে গালিনা এক জায়গায় বসে আছে দর্জির দোকানের তার সহকর্মী মেয়েদের সঙ্গে। মার্জনার স্মিত হাসি তার মুখে — সে স্থিরদৃষ্টিতে আরতিওমের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হল — গালিনার এই হাসিটুকুর মধ্যে যেন সমর্থন রয়েছে, আরও কী যে তার মনে হল তা সে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না।

সিরোতেঙ্কোকে সে বলতে শুনল, 'তোমার জীবন সম্বন্ধে বলো আরতিওম।'

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে শুরু করাটা আরতিওমের পক্ষে সহজ নয়। এমন বিরাট একটা সমাবেশের সামনে বক্তৃতা করার অভ্যেস নেই তার। হঠাৎ তার মনে হল — এ জীবনে যত কিছু বলবার মতো কথা তার মনের মধ্যে জমে উঠেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা তার নেই। উপযুক্ত ভাষাটি খুঁজে পাবার চেষ্টায় সে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল মনের মধ্যে, ঘাবড়ে-যাওয়ার ফলে তার পক্ষে কিছু বলাটা আরও

কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এরকম অভিজ্ঞতা তার এর আগে কখনো হয় নি। সে যে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট পরিবর্তনের প্রবেশপথে, সে যে এমন একটা জায়গায় পা ফেলতে চলেছে যার ফলে তার বাঁকাচোরা নীরস জীবন হয়ে উঠবে সরস আর তাৎপর্যময় — এ সম্বন্ধে সে তীব্রভাবে সচেতন।

'আমাদের সংসারে ছিলাম আমরা চারজন,' বলতে শুরু করল আরতিওম।

নিস্তব্ধ হল-ঘর। টিকালো-নাক আর ঘন-কালো ভুরুর নিচে চাপা-পড়া-চোখ এই দীর্ঘদেহ মজুরটির কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে হল-ঘরের ছ'শো লোক।

'বড়োলোকদের বাড়ি রাঁধুনির কাজ করত আমার মা। বাবাকে আমার প্রায় মনেই পড়ে না, মার সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না। ভয়ানক মদ খেত বাবা। তাই, আমাদের খাওয়ানো-পরানোর কথা মাকেই ভাবতে হত। এতোগুলো পেট চালানো মায়ের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত বাঁদীগিরি করে চার রুবল মাইনে আর একমুঠো খাবার পেত মা। দু'বছর ইস্কুলে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল— সেখানে আমাকে লিখতে পড়তে শেখানো হয়েছিল, কিন্তু আমি ন'বছরে পড়তেই আমাকে একটা মিস্ত্রীখানায় শিক্ষানবীশ হিসেবে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া মার আর কোনো উপায় রইল না। তিন বছর বিনা মাইনেয় কাজ করেছি... শুধু দুবেলা খোরাকি পেতাম... কর্মশালার মালিক ছিল ফেরস্টার নামে একজন জার্মান। আমার বয়েস বড়ো কম বলে সে প্রথমে আমাকে নিতে চায় নি, কিন্তু আমার গড়নটা ছিল বাড়ন্ত, আর তাই মা আমার বয়েসটা দু'-তিন বছর বাড়িয়ে বলেছিল। সেই জার্মানটার কাছে আমি তিন বছর কাজ করেছিলাম — কিন্তু কাজ শেখানোর বদলে লোকটা আমাকে দিয়ে বাড়ির

এটা-ওটা কাজ করিয়ে নিত, ভদ্‌কা আনবার জন্যে পাঠাত। মদে চুর হয়ে থাকত সে সমস্তক্ষণ... কয়লা আর লোহালক্কড় বয়ে আনবার জন্যেও আমাকে পাঠাত... গিন্নিটি তো আমাকে রীতিমতো গোলাম বানিয়ে ছেড়েছিল -- বাসন মাজতে হত আমায়, তরকারি কুটতে হত। কিলচড়-লাথি তো লেগেই ছিল -- বেশির ভাগ সময়েই বিনা কারণে, শুধু অভ্যাসের বশেই যে-কেউ মারত আমাকে। কর্তাটি দিনরাত মদ খেত বলে গিন্নিটির মেজাজ সবসময়েই খারাপ হয়ে থাকত আর আমি তাকে খুশি করতে না পারলেই আমাকে মারধর করত। আমি ছুটে পালিয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসতাম রাস্তায় — কিন্তু যাব কোথায়, নালিশ করব কার কাছে? মা থাকে চল্লিশ মাইল দূরে, তাছাড়া মা তো আর আমার পেট চালাতে পারবে না... আর কারখানায় অবস্থাটাও এর চেয়ে ভালো ছিল না মোটেই। মালিকের ভাই ছিল এখানকার কর্তা, শুয়োরটা আমাকে জব্দ করে মজা দেখতে ভালবাসত। হাপর-চুল্লিটার পাশে এক কোণ দেখিয়ে হয়ত আমাকে সে বলল, 'এই খোকা, ওখান থেকে ওই ওয়াশারটা দাও দিকি,' আর দৌড়ে গিয়ে ওয়াশারটাকে চেপে ধরেই আমাকে চিৎকার করে উঠতে হল — ওয়াশারটাকে তখুনি বের করে আনা হয়েছে চুল্লিটার ভেতর থেকে -- মেঝের ওপরে রাখা অবস্থায় সেটাকে যদিও কালো দেখাচ্ছে, ছুঁলেই কিন্তু পুড়ে বসে যাবে হাতের ছাল মাংস অবধি। আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছি, ওই লোকটার তখন হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। এ ধরনের কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম মায়ের কাছে। কিন্তু মা কিছু ভেবে পেল না কী করবে আমাকে নিয়ে, তাই আবার ফিরিয়ে আনল আমাকে ওই জার্মানটার কাছেই। আমার মনে আছে — সমস্ত

পথটা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল মা। তৃতীয় বছরে ওরা আমাকে কাজটা একটু-আধটু শেখাতে শুরু করল, কিন্তু মারধর চলল সমানে। আবার আমি পালালাম — এবার গেলাম স্তারোকন্‌স্তান্তিনভ-এ। একটা সসেজ তৈরির কারখানায় কাজ পেলাম এবং সেখানে শুধু নাড়িভুঁড়ি ধুয়ে ধুয়েই দেড় বছরেরও বেশি সময় নষ্ট করলাম। তারপর আমাদের মালিক জুয়ো খেলায় কারখানাটাকে খুইয়ে বসল — চার মাস ধরে আমাদের এক পয়সা মাইনে না দিয়ে একদম উধাও হয়ে গেল সে একদিন। বেরিয়ে এলাম এই গর্তটা থেকে। ট্রেনে চেপে ঝ্‌মেরিন্‌কায় এসে কাজের সন্ধানে ঘুরছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমে একজন রেল-কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার দয়া হল আমার ওপর। যখন বললাম আমি একটু-আধটু মিস্ত্রির কাজ জানি, সে আমাকে তার ওপরওয়ালার কাছে নিয়ে গিয়ে তার ভাইপো বলে পরিচয় দিয়ে কোনো একটা কাজে আমাকে ঢুকিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাল। চেহারা দেখে ওরা আমার বয়েস ধরে নিল সতেরো বছর, তাই আমি কাজ পেয়ে গেলাম মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে। আমার বর্তমান কাজটা আমি করছি গত আট বছরেরও কিছু বেশি দিন ধরে। আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে এই আমাব যা-কিছু বলবার। আমার এখনকার জীবন সম্বন্ধে তোমরা তো এখানে জানো সবাই।'

টুপি দিয়ে কপালটা মুছে আরতিওম একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল। সে এখনও আসল কথাটা বলে নি। এই কথাটা বলাই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু অনিবার্য প্রশ্নটা কেউ করে বসার আগেই তাকে সেটা বলতে হবে। ঘন লোমশ ভুরু দুটো কুঁচকে সে তাই বলে চলল নিজের কথা, 'কেন আমি আগেই বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিই নি? তোমাদের সবারই এই

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবার অধিকার আছে। কিন্তু কী উত্তর দেবার আছে আমার? আর যাই হোক, আমি এখনও বুড়ো হয়ে পড়ি নি। আজকের এই দিনটার আগে পর্যন্ত আমি যে এই পথের দিশা পাই নি, এটা কেমন করে হল? সোজা কথাই বলব আমি তোমাদের, কারণ আমার গোপন করার কিছু নেই। ১৯১৮ সালে যখন জার্মানদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তখনই আমার এই পথে আসা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময়ে আমি এই পথের দিশা পাই নি। জাহাজী ঝুখ্‌রাই আমাকে কতোবার বলেছিল। ১৯২০-র আগে আমি রাইফেল ধরি নি। ঝড় যখন থেমে গেল, শ্বেতরক্ষীদের কৃষ্ণ সাগর পার করে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা যে-যার ঘরে। তারপরে সংসার পাতলাম, ছেলেপুলে হল... একেবারে জড়িয়ে পড়লাম আমি পরিবার নিয়ে। কিন্তু এখন, যখন কমরেড লেনিন মারা যাবার পর পার্টির আহ্বান এসেছে, তখন আমি আমার গোটা জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছি কোথায় খুঁত থেকে গেছে: নিজেরা যে-রাজ অর্জন করেছি, শুধু সেইটুকু রক্ষা করে চলাটাই যথেষ্ট নয়; বিরাট একটা পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে লেনিনের জায়গায়, যাতে সোভিয়েত ক্ষমতা দাঁড়াতে পারে একটা ইস্পাতের পাহাড়ের মতো। আমাদের সবাইকেই বলশেভিক হতে হবে। এ তো আমাদেরই পার্টি!'

এতোগুলো কথা এইভাবে একসঙ্গে বলতে সে অনভ্যস্ত, তাই একটু লজ্জা বোধ করছিল আরতিওম। কিন্তু বলার শেষে মনে হল যেন তার কাঁধ থেকে একটা মস্ত বড়ো বোঝা নেমে গেছে। শরীরটাকে টান করে খাড়া হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করে তারই অপেক্ষায়।

তার বক্তৃতার শেষে যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, সেটা

ভেঙে দিয়ে সিবোতেঙ্কোর গলা শোনা গেল, 'কারুর কোনো প্রশ্ন আছে?'

সভার সবাই একটু নড়ে-চড়ে বসল, কিন্তু প্রথমে কেউ সভাপতির কথায় কোনো সাড়া দিল না। তারপরে একজন স্টোকার -- সরাসরি সে এই সভায় এসেছে তার ইঞ্জিনের কাজ থেকে, গুবরেপোকার মতো তার সর্বাঙ্গ কালিলেপা -- দাঁড়িয়ে উঠে শেষ কথা বলে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'জিজ্ঞেস করার আর কী আছে? আমরা তো সবাই ওকে জানি। ওর সভ্যপদভুক্তির নির্দেশ ইত্যাদি যা দেবার দিয়ে চুকিয়ে ফেল!'

কামার গিলিয়াকার মুখখানা গরমে আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল সে, 'খাঁটি মানুষ এই কমরেডটি, কেটে পড়বার লোক নয় ও, ওর ওপরে ভরসা করতে পারো। ওকে নিয়ে নাও, সিরোতেঙ্কো!'

হল-ঘরের একেবারে শেষের দিকে যেখানে কমসোমল সভ্যরা বসে ছিল, সেখান থেকে আধা-অন্ধকারে অদৃশ্য কে-একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'কমরেড করচাগিন জোতজমির ওপর নির্ভর করে আছে কেন এবং চাষী হিসেবে অবস্থাটা তার শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাবকে পরাস্ত করে কিনা---সেটা একটু খোলসা করে বলুক।'

এ কথার অসমর্থনে হল-ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, প্রতিবাদ জানিয়ে একজন বলল, 'আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারে এমন ভাষায় কথা বলো না কেন? বিদ্যে ফলাবার জায়গা এটা নয়...'

কিন্তু ততক্ষণে আরতিওম জবাব দিতে শুরু করেছে, 'ঠিক আছে, কমরেড। আমি যে খেত-খামারের ওপর খানিকটা নির্ভর করি, সেকথা ঠিকই বলেছে ছেলেটি। কথাটা সত্যি, কিন্তু আমার শ্রমিক শ্রেণীর বিবেকের প্রতি আমি

বেইমানি করি নি। যাই হোক, আজ থেকে আমি আমার জমিজমার পাট চুকিয়ে দিচ্ছি। রেল-কারখানার কাছাকাছি কোনোখানে আমি আমার পরিবারকে সরিয়ে আনব। এখানেই ভালো হবে। ওই হতভাগা জমিটা অনেকদিন থেকেই আমার গলায় কাঁটা হয়ে আটকে আছে।'

তার পক্ষে উঁচিয়ে তোলা অসংখ্য হাতের অরণ্য দেখে আরেকবার আরতিওমের বুকটা কেঁপে উঠল। মাথা উঁচু করে সে এসে বসল তার জায়গায়, পেছন দিকে সিরোতেঙ্কোর ঘোষণা শুনল সে, 'সর্বসম্মতিক্রমে।'

সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের পাশে তৃতীয় জন এসে দাঁড়াল--পলেন্তভস্কির ভূতপূর্ব সহকারী জাখার ব্রুঝাক। স্বল্পভাষী এই বুড়ো মানুষটি ইদানীং কিছুদিন থেকে নিজেই ইঞ্জিন-চালক হিসেবে কাজ করছে। নিজের জীবন-ভর শ্রম করে যাওয়ার কাহিনী বলার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এসে তার গলার স্বর নেমে গেল, তখন নিচু গলায় কিন্তু সবাই শুনতে পায় এমন স্বরে বলে চলল সে, 'আমার ছেলেমেয়েরা যে-কাজ শুরু করে গেছে সেটা শেষ করা আমার কর্তব্য। আমি আমার দুঃখ নিয়ে এককোণে মুখ লুকিয়ে বসে রইব—এর জন্যে তারা প্রাণ দেয় নি। তাদের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে, আমি সেটাকে পূরণ করার চেষ্টা করি নি। কিন্তু এখন আমাদের নেতার মৃত্যু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। অতীতের জন্যে জবাবদিহি করতে বোলো না আমায়। আজ থেকে আমাদের জীবনের নতুন করে শুরু।'

দুঃখের স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে নাড়া খেয়ে উঠতেই জাখারের মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন আর গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু কোনো তীব্র প্রশ্ন না করে পার্টিতে তাকে গ্রহণ করার সপক্ষে যখন ভোট দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য

হাত উঠে গেল তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি, চুলে পাক-ধরা তার মাথাটা আর নিচের দিকে ঝুঁকে রইল না।

পার্টিতে এই নতুন সভ্যপদপ্রার্থীদের বক্তব্য শোনা আর ভোট দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলল। যারা সবচেয়ে ভালো কর্মী, যাদের সবাই ভালোভাবে চেনে এবং যাদের জীবনে কোনো কলঙ্ক নেই, শুধু তাদেরই পার্টিতে নেওয়া হল।

লেনিনের মৃত্যুর পরে হাজার হাজার শ্রমিক বলশেভিক পার্টিতে এল। নেতা নেই, কিন্তু পার্টির সাধারণ সভ্যদের সারি রইল অটুট। যে-গাছ তার বলিষ্ঠ শিকড় চালিয়েছে মাটির গভীরে, তার মাথাটা কাটা পড়লেও গাছ মারা পড়ে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোটেলের প্রমোদ-গৃহের প্রবেশপথে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের মধ্যে যে বেশি লম্বা, তার চোখে পেঁসনেই চশমা, লাল বাহুবন্ধনীর ওপরে লেখা: 'কম্যাণ্ড্যাণ্ট'।

'ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের সভা কি এইখানেই বসেছে?' জিজ্ঞেস করল রিতা।

'হ্যাঁ,' নিরুত্তাপ গলায় লম্বা মানুষটি জবাব দিল, 'আপনার কী দরকার, কমরেড?' ঢোকার দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে সে রিতার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল, 'আপনার কাছে কি প্রতিনিধির নির্দেশনামা আছে?'

রিতা তার কার্ডখানা বের করে দেখাল—উঁচু হরফে সোনালি রঙে তার গায়ে লেখা আছে 'কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য'। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি নরম হয়ে উঠল।

'ভেতরে যান, কমরেড,' সে বলল সহৃদয়ভাবে, 'ওদিকে বাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে বসবার খালি জায়গা পাবেন।'

আসনের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে রিতা একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল। সভা শেষ হয়ে আসছে বোঝা গেল। এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো হয়েছে, সভাপতি তার একটা সারমর্ম পেশ করছে। তার গলার স্বরটা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হল রিতার।

'সারা রুশ কংগ্রেসের কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন হয়ে গেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে কংগ্রেস বসবে। ইতিমধ্যে আমি এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকাটা আর একবার পরখ করে দেখি।'

আকিম! নামের তালিকাটা আকিম তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার সময়ে রিতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল।

প্রত্যেক প্রতিনিধি তার নামটা পড়া হওয়ামাত্রই হাত তুলে লাল বা শাদা ছাড়পত্রখানা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ একটা পরিচিত নাম রিতার কানে এল: পানক্রাতভ। একখানা হাত ওপর দিকে উঠতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নজর করল, কিন্তু মানুষের সারির ফাঁকে সে ডক-খালাসী মানুষটার মুখখানা দেখতে পেল না। নামগুলো পড়া হচ্ছে— আরেকব্যর রিতা একটা পরিচিত নাম শুনতে পেল: ওকুনেভ। এবং ঠিক এর পরেই আরেকটা চেনা নাম: ঝার্কি।

প্রতিনিধিদের মুখগুলো ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে রিতা ঝার্কিকে দেখতে পেল। রিতার অদূরেই বসে আছে সে তার দিকে মুখখানা আধাআধি পাশ ফিরিয়ে। হ্যাঁ, ভানিয়াই বটে। এই মুখাবয়বটি রিতা ভুলে গিয়েছিল প্রায়... বেশ কয়েক বছর রিতার সঙ্গে তার দেখা হয় নি।

ওদিকে নামের তালিকাটা পড়া চলছে। তারপরে আকিম

এমন একটা নাম পড়ল যেটা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠল রিতা, করচাগিন।

অনেক দূরে সামনের একটা সারি থেকে একখানা হাত উঠে আবার নেমে গেল এবং এই যে-মানুষটির নাম আর রিতার সেই মৃত কমরেডের নাম একই, তার মুখখানা একবার দেখবার জন্যে রিতার মনে একটা যন্ত্রণাভরা আকাঙ্ক্ষা জাগল-- ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বটে। যে জায়গাটা থেকে হাতখানা উঠেছিল সেদিক থেকে সে কিছুতেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না। কিন্তু সামনের সারির সমস্ত মাথাই তার চোখে একই রকম ঠেকছে। নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ে রিতা দু'সারি আসনের মাঝখান বেয়ে সামনের সারির দিকে এগিয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকিমের তালিকা পড়া শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারগুলো সশব্দে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, তরুণ গলার হাসির আওয়াজে আর কথাবার্তার গুঞ্জনে ভরে উঠল হল-ঘরটা। গোলমালটা ছাপিয়ে যাতে তার গলা সকলে শুনতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে আকিম চেঁচিয়ে বলল, 'বলশোই থিয়েটার... সাতটার সময়। দেরি হয় না যেন!'

বেরিয়ে আসার দরজাটার কাছে ভিড় জমিয়ে তুলেছে প্রতিনিধিরা। রিতা বুঝতে পারল—এই গাদাগাদির মধ্যে থেকে সে তার পুরনো বন্ধুদের কাউকেই খুঁজে বের করতে পারবে না। আকিম চলে যাবার আগে তাকে ধরবার চেষ্টা করতেই হবে এবং সে আর-সবাইকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। ঠিক সেই সময়ে একদল প্রতিনিধি তার পাশ কাটিয়ে বেরোবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। রিতা একজনকে বলতে শুনল, 'ওহে করচাগিন, চলো, আমরাও এবার বেরিয়ে যাই!'

এবং তারপরেই রিতা একটা অতি পরিচিত আর অবিস্মরণীয় গলার স্বরে জবাব শুনল, 'বেশ, তাই চলো।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল রিতা, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সরু ককেশীয় কোমরবন্ধনী-আঁটা, খাকি কোর্তা গায়ে আর নীল ব্রীচেজ-পরা লম্বা, ঘন-রঙ একজন তরুণ।

বিস্ফারিত চোখে রিতা তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপরেই রিতা অনুভব করল তার হাতের নরম আলিঙ্গন, কেঁপে-ওঠা গলায় তাকে মৃদু স্বরে বলতে শুনল, 'রিতা!' রিতা বুঝেছে এ তো পাভেল করচাগিন।

'তুমি বেঁচে আছ তাহলে!?'

রিতার এই কথা ক'টি শুনেই পাভেল সব বুঝে নিয়েছে। তার মারা যাবার খবরটা যে ভুল, সে কথা রিতা জানে না।

হল-ঘরটা অনেকক্ষণ হল ফাঁকা হয়ে গেছে। শহরের প্রধানতম ধমনী এই ৎভের্‌স্কায়া স্ট্রিটের যানবাহন চলাচলের আর জনস্রোতের কোলাহল ভেসে আসছে খোলা জানলাটা দিয়ে। ছ'টা বাজল ঘড়িতে, কিন্তু ওদের দু'জনেরই মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু ঘড়িটা বলছে--বলশোই থিয়েটারে যেতে হবে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে বেরুবার পথে নামতে নামতে রিতা আরেকবার পাভেলের সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে নিল। সে এখন রিতার চেয়ে লম্বায় আধ-মাথা উঁচু, আগের চেয়ে পরিণত-বুদ্ধি আর স্থিতধী। কিন্তু আর-সব দিক থেকে রিতার চেনা সেই আগেকার পাভেলই আছে।

'তুমি এখন কোথায় কাজ করছ, সে কথাটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি নি,' বলল রিতা।

'আমি কমসোমলের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক -দুবাভা যাকে বলে 'আমলা'।' হেসে জবাব দিল পাভেল।

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি তোমার?'

'হ্যাঁ এবং সেই দেখা হওয়ার ঘটনাটার অত্যন্ত অপ্রীতিকর স্মৃতি জমে আছে আমার মনে।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। হর্ন বাজিয়ে মোটরগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, ফুটপাথে ভিড়, ব্যস্ত কোলাহল। বলশোই থিয়েটারে যাবার পথে ওরা কথাবার্তা বলল খুব সামান্যই, দু'জনেরই মন জুড়ে রয়েছে একই চিন্তা। থিয়েটার-বাড়ির কাছে এসে দেখে--অসংখ্য মানুষের একটা উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্র বাড়িটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে, প্রবেশপথের মুখে পাহারাদার লাল ফৌজের শান্ত্রীদের সারি ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় পাথুরে দেয়ালের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু শান্ত্রীরা শুধু প্রতিনিধিদেরই ঢুকতে দিচ্ছে। দু'পাশে সার-বাঁধা প্রহরীদলের মাঝখানকার পথটুকু দিয়ে সগর্বে তাদের ছাড়পত্রগুলো দেখাতে দেখাতে চলেছে প্রতিনিধিরা।

থিয়েটার-বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে কমসোমল সভ্যদের একটা সমুদ্র। এই তরুণ-সমুদ্র কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভায় ঢুকবার টিকিট জোগাড় করতে পারে নি, কিন্তু যেমন করেই হোক ঢুকবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই তরুণদের মধ্যে যারা একটু বেশি তৎপর, তারা প্রতিনিধিদের দলগুলোর ফাঁকে কোনরকমে ঢুকে পড়ছে এবং কোনো-একটা লাল কাগজের টুকরো দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। দু'-একজন এমন কি দরজার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে ফেলছে ডিউটি-রত কেন্দ্রীয় কমিটির লোক কিংবা কম্যাণ্ড্যাণ্ট, যারা প্রতিনিধি আর অতিথিদের তাদের নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে। তারপরে তাদের বিনা

বাক্যব্যয়ে হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং তাই দেখে তার 'টিকিটহীন' বন্ধুদের খুশি আর ধরছে না।

যারা উপস্থিত থাকতে চায়, তাদের সংখ্যার ভগ্নাংশও এই থিয়েটার-ঘরে ধরবে না।

রিতা আর পাভেল ভিড় ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে এল ভেতরে ঢোকার দরজাটার কাছে। প্রতিনিধিরা অনবরত আসতে থাকল: কেউ আসছে ট্রামে, কেউ গাড়িতে। এদের একটা বড়ো দল ভেতরে ঢোকার মুখে জমে গেছে এবং লাল ফৌজের শান্ত্রীরা—যারা নিজেরাই কমসোমলের সভ্য—এদের চাপে দেয়াল-ঠাসা হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে প্রবেশপথের কাছে ভিড়টার মধ্যে থেকে বিরাট একটা চিৎকার উঠল:

'বাউমান পাড়ার ছেলেরা সব, লাগাও এক ঠেলা!'

'চাপলিন আর সাশা কসারেভকে বাইরে আসতে বলো তারা আমাদের ঢুকতে দেবে।'

'জোরসে ঠেলো ভাইসব. আমরা জিতছি!'

'হুর্‌রে!'

কমসোমলের ব্যাজ-আঁটা একটি তরুণ তীক্ষ্ন নজর রেখেছিল, চট করে সে রিতা আর পাভেলের পাশাপাশি কম্যান্ড্যান্টের নজর এড়িয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়েই বারান্দা বেয়ে সোজা দৌড় মারল। এক মুহূর্তে সে মিশে গেল প্রতিনিধিদের ভিড়ের মধ্যে।

চেয়ারের সারিগুলোর পেছন দিকে এক কোণে দুটো জায়গা দেখিয়ে রিতা বলল, 'এসো, এইখানে বসি।'

বসার পর রিতা বলল, 'একটা কথা আমার তোমাকে জিজ্ঞেস করবার আছে। অতীতের ব্যাপার অবশ্য, তবে আমার মনে হয়—তুমি জবাব দিতে আপত্তি করবে না

নিশ্চয়ই। সেবারে তুমি ওভাবে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ছিন্ন করে দিয়েছিলে কেন?'

রিতার সঙ্গে তার দেখা হবার সময় থেকেই পাভেল যদিও এই প্রশ্নটা ওঠার অপেক্ষায় আছে, তবু এখন এই প্রশ্নে সে একটু থতমত খেয়ে গেল। তাদের দু'জনের মধ্যে চোখাচোখি হতেই পাভেল বুঝল যে রিতা বুঝেছে ব্যাপারটা।

'আমার তো মনে হয়, তুমি নিজেই এর জবাবটা জানো, রিতা। ওই তিন বছর আগেকার ঘটনা এবং তখনকার পাভেল যা করেছিল সেজন্য আমি শুধু তার নিন্দেই করতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে, করচাগিন তার জীবনে ছোট-বড়ো অনেক ভুলই করেছে। ওটাও সেই ভুলগুলির মধ্যে একটা।'

হাসল রিতা, 'ভূমিকাটি তো চমৎকার ফাঁদলে দেখছি। এবার প্রশ্নের উত্তরটায় এসো!'

'দোষটা কেবল আমার একারই নয়,' নিচু গলায় বলল পাভেল, 'ওই 'গ্যাডফ্লাই'এরও দোষ, ওর ওই বিপ্লবী রোম্যাণ্টিকতার দোষ। আমাদের আদর্শের প্রতি জীবন উৎসর্গ করা দৃঢ়চিত্ত বীর বিপ্লবীদের সম্বন্ধে উজ্জ্বল বর্ণনা যে-সব বইয়ে আছে, সেই সব বই পড়ে তখনকার দিনে আমি দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলাম। এইসব লোক আমার সমস্ত কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এদের মতো হবার জন্যে আমি মনেপ্রাণে কামনা করতাম। তোমার প্রতি আমার মনোভাবকে আমি ওই 'গ্যাডফ্লাই'এর দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছিলাম। এখন সেটা আমার কাছে নিতান্তই আজগবি ব্যাপার বলে মনে হয়। এখন ওই ঘটনাটা নিয়ে আমার হাসি পায়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয় রাগ।'

'তাহলে, 'গ্যাডফ্লাই' সম্বন্ধে তুমি তোমার মত বদলেছ?'

'না, রিতা, মূলগতভাবে নয়। ওই বইটায় ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি পরীক্ষার যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে যে মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, শুধু সেইটেই আমি পরিত্যাজ্য বলে মনে করি। কিন্তু 'গ্যাডফ্লাই'এর মধ্যে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটাকে আমি এখনও সমর্থন করি—সেটা হল তার বীরত্ব, তার অপরিসীম সহ্যশক্তি, নিজের দুঃখকষ্টগুলো পাঁচজনের কাছে বলে না বেড়িয়ে যন্ত্রণা সইবার আশ্চর্য ক্ষমতা। সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে তুলনায় যার ব্যক্তিগত জীবন তুচ্ছ হয়ে গেছে, সেই ধরনের বিপ্লবী নায়কই আমার আদর্শ।'

'পাভেল, তিন বছর আগে যে তুমি আমাকে এ সব কথা বলো নি, এইটেই আফসোসের কথা,' মৃদু হেসে বলল রিতা। হাসিটা দেখে বোঝা যায়, তার মনটা অনেক দূরে চলে গেছে।

'আফসোস বলছ কেন, রিতা? আমি তোমার কাছে কখনও একজন কমরেডের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারি নি, সেই জন্যেই কি?'

'না, পাভেল, তুমি তার চেয়েও বেশি কিছু হতে পারতে।'

'সে ভুলটা তো এখনও শুধরে নেওয়া যায়।'

'না, কমরেড 'গ্যাডফ্লাই', এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

হেসে কথাটা খুলে বলল রিতা, 'আমার কোলে এখন একটি ছোট্ট মেয়ে, বুঝলে? ওর বাবাকে আমি খুব ভালবাসি। মোটের ওপর আমাদের তিনজনের মধ্যে বেশ দিব্যি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং আমাদের এই তিনজনকে আর পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া যাবে না।'

পাভেলের হাতের ওপর রিতা তার আঙুলগুলো বুলিয়ে দিল। পাভেল সম্বন্ধে একটা উদ্বেগের বশেই সে এটা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল যে এটা করার কোনো দরকার ছিল

না। হ্যাঁ, এই তিন বছরে পাভেল অনেক সুপরিণত হয়ে উঠেছে, এবং সেটা শুধু দেহের দিক থেকেই নয়। ওর চোখের চাউনি দেখেই রিতা বুঝেছে যে তার এই স্বীকারোক্তি শুনে পাভেল গভীর আঘাত পেয়েছে মনে মনে। কিন্তু মুখে সে শুধু বলল, 'তবু, এইমাত্র যা হারালাম, তার তুলনায় আমার যা রইল সেটা ঢের বেশি।'

এবং রিতা বুঝল যে এটা শুধুই একটা ফাঁকা বুলিমাত্র নয়, একটা সহজ সত্য।

এবার তাদের মঞ্চের কাছাকাছি এসে বসবার সময় হয়েছে। ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা যেখানে বসে আছে সেই সারিতে সামনের দিকে ওরা এগিয়ে এল। ব্যান্ড বেজে উঠল। হলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত জুড়ে টাঙানো লাল কাপড়ের ফালির ওপরে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা: 'ভবিষ্যৎ আমাদের!' বিরাট থিয়েটার-ঘরে নিচের চেয়ারের সারি, ওপরের বক্স আর গ্যালারিগুলো ভরে গেছে হাজার হাজার মানুষে। হাজার হাজার মানুষ এসে মিলেছে একটি বিরাট প্রাণকেন্দ্রে যেখান থেকে এক অফুরন্ত শক্তির প্রবাহ উৎসারিত। যন্ত্র-শিল্পের তরুণ শ্রমিকদের অগ্রণী অংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূরা এসে জড়ো হয়েছে এখানে। মঞ্চের ওপর ভারি পর্দাটার গায়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে: 'ভবিষ্যৎ আমাদের!'—হাজার হাজার চোখের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এই কথাগুলোর দীপ্তি।

এখনও মানুষের স্রোত এসে ঢুকছে থিয়েটার-বাড়িতে। আর-কয়েক মুহূর্ত পরেই ভারি মখমলের পর্দাটা সরে যাবে পাশে, সারা রাশিয়া যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এসে দাঁড়াবে, সভা শুরু হবার সেই গাম্ভীর্যমণ্ডিত মুহূর্তে সে অভিভূত হয়ে যাবে, তারপর ঘোষণা করবে:

'সারা রাশিয়া যুব কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেস শুরু হল বলে আমি ঘোষণা করছি।'

বিপ্লবের এই বিরাট শক্তিকে, এই বলিষ্ঠ মহিমাকে এর আগে আর কখনও পাভেল করচাগিন এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করে নি, এতোটা সচেতনভাবে তার মন এর আগে আর কখনও এমন নাড়া খায় নি। জীবনের পথ বেয়ে পাভেল যে একজন যোদ্ধা আর নির্মাতা হিসেবেই বলশেভিক আদর্শের এই তরুণ যোদ্ধাদের বিজয়-সমাবেশের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—এ কথাটা মনে হতে গর্ব আর আনন্দের একটা অনির্বচনীয় আবেগে তার মন ভরে উঠল।

ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সর্বক্ষণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্যস্ত রইল, তাই ইতিমধ্যে আর রিতার সঙ্গে পাভেলের দেখা হয়ে ওঠে নি। একেবারে শেষের দিকের একটা অধিবেশনে ওদের দেখা হল—একদল ইউক্রেনীয় প্রতিনিধির সঙ্গে ছিল রিতা।

'কাল কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলে যাব,' বলল রিতা, 'এর মধ্যে আমরা আর কথাবার্তা বলবার সুযোগ পাব কিনা জানি না। আমি তাই আমার রোজনামচার দুটো পুরনো নোটবই আর একটা ছোট চিঠি তোমার জন্যে তৈরি করে রেখেছি। পড়ে নিও, আর পড়া হয়ে গেলে আমাকে ওগুলো আবার ডাকে ফেরত পাঠিয়ে দিও। তোমাকে যেসব কথা আমার মুখে বলা হয়ে ওঠে নি, সে কথাগুলো তুমি ওর থেকেই জানতে পারবে।'

রিতার হাতখানা চেপে ধরে পাভেল তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল—যেন তার মুখের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য সে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে চায়।

পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা-অনুযায়ী পরের দিন থিয়েটার-বাড়ির প্রধান প্রবেশপথে তাদের দেখা হল এবং রিতা একটা প্যাকেট আর একটা আঁটা খাম দিল পাভেলের হাতে। আশেপাশে লোকজন রয়েছে, তাই তারা সংযতভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। রিতার চোখ দুটো অল্প একটু ঝাপসা—সেই চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যথাভরা নিবিড় স্নেহ ফুটে উঠেছে বলে পাভেল অনুভব করল।

পরের দিন ভিন্নমুখী দুটি ট্রেনে চেপে তারা দুজনে দু'দিকে চলে গেল।

পাভেল যে-ট্রেনে চলেছে, সেই ট্রেনের গোটাকতক কামরা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলে ভর্তি। কিয়েভের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক কামরায় চলেছে পাভেল। সন্ধ্যের পর অন্য যাত্রীরা যখন ঘুমোবার জন্যে শুয়ে পড়েছে আর পাশের বেঞ্চিটায় ওকুনেভ প্রশান্তির সঙ্গে নাক ডাকাচ্ছে, পাভেল তখন আলোটার কাছে সরে এসে চিঠিখানা খুলল·

'প্রিয় পাভেল!

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়েই এই কথাগুলো আমি তোমায় বলতে পারতাম। কিন্তু এই চিঠির মারফত বলাটাই আরও ভালো হবে। আমি শুধু এইটেই কামনা করছি যে কংগ্রেস শুরু হবার আগে আমাদের মধ্যে যে-কথাবার্তা হয়েছে, তার ফলে তোমার জীবনে যেন কোনো ক্ষতচিহ্ন থেকে না যায়। আমি জানি—তুমি শক্তিমান, এবং তুমি যা বলেছ তা আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেছ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি কোনো ছক·বাঁধা রীতের মনোভাব নিয়ে জীবনকে দেখি না। তাই আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির বেলায়—

কদাচিৎ হলেও—কিছু কিছু ব্যতিক্রমের অবকাশ আছে, যদি সেই সম্পর্কটা খাঁটি আর গভীর ভালবাসার ভিত্তির ওপরে গড়ে ওঠে। তোমার বেলায় সেই ব্যতিক্রমটুকু আমি হতে দিতে পারতাম, কিন্তু আমাদের তরুণতর বয়সের সেই দেনাটুকু শোধ করার জন্যে প্রথমেই যে একটা আবেগ আমার মধ্যে জেগেছিল, সেটাকে আমি দমন করেছি। কারণ সেটাকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের দু'জনের কেউই সত্যিকার সুখী হবে না। তবু, তোমার নিজের ওপরে এত রূঢ় হওয়া উচিত নয়, পাভেল। আমাদের জীবনে শুধুই সংগ্রামের নয়, সত্যিকারের ভালবাসার সুখের স্থানও রয়েছে।

'তোমার বাকি জীবন সম্বন্ধে, সেই জীবনের আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে, আমার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। গভীর ভালবাসার সঙ্গে আমি তোমার করমর্দন করছি।

রিতা।'

চিন্তাচ্ছন্নভাবে পাভেল ছিঁড়ে ফেলল চিঠিখানা। জানলার বাইরে হাতখানা বের করে দিয়ে বাতাসের ধাক্কায় কাগজের টুকরোগুলোর উড়ে যাওয়াটা অনুভব করল।

সকাল নাগাদ সে রিতার রোজনামচার নোটবই দুখানা পড়ে ফেলে ডাকে ফেরত পাঠাবার জন্যে কাগজে জড়িয়ে বেঁধে রাখল। খারকভে এসে সে ওকুনেভ, পানক্রাতভ আর জনকতক প্রতিনিধির সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে গেল। তালিয়াকে নিয়ে আসবার জন্যে ওকুনেভ কিয়েভে যাবে, তালিয়া সেখানে আন্নার কাছে আছে। পানক্রাতভ ইউক্রেনীয় কমসোমলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছে, তারও কাজ আছে কিয়েভে। পাভেল ঠিক করল—সেও ওদের সঙ্গে কিয়েভে

গিয়ে একবার ঝার্কি আর আন্নার সঙ্গে দেখা করে আসবে। রিতার ঠিকানায় পার্সেলটা পাঠিয়ে দেবার পর ডাকঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাভেল দেখল, ততক্ষণে অন্য সবাই চলে গেছে। অতএব একাই রওনা হল পাভেল।

আন্না আর দুবাভা যে-বাড়িটায় থাকে, তার সামনে এসে ট্রাম থামল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসে পাভেল বাঁদিকে আন্নার ঘরের দরজায় ঘা দিল। কোনো সাড়া নেই। এতো সকালে আন্না কাজে বেরিয়ে যেতে পারে না তো। 'নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে,' মনে মনে ভাবল পাভেল। এমন সময়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং ঘুমে ভারি চোখ নিয়ে দুবাভা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিঁড়ির চাতালে। মুখখানা তার ছাইয়ের মতো বিবর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়েছে। পেঁয়াজের কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে এবং পাভেলের তীক্ষ্ম নাকে মদের গন্ধও ঠেকল এসে। আধ-খোলা দরজাটার ফাঁকে পাভেলের নজরে পড়ল—বিছানায় শোয়া অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মাংসল পা আর কাঁধ।

দুবাভা তার নজরটা লক্ষ্য করে পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিল। পাভেলের সঙ্গে চোখাচোখিটা এড়িয়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'নিশ্চয়ই কমরেড বোরহার্ৎ-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? সে এখন আর এখানে থাকে না। জানো না নাকি?'

গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাভেল তাকাল দুবাভার দিকে, 'না, জানতাম না। কোথায় গেছে সে?'

হঠাৎ চটে উঠল দুবাভা। চিৎকার করে বলল, 'সেটা আমার জানবার কথা নয়।' তারপর চাপা বিদ্বেষের সঙ্গে বলল, 'ওকে

সান্ত্বনা দিতে এসেছিলে বুঝি, অ্যাঁ? শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ। এই তো তোমার সুযোগ। ভেবো না, ও তোমাকে নামঞ্জুর করবে না। ও আমাকে অনেকবার বলেছে যে তোমাকে ওর ভারি ভালো লাগে... ওই সব ন্যাকা মেয়েরা যেভাবে কথা বলে আর কি! যাও, সময় থাকতে থাকতে সুযোগটা নাও গিয়ে। দেহ-মনের যথার্থ সমন্বয় ঘটাতে পারবে।'

মুখে রক্ত উঠে আসছে বলে অনুভব করল পাভেল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিচু গলায় সে বলল, 'এ সব কী আরম্ভ করেছ, মিতিয়াই? তুমি যে এতো নিচে নেমে যাবে, তা কোনোদিন ভাবি নি। এক সময়ে তুমি তো খারাপ লোক ছিলে না। তুমি কেন এভাবে নিজেকে গোল্লায় যেতে দিচ্ছ?'

দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল দুবাভা। তার খালি পায়ের নিচে সিমেণ্টের মেঝেটা স্পষ্টতই ঠাণ্ডা ঠেকছে, কারণ কেঁপে কেঁপে উঠছে সে। দরজাটা খুলে গেল আর ফোলা-ফোলা চোখওয়ালা একজন স্ত্রীলোকের একটা গোলগাল মুখ বেরিয়ে এল, 'ভেতরে এসো, সোনা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

স্ত্রীলোকটি আর কিছু বলবার আগেই দুবাভা দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে তার গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল।

'তোমার অধঃপতনের শুরুটা তো চমৎকার দেখছি,' বলল পাভেল, 'এসব কী ধরনের সঙ্গী-সাথী তোমার আজকাল? এর শেষ কোথায়?'

কিন্তু দুবাভা আর কোনো কথা শুনতে রাজী নয়। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমি কার সঙ্গে শোব না শোব, তাও তোমরা বলে দেবে নাকি? তোমার এই উপদেশ-দান অনেক

সয়েছি। এবার কেটে পড়ো যেখান থেকে এসেছ সেইখানে! যাও, দৌড়ে গিয়ে সবাইকে বলো গে- দুবাভা মদ খায়, নষ্ট মেয়েমানুষদের নিয়ে শুয়ে থাকে। যাও!'

পাভেল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা আবেগভরা গলায় বলল, 'মিতিয়াই, ওই স্ত্রীলোকটিকে বিদায় করে দাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, শেষ বারের মতো বলছি...'

অন্ধকার হয়ে উঠল দুবাভার মুখ। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও না বলে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

'হতভাগা শুয়োর!' বিড়বিড় করে বলে পাভেল ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

দুটি বছর কেটে গেছে। অনপেক্ষ সময়ের হিসেবে দিন আর মাসগুলো একে একে পার হয়ে গেছে, কিন্তু জীবনের বিচিত্র রঙে রঙীন সময়ের এই মিছিলটার আপাত-গতানুগতিকতা ভরে উঠল অভিনবত্বে, প্রত্যেকটি দিনই অন্য দিনের চেয়ে পৃথক। বিরাট এই দেশের যোলো কোটি মানুষ, যারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম অসীম ঐশ্বর্য-ভরা তাদের এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, তারা তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থাটাকে পুনর্গঠিত করে তোলার বিরাট শ্রমসাপেক্ষ কাজে ব্যাপৃত ছিল এই দু'-বছর ধরে। দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; নতুন বীর্য সঞ্চারিত হয়েছে তার শিরা-উপশিরায়; নির্ধূম-চিমনিওয়ালা পরিত্যক্ত কারখানার প্রাণহীন দৃশ্য আর ইদানীং দেখতে পাওয়া যায় না।

অবিশ্রাম কাজের মধ্যে দিয়ে পাভেলের এই দু'-বছর কেটেছে। জীবনকে যারা নিরুত্তাপ হয়ে গ্রহণ করে, প্রত্যেকটি সকালকে হাই তুলে অলস অভ্যর্থনা জানায় আর দশটা

বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুতে যায়—পাভেল তাদের মতো নয়। গতিমুখর তার জীবন; নিজের বেলায় যেমন, তেমনি অন্যের বেলাতেও প্রত্যেকটি অপচয়িত মুহূর্তের জন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে।

ঘুমোবার জন্যে পাভেল সবচেয়ে কম সময় দেয়। প্রায়ই তার জানলায় গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলে; তখন ঘরের ভেতরে দেখা যাবে—টেবিলের চারধারে জনকতক লোক বসে পড়াশোনায় মগ্ন। এই দু'-বছরে তারা কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড খুঁটিয়ে পড়েছে এবং পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটা এখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাভেলের কাজের এলাকায় এসে জুটেছে রাজভালিখিন। তাকে কোনো একটা জেলা কমসোমল সংগঠনের সম্পাদক নিযুক্ত করার জন্যে সুপারিশ ক'রে প্রাদেশিক কমিটি এখানে পাঠিয়েছে। রাজভালিখিন যখন এসে পোঁছায়, তখন পাভেল এখানে ছিল না এবং তার অনুপস্থিতিতেই ব্যুরো এই নতুন কমরেডটিকে একটা এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। পাভেল ফিরে এসে খবরটা জেনে কোনো মন্তব্য করে নি।

একমাস বাদে পাভেল অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন এসে পড়ল রাজভালিখিনের এলাকায় কাজকর্ম কেমন চলছে দেখার জন্যে। কিছু তথ্য যা নজরে পড়ল তাতে দেখা গেল: নতুন সম্পাদকটি মদ খেয়ে মাতলামি করে, নিজের চারপাশে সে কতকগুলো খোসামুদে মোসাহেব জুটিয়ে নিয়েছে, এবং কর্তব্যনিষ্ঠ আর সক্রিয় কর্মী যারা তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করার উৎসাহটাকে দমিয়ে রেখেছে। পাভেল এইসব প্রমাণ দিয়ে ব্যুরোর কাছে রিপোর্ট দাখিল করল এবং ব্যুরোর আলোচনা-বৈঠকে যখন রাজভালিখিনকে তীব্র তিরস্কার করার

পক্ষে সবাই মত দিল, তখন পাভেল উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'আমি প্রস্তাব করছি— রাজভালিখিনকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হোক এবং এই বহিষ্কার হোক চূড়ান্ত।'

প্রস্তাবটা শুনে সবাই একটু হকচকিয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে এই শাস্তির ব্যবস্থাটা বড়ো বেশি কড়া বলে মনে হল। কিন্তু পাভেল নিজের মতের সমর্থনে দৃঢ় হয়ে বলল, 'বদমায়েশটাকে বের করে দিতেই হবে। ও যাতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে সবরকম সুযোগই ওর ছিল, কিন্তু কমসোমলের মধ্যে ও থেকে গেছে শুধুমাত্র নিজের সুবিধের জন্যে।' তারপরে পাভেল বেরেজদভের ঘটনাটা ব্যুরোর কাছে বলল।

'আমি এর প্রতিবাদ করছি!' চেঁচিয়ে বলল রাজভালিখিন, 'করচাগিন স্রেফ ব্যক্তিগত রাগ মেটাবার চেষ্টায় আছে। ও যা যা বলল, সবই একদম বাজে গালগল্প। ও এই সব অভিযোগের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ পেশ করুক। মনে করো, আমি তোমাদের কাছে এসে বানিয়ে বললাম যে করচাগিন বেআইনী মাল লেনদেন করেছে, তখন তোমরা কি শুধু ওইটুকু শুনেই তাকে কমসোমল থেকে বের করে দেবে? ওকে লিখিত প্রমাণ পেশ করতে হবে।'

'আচ্ছা, ভেবো না। দরকার মতো সমস্ত প্রমাণই পেশ করব আমরা,' জবাব দিল পাভেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজভালিখিন। পাভেল ব্যুরো সভ্যদের যুক্তি-তথ্য দিয়ে বোঝাল, যার ফলে আধঘণ্টা বাদে রাজভালিখিনকে একজন ভিন্ন মতাদর্শের লোক হিসেবে কমসোমল থেকে বহিষ্কৃত করে একটা প্রস্তাব নেওয়া হল।

গরমকাল এসে গেল আর সেই সঙ্গে এল ছুটির মরশুম। পাভেলের সহকর্মীরা সব একে একে চলে গেল তাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসবার জন্যে। শরীর সারাবার জন্যে যাদের তেমন দরকার ছিল তারা গেল সমুদ্রতীরে; পাভেল তাদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আর স্বাস্থ্যনিবাসে জায়গা পাবার বন্দোবস্ত করে দিল। ক্লান্ত দেহ আর বিবর্ণ মুখ নিয়ে—কিন্তু আসন্ন ছুটি উপভোগের প্রত্যাশায় খুশি মনে--তারা রওনা হয়ে গেল। তাদের কাজের বোঝাটা এসে চাপল পাভেলের ঘাড়ে এবং সে বিনা বাক্যব্যয়ে এই বাড়্তি কাজের বোঝাটা বইল ক'দিন ধরে। ওরা সব ফিরে এল রোদে-পোড়া রঙ নিয়ে, প্রাণবন্ত কর্মোদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে। তারপর আবার অন্যেরা গেল। গোটা গ্রীষ্মকালটা ধরে দপ্তরে কাজের লোকের সংখ্যায় ঘাট্তি রয়ে গেল। কিন্তু তার জন্যে জীবন শ্লথগতি হয়ে পড়ে নি -- পাভেলের পক্ষে একদিনের জন্যেও কাজ বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকা সম্ভব হয় নি।

গরমকাল কেটে গেল।

শরৎ আর শীতকালটা পাভেলের ভাল লাগত না, কারণ প্রতি বছর এই সময়টায় তার ভয়ানক শরীরের কষ্ট হয়।

এই বছরটায় পাভেল বিশেষ আগ্রহ নিয়ে গ্রীষ্ম আসার অপেক্ষায় ছিল। কারণ, প্রতি বছরে তার শক্তি একটু একটু করে নিঃশেষিত হয়ে আসছে বলে সে অনুভব করছিল -- যদিও নিজের কাছেও কথাটা স্বীকার করতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করত। মাত্র দুটো উপায় আছে তার: হয়, কাজগুলো করবার জন্যে তাকে যে প্রচণ্ড প্রয়াস করতে হচ্ছে, সেটা তার সহ্য হচ্ছে না বলে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে পঙ্গু বলে ঘোষণা করা; আর না হয়, যতক্ষণ তার পক্ষে কাজ করে

যাওয়া সম্ভব, ততক্ষণ চালিয়ে যাওয়া। এই দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছে সে।

একদিন প্রাদেশিক পার্টি কমিটির ব্যুরোর একটা আলোচনা-বৈঠকে ডাক্তার বার্‌তেলিক তার কাছে এসে পাশে বসল। বহু দিনের পুরনো পার্টি কর্মী সে, পার্টির বেআইনী যুগে গোপন কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। বর্তমানে ডাক্তার বার্‌তেলিক এই অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক। পাভেলকে বলল সে, 'তোমার মুখচোখ কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, করচাগিন। শরীর কেমন যাচ্ছে? তুমি কি চিকিৎসা কমিশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছ? করাও নি? আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার শরীরটা একটু সারিয়ে নেওয়া দরকার। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে একবার এসো, পরীক্ষা করে দেখব একবার আমরা।'

পাভেল যায় নি। কাজে খুব ব্যস্ত ছিল সে। কিন্তু বার্‌তেলিক ভোলে নি তার কথা, কয়েকদিন বাদে সে নিজেই এসে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে হাজির করাল চিকিৎসা কমিশনের কাছে। এই কমিশনে সে নিজে উপস্থিত থাকল স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে। চিকিৎসা কমিশন সুপারিশ করল:

'চিকিৎসা কমিশন মনে করে যে, অবিলম্বে বিশ্রাম নিয়ে ক্রিমিয়ায় গিয়ে দীর্ঘকালের চিকিৎসাধীনে থাকা দরকার এবং তারপরেও নিয়মিত চিকিৎসা দরকার। এটা যদি করা না হয়, তাহলে পরিণামটা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে এবং সেটাকে আর কিছুতেই এড়ানো যাবে না।'

এই সুপারিশটুকুর শিরোভাগে লাতিন ভাষায় যে বিভিন্ন রোগের লম্বা তালিকা দেওয়া ছিল, সেটা পড়ে পাভেল

শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারল: তার আসল রোগটা পায়ে নয়, নার্ভতন্ত্রে—সেটা গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়েছে।

বারতৌলিক চিকিৎসা কমিশনের সিদ্ধান্তের কথাটা ব্যুরোকে জানাল এবং করচাগিনকে অবিলম্বে কাজের দায়িত্ব থেকে খালাস করে দেবার প্রস্তাবে কেউ কোনো আপত্তি তুলল না। করচাগিন নিজে অবশ্য বলল যে, সাংগঠনিক বিভাগের পরিচালক স্‌বিৎনেভ ফিরে না আসা পর্যন্ত তার ছুটি মুলতুবি রাখা হোক। কমিটিকে নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে যেতে সে চায় না। ব্যুরো রাজী হল, যদিও বারতৌলিক এই দেরিতে আপত্তি তুলেছিল।

অতএব, আর তিন সপ্তাহ বাদেই ছুটিতে যাবে — জীবনে সে এই প্রথম ছুটি নিচ্ছে। ইয়েভপাতোরিয়ার এক স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার জন্যে ইতিমধ্যেই তার দেরাজের টানায় একটা পাস রয়েছে।

এই তিন সপ্তাহ সে আরও বেশি করে কাজে লেগে গেল: এই অঞ্চলের কমসোমলের একটা পূর্ণাঙ্গ সভা করল এবং যেখানে যা কিছু কাজে ফাঁক পড়েছিল সমস্তই গুছিয়ে আনবার জন্যে শ্রান্তিহীনভাবে উঠে পড়ে লাগল — যাতে নিশ্চিন্ত মনে সে এখান থেকে যেতে পারে।

এবং তার এই প্রথম সমুদ্র-দর্শনে যাবার ঠিক আগের দিনই একটা অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত ব্যাপার ঘটে গেল।

একটা বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে পাভেল সেদিন কাজের শেষে এসেছিল পার্টির প্রচার বিভাগের দপ্তরে। সে যখন এসে পৌঁছাল, তখন ঘরে আর কেউ নেই। তাই সে অন্যদের আসার অপেক্ষায় এসে বসল বইয়ের তাকের পেছনে খোলা জানলাটার ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন এসে গেল। বইয়ের তাকের আড়াল থেকে সে ওদের দেখতে পাচ্ছে না,

কিন্তু একটা গলা তার চেনা। ফাইলোর গলা — অঞ্চলের আর্থনীতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সে, লম্বা আর সুপুরুষ, চলন-বলনে একটা চোস্ত ফৌজী কায়দা আছে, মদ খাওয়া আর মেয়েদের পিছু নেবার ব্যাপারে খ্যাতি অর্জন করেছে।

ফাইলো এক সময়ে পার্টিজান দলে ছিল। সুযোগ পেলেই সে একগাল হেসে জাঁক করে বলতে ছাড়ে না — মাখ্নোর বোম্বেটে-দলের ডজন ডজন লোকের মাথা সে কীভাবে দিনে দিনে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। পাভেল সহ্য করতে পারে না লোকটাকে। একবার কমসোমলের একটি মেয়ে পাভেলের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল: ফাইলো মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে তার সঙ্গে এক সপ্তাহ একসঙ্গে বসবাস করার পর কেটে পড়েছে, ইদানীং মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলে অভিবাদনও জানায় না। পার্টির নিয়ন্ত্রণ কমিশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা উঠেছিল, কিন্তু মেয়েটি কোনো প্রমাণ দিতে না পারায় সেবারে ফাইলো পার পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাভেলের বিশ্বাস হয়েছিল মেয়েটির কথায়। এখন পাভেলের কানে ঢুকছিল ওদের কথাবার্তা — তার উপস্থিতির কথাটা না জেনে খুব খোলাখুলি কথাবার্তা বলছিল ওরা।

'তারপর ফাইলো, চলছে কেমন? ইদানীং কোন তালে ঘুরছ?'

এটা গ্রিবভের গলা — ফাইলোর প্রমোদ-সঙ্গীদের একজন। কে জানে কেন, গ্রিবভ্‌কে পার্টির প্রচার বিভাগের একজন কর্মী বলে মনে করা হয় — যদিও লোকটা নিতান্তই অজ্ঞ, সংকীর্ণমনা এবং নির্বোধ। সে যাই হোক, পার্টির প্রচার কর্মী বলে অভিহিত হয়ে গ্রিবভ গর্ব বোধ করে এবং যে-কোনো উপলক্ষে সবাইকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

'আমাকে তুমি অভিনন্দন জানাতে পারো হে ছোকরা। কাল আমি আর একটা কেল্লা ফতে করেছি। ওই করোতায়েভা।

তুমি তো বলেছিলে—ওর কাছে বিশেষ সুবিধে হবে না। ওইখানেই তোমাব ভুল হয়েছিল হে। আমি যদি কোনো মেয়ের পেছনে লাগি, তাহলে নিশ্চয় জানবে—আজ হোক, কাল হোক, ঠিক বাগিয়ে নেব।' বড়াই করে কথাটা বলে ফাইলো শেষে কিছু অশ্লীল কথা জুড়ে দিল।

পাভেল অনুভব করল, প্রচণ্ড একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে—ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে যে-রকম তার সর্বদা হয়ে থাকে। করোতায়েভা মহিলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমরেড এবং এই আঞ্চলিক কমিটিতে সে আর পাভেল একই সময়ে আসে। পাভেল তাকে জানে — বেশ ভালো মেয়ে, বিশ্বস্ত পার্টি কর্মী, সাহায্যপ্রার্থী মেয়েদের জন্যে সহৃদয় বিচক্ষণতার সঙ্গে সব রকম বন্দোবস্ত করে দেয়। কমিটির সহকর্মীরা তাকে সম্মান করে। পাভেল জানে করোতায়েভা অবিবাহিতা। তার সম্বন্ধেই যে ফাইলো বলছে, সে বিষয়ে পাভেলের মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

'যাও, যাও! নিশ্চয়ই বানিয়ে বলছ তুমি! করোতায়েভা এমনটি হতে দেবে বলে তো মনে হয় না।'

'বানিয়ে বলছি? আমি? কী ভাবো তুমি আমায়? এর চেয়েও কঠিন কতো ক্ষেত্রে মেরে বেরিয়ে গেলাম! শুধু পদ্ধতিটা জানা চাই। কোন্ মেয়ের কাছে কীভাবে এগুতে হবে সেটা বোঝা দরকার। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গেই প'টে যায়, কিন্তু সে ধরনের মেয়েরা ওই হয়রানিটুকুর যোগ্য নয়। কোনো কোনো মেয়েকে বাগে আনতে আবার মাসখানেক লেগে যায়। ওদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নেওয়াই সবচেয়ে জরুরি জিনিস। ঠিক পথে এগুনোটাই হচ্ছে আসল কথা। ওটা একটা শাস্ত্র-বিশেষ, বুঝলে হে ছোকরা! কিন্তু আমি ও সব বিষয়ে ঝানু বিশেষজ্ঞ। হোঃ হোঃ হোঃ!'

দারুণ একটা আত্মতৃপ্তিতে উপছে উঠেছে ফাইলো। আর, আরও সব রসালো বৃত্তান্ত শোনবার আগ্রহে তার শ্রোতারা তাকে উস্কে দিচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল পাভেল। হাত দুটো মুঠো-বাঁধা হয়ে উঠেছে তার, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটায় উদ্দাম ধুকধুকানি শুরু হয়ে গেছে বলে অনুভব করল সে।

'এমনি সাধারণভাবে টোপ ফেলে যে করোতায়েভাকে গাঁথার খুব বেশি আশা নেই, তা আমি জানতাম। কিন্তু তাই বলে আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজী নই, বিশেষ করে আমি যখন ওকে বাগাব বলে গ্রিবভের সঙ্গে বারো বোতল মদ বাজি রেখেছি। অতএব আমি — যাকে বলে গিয়ে অন্তর্ঘাতী কৌশল খাটানোর চেষ্টা করলাম। দু'একবার ওর আপিসে গেলাম, কিন্তু দেখলাম ওর মনে খুব একটা দাগ কাটতে পারছি না। তাছাড়া, আমার সম্বন্ধে নানা ধরনের সব আজেবাজে কথা বলাবলি হয়, নিশ্চয়ই সে সবের কিছু কিছু ওর কানেও পেঁছেছে... আচ্ছা যাক, সে সব দীর্ঘ বৃত্তান্ত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সরাসরি আক্রমণে কোনো ফল হল না, তাই আমি পেছন দিক থেকে আক্রমণের কৌশল খাটালাম। হোঃ! হোঃ! মতলবটা দিব্যি ফেঁদেছিলাম, বুঝলে! আমার দুঃখভরা জীবনের কাহিনী বললাম ওকে --- কীভাবে আমি যুদ্ধে লড়াই করেছি, নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর জীবনে কতোবার ধাক্কা খেয়েছি, কিন্তু মনের মতো ঠিক মেয়েটিকে কোনদিন খুঁজে পাই নি, নিঃসঙ্গ হতভাগ্যের মতো এই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি — আমায় ভালোবাসার কেউ নেই... এবং এই ধরনের আরও অনেক কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বললাম। আমি ওর মনের দুর্বল জায়গাগুলোয় ঘা মারলাম, বুঝলে তো? ওকে নিয়ে যে আমার ভয়ানক হয়রানি গেছে সে কথা

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে। একবার তো ভেবেই বসেছিলাম যে মেয়েটাকে চুলোর দুয়োরে পাঠিয়ে দিয়ে এসব আহাম্মকির পাট চুকিয়ে দিই। কিন্তু ততদিনে এটা একটা নীতিগত প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে, অতএব নীতির দিক থেকে আমাকে লেগে থাকতেই হল। এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওর প্রতিরোধ ভাঙলাম — তারপর কী হল বলো দেখি? দেখা গেল, ও কুমারী! হাঃ! হাঃ! কী মজার ব্যাপার!'

ফাইলো বলে যেতে লাগল তার ন্যক্কারজনক কাহিনী।

পাভেল কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, তা তার প্রায় মনে নেই। রাগে ফুসছে সে।

'জানোয়ার!' গর্জন করে উঠল পাভেল।

'কী! আমি জানোয়ার, অ্যাঁ? আর, তুমি যে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনো, তুমি তাহলে কী?'

স্পষ্টতই, পাভেল আর কিছুও বলেছিল — কেননা, তার জামার গলার কাছটা চেপে ধরল ফাইলো — একটু মাতাল অবস্থায় ছিল সে।

'আমায় অপমান! অ্যাঁ?' চিৎকার করে উঠেই সে পাভেলকে ঘুষি মেরে বসল।

ওক-কাঠের ভারি একটা টুল তুলে নিয়ে পাভেল একটি আঘাতে তাকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। ফাইলোর কপাল ভাল যে, পাভেলের সঙ্গে সেদিন তার পিস্তলটা ছিল না — থাকলে সেদিন তাকে বাঁচতে হত না।

কিন্তু এই কান্ডজ্ঞানহীন অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা ঘটে গেছে। এবং, ক্রিমিয়ায় যেদিন তার রওনা হয়ে যাবার কথা, সেই দিনই পাভেলকে হাজির হতে হল পার্টি আদালতের সামনে।

পুরো পার্টি সংগঠনের সমস্ত সভ্য এসে জড়ো হয়েছে শহরের থিয়েটার-বাড়িটায়। ঘটনাটার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি হয়েছে এবং পার্টি আদালতের গোটা শুনানিটাই পার্টি সভ্যদের ব্যবহারিক নীতি, চারিত্রিক নীতি আর পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা গুরুতর আলোচনায় গিয়ে দাঁড়াল। এই ঘটনার সঙ্গে সাধারণভাবে যে-সব প্রশ্ন জড়িত ছিল, সেইগুলোর আলোচনার একটা দিকনির্দেশ হিসেবেই ব্যাপারটাকে নেওয়া হল এবং খাস ঘটনাটা গৌণ হয়ে দাঁড়াল। ফাইলো অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করল, অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘোষণা করল যে মামলাটাকে জন আদালতের সামনে হাজির করে মারপিট করবার জন্যে করচাগিনকে সশ্রম দণ্ড ভোগ করাবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করে বসল।

'আমাকে নিয়ে বেশ একটু মুখরোচক গালগল্প করার মতো খোরাক পেতে চাও তোমরা, না? সেটি হচ্ছে না। তোমাদের খুশিমতো যে-কোনো দোষ চাপাতে পারো আমার ঘাড়ে। কিন্তু আসল ঘটনাটা হচ্ছে: মেয়েরা যে আমাকে এমন তীব্র আক্রমণ করেছে, তার কারণ — আমি ওদের দিকে মনোযোগ দিই না। তোমাদের এই গোটা মামলাটাই একটা অতি বাজে ব্যাপার। এটা যদি ১৯১৮'এ হত, তাহলে এই উন্মাদ করচাগিনটার সঙ্গে আমি আমার নিজের মতো করেই ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলতাম। এরপর, তোমরা আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের আদালতের কাজ চালিয়ে যেতে পারো।' এই বলে সে বেরিয়ে গেল হল-ঘর থেকে।

তারপর, সভাপতি পাভেলকে বলল — ঘটনাটা কী ঘটেছিল বলার জন্যে। পাভেল বেশ শান্তভাবেই বলা শুরু করল, যদিও নিজেকে সংযত রাখার জন্যে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল।

'আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি বলেই গোটা ব্যাপারটা

ঘটতে পেরেছে। কিন্তু যখন আমি কোনো কাজের বেলায় মাথা খাটানোর চেয়ে হাত চালানোর ওপরেই বেশি ভরসা করতাম, সে সব দিন বহুকাল গত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার। কী যে করে বসলাম সেটা খেয়াল হবার আগেই আমি ফাইলোকে মেরে বসেছিলাম। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই একবার মাত্র আমি এই ধরনের 'পার্টিজান'সুলভ কাজের অপরাধ করে বসেছি। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি — যদিও, ওই মারটা ফাইলোর প্রাপ্য বলেই আমি মনে করি। ফাইলোর ধরনের লোকগুলো অতি ন্যক্কারজনক। আমি এইটে কিছুতেই বুঝি না, বিশ্বাসও করতে পারি না যে একজন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট কী করে একই সঙ্গে এমন বদমায়েশ আর নোংরা জানোয়ার হতে পারে! এই গোটা ব্যাপারটার একমাত্র ইতিবাচক দিক হল এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে সহকর্মী কমিউনিস্টদের আচার-ব্যবহার কী ধরনের হবে আমাদের সামনে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।'

পার্টি সভ্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ফাইলোকে পার্টি থেকে বের করে দেবার পক্ষে ভোট দিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে গ্রিবভকে তীব্র তিরস্কার করে প্রস্তাব নেওয়া হল এবং এর পরে আর কোনো অপরাধ করলে তাকেও পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে সাবধান করে দেওয়া হল। সেদিন ফাইলোর সঙ্গে সেই কথাবার্তায় অন্য যারা যোগ দিয়েছিল, তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করল এবং তাদের নিন্দা করে ছেড়ে দেওয়া হল।

তারপরে, উপস্থিত সবাইকে ডাক্তার বার্তেলিক পাভেলের স্নায়বিক অবস্থার কথাটা জানাল এবং এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে যে কমরেডটিকে পার্টি থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে যখন প্রস্তাব আনল যে করচাগিনকেও তীব্র

তিরস্কার করা হোক, তখন সভার সবাই ভীষণভাবে প্রতিবাদ তুলল। সেই কমরেডটি তখন তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পাভেলকে নির্দোষ ঘোষণা করা হল।

দিন কয়েক বাদে পাভেল খারকভে রওনা হয়ে গেল। পার্টির আঞ্চলিক কমিটির কাছে পাভেল বারবার করে অনুরোধ জানাচ্ছিল যে তাকে তার বর্তমান কাজ থেকে খালাস করে দিয়ে ইউক্রেনীয় কমসোমলের কেন্দ্রীয় কমিটির হেফাজতে দেওয়া হোক; শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক কমিটি সেটা মঞ্জুর করেছে। ভালো একটা প্রমাণপত্র দেওয়া হয়েছে তাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক আকিম। খারকভে পেঁৗছেই পাভেল তার সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং সমস্ত ব্যাপারটা বলল।

আকিম তার প্রমাণপত্রটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল — তাতে পাভেলের 'পার্টির প্রতি অপরিসীম আনুগত্যের' কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে: 'পার্টিগত সংযম আছে; তবে, বিরল ক্ষেত্রে আত্মসংযম হারিয়ে বসতে পারে। ওর নার্ভতন্ত্রের গুরুতর অবস্থার জন্যে এরকমটা হয়।'

আকিম বলল, 'এমন ভালো একটা প্রমাণপত্র এই একটা কথার জন্যে খুঁত ধরে গেল, পাভেল। যাক গে, ওরকম ব্যাপার তো আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিমান তাদের বেলাতেও ঘটে। দক্ষিণে যাও, শরীরটাকে বাগিয়ে নাও, তারপর ফিরে এলে কাজের কথা হবে।'

আন্তরিকতার সঙ্গে তার সঙ্গে করমর্দন করল আকিম।

কেন্দ্রীয় কমিটির 'কমিউনার' স্বাস্থ্যনিবাস। চারিদিকে গোলাপ-ঝাড় আর উচ্ছল ফোয়ারার মধ্যে মধ্যে বসানো আঙুর-

লতায় ঢাকা শাদা বাড়িগুলো। যারা ছুটি উপভোগ করতে এসেছে তাদের পরনে গরমকালের উপযোগী শাদা হাল্কা পোশাক কিংবা স্নানের পোশাক। একজন অল্পবয়েসী মেয়ে ডাক্তার পাভেলের নামটা রেজিস্টারে লিখে নিল, তারপর কোণের দিকে বাড়িটায় একটা প্রশস্ত কামরায় এসে উঠল পাভেল। ধপধপে শাদা বিছানার চাদর, নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা, আর প্রশান্তি — নির্ব্যাঘাত প্রশান্তির আশীর্বাদ। স্নান করে শরীরটাকে স্নিগ্ধ করে নিয়ে পোশাক বদলে পাভেল তাড়াতাড়ি চলল সমুদ্রতীরে।

সামনে শান্ত মহিমাময় সমুদ্র — দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত পালিশ-করা মার্বেল পাথরের মতো নীলচে-কালো তার বিস্তার। অনেক দূরে যেখানে আকাশের সঙ্গে সমুদ্র মিশেছে, সেখানে ভাসছে একটা নীলাভ কুয়াশা আর তারই বুকে প্রতিফলিত হয়েছে গলিত সূর্যের রক্তিম দীপ্তি। প্রভাতী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে একসারি পাহাড়ের ভারী রেখাকৃতি। পাভেল গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস ভরে টেনে নিল এই শরীর চাঙ্গা করে তোলা নির্মল সমুদ্রবায়ু, দু'-চোখ ভরে দেখল সুনীল সাগরবিস্তারের নিঃসীম প্রশান্তি।

অলস গতিতে একটা ঢেউ বেলাভূমির সোনালি বালিয়াড়ির বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল তার পায়ের কাছে।

সপ্তম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্যনিবাসের ঠিক পাশেই প্রধান পলিক্লিনিকের বাগান, সমুদ্রতীর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে আসতে সময় কম লাগে বলে রোগীরা এই বাগানের মধ্যে দিয়ে যায়। এই বাগানের উঁচু চুণো পাথরের দেয়ালের

পাশে একটা দীর্ঘ-শাখা-বিস্তারী প্লেইন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে ভারি ভালো লাগে পাভেলের। শান্তি-ঘেরা এই নির্জন জায়গাটি থেকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাগানের পথে মানুষগুলোর প্রাণবন্ত চলাফেরা, বিকেলের দিকে বসে বসে শোনে ব্যান্ডের বাজনা -- বিরাট এই স্বাস্থ্যনিবাসের আমুদে নরনারীর ভিড়ের বিরক্তিকর ঠেলাঠেলি থেকে এখানে সে বিশ্রাম পায়।

আজকেও সে তার এই প্রিয় জায়গাটিতে এসে বসেছে। রোদ্দুরের তেজে আর এই মাত্র স্নান করে আসার ফলে একটু ঘুমের আমেজ জমেছে, দোলনা-কেদারাটায় গভীর আরামে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল। স্নানের তোয়ালেটা আর ফুর্মানভের 'অভ্যুত্থান' নামে যে-বইটা সে পড়ছিল, পড়ে রইল পাশের কেদারায়। স্বাস্থ্যনিবাসে এই প্রথম কয়েকদিনে তার স্নায়বিক পীড়াটা মোটেই কমে নি, মাথা-ধরাটাও লেগে আছে। তার ব্যায়রামটা এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তারদের বড়ো ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। তারা পাভেলের ব্যায়রামের মূল উৎস সন্ধানের চেষ্টায় আছে। অনবরত এই ডাক্তারি পরীক্ষায় ভারি বিরক্ত বোধ করছে সে -- ডাক্তারদের ঠেলায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। পাভেল যে ওয়ার্ডে আছে, সেখানকার মেয়ে ডাক্তার বেশ দিব্যি মেয়েটি, নামটা তার বড়ো মজার—ইয়েরুসালিম্‌চিক। পাভেল যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। এই অনিচ্ছুক রোগীটিকে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে বা কোনো একটা শারীরিক পরীক্ষার জন্যে কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে রাজী করানোর ব্যাপারে মেয়েটিকে বড়ো মুশকিলে পড়তে হয়।

পাভেল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'এই গোটা ব্যাপারটাই

ভারি ক্লান্তিকর ঠেকছে আমার। দিনে পাঁচবার করে সেই একই বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছি আর যতোসব বাজে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি: আমার ঠাকুরমা পাগল ছিলেন কি-না, ঠাকুরদার বাপের গিঁঠেবাত ছিল কি-না। আরে গেল যা, তাঁর কি ব্যায়রাম ছিল না ছিল তা আমি জানব কোত্থেকে? জীবনে কোনদিন দেখিই নি আমি তাঁকে! ওই ডাক্তারদের প্রত্যেকটি আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চায় যে আমার গনোরিয়া বা তার চাইতেও খারাপ কিছু একটা ব্যায়রাম হয়েছিল, এর জন্য আমার ভয়ানক ইচ্ছে জাগে তাদের টেকো মাথার উপর ঘাই কষাবার। আমাকে একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিন, ব্যস, শুধু ওইটুকুই আমি চাই। এখানে আমার থাকবার এই ছ'সপ্তাহ ধরে যদি শুধু নিজের রোগনির্ণয়ের পরীক্ষা চালাতে দিতে থাকি, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি সমাজের পক্ষে একটি বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে উঠব।'

ইয়েরুসালিম্‌চিক কথাটা শুনে ওর সঙ্গে হাসাহাসি করে, কৌতুক করে, কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই ধীরভাবে পাভেলের হাতখানা ধরে সারা পথটা অনর্গল কথা বলতে বলতে নিয়ে আসে ওকে সার্জনের কাছে।

কিন্তু আজ আর কোনো পরীক্ষার ব্যাপার নেই, এবং খাবার দেরি আছে ঘণ্টাখানেক। একটু বাদেই সে তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পেল পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। পাভেল চোখ খুলল না। ভাবল, 'ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে চলে যাবে।' বৃথা আশা। পাশে কে একজন এসে বসতে কেদারাটার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তার কানে এল। মৃদু একটা সুগন্ধের রেশ নাকে ঢুকতেই বুঝল, আগন্তুকটি মেয়ে। চোখ খুলল সে— প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ঝলমলে শাদা পোশাক আর নরম চামড়ার চটি-পরা একজোড়া তামাটে রঙের পা, তারপরে

দেখল ছেলেদের মতো ক'রে ছাঁটা চুল, একজোড়া মস্ত বড়ো বড়ো চোখ আর ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ণ এক পাটি শাদা দাঁত। লাজুক হাসি হাসল মেয়েটি তাকে দেখে, 'ব্যাঘাত সৃষ্টি করি নি, আশা করি?'

কোনো জবাব দিল না পাভেল — এটা তার দিক থেকে একটু অভদ্রতা হলেও সে তখনও আশা করছে যে চলে যাবে মেয়েটি।

'এটা আপনার বই?' ফুর্‌মানভের বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'হুঁ।'

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

'আপনি তো 'কমিউনার' স্বাস্থ্যনিবাসে আছেন, না?'

অধৈর্যের সঙ্গে শরীরটাকে নাড়াল পাভেল। 'একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না তাকে মেয়েটা। বিশ্রামটুকুর দফা রফা। ও এবার তার অসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা শুরু করবে। চলেই যেতে হবে দেখা যাচ্ছে।'

'না।' কাটা জবাব দিল সে।

'কিন্তু আপনাকে ওখানেই দেখেছি নিশ্চয়।'

পাভেল উঠে পড়তে যাবে, এমন সময়ে পেছনে শুনল একটা মেয়ের গভীর আর মিষ্টি গলার স্বর, 'কিরে দোরা, এখানে কী করছিস?'

স্নানের পোশাক-পরা মোটাসোটা, রোদে-পোড়া, সোনালী চুলওয়ালা একটি মেয়ে এসে বসল চেয়ারটার প্রান্তে। দ্রুত এক নজর তাকাল সে পাভেলের দিকে।

'কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি, কমরেড। আপনি খারকভ থেকে এসেছেন না?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় কাজ করেন আপনি?'

কথাবার্তাটা বন্ধ করে দিতে মনস্থ করল পাভেল।

'শহরের জঞ্জাল সাফ করার বিভাগে,' জবাব দিল সে। এই ঠাট্টায় এমন জোরে হেসে উঠল মেয়ে দুটি যে পাভেল চমকে উঠল।

'কিন্তু কমরেড, এটা খুব ভদ্রতা হচ্ছে কি?'

এইভাবে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। জানা গেল — দোরা রদ্‌কিনা খারকভে পার্টির শহর কমিটির ব্যুরো সভ্য। পরে যখন তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তখন তাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাতের সময়কার এই মজার ঘটনাটা নিয়ে দোরা প্রায়ই পাভেলকে কৌতুকচ্ছলে খোঁচা দিত।

একদিন বিকেলে 'তালাসা' স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানে খোলা জায়গায় একটা গান-বাজনার আসরে পুরনো বন্ধু ঝার্‌কির সঙ্গে পাভেলের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার—তাদের দেখা হয়ে যাবার কারণটা হল একটা 'ফক্স-ট্রট' নাচ।

স্থূলকায়া একজন চড়া-গলাওয়ালা গায়িকা গভীর আবেগের সঙ্গে 'উদগ্র কামনার রাত্রি' গানটি শ্রোতাদের গেয়ে শোনানোর পর, একজোড়া মেয়ে-পুরুষ লাফিয়ে এগিয়ে এল মঞ্চের ওপর। পুরুষটি অর্ধ-নগ্ন — মাথায় একটা লাল উঁচু টুপি আর ঝলমলে রঙিন কতকগুলো স্প্যাঙ্‌ল তার ঊরুতে, ঝকঝকে শাদা একটা শার্টের সামনের অংশটুকু তার বুকের ওপর ঝুলছে, গলায় একটা 'বো-টাই' বাঁধা — বন্য মানুষের একটা বাজে অনুকরণ করেছে সে। তার সঙ্গিনীটির পুতুলের মতো মুখ, প্রচুর কাপড় পরা। স্বাস্থ্যনিবাসের রুগীরা আরামকেদারা আর খাটিয়াগুলোয় বসে আছে, এগুলোর পেছনে

দাঁড়িয়ে আছে ষাঁড়ের মতো গর্দানওয়ালা মুনাফাখোর দোকানদারেরা — এদের খুশির গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে মঞ্চের ওপরে ওই স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে একটা 'ফক্স-ট্রট' নাচের জটিল নক্সা এঁকে চলল পায়ে পায়ে। এর চেয়ে ন্যক্কারজনক দৃশ্য কল্পনা করা শক্ত। নাদুসনুদুস পুরুষটি উজবুকের মতো উঁচু টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তার সঙ্গিনীটিকে জোরে চেপে ধরে মঞ্চের ওপরে ইঙ্গিতপূর্ণ নানারকম দেহভঙ্গি করছে। পাভেল তার পেছনে শুনতে পেল ভুঁড়িওয়ালা একটা মোটাসোটা দেহের সশব্দ নিঃশ্বাস। চলে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, এমন সময়ে সামনের সারি থেকে কে-একজন দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, 'ঢের হয়েছে এই সব বেশ্যাবাড়ির নাচগান! চুলোয় যাক!'

এ ঝারকি।

পিয়ানো-বাজনদার বাজনা বন্ধ করে দিল, বেহালাটা থেমে গেল একটা ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ তুলে।

মঞ্চের ওপরে স্ত্রী-পুরুষ দুটি শরীর মোচড়ানো বন্ধ করে দিল। পেছনের জনতা হিংস্রভাবে হিসহিসিয়ে উঠল:

'এ কী বেআদবি — অনুষ্ঠানের মধ্যে বাধা দিচ্ছে!'

'গোটা ইউরোপ আজ 'ফক্স-ট্রট' নাচছে!'

'এ কী অত্যাচার!'

কিন্তু রুগীদের মধ্যে একজন, চেরেপোভেৎসই কমসোমল সংগঠনের সম্পাদক সেরিওঝা ঝবানভ মুখের মধ্যে চারটে আঙুল পুরে কান-ফাটানো একটা সিটি মারল। তার এই উদাহরণ অনুসরণ করল আর-সবাই এবং মুহূর্তের মধ্যে নাচিয়ে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে অদৃশ্য হয়ে গেল মঞ্চ থেকে — যেন দমকা একটা হাওয়ায় উড়ে গেল তারা। আগেকার দিনের চাপরাশিদের মতো দেখতে যে বাচাল লোকটি আজকের এই

প্রমোদ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল, সে এসে ঘোষণা করল যে নাচ-গানের দলটি চলে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যনিবাসের স্নানের পোশাক-পরা একটি ছেলে সবার হাসির মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'বাঁচিয়েছ বাপু, যেখানকার মাল সেখানেই গেছে।'

সামনের সারিগুলোর দিকে এগিয়ে এসে ঝারকিকে খুঁজে বের করল পাভেল। পাভেলের ঘরে বসে দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল। ঝারকি জানাল, পার্টির একটা আঞ্চলিক কমিটির প্রচার-আন্দোলন বিভাগে সে কাজ করছে।

'আমি বিয়ে করেছি, জানো না বোধ হয়?' বলল ঝারকি, 'শিগগিরই একটি ছেলে বা মেয়ে আশা করছি।'

বিস্মিত হল পাভেল, 'তাই নাকি, বিয়ে করেছ? তোমার স্ত্রীটি কে?'

পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে ঝারকি পাভেলকে দেখাল, 'চিনতে পারছ?'

ঝারকি আর আন্না বোরহার্ৎ-এর একসঙ্গে তোলা একটা ফটোগ্রাফ।

আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল পাভেল, 'তাহলে দুবাভার খবর কী?'

'ও মস্কোতে আছে। পার্টি থেকে ওকে বের করে দেবার পর ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। বাউমান উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ে এখন পড়ছে ও। শুনেছি ওকে নাকি ফের পার্টিতে নেওয়া হয়েছে। খবরটা সত্যি হলে খুব খারাপ বলতে হবে। পুরোপুরি একদম বাজে ছেলে হয়ে গেছে ও... পানক্রাতভ কী করছে জানো? একটা জাহাজ-তৈরির কারখানার সহকারী পরিচালক। অন্যদের খবর আমি বিশেষ কিছু জানি না। ইদানীং আর বড়ো একটা যোগাযোগ নেই আমাদের। আমরা

সবাই দেশের নানান জায়গায় কাজ করেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরকম এক জায়গায় জড়ো হয়ে মিললেই পুরনো দিনের গল্পসল্প করতে ভারি ভালো লাগে।'

দোরা ঘরে ঢুকল আরও জনকতককে সঙ্গে নিয়ে। ঝার্কির কোর্তার ওপরে আটকানো মেডেলের দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে পাভেলকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার এই কমরেডটি কি পার্টি সভ্য? কোথায় কাজ করেন ইনি?'

থতমত খেয়ে পাভেল সংক্ষেপে ঝার্কি সম্বন্ধে বলল তাকে।

'বেশ,' বলল দোরা, 'তাহলে ইনি থাকতে পারেন। এই কমরেডরা সদ্য মস্কো থেকে এসেছে। পার্টির সাম্প্রতিক খবরগুলো এদের কাছ থেকে শোনা যাবে। তোমার ঘরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা পার্টি বৈঠক গোছের বসাব বলে ঠিক করলাম,' ব্যাখ্যা করে বলল সে।

পাভেল আর ঝার্কি ছাড়া এই আগন্তুকরা সবাই পুরনো বলশেভিক। ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ আর কামেনেভের নেতৃত্বে নতুন বিরোধীপক্ষের কথা তাদের বলল মস্কো পার্টির 'নিয়ন্ত্রণ কমিশন'এর সভ্য বার্তাশেভ।

'এই সংকটের মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের কাজের জায়গায় থাকা উচিত। আমি কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে,' উপসংহারে জানাল বার্তাশেভ।

পাভেলের ঘরে এই আলোচনা বৈঠকের পরে তিন দিনের মধ্যেই একদম ফাঁকা হয়ে গেল স্বাস্থ্যনিবাসটা। পাভেলও অল্প কয়েকদিন বাদেই চলে এল — তার বিশ্রামের মেয়াদ ফুরোবার আগেই।

কমসোমলের কেন্দ্রীয় কমিটি কাজের অপেক্ষায় বসিয়ে রাখল না তাকে—একটা শিল্প এলাকায় কমসোমল সম্পাদক হিসেবে কাজ দেওয়া হল পাভেলকে এবং দেখা গেল — এক

সপ্তাহের মধ্যেই সে স্থানীয় শহর সংগঠনের একটা সভায় বক্তৃতা করতে লেগে গেছে।

সেই বছরের শরৎকালের শেষ দিকে পাভেল একদিন আর-দু'জন পার্টি কর্মীর সঙ্গে চলেছে দূরের কোন-একটি জেলায়, তখন মাঝপথে এক জায়গায় তাদের গাড়িটা হড়কে গিয়ে একটা খানার মধ্যে গড়িয়ে পড়ে উল্টে গেল।

আরোহীদের সবাই আহত হল। পাভেলের ডান হাঁটুটা পিষে গেল। দিন কয়েক বাদে তাকে নিয়ে আসা হল খারকভের অস্ত্রচিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে। জখম পা-টার এক্স-রে ফোটো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার পর চিকিৎসা কমিশন অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিল।

পাভেল মত দিল।

চিকিৎসা কমিশনের সভাপতি গাঁট্টাগোট্টা অধ্যাপকটি বললেন, 'তাহলে, কাল সকালেই।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর সবাই তাঁর পেছনে সার বেঁধে বেরিয়ে গেল।

আলোয় উজ্জ্বল ছোট একটা ওয়ার্ড, সেখানে একটা মাত্র খাট। নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা আর পাভেলের অনেকদিন হল ভুলে-যাওয়া সেই হাসপাতালের অদ্ভুত ধরনের গন্ধ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে। খাটটার পাশে তুষার-শুভ্র কাপড়ে ঢাকা একটা ছোট টেবিল আর শাদা রঙ-করা একটা টুল। ঘরটার আসবাব বলতে এই।

নার্স এল তার রাত্রের খাবার নিয়ে।

পাভেল ফেরত পাঠিয়ে দিল খাবারটা। বিছানাটার ওপরে আধ-শোওয়া অবস্থায় চিঠি লিখছিল সে। লিখতে লিখতে হাঁটুর যন্ত্রণাটাও চাগিয়ে উঠে তার চিন্তায় বাধা দিচ্ছিল, খিদেটাও নষ্ট হয়ে গেল যন্ত্রণার চোটে।

চতুর্থ চিঠিখানা লেখা হয়ে যাবার পর আস্তে করে দরজাটা

খুলে গেল, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো শাদা একটা কোর্তা গায়ে আর শাদা ক্যাপ মাথায় একটি তরুণী তার বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

আবছা আলোয় পাভেল দেখতে পেল এক জোড়া বাঁকা ভুরু আর ডাগর ডাগর দুটি চোখ -- চোখ দুটির রঙ কালো বলেই মনে হল। তার এক হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ, অন্য হাতে একখানা কাগজ আর পেন্সিল।

'আমি আপনার ওআর্ডের ডাক্তার,' বলল মেয়েটি, 'আমি এবারে এক গাদা প্রশ্ন করে যাব আর, ভালো লাগুক বা না লাগুক, আপনাকে নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলে যেতে হবে।'

মিষ্টি হাসল সে, আর এই হাসিটুকুতেই তার পাভেলকে 'জেরা' করার ধার ক্ষয়ে গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পাভেল তার কাছে বলে গেল — শুধু নিজের কথাই নয়, কয়েক পুরুষ ধরে তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কথাও।

অস্ত্রোপচারের ঘর। নাকের ওপর, মুখের ওপর গেজ-কাপড়ের ঠুলি আঁটা লোকজন।

চকচকে নিকেলের যন্ত্রপাতি; লম্বা, সরু একটা টেবিল আর তার নিচে বিরাট একটা গামলা। অস্ত্রোপচারের টেবিলটার ওপরে পাভেল যখন শুয়ে পড়ল, অধ্যাপকটি তখনও হাত ধুচ্ছিলেন। তার পেছনে অস্ত্রোপচারের দ্রুত প্রস্তুতি চলেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল পাভেল — নার্সটি চিমটে আর ছুরিগুলো সাজিয়ে রাখছে।

'ওদিকে তাকাবেন না, কমরেড করচাগিন,' পাভেলের পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলতে খুলতে বলে উঠল তার ওআর্ডের ডাক্তার বাঝানোভা, 'ওতে মনের জোর কমে যেতে পারে।'

সকৌতুক হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল পাভেল, 'কার মনের জোর, ডাক্তার?'

কয়েক মিনিট বাদে ভারি কাপড়ের একটা ঠুলি পরিয়ে ঢেকে দেওয়া হল তার মুখ এবং অধ্যাপককে বলতে শুনল সে, 'আমরা এবার আপনাকে অজ্ঞান করে ফেলার ওষুধ দেব। নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিন আর এক-দুই-তিন গুণতে থাকুন।'

মুখে ঠুলি-চাপা শান্ত স্বরে উত্তর দিল পাভেল, 'বেশ। যদি কোনো অকথ্য মন্তব্য করে বসি, তার জন্যে অগ্রিম মাপ চেয়ে রাখছি।'

হাসি চাপতে পারলেন না অধ্যাপকটি।

ইথারের প্রথম দু-চার ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দম-আটকানো একটা জঘন্য গন্ধ।

গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল পাভেল, স্পষ্ট উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে করতে গুণতে শুরু করল। এতে তার ট্রাজেডি-ভরা জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হল।

খামখানা প্রায় অর্ধেক ছিঁড়ে আরতিওম চিঠিখানা খুলল, ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা অস্থিরতা জেগেছে তার মনে। তার চোখের দৃষ্টি যেন বিঁধে দিল চিঠিখানার প্রথম কয়েক ছত্র। তারপরে পাতাটার বাকি অংশটুকুর ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেল সে।

'আরতিওম! আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখি এতো কম—বছরে বড়ো জোর একটা কি দুটো! কিন্তু কতোগুলো চিঠি লিখলাম না-লিখলাম তাতে কি কিছু যায় আসে? তুমি লিখেছ—তোমার পরিবারকে তুমি

শেপেতোভকা থেকে কাজাতিনের রেল-কারখানায় সরিয়ে নিয়ে এসেছ, কারণ, তুমি শেকড় শুদ্ধ নিজেকে উপড়ে আনতে চাও। আমি জানি, এই শেকড়টা হচ্ছে স্তেশা আর তার আত্মীয়দের পেছন-মুখো ক্ষুদে-মালিকানা মনোভাবের মধ্যেই। স্তেশার মতো লোকদের নতুন করে গড়ে তোলাটা সহজসাধ্য নয়, এবং তুমিও হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। তুমি লিখেছ—তোমার 'এই বুড়ো বয়সে' পড়াশোনা করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তবু, আমার তো মনে হচ্ছে তুমি মন্দ এগুচ্ছো না। তুমি যে কারখানার কাজটা ছেড়ে দেবে না বলে জিদ ধরেছ আর শহর সোভিয়েতের সভাপতি হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছ না, সেটা ভুল হচ্ছে। সোভিয়েত সরকার কায়েম করার জন্যে তুমি লড়াই করো নি কি? তাহলে লেগে যাও! কালকেই শহর সোভিয়েতের সভাপতি হয়ে কাজে লেগে যাও!

'এবার আমার কথা বলি। কিছু একটা গুরুতর ব্যামোয় ধরেছে আমাকে। আমি আজকাল খুব ঘন ঘন হাসপাতালের বাসিন্দা হয়ে পড়ছি। ওরা দু'বার আমাকে কাটা-ছেঁড়া করেছে, বেশ কিছুটা রক্ত আর শক্তি খুইয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ বলতে পারছে না এর শেষ হবে কবে।

'আমি আর কর্মক্ষম নই এবং ইদানীং একটা নতুন পেশা নিয়েছি আমি—'পঙ্গু' মানুষের পেশা। ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে আমায় এবং এর মোট ফলটা দাঁড়িয়েছে—ডান পায়ের নড়ন-চড়ন বন্ধ, শরীরের নানা জায়গায় কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন আর এবারকার এই অধুনাতন ডাক্তারি আবিষ্কার: সাত বছর আগে আমার

শিরদাঁড়া জখম হয়েছিল, আর এই জখমটার জন্যে আমায় কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে। কিন্তু আমি কর্মিদলের মধ্যে যাতে ফিরে যেতে পারি, তার জন্যে যে-কোনো কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।

'কর্মিদলের বাইরে পড়ে থাকার চেয়ে ভয়ংকর কিছু আমার জীবনে আমি কল্পনাও করতে পারি না। এ ধরনের কোনো সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করতে চাই না আমি। এবং সেই জন্যেই এই ডাক্তাররা আমাকে নিয়ে যা করতে চায় তাই করতে দিই। কিন্তু কোনো উন্নতি হচ্ছে না—ক্রমশই আরও অন্ধকার, আরও ঘন হয়ে জমে উঠছে মেঘ। প্রথমবার অস্ত্রোপচারের পর আমি হাঁটবার শক্তি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু শিগগিরই আবার ওরা ফিরিয়ে আনল আমায়। এবার আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইয়েভপাতোরিয়া-র এক স্বাস্থ্যনিবাসে। কাল রওনা হব। কিন্তু দমে যেও না, আরতিওম, তুমি তো জানো আমি বড়ো সহজে হাল ছাড়ি না। তিনজন মানুষের জীবনীশক্তি আমার মধ্যে আছে। দাদা, তুমি আর আমি এখনও আরও কিছু কাজের কাজ করব। তোমার শরীরের যত্ন নিয়ো, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে শক্তি খুইয়ো না যেন, কারণ আমাদের শরীর সারাবার জন্যে বিশ্রাম নিতে গিয়ে পার্টিকে বড্ড ক্ষতি সইতে হয়। কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি আর পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, সেটা খুবই মূল্যবান—হাসপাতালে শুয়ে থেকে তার অপচয় হতে দেওয়া চলে না। তোমার করমর্দন করছি।

পাভেল।'

আরতিওম যখন তার ঘন ভুরু-জোড়া কুঁচকে ভাইয়ের চিঠিখানা পড়ছে সেই সময়ে ওদিকে পাভেল হাসপাতালে ডাক্তার বাঝানোভার কাছে বিদায় নিচ্ছে।

'তাহলে কাল আপনি ক্রিমিয়ায় রওনা হচ্ছেন?' পাভেলের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল বাঝানোভা, 'আজকের বাকি সময়টুকু কাটাবেন কীভাবে?'

'কমরেড রোদ্‌কিনা এখুনি এসে যাবে,' জবাব দিল পাভেল, 'ও আমাকে নিয়ে যাবে ওর বাড়ির সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। ওর ওখানেই আমি রাত্তিরে থাকব, সকালে ও আমাকে স্টেশনে পেঁৗছে দেবে।'

বাঝানোভা দোরাকে চেনে, কারণ সে প্রায়ই হাসপাতালে এসে দেখে যেত পাভেলকে।

'কিন্তু, কমরেড করচাগিন, আমার বাবাকে দিয়ে আপনাকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেব বলেছিলাম—আপনিও রাজী হয়েছিলেন, সেটা কি ভুলে গেছেন? আমি তাঁর কাছে আপনার অসুখের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। তাঁকে দিয়ে আপনাকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতে চাই আমি। আজ বিকেলে আপনি সময় করে নিতে পারবেন বোধ হয়?'

তৎক্ষণাৎ রাজী হল পাভেল।

সেদিন বিকেলে বাঝানোভা পাভেলকে নিয়ে এল তার বাবার মস্ত বড়ো কাজের কামরায়।

বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক তিনি। তিনি পাভেলকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর মেয়ে হাসপাতাল থেকে পাভেলের সমস্ত এক্স-রে ছবিগুলো আর তার ব্যামোর সম্বন্ধে রিপোর্টগুলো নিয়ে এসেছিল। বাঝানোভার বাবা যখন লাতিন ভাষায় অনেকক্ষণ ধরে কী-সব মন্তব্য করলেন তখন বাঝানোভার মুখখানা যে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সেটা

পাভেল লক্ষ্য না করে পারে নি। অধ্যাপকের বিরাট টেকো মাথাটার দিকে চেয়ে চেয়ে পাভেল তাঁর তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টির অর্থটা অনুসন্ধান করল। কিন্তু ডাক্তার বাঝানোভের মুখের ভাব দুর্বোধ্য।

পাভেলের পোশাক পরা হয়ে যাবার পরে পাভেলকে প্রীতি জানিয়ে অধ্যাপক বিদায় নিলেন, বললেন, তাঁকে এখনি একটা আলোচনা-সভায় যেতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলটা পাভেলকে জানানোর ভার দিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ের ওপরে।

বাঝানোভার রুচিসম্মতভাবে সাজানো ঘরখানায় একটা কৌচের ওপর শুয়ে পাভেল ডাক্তারের মতামত জানার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু কী ভাবে যে শুরু করবে কথাটা, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বাঝানোভা। তার বাবা তাকে যা বলে গেলেন, সেটা কিছুতেই পাভেলকে বলে উঠতে পারছে না সে—তিনি বলেছেন: পাভেলের শরীরের মধ্যে যে সাংঘাতিক প্রদাহের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে, এ পর্যন্ত কোনো ওষুধ সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন অধ্যাপক: 'এই ছেলেটি ওর হাত-পা নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে বসবে—এটাই অবধারিত। এই মর্মান্তিক পরিণতি ঠেকাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

ডাক্তার হিসেবে এবং বন্ধু হিসেবে ওকে এ কথাটা বলা ঠিক হবে না বলেই মনে হচ্ছে বাঝানোভার। তাই, সাবধানে কথা বাছাই করে সে পাভেলকে আসল ব্যাপারটার খানিকটা মাত্র বলল।

'ইয়েভপাতোরিয়ার কাদা-জলে আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন বলে আমার মনে হচ্ছে, কমরেড করচাগিন। শরৎকালের মধ্যেই আপনি কাজে যোগ দিতে পারবেন।'

কিন্তু বাঝানোভা ভুলে গেছে যে, পাভেলের সুতীক্ষ্ণ চোখ দুটো তাকে সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করে চলেছে।

'আপনি যেটুকু বললেন—কিংবা বরং বলতে পারি, যেটুকু আপনি চেপে গেলেন, তার থেকে বুঝতে পারছি যে অবস্থাটা খুব গুরুতর। আমাকে সব কথাই খোলাখুলি বলবার জন্যে আমি যে বরাবর আপনাকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি, সেটা মনে আছে তো? আমার কাছে কোনো কিছু চেপে যাবার দরকার নেই, আমি অজ্ঞান হয়েও পড়ব না, কিংবা নিজের গলা কেটে ফেলবার চেষ্টাও করব না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ আমি জানতে চাই।'

সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বাঝানোভা একটা রসিকতা করল এবং সে রাত্রে পাভেল নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারল না।

বিদায় নেবার সময় কোমল গলায় বাঝানোভা বলল, 'আমি আপনার বন্ধু—এ কথাটা যেন ভুলে যাবেন না, কমরেড করচাগিন। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে কী হবে না-হবে কে বলতে পারে। যদি কখনও আমার সাহায্য বা পরামর্শের দরকার হয়, দয়া করে লিখে জানাবেন। আমার সাধ্যে যা আছে, নিশ্চয়ই করব।'

জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল—চামড়ার কোট-পরা লম্বা মূর্তিটা লাঠির ওপরে সজোরে ভর দিয়ে অতি কষ্টে দরজাটার কাছে অপেক্ষমান গাড়িটার দিকে এগুচ্ছে।

আবার সেই ইয়েভপাতোরিয়া। দক্ষিণ অঞ্চলের উষ্ণ রোদ। ছুঁচের কাজ করা চাঁদি টুপি মাথায় রোদে-পোড়া লোকজন সব কথা বলে জোরে জোরে। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি হাঁকিয়ে নতুন আগন্তুকদের নিয়ে আসা হল ধূসর রঙের চুনো

পাথরের একটা দোতলা বাড়িতে। 'মাইনাক' স্বাস্থ্যনিবাস।

ডিউটিরত ডাক্তার আগন্তুকদের নানা ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়।

'আপনার কীরকম পাস আছে, কমরেড?' পাভেলকে সে জিজ্ঞেস করল। তখন তারা এগারো-নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে।

পাভেল জানাল, 'ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দেওয়া পাস।'

'বেশ তাহলে কমরেড এব্‌নেরের সঙ্গে এক ঘরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কমরেডটি জার্মান, একজন রুশী সঙ্গী চান।' বলে দরজাটার ওপরে টোকা মারল ডাক্তারটি।

একটা গলার স্বর ভেসে এল ভেতর থেকে, 'ভেতরে আসুন,' উচ্চারণটা নিতান্তই বিদেশী।

পাভেল তার স্যুটকেসটা রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল বিছানায় শোয়া মানুষটিকে—সোনালী চুল, নীল চোখ দুটির দৃষ্টি প্রাণময়। খুশিভরা হাসির সঙ্গে জার্মানটি তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

লম্বা আঙুলওয়ালা একখানা ফ্যাকাশে হাত পাভেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'গুটেন মর্গেন, গেনোসেন।' তারপর শুধরে নিয়ে জার্মান-ঘেঁষা উচ্চারণে ভাঙা রুশ ভাষায় বলল, 'সুপ্রভাত!'

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল—পাভেল তার বিছানার ধারে বসে আছে, আর দু'জনে খুব প্রাণবন্ত কথাবার্তায় জমে গেছে—তাদের সংলাপের ভাষাটা হচ্ছে সেই 'আন্তর্জাতিক' ভাষা যাতে মুখের কথার ভূমিকাটা গৌণ; অলিখিত এসপেরেণ্টো ভাষার ইঙ্গিত-ইশারা-মুখভঙ্গী আর আন্দাজ ইত্যাদি সমস্ত ফাঁক পূরণ করে তোলে।

পাভেল জানল এব্‌নের একজন জার্মান শ্রমিক, ১৯২৩-এর

হামবুর্গ-অভ্যুত্থানের সময় উরুতে জখম হয়। পুরনো চোটটা আবার চেগে উঠে তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। কিন্তু সমস্ত কষ্ট সে হাসিমুখে সহ্য করে এবং এই জন্যেই পাভেল তার প্রতি সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল।

এক ঘরে থাকার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সঙ্গী আর কামনা করতে পারত না পাভেল। এ লোকটি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তার ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে বকবক করবে না, নিজের মন্দভাগ্য নিয়ে হা-হুতাশ করবে না।

বরং ওর সঙ্গ পেয়ে লোকে নিজের জ্বালাযন্ত্রণার কথাই ভুলে থাকতে পারে।

একটু ক্ষোভের সঙ্গেই পাভেল ভাবল মনে মনে, 'আহা, জার্মান ভাষাটা একটুও জানি নে।'

স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানের এক কোণে গোটাকতক দোলনা-চেয়ার, একটা বাঁশের টেবিল আর দুটো চাকা-লাগানো ঠেলা-চেয়ার পাতা থাকে। প্রতিদিন ডাক্তারদের দেখা-শোনা-চিকিৎসা ইত্যাদি হয়ে যাবার পরে পাঁচজন রোগী এখানটায় এসে জড়ো হয় সময় কাটাবার জন্যে। স্বাস্থ্যনিবাসের অন্য সব রোগীরা এই পাঁচজনের নাম দিয়েছে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক কমিটি'।

ঠেলা-চেয়ারগুলোর একটায় আধ-শোয়া অবস্থায় বসে থাকে এবনের। আরেকটায় বসে থাকে পাভেল—তারও হাঁটাহাঁটি করা বারণ। এই দলের আর-তিনজনের মধ্যে আছে ভাইমান, গাঁট্টাগোট্টা শরীরের একজন এস্তোনিয়ান, ক্রিমিয়ার প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্য দপ্তরে কাজ করত সে; আরেকজন মার্তা লাউরিন, অল্পবয়েসী পিঙ্গল-চোখ এই লাতভিয়ান মেয়েটিকে দেখে বছর আঠারো বয়েস বলে

মনে হয়; আর তৃতীয়জন লেদেনেভ, লম্বা বলিষ্ঠ গড়নের একজন সাইবেরিয়ান, কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে তার। সত্যিই পাঁচটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি রয়েছে এই ছোট্ট দলটায়—জার্মান, এস্তোনিয়ান, লাত্ভিয়ান, রাশিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান। মার্তা আর ভাইমান জার্মান বলতে পারে, তাই এব্নের দোভাষীর কাজ করিয়ে নেয় এদের দিয়ে। পাভেল আর এব্নেরের বন্ধুত্বের কারণটা হচ্ছে তারা একই ঘরে থাকে। মার্তা আর ভাইমান জার্মান ভাষা জানে বলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এবং পাভেল আর লেদেনেভের মধ্যে বন্ধুত্বের বাঁধনটা গড়ে উঠেছে দাবা-খেলার মারফত।

লেদেনেভ এখানে আসার আগে পর্যন্ত পাভেল ছিল এই স্বাস্থ্যনিবাসের 'চ্যাম্পিয়ন' দাবা-খেলোয়াড়। ভাইমানের সঙ্গে একটা তীব্র প্রতিযোগিতার পর সে তার কাছ থেকে এই সম্মানের পদবীটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। ঢিলাঢালা শান্ত স্বভাবেব এই এস্তোনিয়ানটি এই পরাজয়ের ফলে বেশ একটু দমে গেছল এবং তাকে এভাবে অপদস্থ করার জন্যে সে বহুদিন পর্যন্ত মনে মনে পাভেলকে ক্ষমা করতে পারে নি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যনিবাসে একজন লম্বা লোক এসে পেঁছাল, পঞ্চাশ বছর বয়সের পক্ষে তাকে দেখে রীতিমত তরুণ বলে মনে হয়। করচাগিনের সঙ্গে সে একদান দাবা খেলতে চায় বলে জানাল। বিপদের কোনো আভাস না দেখে. পাভেল শান্তভাবে গোড়ার দিকেই মন্ত্রী চেলে আক্রমণ করে খেলা শুরু করল। লেদেনেভ সামনের বোড়েগুলো এগিয়ে দিয়ে পাল্টা চাল দিল। নতুন কোনো আগন্তুক এলেই তার সঙ্গে পাভেলকে 'চ্যাম্পিয়ন' খেলোয়াড় হিসেবে একহাত দাবা-খেলায় বসতে হত এবং খেলার সময় সর্বদাই একদল উৎসুক দর্শকের ভিড় জমে উঠত দাবার ছকটাকে ঘিরে। ন'বারের

বার চাল দিতে গিয়ে পাভেল বুঝতে পারল যে প্রতিপক্ষ তার বোড়েগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে এনে চারিদিক থেকে তাকে চেপে ধরছে। এতক্ষণে পাভেল দেখতে পেল যে তার প্রতিপক্ষ বড়ো সাংঘাতিক খেলোয়াড়, প্রথম দিকে এতোটা হাল্কা চালে খেলেছে বলে অনুতাপ হল তার।

তিন ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তির মধ্যে দিয়ে পাভেল তার সব রকম কলাকৌশল আর বুদ্ধি খাটাবার পর হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। দর্শকদের মধ্যে আর কারুর ব্যাপারটা বুঝে ওঠার অনেক আগেই সে নিজের পরাজয়টা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল।

প্রতিপক্ষের দিকে একনজর তাকিয়ে সে দেখে—লেদেনেভ তার দিকে তাকিয়ে আছে—তার মুখে সদয় হাসি। বোঝা গেল, সে-ও জানে খেলার ফলটা কী দাঁড়াবে। ভাইমান গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলাটা অনুসরণ করে চলেছিল এবং পাভেলের হেরে যাওয়াটাই যে তার কাম্য, সেটা গোপন করার একটুও চেষ্টা করছিল না। কিন্তু সেও বুঝে উঠতে পারে নি যে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে ফলটা।

পাভেল বলল, 'শেষ বোড়েটা হাতে থাকা পর্যন্ত আমি হাল ছাড়ি না।' সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল লেদেনেভ।

পাভেল লেদেনেভের সঙ্গে পাঁচ দিনে দশ দান খেলল—সাতবার হেরে গেল, দুবার জিতল এবং একবার খেলায় কোন নিষ্পত্তি হল না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ভাইমান।

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, কমরেড লেদেনেভ! দারুণ একখানা ধোলাই দিয়েছেন ওকে! এরকম একটা মার খাবার দরকার ছিল ওর! আমাদের মতো পুরনো সব দাবা-খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়ে বসে ছিল, শেষ পর্যন্ত কিনা

একজন বুড়ো মানুষের কাছেই পাল্টা হার মানতে হল ওকে। হাঃ হাঃ হাঃ।'

ভূতপূর্ব বিজয়ী খেলোয়াড়টিকে সে খোঁচা মারল, 'হেরে গিয়ে কেমন লাগছে এবার, অ্যাঁ?'

পাভেলকে 'চ্যাম্পিয়ন' পদবীটা খোয়াতে হল বটে; কিন্তু লেদেনেভকে সে বন্ধু হিসেবে পেল, এবং এ বন্ধুত্ব তার পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। এতদিনে সে বুঝেছে যে দাবা-খেলায় লেদেনেভের কাছে তার হেরে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। দাবার কলাকৌশল সম্বন্ধে তার জ্ঞানটা নিতান্তই ভাসাভাসা এবং এই খেলাটার সমস্ত গোপন রহস্যগুলো যার নখদর্পণে এই রকম একজন বিশেষজ্ঞের কাছেই তার হার অনিবার্য।

পাভেল আর লেদেনেভের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য তারিখের মিল আছে দেখা গেল: লেদেনেভ যে-বছরে পার্টিতে যোগ দেয়, সেই বছরেই পাভেলের জন্ম। এরা দু'জনেই বলশেভিকদের মধ্যে তরুণ আর প্রবীণ কর্মিদলের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। একজনের পেছনে রয়েছে নিরবসর রাজনৈতিক কাজে-ভরা সুদীর্ঘ জীবন, গোপন আন্দোলনের কাজে ব্যয়িত অনেকগুলি বছর, জারের জেলখানায় বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতা; এ সবের পর গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ। অন্য জনের রয়েছে দৃপ্ত যৌবন আর মাত্র আট বছরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা—কিন্তু এমন আট বছর যার দীপ্তি একাধিক জীবনকে ম্লান করে দিতে পারে। প্রবীণ আর নবীন এদের দু'জনেরই আছে অশান্ত হৃদয় অথচ ভগ্নস্বাস্থ্য।

বিকেলের দিকে এব্নের আর করচাগিনের ঘরখানা ক্লাব গোছের হয়ে ওঠে। আর সমস্ত রাজনীতিক খবরাখবরের উৎসও এটা। কথাবার্তা আর হাসির শব্দে গম্‌গম্‌ করে

ঘরখানা। ভাইমান সাধারণত কথাবার্তার মাঝখানে এক-আধটা স্থূল রসিকতার গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মার্তা আর করচাগিন তাকে দু'পাশ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে আক্রমণ করবেই। সুতীক্ষ্ন কোনো একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে মার্তা সাধারণত তাকে থামিয়ে দিতে পারে, আর এতেও সে না থামলে করচাগিন এগিয়ে আসে।

'তোমার এই বিশেষ ধরনের 'রসিকতা'টুকু ঠিক আমাদের রুচিসম্মত কিনা প্রথমে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত, বুঝলে ভাইমান...'

'তুমি যে এ ধরনের কথাবার্তা কী করে মুখে আনো সেটা আমি ঠিক বুঝি না,' অশান্ত গলায় বলে পাভেল।

ভাইমান তার পুরু নিচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে, ছোট ছোট চোখের চাউনিতে ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়ে অন্য সবার মুখের ওপর নজর বুলিয়ে বলে, 'রাজনীতিক শিক্ষা বিস্তারের বিভাগে একটা নীতিশাস্ত্রের দপ্তর খুলে করচাগিনকে তার বড়ো কর্তা করে দেবার জন্যে সুপারিশ করতে হবে দেখছি। মার্তার আপত্তির কারণটা বুঝি—স্ত্রীলোক হিসেবে ও হল গিয়ে আমাদের পেশাদার বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু করচাগিন নেহাত বালক হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে, যেন কমসোমলের কোলে একটি খোকা... আর তা ছাড়া, নাতি হয়ে ঠাকুর্দাকে শিক্ষা দিতে আসাটাতেও আমার আপত্তি আছে।'

কমিউনিস্টদের নীতিবোধ সম্বন্ধে খুব জোরালো একটা তর্কের শেষে স্থূল রসিকতা নিয়ে আলোচনা উঠল নীতির দিক থেকে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত মার্তা তরজমা করে করে বুঝিয়ে দিল এবনেরকে। এবনের বলল, 'স্থূল রসিকতা ভালো নয়। আমি পাভেলের সঙ্গে একমত।'

পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল ভাইমান। প্রসঙ্গটাকে হেসে

উড়িয়ে দিয়ে নিজের পরাজয়টা সাধ্যমতো সামলে নেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এরপর আর কোনোদিন সে সেই গল্প বলে নি।

পাভেল মার্তাকে কমসোমল সভ্য বলে ধরে নিয়েছিল, কারণ, ঊনিশ বছরের বেশি ওর বয়েস নয় বলেই তার মনে হয়েছিল। তারপরে যখন শুনল যে ১৯১৭ থেকে সে পার্টি সভ্য, তার বয়েস একত্রিশ বছর আর লাতভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সে একজন সক্রিয় কর্মী, তখন তার বিস্ময় আর ধরে না! ১৯১৮-য় শ্বেতরক্ষীরা তাকে গুলি করে মারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বন্দী-বিনিময়ের ব্যাপারে অন্য জনকতক কমরেডের সঙ্গে তাকে সোভিয়েত সরকারের হাতে দেওয়া হয়। ও এখন 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছে আর সেই সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়েও পড়ছে, শিগগির শেষ করবে। পাভেলের অজানতেই মার্তার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এই লাতভিয়ান মেয়েটি প্রায়ই এবনেরকে দেখতে আসে, সেই সূত্রে ও এই 'পাঁচজন'এর একজন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে!

এগলিং নামে একজন পুরনো দিনের বে-আইনী পার্টির কর্মী এই ব্যাপারটা নিয়ে মার্তার পেছনে লাগে, 'আহা, বেচারি ওজোল্ ওদিকে মস্কোয় ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মরছে, তার কি হবে? হায়, হায় মার্তা! কোন প্রাণে তুমি করছ এমনটা?'

সকালে ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টাটা বাজবার ঠিক আগেই স্বাস্থ্যনিবাসের বাড়িটা জুড়ে একটা মোরগের জোরালো ডাক শোনা যায়। রোগীদের দেখাশোনা করে যারা, তারা কোথা থেকে এই আওয়াজটা আসে বুঝে উঠতে না পেরে অসভ্য ওই পাখিটার সন্ধানে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। এবনের

যে মোরগের ডাকের অবিকল নকল করতে পারে আর সে-ই যে তাদের নিয়ে একটু মজা করছে, এটা তাদের কারুর মাথায় একদম খেলে না। এব্‌নের ব্যাপারটা ভারি উপভোগ করত।

স্বাস্থ্যনিবাসে পাভেলের একমাস মেয়াদের শেষের দিকে তার শরীরের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ডাক্তাররা তাকে বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এব্‌নের। সে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে এই নির্ভীক বলশেভিক তরুণটিকে—জীবনীশক্তি আর উদ্যমে ভরা এই যে-ছেলেটি এতো অল্পবয়সেই স্বাস্থ্য হারিয়ে বসেছে।

ডাক্তাররা করচাগিনের মর্মান্তিক পরিণতির যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সে কথা মার্তা তাকে বলার পর এব্‌নের গভীরভাবে পীড়িত হল মনে মনে।

স্বাস্থ্যনিবাসে পাভেলের শেষের দিনগুলো কাটল শয্যাশায়ী অবস্থায়। নিজের যন্ত্রণাটাকে সে আর-সবার কাছ থেকে গোপন করে গেল—শুধু মার্তা তার মুখের নিদারুণ বিবর্ণতা লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিল কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা সে সইছে। এখান থেকে তার চলে যাবার এক সপ্তাহ আগে পাভেল ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। তাতে জানানো হয়েছে যে স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তাররা তাকে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করার ফলে তাঁদের পরামর্শ অনুসারে পাভেলের ছুটি আরও দু'মাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হল।

খরচের টাকাও চিঠির সঙ্গে এসে পেঁৗছাল।

অনেক দিন আগে ঝুখ্‌রাইয়ের কাছে মুষ্টিযুদ্ধ শিখতে গিয়ে যেভাবে সে তার প্রথম ঘুষিগুলো সয়েছিল, এবারও পাভেল সেইভাবে সইল এই আঘাতটা। তখনও সে ঘুষি খেয়ে

বার বার পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফের উঠে দাঁড়িয়েছিল।

মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল পাভেল—আলবিনা কিউৎসাম নামে তার এক পুরনো দিনের সখীর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করবার জন্যে লিখেছে সে; ইয়েভপাতোরিয়ার কাছেই একটা ছোট বন্দর-শহরে তিনি থাকেন। এই বান্ধবীটির সঙ্গে পনেরো বছর দেখাশোনা হয় নি পাভেলের মায়ের, তাই সে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছে যেন ক্রিমিয়ায় থাকতে থাকতে পাভেল গিয়ে একবার আলবিনার সঙ্গে দেখা করে আসে। পাভেলের জীবনে এই চিঠিখানার ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক সপ্তাহ বাদে পাভেলের স্বাস্থ্যনিবাসের বন্ধুরা সবাই বন্দর-ঘাটায় এসে তাকে আন্তরিক বিদায়-অভিবাদন জানাল। এব্‌নের তাকে ভাইয়ের স্নেহে আলিঙ্গন করে চুমো খেল। মার্তা অন্য কোথায় যেন গিয়েছিল সেই সময়টায়, তাই পাভেলকে তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই রওনা হতে হল।

পরদিন সকালে বন্দর-ঘাটা থেকে একখানা ঘোড়াগাড়ি পাভেলকে নিয়ে এসে থামল ছোট বাগানওয়ালা একটা বাড়ির সামনে।

পাঁচজন লোক নিয়ে এই কিউৎসাম-পরিবার: মা আলবিনা, মোটা-সোটা, বয়স্কা মহিলা, কালো বিষণ্ণ দুই চোখ, বার্ধক্যের ছাপ ফুটে-ওঠা তার মুখে অতীত সৌন্দর্যের আভাস; তার দুই মেয়ে লোলা আর তাইয়া; লোলার একটি ছোট্ট খোকা; আর বাড়ির কর্তা কিউৎসাম—হোঁৎকা-গোছের আর বিরক্তিকর বৃদ্ধকে দেখতে বুনো শুয়োরের মতো।

বুড়ো কিউৎসাম একটি দোকানে কাজ করে। ছোট মেয়ে

তাইয়া ফাইফরমাশ খাটে। লোলার সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—লোকটা মাতাল আর অত্যাচারী। টাইপিস্ট লোলা ইদানীং কাজ না করে এই বাড়িতেই থাকে, তার ছোট ছেলেটির দেখাশোনা করে আর সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করে।

এই দুটি মেয়ে ছাড়া, জর্জ নামে একটি ছেলেও আছে; পাভেলের এখানে আসার সময় সে মস্কোয় ছিল।

পরিবারের লোকজন পাভেলকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। শুধু বুড়ো কিউৎসাম আগন্তুকটিকে দেখল শত্রুতাভরা সন্দেহের দৃষ্টিতে।

ধৈর্যের সঙ্গে পাভেল আলবিনাকে সমস্ত পারিবারিক খবরাখবর জানাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিউৎসাম-পরিবারের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে গেল।

বাইশ বছর বয়েস লোলার। সাদাসিধে মেয়েটি, বব্-করা বাদামী চুল, মুখের ধাঁচটা একটু চওড়া-গোছের, মুখে মন-খোলা একটা ভাব। সঙ্গে সঙ্গেই সে পাভেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল এবং পরিবারের গোপন কথাগুলো সবই জানিয়ে দিল তাকে। বলল, গোটা পরিবারটাকে ওই বুড়ো নিজের ইচ্ছে মতো কড়া-হাতে শাসন করে, অন্য কেউ স্বাধীনভাবে কিছু করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেই সেটাকে চেপে দেয়। সংকীর্ণমনা, গোঁড়ামিতে ভরা আর ছিদ্রান্বেষী এই লোকটি পরিবারের লোকজনদের সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। ফলে তার ছেলেমেয়েরা তাকে দারুণ অপছন্দ করে, স্ত্রী ঘৃণা করে—যে-স্ত্রী এই পঁচিশ বছর ধরে তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েরা সবসময় মায়ের পক্ষ নেয়। পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে এবং এর ফলে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠছে।

অবিরাম বকাবকি আর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটে।

লোলা পাভেলকে বলল: পরিবারের জীবনে অশান্তির আরেকটি উৎস হল তাদের ভাই জর্জ — খাঁটি অকর্মা ছেলে একটি, দেমাক-ভরা, উদ্ধত প্রকৃতির; ভালো খাওয়া-দাওয়া, কড়া মদ আর পরিপাটি পোশাক-আশাক ছাড়া আর কোনোকিছুর ধার ধারে না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে জর্জ মায়ের বড়ো প্রিয়। ইস্কুলের পড়া শেষ করার পর জর্জ বলল সে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে এবং সেখানে যাবার জন্যে তার টাকা চাই, 'লোলা ওর আংটিটা বেচে দিতে পারে, তোমারও তো দু'-একটা জিনিস আছে যার বদলে টাকা পাওয়া যেতে পারে। আমার টাকার দরকার। তুমি সেটা কীভাবে জোগাড় করবে তা আমি জানি না।'

জর্জ ভালোভাবেই জানত — সে যা-ই চাক, মা তাকে সেটা না দিয়ে পারবে না এবং নির্লজ্জভাবে সে মায়ের এই স্নেহেব সুযোগ নিয়ে থাকে। বোনদের সে দেখে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে। স্বামীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মা তার কাছ থেকে যা-কিছু টাকা-পয়সা বাগাতে পারে সেটার সবটাই ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়, তাছাড়া তাইয়ার রোজগারের যথাসর্বস্বও মা জর্জকে পাঠায়। ইতিমধ্যে, জর্জ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল মারার পর এখন মস্কোয় তার কাকার কাছে দিব্যি ফুর্তিতেই আছে এবং আরও টাকা চেয়ে ঘন ঘন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মার মনে সব সময় আতঙ্ক জাগিয়ে রেখেছে।

তার এখানে এসে পৌঁছাবার দিন সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত পাভেল তাইয়ার দেখা পায় নি। বারান্দাটায় তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল আলবিনা, পাভেলের কানে এল — সে ফিসফিসিয়ে তার আসার খবরটা বলছে তাকে। অপরিচিত

তরুণটির সঙ্গে তাইয়া সলজ্জভাবে করমর্দন করল, তার ছোট কান পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠল এবং পাভেল তার ছোট কড়াপড়া বলিষ্ঠ হাতখানা কয়েক মুহূর্ত চেপে ধরে রইল।

উনিশ বছরে পড়েছে তাইয়া। সুন্দরী নয়, কিন্তু তবু তার বড়ো বড়ো বাদামী চোখ, মঙ্গোলীয় ধাঁচের তির্যক ভুরু, টিকালো নাক, ভরা, তাজা ঠোঁট—সব মিলিয়ে তার বেশ একটা আকর্ষণ আছে। ডোরা-কাটা ব্লাউজের নিচে তার উন্নত স্তন দুটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

দুই বোনের জন্যে দুটি ছোট ছোট ঘর। তাইয়ার ঘরে সরু একটা লোহার খাট, টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি একটা টানা-আলমারি, তার ওপর ছোট একটা আয়না, আর দেয়ালের গায়ে কয়েক ডজন ফটোগ্রাফ আর ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড। জানলার তাকে দুটো পাত্রের একটাতে গাঢ় লাল রঙের জেরানিয়ম-ফুল, অন্যটাতে হাল্কা পাটল রঙের অ্যাস্টার-ফুল। লেসের পর্দাটা ফিকে নীল রঙের ফিতে দিয়ে আটকানো।

লোলা তার বোনকে খুনসুড়ি কেটে বলল, 'তাইয়া সাধারণত পুরুষ-জাতীয় ব্যক্তিদের ওর ঘরে ঢুকতে দেয় না। আপনার বেলাতেই ও ব্যতিক্রম ঘটালো।'

বৃদ্ধ দম্পতি বাড়ির যে অংশে থাকে, সেই অংশের একটা ঘরে পরের দিন বিকেলে বাড়ির সবাই বসে চা খাচ্ছিল। তাইয়া নিজের ঘরে ছিল, ওখান থেকে কথাবার্তা শুনছিল। বৃদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে তার চা-টা চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে তার চশমার ওপর দিয়ে বিরূপ নজর চালিয়ে অতিথিটির দিকে তাকাচ্ছিল।

'আজকালকার এই বিয়ের আইনকানুনগুলোর ওপরে আমার

কোনো শ্রদ্ধা নেই,' বলল সে, 'আজ বিয়ে, কালই খারিজ। খেয়াল-খুশির ব্যাপার। পূর্ণ স্বাধীনতা!'

গলায় বিষম লেগে গিয়ে কেশে উঠল বৃদ্ধ, তারপরে দম নিয়ে লোলাকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখো না—কারুর অনুমতি না নিয়েই সে আর ওই মিনসেটা গিয়ে বিয়ে করে বসলে, ছাড়াছাড়িও হয়ে গেল ওইভাবেই। আর এখন আমাকেই ওকে আর ওর ওই অপোগণ্ডটিকে খাওয়াতে হচ্ছে। কী অন্যায় জুলুম!'

লজ্জায় যন্ত্রণায় রক্তিম হয়ে উঠল লোলার মুখ, জলভরা চোখে মুখখানা আড়াল করে নিল পাভেলের দিক থেকে।

'তাহলে আপনি মনে করেন যে ওই বদমায়েসটার সঙ্গেই ওর থাকা উচিত ছিল?' জিজ্ঞেস করল পাভেল। তার দুই চোখে ক্রোধের দীপ্তি।

'কাকে বিয়ে করতে চলেছে, সেটা দেখেশুনেই করা উচিত ছিল ওর।'

আলবিনা বাধা দিল। রাগটাকে একরকম না চেপেই, তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, 'বাইরের একজন লোকের সঙ্গে এ সব আলোচনা কি না-করলেই নয়? বলবার মতো আর-কোনো কথা কি খুঁজে পেলে না?'

বুড়োটা তার দিকে ঘুরে বসে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী আলোচনা করব না-করব তা আমার জানা আছে! আমাকে কী করতে হবে না-হবে সেটা আবার তুমি বলে দিতে শুরু করলে কবে থেকে!'

সেদিন রাত্রে পাভেল এই কিউৎসাম-পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে রইল। আকস্মিকভাবে এখানে এসে পড়ে সে নিজের অজানতেই এই পারিবারিক ঘটনাচক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মাকে আর মেয়েদের সে কীভাবে এই

বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সাহায্য করতে পারে সেই কথাটাই ভাবছিল। নিজের জীবনটাই তার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গতি কমাতে শুরু করেছে। অনেক কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে তাকে অথচ এখন সুনির্দিষ্ট কোনো একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা আগেকার চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, একটাই পথ আছে: পরিবারের লোকগুলোকে ভিন্ন করে দিতে হবে, মাকে আর মেয়েদের চলে যেতেই হবে এই বুড়ো মানুষটিকে ছেড়ে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। পাভেলের পক্ষে কোনক্রমেই এই পারিবারিক বিপ্লবের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ, সে তো দু'-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে এবং হয়তো আর কোনদিনই তার এদের সঙ্গে দেখাও হবে না। সেক্ষেত্রে, ঘোলাজলের এই বদ্ধ ডোবাটাকে নেড়ে দেবার চেষ্টা না করে, ঘটনাস্রোতকে তার নিজস্ব গতিতে বয়ে যেতে দেওয়াটাই ভালো নয় কি? কিন্তু বুড়ো মানুষটির ওই ন্যক্কারজনক চরিত্রটা তাকে কিছুতেই শান্তি দিচ্ছে না। গোটাকতক পরিকল্পনা তার মাথায় এল, কিন্তু আরও ভালো করে ভেবে দেখার পর সবগুলোকেই সে অবাস্তব বলে বাতিল করে দিল।

পরের দিন ছিল রবিবার। শহরের মধ্যে এক পাক ঘুরে এসে পাভেল দেখে বাড়িতে একা তাইয়া রয়েছে। অন্যেরা গেছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

পাভেল তাইয়ার ঘরে এসে একটা চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু আমোদপ্রমোদ করো না কেন?'

নিচু গলায় জবাব দিল তাইয়া, 'আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।'

রাত্রে সে যেসব পরিকল্পনা ভেবেছিল, সেগুলো মনে পড়ল পাভেলের. কথাগুলো সে তাইয়াকে বলবে বলে মনস্থ করল, আর কেউ এসে পড়ার আগেই ব্যাপারটা শেষ করতে হবে বলে সরাসরি আসল কথাটা পাড়ল সে। তাড়াতাড়ি করে বলে চলল, 'শোনো, তাইয়া, তোমার-আমার মধ্যে 'তুমি' বলা ভাল। আমাদের মধ্যে আর এইসব আনুষ্ঠানিক কেতা মেনে চলার দরকারটা কী? আমি শিগগিরই চলে যাচ্ছি। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা হল এমন একটা সময়ে যখন আমি নিজেই নানান দুর্ভোগে পড়েছি — এইটে একটা আফসোসের কথা, নইলে, ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারত। এক বছর আগে হলে আমরা সবাই একসঙ্গে এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। তোমার আর লোলার মতো মেয়েদের জন্যে সর্বত্রই প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ আর বদলাবে বলে আশা করা নিরর্থক। তোমার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব। আমার নিজের কী হবে না-হবে এখনও পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না। আমি বিশেষ করে পীড়াপীড়ি করব যাতে আমাকে ফের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে যতোসব আজেবাজে কথা লিখে পাঠিয়েছে আর কমরেডরা সবাই চেষ্টা করছে যাতে অনন্তকাল ধরে আমার চিকিৎসা চলে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে ভাবা যাবে এখন... আমি মাকে চিঠি লিখে এখানে তোমাদের কঠিন অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাব। অবস্থাটাকে এভাবে চলতে দিতে পারি না। কিন্তু, তাইয়া, তোমাকে এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে এর ফলে বর্তমান জীবন থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে আনতে হবে! সেটা কি তুমি করতে চাও এবং সেটা করার মতো জোর তোমার হবে তো?'

চোখ তুলে তাকাল তাইয়া। আস্তে আস্তে বলল, 'চাই, কিন্তু সে জোর আমার আছে কি-না তা জানি না।'

তার এই অনিশ্চয়তাটুকু পাভেল বোঝে। সে বলল, 'কিছু ভেবো না, তাইয়া! ইচ্ছাটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব-কিছু ঠিক হয়ে যাবে। পরিবারের সবার ওপরে তোমার টানটা কি খুব বেশি?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তাইয়া। শেষে বলল, 'মার জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। বাবা তাঁর জীবনটা বিষময় করে তুলেছেন, আর এখন জর্জ তাঁকে জ্বালাচ্ছে। জর্জকে মা যতোটা ভালোবাসেন, আমাকে সে রকম কোনোদিনই বাসেন নি, তবু মার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়..'

অনেকক্ষণ ধরে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হল তাদের মধ্যে। বাড়ির অন্য লোকজন সব ফিরে আসার একটু আগে পাভেল কৌতুক করে বলল, 'এতদিনে যে বুড়ো কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেয় নি, সেইটেই আশ্চর্য।'

কথাটা শুনে তাইয়া আতঙ্কে হাত দুটো বিক্ষিপ্ত করে বলল, 'না, না, আমি কখনও বিয়ে করব না। বেচারি লোলার অবস্থাটা আমি দেখেছি। কোনো কিছুর লোভেই আমি বিয়ে করতে রাজী নই!'

হেসে উঠল পাভেল, 'তাহলে বাকি জীবনটার মতো তুমি ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছ? কিন্তু যদি কোনো চমৎকার সুপুরুষ তরুণ তোমার জীবনে এসে যায়, তাহলে?'

'না, তাহলেও না। বিয়ের আগে প্রেম করার বেলায় ওরা সবাই ভারি চমৎকার।'

শান্ত করার ভাবে পাভেল তার কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক আছে, তাইয়া। স্বামী না হলেও তোমার দিব্যি চলে যেতে পারে। কিন্তু তরুণদের ওপরে তোমার অতোটা নির্মম হবার

দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে প্রেম জমাবার চেষ্টায় আছি — এ সন্দেহ যে তোমার মনে জাগে নি, সেটা ভালো, নইলে মুশকিল হত।' ভাইয়ের মতো পাভেল তার বাহুর ওপরে চাপড় মারল।

কোমল গলায় বলল তাইয়া, 'তোমার মতো মানুষরা অন্য ধরনের মেয়েদের বিয়ে করে।'

দিনকয়েক বাদেই পাভেল খারকভ রওনা হয়ে গেল। পাভেলকে বিদায় জানাবার জন্যে তাইয়া, লোলা আর আলবিনা তার বোন রোজাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে এল। আলবিনা তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল — সে যেন তার মেয়েদের ভুলে না যায়, এই দুরবস্থার মধ্যে থেকে যাতে তারা উদ্ধার পায় তার জন্যে যেন সে তাদের সাহায্য করে। ঘনিষ্ঠ কোনো প্রিয়জনকে যেমন লোকে বিদায় দেয়, তেমনিভাবেই তারা পাভেলকে বিদায় জানাল, তাইয়ার চোখে জল এসে গেল। কামরাটার জানলা দিয়ে পাভেল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোলার হাতে শাদা রুমালটা আর তাইয়ার ডোরা-কাটা ব্লাউজটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে আসতে শেষে মিলিয়ে গেল।

খারকভে পৌঁছে পাভেল সোজা চলে এল তার বন্ধু পেতিয়া নোভিকভের ঘরে — কারণ, দোরাব ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না সে। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে এল কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এখানে এসে আকিমের জন্যে অপেক্ষা করে রইল এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা দু'জন ছাড়া ঘরে আর কেউ রইল না, তখন পাভেল বলল যে তাকে অবিলম্বে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোক। মাথা নাড়ল আকিম, 'তা হয় না, পাভেল! চিকিৎসা কমিশনের নির্দেশ আছে, আর কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে,

তোমার শরীরের অবস্থা গুরুতর। তোমাকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না—স্নায়বিক রোগ-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'ওরা কী বলল না-বলল, আমি তার কি ধার ধারি, আকিম! আমি তোমার কাছেই আবেদন জানাচ্ছি। কাজ করার একটা সুযোগ আমাকে দাও! একটা হাসপাতাল থেকে আরেকটা হাসপাতালে এইভাবে ঘোরাঘুরি এতে কোনো লাভ নেই।'

আকিম তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টায় যুক্তি দেখাল, 'পার্টি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারি না আমরা। এটা যে তোমারই ভালোর জন্যে তা কি তুমি বোঝ না, পাভলুশা?'

কিন্তু পাভেল এমন আন্তরিক আবেগের সঙ্গে নিজের কথাটা তুলে ধরল যে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল আকিমকে।

পরের দিনই পাভেল কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বিশেষ বিভাগে কাজে লেগে গেল। কাজ শুরু করে দিলেই শরীরে হৃতশক্তি ফিরে আসবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝল সেটা ভুল। একনাগাড়ে আট ঘণ্টা বসে থাকে সে তার ডেস্কে, দুপুরের খাবার সময়টুকুতেও কাজ বন্ধ করে না, তার কারণ শুধু এই যে তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে ক্যান্টিন পর্যন্ত ওঠানামা করার হয়রানিটুকু সওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রায়ই তার হাত বা পা হঠাৎ অসাড় হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে তার গোটা শরীরটাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রায়ই একটা জ্বর-জ্বর ভাব বোধ করে সে। মাঝে মাঝে সকালে দেখে বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি নেই এবং ব্যায়রামের সেই সাময়িক আক্রমণ কেটে যাবার পর হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে সেদিনকার মতো কাজে

যোগ দিতে তার পুরো একঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত একদিন দেরি করে কাজে আসার জন্যে তাকে সরকারীভাবে তিরস্কার করা হল। আর তখনই সে বুঝল যে, যে-ব্যাপারটাকে সে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এসেছে, এটা তারই সূত্রপাত -- সক্রিয় কর্মিদলের বাইরে পড়ে যাচ্ছে সে।

আকিম তাকে দু'-বার অন্য কাজে বদলি করে দিয়ে সাহায্য করল, কিন্তু অনিবার্য ঘটনাটা ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। ফিরে এসে কাজে যোগ দেবার একমাস বাদেই পাভেল আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। এইবারে তার মনে পড়ল বিদায় নেবার সময় বাঝানোভার শেষ কথাগুলো। পাভেল তাকে চিঠি লিখল এবং সেইদিনই এসে পড়ল বাঝানোভা। যে-কথাটা পাভেলের কাছে সবচেয়ে প্রধান, সেই কথাটাই বাঝানোভা বলল তাকে -- হাসপাতালে যে পাভেলকে যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

তামাশা করতে গিয়ে পাভেল বলল, 'তাহলে আমার শরীর আজকাল এতো ভালো যাচ্ছে যে আর চিকিৎসার দরকার নেই, অ্যাঁ?' কিন্তু কৌতুকটা খুব কার্যকরী হল না।

আগের চেয়ে একটু সেরে উঠেছে বলে মনে হতেই সে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ফিরে এল। কিন্তু এবারে আকিমের মনোভাব একেবারে অনমনীয়: পাভেলকে হাসপাতালে যেতে হবে বলে গোঁ ধরল সে।

'হাসপাতালে যাব না আমি,' চাপা স্বরে বলল পাভেল, 'কোনো লাভ হবে না গিয়ে। খুব ভালোরকম নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মত জেনেই আমি একথা বলছি। একটা পথই শুধু আমার সামনে খোলা আছে — পেনশন নিয়ে কাজকর্ম থেকে অবসর নেওয়া। কিন্তু সেটি হচ্ছে না! আমাকে কাজ ছেড়ে দেওয়াতে পারবে না তোমরা। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস

আমার - অকর্মণ্য পঙ্গু হিসেবে, আর কোনো লাভ নেই জেনেও হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চাই না আমি। কিছু একটা কাজ তোমাদের আমাকে দিতেই হবে — আমার এই অবস্থার পক্ষে উপযোগী কোনো কাজ। বাড়িতে বসে কাজ করতে পারি আমি, কিংবা আপিসেও থাকতে পারি... শুধু দেখো, চিঠিপত্রে নম্বর বসিয়ে যাওয়া বা ওই ধরনের স্রেফ কলম-নাড়াচাড়ার কোনো কাজ যেন দিয়ো না। এমন একটা কাজ আমাকে পেতেই হবে, যাতে আমার মন পরিতৃপ্ত হয়, আমার এই সান্ত্বনাটুকু থাকবে যে আমি এখনও কোনো-একটা কাজে লাগছি।'

পাভেলের আবেগ-কম্পিত গলার স্বর ক্রমশই চড়া পর্দায় উঠে গেল।

আকিম তার প্রতি গভীর একটা সমবেদনা অনুভব করল। এই-যে দীপ্ত-হৃদয় তরুণটি তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সবটাই পার্টির জন্যে দান করেছে, তার পক্ষে সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার এই চিন্তাটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে পেছনের সারিতে সরে গিয়ে অবসর-জীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়াটা যে কী মর্মান্তিক, তা আকিম জানে। সে যতদূর পারে পাভেলকে সাহায্য করবে বলে মনস্থ করল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। শান্ত হও, পাভেল। আগামীকাল সেক্রেটারিয়েটের একটা বৈঠক আছে, সেখানে আমি কমরেডদের কাছে তোমার ব্যাপারটা তুলব। কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য করব।'

ভারি পায়ে উঠে দাঁড়াল পাভেল, আকিমের হাতখানা চেপে ধরল, 'আকিম, তোমার কি সত্যিই মনে হয় যে জীবন আমাকে কোণঠাসা করে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃৎপিণ্ডটা এইখানে ধুকধুক করবে,' বলতে বলতে সে

আকিমের হাতখানা চেপে ধরল নিজের বুকের ওপরে যাতে সে তার হৃৎপিণ্ডের ভোঁতা ধুকধুক আওয়াজটা শুনতে পায়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধুকধুকুনি বন্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাকে পার্টি থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমাকে পার্টির কর্মিদলের বাইরে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে একমাত্র মৃত্যুই। এই কথাটি মনে রেখো, ভাই।'

কিছু বলল না আকিম। সে জানে পাভেলের এই কথাগুলো শুধুই ফাঁকা বুলি নয় — এটা যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত সৈনিকের চিৎকার। সে জানে, করচাগিনের মতো মানুষ এ ছাড়া অন্য কোনরকম ভাবতে বা বলতে পারে না।

দু'দিন বাদে আকিম পাভেলকে জানাল, একটা কেন্দ্রীয় খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সুযোগ তাকে দেওয়া হবে — অবশ্য যদি লেখালেখির কাজ তাকে দিয়ে হবে বলে মনে হয়, তাহলে। সম্পাদকীয় দপ্তরে পাভেলকে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান হল এবং একজন সহকারী সম্পাদক তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন — পুরনো দিনের পার্টি কর্মী এই মহিলাটি ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর একজন সভ্য।

'আপনি লেখাপড়া কতদূর পর্যন্ত করেছেন, কমরেড?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'প্রাথমিক স্কুলে তিন বছর পড়েছি।'

'পার্টির কোনো রাজনীতিক স্কুলে আপনি পড়েছেন কি?'

'না।'

'তা, স্কুল-কলেজে খুব বেশি দূর না পড়েও ভালো সাংবাদিক হওয়া যায়। কমরেড আকিম আমাদের বলেছে আপনার কথা। বাড়িতে বসে করবার মতো কাজ আমরা আপনাকে দিতে পারি। আর, সাধারণভাবে, আপনার কাজ

করার মতো যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিতেও প্রস্তুত আছি আমরা। কিন্তু এ ধরনের কাজের জন্যে বেশ খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার -- বিশেষ করে সাহিত্য আর ভাষার ক্ষেত্রে।'

অবস্থাটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আধঘণ্টা ধরে এই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সে দেখতে পেল -- তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কেমন লিখতে পারে দেখবার জন্যে তাকে একটা প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল; লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দেখানো তিরিশটার বেশি ভাষাগত প্রকাশভঙ্গীর ভুল আর বানান-ভুল সমেত লেখাটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

'আপনার বেশ যোগ্যতা আছে, কমরেড করচাগিন,' বললেন সম্পাদিকা, 'কিছুদিন বেশ খাটলে আপনি দিব্যি লিখতে শিখে যেতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে আপনার লেখায় ব্যাকরণের অনেক ভুল আছে। আপনার প্রবন্ধটা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনার রাশিয়ান ভাষায় যথেষ্ট দখল নেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনি সেটা শেখার সময় পান নি। আমরা এখানে আপনাকে কোনো কাজে লাগাতে পারব না বলে দুঃখিত। তবু ফের বলছি, আপনার যোগ্যতা আছে। আপনার প্রবন্ধটির বক্তব্য না বদলিয়ে যদি শুধু ভাষাটার সম্পাদনা করে দেওয়া যায়, তাহলে ওটা একটা চমৎকার রচনা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, দেখুন, এমনিতেই আমাদের সম্পাদনা করবার মতো লোক দরকার।'

লাঠিটার ওপরে ঝুঁকে পড়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল করচাগিন। তার ডান চোখের ভুরুটা বার বার কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ, আপনার বক্তব্যটা আমি বুঝেছি। আমি আর সাংবাদিক হব কোত্থেকে? আমি এককালে ছিলাম ভালো স্টোকার, আর, ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবেও মন্দ নয়। ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলাম এবং কমসোমল তরুণদের মধ্যে আলোড়ন

জাগিয়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা খুব করুণ হয়ে দাঁড়াবে।'

করমর্দন করে বেরিয়ে এল সে।

বারান্দাটার একটা বাঁকে এসে ঘুরে যাবার সময়ে হঠাৎ সে পড়েই যাচ্ছিল; সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটি মেয়ে — সে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল।

'কী হয়েছে, কমরেড? মুখটা বিবর্ণ হয়েছে আপনার!'

সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল পাভেলের। তারপরে সে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভর দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সেইদিন থেকে পাভেল অনুভব করল, তার জীবনটা ক্ষয়ে আসছে। এখন আর কাজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ক্রমশই বেশি বেশি করে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে কাজের দায়িত্ব থেকে খালাস করে দিয়ে পেনশনের ব্যবস্থা করে দিল। যথাসময়ে মাসোহারা এসে গেল, আর সেই সঙ্গে এসে গেল তাকে অসুস্থ পঙ্গু হিসাবে ঘোষণা করে একখানা সুপারিশ-পত্র। পাভেলকে খুশিমতো যে-কোনো জায়গায় যাবার অধিকার দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে টাকাকড়ি আর পরিচয়-পত্র ইত্যাদি দিয়ে দিল। মার্তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল সে — মস্কোতে গিয়ে তার কাছে কিছুদিন থাকতে বলছে সে। এদিকে পাভেলও কিছুদিন থেকে মস্কোতে যাবে বলে মনস্থ করেছিল, কারণ, তখনও তার মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে ছিল যে সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি হয়তো তাকে এমন একটা কোনো কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে যে-কাজে ঘোরাঘুরি করে বেড়াবার দরকার পড়বে না। কিন্তু মস্কোতেও তাকে ডাক্তারী চিকিৎসা করাবার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল এবং ভালো একটা

হাসপাতালে তাকে জায়গাও দিতে চাওয়া হল। সেটা প্রত্যাখ্যান করল সে।

মার্তা আর তার বান্ধবী নাদিয়া পিটার্সন যে-ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকে, সেখানে পাভেলের উনিশটা দিন দ্রুত কেটে গেল। অনেকখানি সময় পাভেলকে একলা কাটাতে হত, কারণ, মার্তা আর নাদিয়া সকালে কাজে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যের আগে ফেরে না। মার্তার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ে পড়ে সময় কাটাত সে—মার্তার বইয়ের সংগ্রহ বেশ ভালো। সন্ধ্যাবেলায় মার্তা আর নাদিয়ার বন্ধুবান্ধব আসে, তাদের সঙ্গে সময়টা বেশ আনন্দে কাটত।

কিউৎসামদের কাছ থেকে চিঠি এল, তারা তাকে একবার ওদের ওখানে আসতে লিখেছে। অসহনীয় হয়ে উঠছে তাদের জীবন, পাভেলের সাহায্য চায় তারা।

তাই একদিন সকালে পাভেল গুসিয়াৎনিকভ্ গলির সেই ছোট্ট নিরিবিলি ফ্ল্যাট ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। ট্রেনটা তাকে দক্ষিণমুখো দ্রুত বয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে, স্যাঁৎসেঁতে বৃষ্টিঝরা শরৎ থেকে দূরে সে চলেছে দক্ষিণ ক্রিমিয়ার উষ্ণ উপকূলে। জানলার ধারে বসে পাভেল টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর দ্রুত পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়াটা লক্ষ্য করছে। ভুরু দুটি তার কুঁচকে আছে, তার কালো দুই চোখে একটা দীপ্তি অনির্বাণ হয়ে আছে।

অষ্টম অধ্যায়

নিচে সমুদ্র এসে আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো খাঁজ-কাটা পাথুরে তীরে। সুদূর তুরস্ক থেকে বয়ে আসা শুকনো হাওয়া এসে লাগছে মুখেচোখে। কংক্রিটের বাঁধ

দিয়ে সমুদ্র থেকে আড়াল করা পোতাশ্রয়টা এলোমেলো একটা বৃত্তাংশ রচনা করে ঢুকে গেছে তটভূমির মধ্যে। আর তারই ওপর দিয়ে দেখা যায় -- সমুদ্রের ধারে এসে হঠাৎ থেমে-যাওয়া পাহাড়ের সারির ঢালু বুকের ওপর আটকে রয়েছে শহরতলীর ছোট ছোট শাদা বাড়িগুলো।

শহরের বাইরে এই পুরনো পার্কটা বেশ শান্ত। ম্যাপলগাছের হলদে পাতাগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে পার্কের ঘাস-গজানো পথগুলোর ওপরে।

শহর থেকে পাভেলকে এখানে গাড়ি করে পেঁাছে দিয়ে গেছে একজন বুড়ো পারসীক গাড়োয়ান। অদ্ভুত এই সওয়ারটি যখন নেমে এল তার গাড়ি থেকে তখন সে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না, 'এতো জায়গা থাকতে এখানে এলে কেন? এখানে না আছে কম-বয়েসী মেয়ে, না আছে কোনো আমোদের ব্যবস্থা, আছে শুধু শেয়ালের পাল... এখানে আর করবে কী? চলো বরং আমি গাড়ি করে তোমাকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, কমরেড-মশাই!'

পাভেল তার ভাড়া চুকিয়ে দিল। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল বুড়ো।

পার্কটা সত্যিই সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পাহাড়ের খাড়াইটার কাছে সমুদ্রের মুখোমুখি একটা বেঞ্চি পেয়ে গেল পাভেল, বসে পড়ে মুখখানা মেলে ধরল মৃদু-তেজ শরৎ রৌদ্রের দিকে।

সবকিছু ভেবে দেখার জন্যে এবং নিজের জীবনে কী করবে না-করবে সেটা বিবেচনা করার জন্যে সে এই নিরিবিলি জায়গাটায় এসে বসেছে। অবস্থাটা ভালো করে বিবেচনা করার পর একটা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে।

কিউৎসামদের এখানে তার এই দ্বিতীয়বার আসাতে তাদের

পারিবারিক সংঘাতটা একেবারে পেকে উঠেছে। পাভেলের এসে পড়ার খবর পেয়েই বুড়ো দারুণ চটে উঠে সাংঘাতিক গালাগাল-চেঁচামেচি করেছিল। স্বভাবতই প্রতিরোধের নেতৃত্বটা এসে পড়েছিল পাভেলের ওপরে। অপ্রত্যাশিতভাবে স্ত্রী আর মেয়েদের কাছ থেকে একটা জোরালো প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল বুড়োকে। পাভেলের এখানে এসে পেঁছানোর প্রথম দিন থেকেই গোটা বাড়িটা দুটো শত্রু-শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। বাড়িটার যে-অংশে বাবা-মা থাকে, সেদিকে যাবার দরজাটা তালা-বন্ধ হয়ে গেল। পাশের দিকে ছোট একখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হল করচাগিনকে। পাভেল অগ্রিম ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ায় বুড়ো এই ব্যবস্থায় কিছুটা শান্ত হল। মেয়েরা এখন ভিন্ন হয়ে গেছে, তাই সে আর তাদের ভরণপোষণ করবে বলে আশা করা যায় না।

কূটনীতিক কারণে আলবিনা তার স্বামীর সঙ্গেই আছে। বুড়ো মেয়েদের বসবাসের অংশটুকুর এদিকে এক পাও আসে না কখনও; যে-মানুষটিকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে দেখাদেখিটা এড়িয়ে চলে। কিন্তু সে যে এখনও বাড়ির কর্তা, সেটা জাহির করার জন্যে বাইরের উঠোনটায় যতোদূর পারে সে সোরগোল তোলে।

দোকানে কাজ নেবার আগে এই কিউৎসাম বুড়ো জুতো তৈরি করে আর ছুতোরগিরি করে চালাত, তাই পেছনের আঙিনাটায় তার ছোট্ট একটা কর্মশালা ছিল। ভাড়াটেকে বিরক্ত করবার জন্যে এখন সে তার কাজ করার বেঞ্চিটাকে চালার ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এসে বসিয়েছে ঠিক পাভেলের ঘরের জানলাটার নিচেই · সেখানে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দে হাতুড়ি পেটায় আর তার ফলে করচাগিনের

পড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে জেনে একটা বিদ্বেষভরা তৃপ্তি লাভ করে।

হিসহিসিয়ে বুড়ো আপন মনে বলে, 'দাঁড়াও, এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়ছি তোমায়...'

অনেক দূরে একেবারে দিগন্তের কাছে একটা স্টিমার ছোট একটা ধোঁয়ার রেখা এঁকে দিয়েছে সমুদ্রের উপরে। একঝাঁক গাংচিল ডানা ছড়িয়ে কান-ফাটানো চিৎকার তুলে সমুদ্রের ঢেউয়ে ছোঁ মারছে।

হাতের তেলোয় থুতনিটা রেখে পাভেল চিন্তায় ডুবে গেছে। ছেলেবেলা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গোটা জীবনের ছবিটা তার মনশ্চক্ষুর সামনে খেলে গেল। এই চব্বিশ বছর সে কীভাবে বেঁচেছে? বাঁচাটা সার্থক হয়েছে, না, ব্যর্থ হয়েছে? আরেকবার সে জীবনটার পর্যালোচনা করে চলল বছর ধরে ধরে, ধীরভাবে পক্ষপাতহীন বিচার করে করে। সে দেখল যে ততোটা খারাপভাবে জীবনটা কাটায় নি, তখন দারুণ একটা স্বস্তি বোধ করল। ভুলত্রুটি ঘটেছে ঠিকই, — তরুণ বয়সের অনভিজ্ঞতার ভুল, প্রধানত অজ্ঞতাজনিত ভুল। কিন্তু সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামের সময়ে সেই সব ঝোড়ো দিনগুলোয় সে-ও থেকেছে লড়াইয়ের মাঝখানে এবং বিপ্লবের রক্ত-পতাকায় তার জীবনের দু-এক বিন্দু রক্তও লেগে আছে।

শক্তি নিঃশেষ হয়ে না আসা পর্যন্ত সে থেকেছে কর্মিদলের মধ্যে। আর এখন চোট খেয়ে পড়ে যাবার পর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সামনের সারিতে জায়গা নিতে অসমর্থ হয়ে তার এবার পেছন-ঘাঁটির হাসপাতালে এসে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পাভেলের মনে পড়ল তাদের ওয়ারস আক্রমণ করার কথাটা এবং লড়াই যখন চরমে উঠেছে

তখন একজন সৈন্যের গুলি লেগে পড়ে যাবার দৃশ্যটা। মাটির ওপরে ঘোড়ার খুরের সামনে পড়ে গিয়েছিল সে। কমরেডরা তাড়াতাড়ি তার ক্ষতগুলো বেঁধেছেঁদে স্ট্রেচার-বাহকদের জিম্মায় দিয়ে শত্রুর পেছনে তাড়া করে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। একজন আহত সৈনিকের জন্যে পুরো স্কোয়াড্রনের এগিয়ে যাওয়াটা থেমে থাকে নি। মহৎ আদর্শের জন্যে সংগ্রামে এই রকমই হয়, এরকমই হবেই। অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটে। সে পা-কাটা মেশিনগান-গোলন্দাজদেরও কামান বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়িতে চেপে যুদ্ধে যেতে দেখেছে তো। এই সব লোক শত্রুসারির মধ্যে নিদারুণ আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে, মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে তাদের মেশিনগান, ইস্পাত-কঠিন সাহস আর অভ্রান্ত নিশানার ক্ষমতার জন্যে তারা হয়ে উঠেছে তাদের নিজের নিজের ফৌজীদলের গর্ব। কিন্তু এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুব কম।

কিন্তু এই পরাজয়ের পর আর যখন কর্মিদলের মধ্যে তার ফিরে যাবার কোনো আশা নেই, এ অবস্থায় কী করবে সে? ভবিষ্যতে যে তাকে এর চেয়েও ঢের বেশি ভয়ংকর কিছু সইতে হবে---বাঝানোভার কাছ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু তো সে আদায় করেই ছেড়েছে। কী করবে সে? অমীমাংসিত এই প্রশ্নটি যেন তার সামনেই একটা অতলস্পর্শী গহ্বরমুখ বিস্তার করে রয়েছে।

সংগ্রাম করার ক্ষমতাকেই সে জীবনে সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছে, সেই ক্ষমতাটাকেই হারিয়ে বসার পর আর বেঁচে রইবে কিসের জন্যে? আজকের আর নিরানন্দ আগামীকালের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তিটা কী? কী দিয়ে ভরে তুলবে সে তার দিনগুলোকে? টিকে রইবে শুধু

নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আর পান-আহার করবার জন্যে? তার কমরেডরা সব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে, আর সে শুধু পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখে যাবে? যোদ্ধাদের দলে সে হয়ে রইবে একটা বোঝা? এই যে দেহটা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেটাকে ধ্বংস করে ফেলাটাই কি ঢের ভালো হবে না? হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দাও--আর চুকিয়ে ফেল সবকিছু! সেই হবে সার্থক জীবনের সময়োচিত পরিসমাপ্তি। যন্ত্রণার হাত থেকে যে সৈনিক নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, তার নিন্দা করবে কে?

পকেটের মধ্যে তার ব্রাউনিং-পিস্তলের চ্যাপ্টা গড়নটা হাতড়াল সে। বাঁটের ওপরে আঙুলগুলো চেপে এল। ধীরে ধীরে বের করে আনল পিস্তলটা।

'শেষ পর্যন্ত যে তুমি এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসবে, তা কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে?'

নিঃশব্দ ঘৃণার চোখ মেলে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিস্তলেব নলটা। পাভেল হাঁটুর ওপরে পিস্তলটা রেখে নিদারুণ আত্মগ্লানির সঙ্গে গাল পাড়ল একটা।

'শস্তা বাহাদুরি যতো সব! যে-কোনো আহাম্মকই তো গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে- ওটাই তো সবচেয়ে সহজ পথ, কাপুরুষের পথ। জীবন যখন তোমার ওপরে বড়ো বেশি রকম নির্দয় হয়ে ওঠে, তখন তো যে-কোন সময়েই খুলির মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু জীবনে এই সংকট কাটাবার চেষ্টা করেছ কি? এ কথাটা কি বিনা দ্বিধায় বলতে পারো যে লোহার ফাঁদটাকে কেটে বেরিয়ে আসার জন্যে যথাসম্ভব সব করেছ? নভোগ্রাদ-ভলিন্স্কির সেই লড়াইয়ে আমরা পরপর সতেরো বার হামলা চালিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জয়ী

হলাম—সে কথাটা ভুলে গেছ নাকি? সরিয়ে রেখে দাও পিস্তলটা। আর, কখনও কারুর কাছে ঘুণাক্ষরেও কথাটা বোলো না যেন। জীবন যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কী করে বাঁচতে হয়, সেটা শেখো। জীবনটাকে কাজে লাগাও।'

দাঁড়িয়ে উঠে রাস্তায় গিয়ে পড়ল পাভেল। পথ চলতি একজন পাহাড়ী তাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে পোঁছে দিল। শহরে পোঁছে গাড়ি থেকে সে নেমে গেল। একখানা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে তাতে পড়ল—'দেমিয়ান বেদ্নি' ক্লাবে শহর পার্টি গ্রুপের একটা সভা বসবে। সেদিন অনেক রাত্রে পাভেল বাড়ি ফিরল। সভায় সে বক্তৃতা দিয়েছিল। তখন সে ভাবতেও পারে নি যে বড়ো কোনো সাধারণ সভায় তার এই শেষ বক্তৃতা।

পাভেল যখন বাড়ি ফিরল, তাইয়া তখনও জেগে আছে। পাভেলের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে দুর্ভাবনায় পড়েছিল। মনে পড়ছিল—সকালে পাভেলের দুই চোখে সে কেমন যেন কঠোর আর নিরুত্তাপ একটা চাউনি লক্ষ্য করেছে—যে-চোখ দুটির দৃষ্টি সর্বদাই প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল। উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিল—কী হল ওর? পাভেল কখনও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে ভালোবাসে না, কিন্তু সে যে কোনো-একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে সেটা তাইয়া অনুভব করেছিল।

মার ঘরে ঘড়িটায় যখন দু'টো বাজল, তখন বাইরের দেউড়িটার ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ শুনতে পেল তাইয়া। জ্যাকেটটা চাপিয়ে সে দরজাটা খুলে দেবার জন্যে বেরিয়ে এল। ঘুমন্ত লোলার ঘরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সে এপাশ-ওপাশ করে অস্পষ্ট ভাষায় কী যেন বলে উঠল।

পাভেল ঢুকতেই তাইয়া স্বস্তির সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমার তো ভাবনাই শুরু হয়ে গিয়েছিল।'

'যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার কিছু হবে না, তাইয়া,' ফিসফিসিয়ে বলল পাভেল, 'লোলা ঘুমুচ্ছে? কি জানি কেন, আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না। আমার কিছু বলার আছে তোমায়। চলো, তোমার ঘরে যাই, যাতে লোলার ঘুম ভেঙে না যায়।'

একটু ইতস্তত করল তাইয়া। অনেক রাত হয়ে গেছে। এই গভীর রাত্রে সে কী করে পাভেলকে আসতে দেবে তার ঘরে? মা কী ভাববে? কিন্তু পাভেল পাছে মনে আঘাত পায়, এই আশঙ্কায় সে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। পাভেলের আগে আগে ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল, তাকে কে জানে কী বলবে পাভেল?

'যা বলছিলাম, তাইয়া,' নিচু গলায় বলতে লাগল পাভেল। অন্ধকার ঘরে তাইয়ার মুখোমুখি বসেছে সে, এতো কাছাকাছি বসেছে যে তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে তাইয়া। 'জীবনের গতি এমন অদ্ভুতভাবে মোড় নিচ্ছে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই গত কয়েকদিন ধরে আমার অতি বিশ্রী লাগছিল। কীভাবে যে বাঁচব সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জীবনটাকে আর কখনও এমন অন্ধকার মনে হয় নি। কিন্তু আজ আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত 'রাজনীতিক ব্যুরো'র একটা সভা ডেকেছিলাম এবং সেই সভায় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা বলতে যাচ্ছি, তা শুনে আশ্চর্য হয়ো না যেন।'

গত কয়েক মাস তার কীভাবে কেটেছে সে কথা এবং আজ পার্কে বসে তার মনে যে সব চিন্তা খেলে গেছে তার অনেকটাই সে খুলে বলল তাইয়ার কাছে।

'এই হচ্ছে অবস্থাটা। এবার সবচেয়ে গুরুতর কথাটা বলি। এই পরিবারে ঝড় সবে শুরু হচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে এসে খোলা বাতাসে গিয়ে আমাদের পড়তে হবে—এই গর্ত থেকে যতোটা দূরে চলে যাওয়া সম্ভব। নতুন করে জীবন শুরু করতেই হবে আমাদের। এই লড়াইয়ে একবার যখন আমি যোগ দিয়েছি, তখন এর শেষ পর্যন্ত আমি যাবই। বর্তমানে আমাদের জীবন - তোমার-আমার দু'জনেরই - মোটেই সুখের নয়। এই জীবনে আগুন লাগিয়ে দেব বলে আমি স্থির করেছি। কী বলতে চাচ্ছি, বুঝেছ? তুমি কি আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার স্ত্রী হতে রাজী আছ, তাইয়া?'

তাইয়া এতক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল তার কথা, এই শেষের কথাগুলো শুনে সে চমকে উঠল।

'আমি আজ রাত্রেই তোমার উত্তর জানতে চাচ্ছি না,' বলে চলল পাভেল, 'তোমাকে খুব ভালো করে ভেবে দেখতে হবে কথাটা। তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না যে নিয়ম-মাফিক পূর্বরাগের পালা, প্রেম ইত্যাদি না চালিয়ে, এ ধরনের কথা এমন স্থূলভাবে বলে বসা যায় কী করে। কিন্তু তোমার-আমার মধ্যে ওসব বাজে ব্যাপারের কোনো প্রয়োজন নেই। এই আমি হাত এগিয়ে দিলাম তোমার দিকে। আমায় বিশ্বাস করলে ভুল হবে না তোমার। পরস্পরকে অনেক কিছুই দিতে পারি আমরা। আমি যেটা ভেবে স্থির করেছি, সেটা এবার বলি: যতোদিন না তুমি একজন সত্যিকার মানুষ, একজন যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠছ, ততদিন আমাদের এই বোঝাবুঝি বলবত থাকবে। এ ব্যাপারে যদি আমি তোমায় সাহায্য না করতে পারি, তাহলে জানব আমার এক কানাকড়িও দাম নেই। ততদিন পর্যন্ত আমাদের চুক্তি কিছুতেই ভাঙা চলবে না। কিন্তু তোমার মন যখন পরিণত

হয়ে উঠবে, তখন তুমি সমস্ত রকম বাধ্যবাধকতা থেকে খালাস পেয়ে যাবে। কে জানে কী ঘটবে! একেবারে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যেতে পারি আমি, এবং সে ক্ষেত্রে, মনে রেখো, তুমি আমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছ বলে কিছুতেই মনে করবে না।'

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপরে স্নেহভরা কোমল গলায় আবার বলল, 'আমার বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা এই আমি জানিয়ে রাখলাম তোমায়।'

তাইয়ার আঙুলগুলো সে ধরে রইল, একটা প্রশান্তি অনুভব করল মনে মনে, যেন তাইয়া ইতিমধ্যেই মত দিয়ে দিয়েছে।

'প্রতিজ্ঞা করো, তুমি আমায় কখনও ছেড়ে যাবে না?'

'মুখের কথাটুকুই প্রমাণ নয়, তাইয়া। আমার মতো লোকেরা যে তাদের বন্ধুদের প্রতি কখনও বেইমানি করে না, সেটা বিশ্বাস করো... আসল কথা হল তারাও আমার প্রতি বেইমানি না করুক।' ক্ষোভের সঙ্গে বলল পাভেল।

'আজ রাত্রে আমি তোমায় কোনো উত্তর দিতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বড়ো আকস্মিক,' বলল তাইয়া।

উঠে পড়ল পাভেল।

'শুতে যাও, তাইয়া। ভোর হয়ে আসছে।'

নিজের ঘরে এসে জামা-কাপড় না ছেড়েই পাভেল শুয়ে পড়ল এবং বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পাভেলের ঘরে জানলার পাশে টেবিলটার ওপরে উঁচু হয়ে আছে পার্টি লাইব্রেরি থেকে আনা বই, খবরের কাগজ আর লেখায় ভর্তি কতকগুলো নোট-বইয়ের স্তূপ। একটা খাট, দুটো চেয়ার এবং তার আর তাইয়ার ঘরের মাঝখানের দরজাটার গায়ে টাঙানো ক্ষুদে ক্ষুদে লাল আর কালো নিশান-

চিহ্নিত মস্ত বড়ো একটা চীনের মানচিত্র — এই হচ্ছে ঘরটার যা কিছু আসবাব। স্থানীয় পার্টি কমিটির কমরেডরা পাভেলকে বই আর সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে। কথা হল ওরা শহরের সবচেয়ে বড়ো সাধারণ পাঠাগারের পরিচালককে নির্দেশ দেবে যাতে সে পাভেলকে দরকার মতো যে-কোনো বই পাঠিয়ে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বইয়ের বড়ো বড়ো বাণ্ডিল আসা শুরু হল। পাভেল ভোর থেকে সারা দিন বসে বসে এই বই পড়ে, মাঝে মাঝে নোট নেয়, আর সকাল-সন্ধ্যেয় খাবার সময়ে শুধু সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে পড়া বন্ধ রাখে; তার এই ব্যাপার দেখে লোলা তো একেবারে অবাক হয়ে গেছে। সন্ধ্যেগুলো পাভেল সর্বদা এই দুই বোনের সঙ্গে গল্পসল্প করে কাটায়, সারা দিনে যা পড়েছে তা শোনায় ওদের।

রাত্রি বারোটা বেজে যাবার অনেক পরেও বুড়ো কিউৎসাম তার ওই অবাঞ্ছনীয় ভাড়াটের জানলার খড়খড়ির ফাঁকে আলোর রেখা দেখতে পায়। পা টিপে টিপে জানলার কাছে এগিয়ে এসে সে ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখে টেবিলের ওপরে একটা মাথা ঝুঁকে রয়েছে।

'এতো রাত্রে ভদ্রলোকরা সব যখন ঘুমুচ্ছে বিছানায় শুয়ে. তখন এই লোকটা সারা রাত্রি ধরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। ভাবখানা যেন ও-ই এ বাড়ির কর্তা। ও আসার পর থেকে মেয়ে দুটো তো একেবারেই শাসনের বাইরে চলে গেছে।' মনে মনে গজগজ করতে করতে বুড়ো তার নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

আট বছরের মধ্যে এই প্রথমবার পাভেল এতো অজস্র সময় পেয়েছে এবং এই প্রথম তার হাতে করবার মতো কোনো নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম নেই। সময়ের সদ্ব্যবহারে লেগে

গেছে সে, জ্ঞানের সাধনায় নব-দীক্ষিতের আগ্রহ-ঔৎসুক্য নিয়ে বই পড়ে চলেছে। দিনে আঠারো ঘণ্টা পড়াশোনা করে সে। তার শরীর যে এ চাপ আর কতোদিন সইত বলা যায় না, কিন্তু একদিন তাইয়ার একটা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে সবকিছু বদলে গেল।

'তোমার-আমার ঘরের মাঝখানে দরজায় ঠেকা-দেওয়া ওই টানা-আলমারিটা আমি সরিয়ে নিয়েছি। যদি কোনো সময়ে আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়, তাহলে সোজা চলে এসো আমার ঘরে। লোলার ঘরের মধ্যে দিয়ে আসার দরকার নেই।'

পাভেলের গাল রক্তিম হয়ে উঠল। সুখের হাসি হাসল তাইয়া। ওদের মধ্যে চুক্তিটা সম্পাদিত হয়ে গেল।

কিউৎসাম বুড়ো ইদানীং আর ওই কোণের ঘরের খড়খড়ি-ফেলা জানলার ফাঁকে আলোর রেখাটা দেখতে পায় না, আর তাইয়ার মা লক্ষ্য করতে শুরু করেছে তার মেয়ের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে-ওঠা একটা সুখানুভূতির দীপ্তি, যেটাকে তাইয়া গোপন করতে পারছে না। তার চোখের কোলে কালিমার আবছা আভাস দেখে বিনিদ্র রাত্রিগুলির কথা বোঝা যায়। আজকাল প্রায়ই এই ছোট্ট বাড়িটায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে তাইয়ার গানের সুর আর গিটারের ঝঙ্কার।

কিন্তু তাইয়ার এই সুখ নিরুপদ্রব নয়। পাভেলের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এই যে গোপনীয়তা, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার নবজাগ্রত নারীত্ব। যে-কোনো শব্দেই চমকে ওঠে সে, মার পায়ের শব্দ শুনেছে বলে মনে হয়। যদি মা কিংবা লোলা জিজ্ঞেস করে বসে যে সে ইদানীং তার ঘরের অন্য দরজাটা ছিটকিনি এ'টে বন্ধ করে রাখে কেন—

তাহলে কী জবাব দেবে? চিন্তাটা পীড়া দিচ্ছিল তাকে। তাইয়ার আশঙ্কাটা লক্ষ্য করে পাভেল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

'ভয়টা কিসের তোমার?' কোমল গলায় বলে সে, 'আর যাই হোক, তুমি আর আমি তো আমাদের জীবনের কর্তা। ঘুমোও শান্ত হয়ে। কেউ আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।'

তারপর, নিরুদ্বেগ মনে তাইয়া পাভেলের বুকের ওপরে মুখ রেখে, দুই হাতে তার ভালোবাসার মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। আর, পাভেল জেগে থেকে শোনে তার নিঃশ্বাসের নিয়মিত শব্দ, অনড় হয়ে সে পড়ে থাকে যাতে তাইয়ার ঘুমে ব্যাঘাত না হয়; এই যে মেয়েটি পরম নির্ভরতায় তার জীবনটাকে তুলে দিয়েছে ওর হাতে, তার প্রতি একটা নিবিড় স্নেহে আবিষ্ট হয়ে যায় ওর সমগ্র সত্তা।

তাইয়ার চোখে এই জ্বলজ্বলে দীপ্তি ফুটে ওঠার কারণটা লোলাই প্রথম আবিষ্কার করল। এবং, সেইদিন থেকে দুই বোনের মধ্যে একটা ব্যবধানের ছায়া নেমে এল। শিগগিরই মাও জেনে গেল, কিংবা বলা যেতে পারে, আন্দাজ করে নিল। দুর্ভাবনায় পড়ল আলবিনা—করচাগিনের কাছ থেকে সে এটা আশা করে নি।

লোলার কাছে আলবিনা বলল, 'তাইয়া তো ওর বউ হবার মতো মেয়ে নয়। কী হবে শেষ পর্যন্ত কি জানি!'

দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আলবিনা, কিন্তু করচাগিনকে কিছু বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না সে।

স্থানীয় তরুণতরুণীর দল পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে আসা শুরু করেছে। মাঝে মাঝে ওদের সবাইকে একসঙ্গে পাভেলের ঘরে বসাবার মতো জায়গা কুলোয় না বলতে

গেলে। মৌমাছির চাকের গুঞ্জনের মতো ওদের গলার আওয়াজ এসে পেঁছায় বুড়ো কিউৎসামের কানে। প্রায়ই ওদের গলামেলানো গান শুনতে পায় সে:

> সদাই নির্জন এই মোদের সাগর,
> রাত্রিদিন শুনি তার রোষরুষ্ট স্বর .

আর, পাভেলের সেই প্রিয় গানটি:

> চোখের জলে ভিজে গেছে তামাম দুনিয়াটা...

প্রচার সংক্রান্ত কিছু কাজ করবার জন্যে পাভেল চিঠি লিখে পীড়াপীড়ি করতে থাকায় পার্টি কমিটি তার ওপরে তরুণ শ্রমিকদের পাঠ-চক্রটা পরিচালনা করার ভার দিয়েছে।

আরেকবার সে শক্ত দুই হাতে হাল চেপে ধরেছে এবং তার জীবনতরীখানা বারকতক বিপজ্জনক রকমে টলমল করে ওঠার পর এখন আবার একটা নতুন পথ কেটে চলেছে নির্দিষ্ট গতিতে। পড়াশোনা আর জ্ঞান-সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে পাভেলের আবার পার্টি কর্মীদের মধ্যে ফিরে আসার স্বপ্নটা সফল হতে চলেছে।

কিন্তু জীবন পাভেলের চলার পথে একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করেই চলেছে এবং এই প্রত্যেকটা বাধা তার লক্ষ্যে পেঁছানোর পথে কতটা করে দেরি করিয়ে দিচ্ছে ভেবে সে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

একদিন জর্জ, সেই বদনসীব ছাত্রটি মস্কো থেকে এসে হাজির হল সঙ্গে এক বউ নিয়ে। সে এসে উঠল তার উকিল শ্বশুরের বাড়ি এবং সেখান থেকে টাকার জন্যে মার ওপরে দারুণ তাগিদ দিতে থাকল।

কিউৎসাম-পরিবারে যে ফাটল ধরেছিল, জর্জ আসার ফলে সেটা আরও বেড়ে গেল। বিনা দ্বিধায় জর্জ তার বাবার পক্ষ

নিল। তার স্ত্রীর পরিবারের লোকজনদের মনোভাবটা খানিকটা সোভিয়েত বিরোধী —এদেরই সহযোগিতায় সে নানান ফন্দি খাটিয়ে করচাগিনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে এবং তাইয়া যাতে তাকে ছেড়ে আসে তার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

লোলা আরেকটা শহরে একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ায়, জর্জের এসে পৌঁছানোর দু'সপ্তাহ বাদে সে তার বাচ্চা ছেলেটিকে আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে চলে গেল। এর দিন কতক বাদেই পাভেল আর তাইয়া চলে গেল দূরে সমুদ্রের ধারে একটা শহরে।

আর্তিওম তার ভাইয়ের কাছ থেকে বড়ো একটা চিঠিপত্র পায় না। কিন্তু সেই সব অতি-বিরল ক্ষেত্রে, যখনই সে শহর সোভিয়েতের দপ্তরে তার ডেস্কের ওপরে পরিচিত হস্তাক্ষরে নিজের নাম লেখা খামখানা তার অপেক্ষায় রয়েছে দেখতে পায়, তখনই আবেগে তার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে। আজও সে খামখানা খুলতে খুলতে সস্নেহে ভাবল মনে মনে, 'আহা, পাভেল, তুই যদি আমার আরও কাছাকাছি থাকতিস! নানা বিষয়ে তোর পরামর্শ পেলে আমার ভারি সুবিধে হতো, ভাই।'

চিঠিখানা পড়তে লাগল সে।

'আর্তিওম, সম্প্রতি আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, সে সব তোমায় জানাবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। এসব কথা আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে লিখি না। আমি জানি, একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করে এসব কথা খুলে বলা যায়। কারণ, তুমি আমাকে জানো বলেই কথাগুলো বুঝবে।

'স্বাস্থ্যের দিক থেকে জীবন আমাকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ক্রমাগত পেড়ে ফেলছে। একটা আঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে উঠে দাঁড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও আরো নির্মম আঘাত এসে আমাকে ফের পেড়ে ফেলছে। আমার আর প্রতিরোধের শক্তি নেই, এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার। প্রথমে আমার বাঁহাতখানার সমস্ত শক্তি খুইয়ে বসলাম। কিন্তু, এতেও যেন দুর্ভোগের পরিমাণটা যথেষ্ট হল না; তাই, এবারে দুই পায়ের জোরও এমনিতেই গেল। কোনোরকমে হাঁটাহাঁটিটুকু করতে পারছিলাম (ঘরের সীমানার মধ্যেই অবশ্য), কিন্তু এখন বিছানা থেকে টেবিলটার কাছ পর্যন্ত পেঁছতে আমার কষ্ট হয়। এবং অবস্থাটা যে এর চেয়েও খারাপ দাঁড়াবে, তা জানি। আগামীকাল যে আমার অবস্থা কী দাঁড়াবে তা কেউ জানে না।

'ইদানীং আর আমার বাড়ির বাইরে একেবারে যাওয়া হয় না। আমার জানলা দিয়ে সমুদ্রের ছোট্ট একটা টুকরো মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেহ-মনের এই যে বিরোধ, মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি আর কি হতে পারে?— বিশ্বাসঘাতক দেহটা প্রতি পদে আমাকে মেনে চলতে অস্বীকার করে বসছে, অথচ মনটা আমার একজন বলশেভিকের—এমন একজন বলশেভিকের, যে কাজ করার জন্যে একান্ত উদ্‌গ্রীব, সংগ্রামী সৈনিকদের সারিতে, তোমরা যারা গোটা লড়াইয়ের মোর্চা-জুড়ে এগিয়ে চলেছ নিদারুণ তুষার-ঝঞ্ঝার মতো, তাদেরই পাশাপাশি থাকাই যার একমাত্র কামনা।

'আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, কর্মিদলের মধ্যে আমি আবার ফিরে যাব, সৈনিকদের সারিতে গিয়ে আমিও

জায়গা নেব, বেয়নেট বাগিয়ে ধরব শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে। এ বিশ্বাস আমাকে রাখতেই হবে, না-রাখার কোনো অধিকারই আমার নেই। দশ বছর ধরে পার্টি আর কমসোমল আমাকে লড়াই করতে শিখিয়েছে এবং আমাদের সবাইকে উদ্দেশ করে আমাদের নেতা যা বলে গেছেন, তা আমার পক্ষেও সমানই প্রযোজ্য: 'বলশেভিকরা জয় করে নিতে পারে না এমন কোনো দুর্গ নেই।'

'ইদানীং পুরোপুরি পড়াশোনার মধ্যে দিয়েই আমার জীবনটা কাটছে। শুধু বই আর বই। অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি, আরতিওম। সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্য ভালো করে অনুশীলন করেছি। বাড়িতে বসে চিঠিপত্রের মারফতে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার যে ব্যবস্থা আছে, আমি সেটার প্রথম বছরের পরীক্ষায় পাশ করেছি। বিকেলের দিকে তরুণ কমিউনিস্টদের একটা পাঠ-চক্র পরিচালনা করছি। পার্টি সংগঠনের প্রত্যক্ষ কর্মজীবনের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এই তরুণ কমরেডরা। আর আছে তাইয়ার মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার বিষয়টা আর আমার এই স্নেহময়ী স্ত্রীর ভালোবাসা আর সাদর পরিচর্যা। আমরা দু'জনে বড় বন্ধু। খুব সাদাসিধেভাবে সংসার চলে আমাদের—আমার পেনশনের বত্রিশ রুবল আর তাইয়ার রোজগার মিলিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে আমাদের। যে পথ বেয়ে আমি পার্টিতে এসেছি, তাইয়াও সেই পথেই এগুচ্ছে: ও কিছু দিন একটা বাড়িতে ঝির কাজ করেছে, এখন একটা ভোজনাগারে ডিশ্‌ ধোয়ার কাজ নিয়েছে (এই শহরে কোনো কলকারখানা নেই)।

'সেদিন ও আমাকে ভারি গর্বের সঙ্গে মহিলা বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া ওর প্রথম পরিচয়পত্রখানা দেখাচ্ছিল। এটা ওর কাছে শুধু একটা কাগজের টুকরোমাত্র নয়। ওর মধ্যে আমি এক নতুন নারীর জন্ম দেখতে পাচ্ছি এবং এই জন্মপ্রক্রিয়ায় আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করছি। কখনও বড়ো কোনো কারখানায় ও কাজ করবে, সেখানে কাজের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ শ্রমিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে ও সুপরিণত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর পক্ষে এখানে যেটুকু করা সম্ভব, সেইটেই করছে ও।

'তাইয়ার মা দু'বার এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে। নিজের অজানতেই সে তাইয়াকে আবার তুচ্ছতায় ভরা, সংকীর্ণ স্বার্থপর জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমি আলবিনাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে তার মেয়ে যে-পথ বেছে নিয়েছে, সেই পথটাকে সে যেন তার নিজের ভাগ্যহত অতীত জীবনের ছায়া ফেলে অন্ধকারে ঢেকে না দেয়। কিন্তু কোনো ফল হয় নি তাতে। আমার মনে হচ্ছে, একদিন না একদিন মা এসে তার মেয়ের পথরোধ করে দাঁড়াবে, আর, তখন একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।

'তোমার হাতখানা চেপে ধরলাম।

তোমার পাভেল।'

'পুরনো মাৎসেস্তা'য় পাঁচ-নম্বর স্বাস্থ্যনিবাস... পাহাড়ের গা খুঁড়ে একটা তাক-মতো বের করে নেওয়া হয়েছে. তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এই তিনতলা ইঁটের বাড়িটা। চারিদিকে ঘন বন। প্যাঁচালো পাক খেয়ে একটা রাস্তা নেমে গেছে

নিচে। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে বাতাস বয়ে আনছে খনিজ জলের ফোয়ারাগুলোর গন্ধকের ঘ্রাণ। পাভেল করচাগিন একা রয়েছে এই ঘরে। কাল নতুন রোগীরা এলে সে এই ঘরে একজন সঙ্গী পাবে। জানলার বাইরে পায়ের শব্দ আর পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেল সে। জনকতক লোক কথাবার্তা বলছে। কিন্তু পাভেল এই গভীর খাদের গলাটা কোথায় শুনেছে যেন আগে? স্মৃতির গহনে চাপা পড়ে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসা, কিন্তু অ-বিস্মৃত একটি নাম ফুটে উঠল তার মনের পটে: 'লেদেনেভ ইন্নকেন্তি পাভ্‌লভিচ, ও ছাড়া আর কেউ নয়!' রীতিমত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পাভেল ডাকল তার বন্ধুকে, আর, এক মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল--লেদেনেভ বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সোৎসাহে করমর্দন করছে।

'তাহলে করচাগিন দেখছি এখনও চালিয়ে যাচ্ছ, অ্যাঁ? আচ্ছা, নিজের পক্ষ থেকে কী তোমার বলার আছে বলো দিকি? অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার জন্যে তুমি যে সত্যিই উঠে-পড়ে লেগে গেছ, এমনটা তো নয় নিশ্চয়ই! ও সব চলবে না! আমার উদাহরণটা অনুসরণ করা উচিত তোমার। আমাকেও ডাক্তাররা তাকের ওপর তুলে রাখতে চেয়েছিল—কিন্তু ওদের মুখে ছাই দিয়ে এই আমি দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি।' বলতে বলতে ভারি আমোদের হাসি হেসে উঠল লেদেনেভ। কিন্তু এই হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আর দুঃখটা অনুভব করল পাভেল।

দু'ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাল তারা। মস্কোর সমস্ত সাম্প্রতিক খবরাখবর পাভেলকে জানাল লেদেনেভ। কৃষিতে যৌথখামারের প্রবর্তন আর গ্রামজীবনকে নতুন করে সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে পার্টি যে সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে

তার কাছ থেকেই সেগুলো পাভেল এই প্রথম শুনল। গভীর আগ্রহের সঙ্গে লেদেনেভের প্রত্যেকটি কথা যেন মনের মধ্যে গেঁথে নিল সে।

'আমি তো এদিকে ভাবছিলাম, তোমার দেশ ইউক্রেনের কোনো জায়গায় গিয়ে হয়ত তুমি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেছ,' বলল লেদেনেভ, 'তুমি আমায় হতাশ করলে দেখছি। আচ্ছা, যাকগে। আমার অবস্থা তো আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিলাম শয্যাশায়ী থাকতে হবে সারা জীবনই, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ, এখনও খাড়া আছি আমি। ইদানীং আর শান্তভাবে নিরুপদ্রবে দিন কাটাবার কোনো উপায় নেই। মোটেই চলবে না তাহলে! স্বীকার করতেই হবে: মাঝে মাঝে স্রেফ একটু দম নেবার জন্যে সামান্য দিন কয়েকের মতো জিরিয়ে নিলে যে কি চমৎকার হত, সেই চিন্তাটা আমাকে পেয়ে বসে। আর যাই হোক, আমার তো আর আগেকার মতো বয়েস নেই, দৈনিক দশ থেকে বারো ঘণ্টা করে কাজ করাটা মাঝে মাঝে আমার পক্ষে একটু কঠিন হয়েই দাঁড়ায়। তা, এসব কথা একটু-আধটু ভাবতে ভাবতে বোঝাটাকে একটু হাল্কা করে নেবার চেষ্টাও করে থাকি মাঝে মাঝে, কিন্তু ফের সেই একই অবস্থা দাঁড়ায়। কখন্ যে আবার সেই এক-গলা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে রাত্রি বারোটার আগে বাড়ি ফেরার ফুরসত পাওয়া যায় না। যন্ত্রটা যতোই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তার চাকাগুলোও ততোই জোরে ঘোরা শুরু করেছে, আর আমাদের পক্ষে ততোই দিন দিন গতিটা বেড়ে চলেছে যাতে কি-না আমাদের এই বুড়ো-বয়েসীদের স্রেফ জোয়ান-বয়েসীদের মতো না থেকে উপায় নেই।'

উঁচু কপালটার ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে লেদেনেভ

বাবার মতো করে বলল, 'আচ্ছা, এবার তোমার নিজের কথা বলো।'

লেদেনেভের সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পর যা যা ঘটেছে, পাভেল তার একটা বিবরণ দিয়ে গেল। বলতে বলতে অনুভব করল — তার বন্ধুর সহানুভূতিভরা দুই চোখে সমর্থনের চাউনি।

বারান্দাটার এক কোণে ডালপালা-ছড়ানো গাছগুলোর ছায়ার নিচে একটা ছোট টেবিলের চারধারে স্বাস্থ্যনিবাসের একদল রোগী বসে আছে। ওদের মধ্যে একজন তার ঘন ভুরুজোড়া কুঁচকে 'প্রাভদা' পড়ছে। তার গায়ে কালো রাশিয়ান শার্ট, মাথায় জীর্ণ পুরনো ক্যাপ, না-কামানো মুখ আর গভীর গর্তের মধ্যে বসে-যাওয়া নীল চোখ দেখেই বোঝা যায় সে একজন বহুদিনের অভিজ্ঞ খনি-মজুর। বারো বছর হয়ে গেল — খ্রিসান্ফ্ চের্নকজভ খনির কাজ ছেড়ে এসে একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে বহাল হয়েছে, কিন্তু তবু তাকে দেখে মনে হয় যেন সে সবে খনির খাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার হাবভাব, চলা-ফেরা, কথা বলার ভঙ্গি সব কিছুর মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার পেশাটা।

চের্নকজভ প্রাদেশিক পার্টি ব্যুরোরও সভ্য। একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তার শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছে: ঘৃণা করে চের্নকজভ তার 'গ্যাংগ্রিন'-দুষ্ট পা-টাকে, যার জন্যে সে আজ প্রায় ছ'মাস হতে চলল শয্যাশায়ী হয়ে আছে।

তার সামনে বসে চিন্তাচ্ছন্নভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ঝিগিরেভা — আলেক্সান্দ্রা আলেক্সেয়েভনা ঝিগিরেভা — সাঁইত্রিশ বছরের এই মহিলাটি উনিশ বছর ধরে পার্টি সভ্য। পিটার্সবুর্গের গুপ্ত-আন্দোলনের কমরেডরা তার নাম

দিয়েছিল—'ধাতু-মজুরনী শুরোচ্কা'। সাইবেরিয়ায় যখন সে নির্বাসিত হয়, তখন সে ছিল প্রায় বালিকা-বয়েসী।

এই দলের তিন-নম্বর সভ্য পান্কভ। পাশের দিক থেকে দেখতে যেন খোদাই করা তার মুখখানা। তার সুন্দর চুলওয়ালা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে একটা জার্মান পত্রিকার ওপরে। শিঙের ফ্রেমওয়ালা তার বিরাট চশমাটা ঠিক মতো বসিয়ে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে সে হাত তুলছে। ত্রিশ বছর-বয়েসী, ব্যায়ামবিদের মতো সুগঠিত-দেহ এই যুবকটি যখন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট তার পাটা টেনে টেনে চলা-ফেরা করে তা তখন দেখে কষ্ট হয়। পানকভ একজন লেখক এবং সম্পাদক, শিক্ষার জনকমিশারিয়েটে কাজ করে। সে ইউরোপ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ এবং গোটাকতক বিদেশী ভাষা জানে। রীতিমত পণ্ডিত লোক সে—এমন কি, গম্ভীর প্রকৃতির চের্নকজভ পর্যন্ত তাকে খুব সমীহ করে চলে।

'এই বুঝি তোমার ঘরের সঙ্গী?' পাভেল করচাগিন যে-চেয়ারটায় বসে আছে, সেদিকে মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে ঝিগিরেভা জিজ্ঞেস করল চের্নকজভ্কে।

চের্নকজভ খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কুঁচ্কানো ভুরু জোড়া মসৃণ হয়ে গেল, 'হ্যাঁ, ওই করচাগিন। ওর সঙ্গে আলাপ করে নিন, শুরা। ব্যায়রামটা ওকে ভারি কাবু করে ফেলেছে—বড়ো ক্ষোভের কথা। তা নইলে ছেলেটা খুব শক্ত শক্ত জায়গায় আমাদের খুবই কাজে লাগতে পারত। কমসোমলের একেবারে গোড়ার দলের ও একজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওকে যদি আমরা সাহায্য করি—এবং সে সাহায্য আমি ওকে করব বলেই মনস্থ করেছি—তাহলে ও এখনও কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

পান্কভও শুনছিল চের্নকজভের কথাগুলো।

'ওর অসুখটা কী?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল শুরা ঝিগিরেভা।

'গৃহযুদ্ধের সময়কার জের আর কি। মেরুদণ্ডের কি একটা ব্যায়রাম। আমি এখানকার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি তো বললেন ওর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বেচারি!'

শুরা বলল, 'আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসি এখানে।'

এইভাবে ওদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল। পাভেল তখন জানত না যে ঝিগিরেভা আর চেরুনকজভ তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠবে এবং ব্যাধির ভারে আক্রান্ত তার ভবিষ্যৎ জীবনে এরাই হবে তার প্রধান অবলম্বন।

আগেকার মতোই বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। তাইয়া কাজ করছে আর পাভেল পড়াশোনা করে চলেছে। পাঠচক্রগুলোর কাজটা শুরু করামাত্রই আরেকটা নিদারুণ বিপত্তি এসে তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। তার দুটো পাই সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। এখন শুধু ডানহাতখানাই সে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করতে পারবে। বারবার চেষ্টা করার পর যখন সে বুঝল যে তার আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই, তখন ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল। তাইয়া যে পাভেলকে সাহায্য করতে অক্ষম, এই কথাটা মনে হতেই তাইয়া হতাশা-মেশানো তীব্র একটা ক্ষোভ অনুভব করল, কিন্তু বীরত্বের সঙ্গে এই হতাশা আর বিক্ষোভটাকে চেপে গেল। পাভেল ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'এবারে আমাদের ভিন্ন হয়ে যেতে হবে, লক্ষ্মীটি। আমাদের চুক্তির মধ্যে আর-যাই থাক, এটা তো আর ছিল না। কথাটা আজ আমি একবার ভালো করে ভেবে দেখব।'

কিন্তু তাইয়া তাকে আর কোনো কথা বলতে দেবে না। চোখের জল আর চেপে রাখতে না পেরে পাভেলের বুকে মুখ গুঁজে কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল সে।

আরতিওম তার ভাইয়ের এই সাম্প্রতিকতম বিপত্তির কথাটা জানতে পেরে মাকে চিঠি লিখল। মারিয়া ইয়াকোভ্লেভনা সবকিছু ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে চলে এল ছেলের কাছে। এখন থেকে তারা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে লাগল। তাইয়া এবং এই বৃদ্ধাটি প্রথম থেকেই পরস্পরকে ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

সমস্ত রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও পাভেল এরই মধ্যে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

শীতকালে একদিন সন্ধ্যের দিকে তাইয়া বাড়ি ফিরে এল তার প্রথম জয়ের খবর নিয়ে: শহর সোভিয়েতে নির্বাচিত হয়েছে সে। এর পর থেকে পাভেল খুব কমই তার দেখা পায়। স্বাস্থ্যনিবাসের রান্নাঘরে তাইয়া কাজ করে, সেখানে তার সারাদিনের কাজের শেষে সোজা সে যায় শহর সোভিয়েতের দপ্তরে, আর অনেক রাত্রে ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে, কিন্তু অনেক কিছু নতুন ধারণা মাথায় নিয়ে। শিগগিরই সে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত করবে এবং সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটির জন্যে আগ্রহভরা আশা নিয়ে সে প্রস্তুত হচ্ছে। এমন সময়ে দুরদৃষ্ট আরেকটা আঘাত হানল। পাভেলের ক্রমবর্ধমান ব্যায়রামটা ধীরে ধীরে তার কাজ চালিয়ে আসছিল। হঠাৎ একটা অসহ্য জ্বালা ধরানো যন্ত্রণা তার ডান চোখটাকে যেন ছুঁচ দিয়ে বিঁধতে লাগল। বাঁ চোখের কাছ পর্যন্ত যন্ত্রণাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকল। চারপাশের সমস্ত কিছুকে আড়াল করে দিয়ে একটা কালো পর্দা নেমে এল এবং

পরিপূর্ণ দৃষ্টিহীনতার ভীষণতা পাভেল জানল জীবনে এই প্রথম।

নিঃশব্দে এই নতুন বাধাটা এসে তার পথ রুখে দাঁড়িয়েছে— অলঙ্ঘনীয় ভয়ঙ্কর এ বাধা। এই ব্যাপারটা তাইয়াকে আর মাকে নিদারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন করে দিল। কিন্তু পাভেল তুহিন-শীতল একটা শান্ত মনোভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, 'আমাকে অপেক্ষা করে থেকে দেখে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে। সত্যিই যদি আর এগুবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, কর্মিদলের মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে আমার সমস্ত চেষ্টা যদি এই দৃষ্টিহীনতার ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই সবকিছু চুকিয়ে ফেলতেই হবে আমায়।'

পাভেল তার বন্ধুদের চিঠি লিখল আর জবাবে তারা তাকে উৎসাহ জোগাল সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্যে।

এই নিদারুণ লড়াইটা চলতে থাকার সময়ে একদিন তাইয়া বাড়ি ফিরে এসে উজ্জ্বল মুখে ঘোষণা করল, 'আমি এখন পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী, পাভ্‌লুশা।'

যে মিটিং-এ তার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে, সেই আলোচনা-বৈঠকের একটা উত্তেজিত বিবরণ দিয়ে গেল তাইয়া — শুনতে শুনতে পাভেলের মনে পড়ল পার্টির ভেতরে তার নিজের প্রথম পদক্ষেপের কথাটা।

তাইয়ার হাতখানা জোরে চেপে ধরে সে বলল, 'তাহলে, কমরেড করচাগিনা, তুমি আর আমি দুজনে এখন থেকে একটা 'পার্টি ফ্র্যাক্‌শন' হলাম।'

পরের দিন পাভেল জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদককে একটা চিঠি লিখল — সে যেন একবার এসে তার সঙ্গে দেখা করে। সেই দিনই বিকেলের দিকে সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে-লাগা একটা গাড়ি বাড়িটার বাইরে এসে থামল এবং এক

মিনিট বাদেই দেখা গেল জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক ভোলমের পাভেলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মাঝ-বয়েসী একজন লাতভিয়ান এই ভোলমের, আকর্ণ-বিস্তৃত তার দাড়ি।

'আচ্ছা, আছো কেমন? তোমার এরকম ব্যবহারের মানেটা কী, অ্যাঁ? খাড়া হয়ে যাও দেখি, আমরা তোমায় এক্ষুণি গ্রামের দিকে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' হাল্কা হাসির সঙ্গে সে বলে উঠল।

তার যে একটা সভায় উপস্থিত থাকার কথা, সেটা একদম ভুলে গিয়ে দু'ঘণ্টা রইল সে পাভেলের কাছে। কাজ পাবার জন্যে পাভেলের আবেগদীপ্ত আবেদন শুনতে শুনতে সে ঘরটায় পায়চারি করল।

পাভেলের বলা শেষ হয়ে গেলে সে বলল, 'পাঠ-চক্রের কথা-টথা এখন বন্ধ করো। বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। আর, তোমার ওই চোখ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে আমাদের। এখনও হয়তো কিছু একটা করা সম্ভব। মস্কোতে গিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ চোখের ডাক্তারকে দেখালে কেমন হয়? তুমি ভেবে দেখো এটা...'

তার কথায় বাধা দিল পাভেল, 'আমি চাই মানুষের মধ্যে থাকতে, কমরেড ভোলমের, রক্তমাংসে গড়া মানুষদের মধ্যে! আগের চেয়ে এখনই এটা আমার আরও বেশি দরকার। একা একা থাকতে পারব না আমি। আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তরুণদের, যাদের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে কম। গ্রামে গ্রামে ওরা একটু বেশিরকম বাঁয়ে ঝুঁকছে — যৌথখামারের পরিধি যথেষ্ট নয় মনে করে ওরা কমিউন সংগঠিত করে তুলতে চাচ্ছে। কমসোমলদের জানো তো, ওদের যদি না সামলাও, তাহলে সারি ভেঙে ছুটে অতিরিক্ত এগিয়ে যেতে চাইবে ওরা। আমি নিজেই এইরকম ছিলাম এককালে।'

ভোলমের তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এসব খবর জানলে কি করে? সবে তো আজ ওরা জেলা থেকে খবর এনেছে।'

হাসল পাভেল, 'আমার স্ত্রী বলেছে। তোমার বোধহয় মনে আছে তাকে? গতকাল তাকে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।'

'করচাগিনার কথা বলছ নাকি — ওই যে ডিশ্ ধোয়, সেই মেয়েটি? তোমার স্ত্রী! তা তো জানতাম না!' দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপর মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে যেতেই কপালের ওপরে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আচ্ছা, কাকে তোমার কাছে পাঠাব, বলি শোনো: লেভ বের্সেনেভ। ওর চেয়ে ভালো কমরেডের সঙ্গ কামনা আর করতে পারবে না তুমি। ও একেবারে তোমার মনের মতো মানুষ, তোমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি দুটো ট্রান্সফর্মারের মতো। এককালে আমি ইলেকট্রিশিয়ান ছিলাম জানো, তাই প্রায়ই এই বিশেষ বিশেষ শব্দ বলি। লেভ তোমার জন্যে একটা রেডিও-সেট বানিয়ে দেবে — ও এসব কাজে খুব ওস্তাদ। আমি তো ওর ওখানে প্রায়ই রাত্রি দুটো পর্যন্ত কানে ওই ইয়ার-ফোন লাগিয়ে বসে থাকি। আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সত্যি সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছিল — ওই অতো রাত্রে বাড়ি ফেরার মানেটা কী, সে সম্বন্ধে কৈফিয়ত দাবি করে বসেছিল।'

হাসল করচাগিন।

'বেরসেনেভ কে?' জিজ্ঞেস করল সে।

পায়চারি থামিয়ে বসে পড়ল ভোলমের, 'ও আমাদের একজন উকিল। কিন্তু আসলে, এই আমি যেমন ব্যালে-নাচিয়ে ও তেমনি উকিল। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত ও একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিল। ১৯১২ থেকে বৈপ্লবিক

আন্দোলনের মধ্যে আছে, অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকে পার্টি সভ্য। গৃহযুদ্ধের সময় দু'-নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মির বিপ্লবী আদালতে কাজ করেছে, তখন ককেশাসে শ্বেতরক্ষী পরজীবীদের খতম করা হচ্ছিল। ও আবার সারিৎসিনেও, দক্ষিণ যুদ্ধ-ফ্রণ্টেও। তারপর কিছুদিন দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সামরিক আদালতের সভাপতি হল। ওখানে ও ছিল বড়ো কষ্টের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মায় ধরে ওকে। দূর প্রাচ্যের কাজ ছেড়ে এখানে এই ককেশাসে চলে আসে। প্রথমে ও প্রাদেশিক আদালতের সভাপতি হিসেবে, তারপর প্রাদেশিক আদালতের সহ-সভাপতি হিসেবে কাজে লাগে। তারপর ফুসফুসের ব্যায়রাম একেবারে কাবু করে ফেলল ওকে। ব্যাপার দাঁড়াল—হয় ওকে এখানে এসে চুপচাপ বিশ্রাম নিতে হবে, আর না হয় পঞ্চত্ব পেতে হবে। অতএব এইভাবে আমরা এমন একজন বিশিষ্ট উকিল পেয়ে গেছি। কাজটিও বেশ দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট ধরনের—ওর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ। যাই হোক, এখানকার লোকে তো ক্রমে ক্রমে ওকে টেনে আনল একটা গ্রুপের মধ্যে। তার পরেই ও জেলা কমিটিতে নির্বাচিত হয়ে গেল, একটা রাজনীতিক ইস্কুলের ভার দিল ওকে, তারপর নিয়ন্ত্রণ কমিশনেও এনে বসিয়ে দিয়েছে। যে কোন গোলমেলে ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কমিশন নিযুক্ত হলেই ও সেই সব কমিশনের অবধারিত সভ্য। এই সব ছাড়াও, ও আবার শিকারে বেরোয়, দারুণ রেডিও-বাতিকগ্রস্ত এবং ওর যে মাত্র একটা ফুসফুস, তুমি ওকে দেখে সেটা বিশ্বাসই করতে পারবে না। প্রচণ্ড উদ্যমে একেবারে ফেটে পড়ছে। ও যদি মারা যায়, তাহলে নিশ্চয় জেলা কমিটি থেকে আদালতে যাবার পথের মাঝখানে কোথাও মারা পড়বে।'

ভোলমেরকে থামিয়ে দিয়ে পাভেল তীক্ষ্ম স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে এতোগুলো বোঝা তোমরা ও'র ঘাড়ে চাপিয়েছ কেন? উনি তাহলে তো এখানে এসে আগের চেয়ে বেশিই কাজ করছেন!'

দুষ্টুমি-ভরা চোখে ভোলমের তাকাল তার দিকে, 'আর, আমি যদি তোমাকে একটা পাঠ-চক্রের আর অন্য কিছু একটা কাজের ভার দিই, তাহলে লেভ বের্সেনেভ-ও ঠিক এই রকমই এসে বলবে, 'এতোগুলো বোঝা কি করচাগিনের ঘাড়ে না চাপালেই নয়?' কিন্তু নিজের বেলায় ও বলে, পাঁচ বছর হাসপাতালে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার চেয়ে এক বছর খুব জোরদার রকমের কাজ চালিয়ে যাওয়াটা ওর ঢের পছন্দসই। দেখে-শুনে তো মনে হচ্ছে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার আগে আর আমাদের নিজেদের লোকজনদের সম্বন্ধে ঠিকমতো নজর দিয়ে উঠতে পারব না।'

'কথাটা ঠিক -- আমিও পাঁচ বছরের বদ্ধতার চেয়ে এক বছরের সক্রিয় জীবন ঢের বেশি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা অত্যন্ত অন্যায় রকমে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটাই। এখন আমি বুঝি যে, এটা বীরত্বের লক্ষণ ততোটা নয় যতোটা স্বতঃস্ফূর্ততা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার লক্ষণ। এখন এই এতোদিনে আমি বুঝতে শুরু করেছি যে, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন নির্বোধের মতো অসাবধান হবার কোনো অধিকারই আমার ছিল না। এখন দেখতে পাচ্ছি যে তার মধ্যে বীরত্বের কিছুই নেই। ওই ভ্রান্ত আত্মোৎসর্গের ধারণাটা যদি আমার মাথায় না থাকত, তাহলে আরো গোটাকতক বছর বেশি টিকতে পারতাম। অর্থাৎ, বামপন্থার শিশু রোগ আমার একটা প্রধান বিপদ।'

'এখন এই সব কথা ও বলছে বটে,' মনে মনে ভাবল ভোলমের, 'কিন্তু পায়ের ওপর একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতে দাও, দেখবে কাজ ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেছে ছেলেটা।' কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে।

পরের দিন বিকেলে লেভ বের্‌সেনেভ এল। মাঝরাত্রি হয়ে গেল তার পাভেলের কাছ থেকে বিদায় নিতে। একটি ভাই পেয়েছে -- এরকম একটা মনোভাব নিয়ে সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে ফিরল সে।

পরের দিন সকালে করচাগিনের ঘরের ছাদে বেতারের এরিয়েলের খুঁটি আর তার লাগানো হল। ঘরের মধ্যে তখন লেভ তার অতীত জীবনের নানান কৌতূহল-জাগানো ঘটনার কাহিনী পাভেলকে বলতে বলতে রিসিভিং-সেটটা ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। পাভেল তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তাইয়া তার যে-বর্ণনা দিয়েছে, তার থেকে পাভেল তার চেহারাটা বুঝে নিয়েছে — লম্বা, সোনালী চুলওয়ালা, নীল-চোখ যুবক এই লেভ, তার চলন-বলনের মধ্যে একটা উত্তেজনা-চালিত ভঙ্গি আছে — লেভ-এর সঙ্গে প্রথম আলাপের মুহূর্তে পাভেল তার হুবহু এই রকম চেহারার কল্পনাই করেছিল।

সন্ধ্যা আসতে ঘরে তিনটে ছোট ছোট ভাল্‌ভ্‌ মৃদু আলোয় জ্বলতে থাকল। বিজয়ীর ভঙ্গিতে লেভ পাভেলের হাতে তুলে দিল ইয়ার-ফোন। এলোমেলো সব বিশৃঙ্খল আওয়াজে ভরে উঠেছে ঈথর। বন্দরের ট্র্যান্সমিটার থেকে কিচিরমিচির একটা আওয়াজ আসছে একদল পাখির চেঁচামেচির মতো। সমুদ্রের ওপরে কাছাকাছি কোনো জাহাজের বেতার থেকে বেরিয়ে আসছে ফুটকি আর ড্যাশ-চিহ্নের স্রোত। কিন্তু এই সমস্ত গোলমাল আর আওয়াজগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে

থেকে টিউনিং কয়েলটি বাছাই করে নিল একটা আত্মপ্রত্যয়-ভরা প্রশান্ত গলা, তারপর কয়েলটি সেইখানেই স্থির হয়ে রইল:

'মস্কো রেডিও থেকে বলছি...'

ছোট্ট এই রেডিও-সেটটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ষাটটা বেতার কেন্দ্রকে পাভেলের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। যে-জীবন থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেটা আবার তার কাছে এসে পড়ল এই ইয়ার-ফোনের পাতলা পর্দার মধ্যে দিয়ে। পাভেল আবার অনুভব করতে পারছে সেই বৃহত্তর জগতের নাড়ীর বলিষ্ঠ গতিচাঞ্চল্য।

পাভেলের চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখে ক্লান্ত বের্‌সেনেভ তৃপ্তির হাসি হাসল।

মস্ত বড়ো বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কি যেন বিড়বিড়িয়ে বলল তাইয়া। পাভেল আজকাল খুব কমই তার স্ত্রীর দেখা পায়। অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফেরে সে। কাজের পেছনে ক্রমশই বেশি বেশি করে সময় দিতে হচ্ছে তাকে এবং বিকেলের দিকে ইদানীং সে ফুরসত পায় ক্বচিৎ কখনও। এ সম্বন্ধে বের্‌সেনেভের কথাটা মনে পড়ে পাভেলের, 'কোনো বলশেভিকের বউটিও যদি পার্টি কমরেড হয়, তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে দেখাশোনাটা খুব বিরল হয়ে দাঁড়ায়! কিন্তু এর দুটো সুবিধের দিক আছে: পরস্পরের কাছে তারা কোনদিন একঘেয়ে হয়ে উঠবে না, ঝগড়া করারও সময় হবে না তাদের!'

সত্যিই তো, সে আপত্তি করবে কী করে? এ ছাড়া আর কীই বা আশা করতে পারত সে? এক সময়ে তাইয়ার বিকেল-

গুলি ছিল পাভেলেরই জন্যে। তখন তাদের সম্পর্কটা ছিল আরও নিবিড়, আরও বেশি স্নেহের মাধুর্যে ভরা। কিন্তু তখন তাইয়া ছিল শুধু স্ত্রী, পাভেলের সঙ্গিনী মাত্র; এখন সে তার ছাত্রী এবং পার্টি কমরেড।

সে জানে, তাইয়া যতোই রাজনীতির দিক থেকে সুপরিণত হয়ে উঠবে, পাভেলের জন্যে সে ততোই কম সময় দিতে পারবে। তাই যা অনিবার্য সেটা মেনে নিয়েছে পাভেল।

একটা পাঠ-চক্র পরিচালনার কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে, বিকেলের দিকে আবার তার ঘরখানা ভরে উঠছে নানা কণ্ঠের মিলিত আওয়াজের গুঞ্জনধ্বনিতে। তরুণদের সঙ্গে এই কয়েক ঘণ্টা কাটানোর ফলে পাভেল নতুন উদ্যম আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে।

বাকি সময়টা তার কাটে রেডিও শুনে। খাবার সময়ে তার ইয়ার-ফোন কান থেকে খুলে নেবার জন্যে মাকে বড়ো মুশকিলেই পড়তে হয়।

অন্ধ হয়ে যাবার ফলে সে যা হারিয়েছিল, এই রেডিওটা আবার তাকে সেই জ্ঞান আহরণের সুযোগটুকু ফিরিয়ে দিয়েছে। দেহে তার নিদারুণ যন্ত্রণা; দুই চোখে তীব্র জ্বালা-ধরা বেদনা; নির্মম দুরদৃষ্ট তার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে কষ্টের বোঝা — কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয়ের সর্বগ্রাসী কামনা তাকে এই সবকিছুই ভুলে থাকতে সাহায্য করেছে।

রেডিওটা যখন মাগ্‌নিতোস্ত্রোই-এর খবরে সেখানকার কমসোমল সভ্যদের বীর-কৃতিত্বের বিবরণ দিয়ে গেল, তখন আনন্দে ভরে উঠল পাভেলের বুক। — এই তরুণ কমিউনিস্টরা সব পাভেলদের পরবর্তী দলের ছেলেমেয়ে।

নির্মম তুষার-ঝড় আর একপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মতো ভয়ঙ্কর সেই ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া উরালের মাটি —

দৃশ্যটাকে কল্পনা করতে লাগল পাভেল। বাতাসের গর্জন তার কানে বাজতে লাগল, আর তার চোখের সামনে ফুটে উঠল তুষার-ঝড়ে-পড়া ঘূর্ণির মধ্যে একদল কমসোমল তরুণ -- যারা তার পরে জন্মেছে --- বিরাট বিরাট কারখানা-বাড়িগুলোর ছাদে আর্ক ল্যাম্পের আলোয় জানলায় জানলায় শার্সি লাগাচ্ছে, প্রথম দফার বড়ো বড়ো দামী যন্ত্রপাতিগুলো তুষার-ঝড় আর বরফের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে। এর তুলনায়, তাদের প্রথম দলের সেই কিয়েভের কমসোমল তরুণদের বনের মধ্যে রেল-পথ তৈরির কাজে ঝড়-জল-তুষারপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারটা কতো তুচ্ছ বলে মনে হয়! দেশ ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠছে, আর, সেই সঙ্গে দেশের মানুষগুলোও।

ওদিকে নীপারের জলস্রোত লোহার বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মানুষ আর যন্ত্রপাতি। এবং আরেকবার সেখানেও কমসোমল তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁধের ফাটল রুখবার জন্যে - দুদিন ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা সেই দুর্দমনীয় স্রোতের তোড়কে ফের বাগ মানিয়েছে। পাভেলের পরবর্তী নতুন একদল কমসোমল তরুণ এগিয়ে চলেছে এই বিরাট সংগ্রামের পুরোভাগে। এবং এই বীরদলের নামের তালিকায় পাভেল গর্বের সঙ্গে শুনল তার পুরনো কমরেড ইগনাৎ পানক্রাতভের নাম।

নবম অধ্যায়

মস্কোয় এসে প্রথম কয়েকটা দিন ওরা রইল এক দপ্তরের মহাফেজখানার একটা ভাঁড়ার ঘরে। এই দপ্তরের কর্তা

পাভেলকে বিশেষ একটা ক্লিনিকে ভরতি করার জন্যে ব্যবস্থা করছিল।

এতোদিনে পাভেল উপলব্ধি করেছে — যখন সে তরুণ ছিল আর তার শরীর শক্ত ছিল, তখন তার পক্ষে বীরত্ব দেখানো ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এখন যখন জীবন তাকে লোহার মতো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে, তখন কোট বজায় রাখাটা একটা সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেড় বছর হল পাভেল করচাগিন মস্কোয় এসেছে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভরা আঠারোটি মাস।

চক্ষু-চিকিৎসাগারের অধ্যাপক আভেরবাখ পাভেলকে খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছেন যে তার আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কোনো আশা নেই। ভবিষ্যতে কোনো সময়ে প্রদাহটা কমে গেলে, চোখের তারার ওপরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হতে পারে। ইতিমধ্যে, প্রদাহটা বন্ধ করার জন্যে তিনি একটা অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

পাভেলের মত আছে কি না জানতে চাইলেন তাঁরা। পাভেল ডাক্তারদের বলল, যা যা করা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন সবই করতে পারেন।

এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে রইল সে অস্ত্রোপচারের টেবিলের ওপরে, তার গলার মধ্যে ছুরির ফলাটা বারবার খুঁজে ফিরল প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিটা এবং তিনবার মৃত্যুর কালো ডানার ঝাপটা অনুভব করল সে। কিন্তু নাছোড়বান্দার জেদ নিয়ে পাভেল আঁকড়ে ধরে রইল জীবনকে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুঃসহ উৎকণ্ঠা ভোগ করার পর তাইয়া তার প্রিয়তমকে দেখতে পেল — মড়ার মতো বিবর্ণ তার মুখ, কিন্তু বেঁচে আছে সে, আর বরাবরের মতোই শান্ত আর ধীর।

'কিছু ভেবো না, লক্ষ্মীটি, আমাকে মেরে ফেলাটা এতো সহজ নয়। আর কিছু না হলেও অন্তত এই সব বিজ্ঞ ডাক্তারের হিসেবগুলোকে ভণ্ডুল করে দেবার জন্যেও আমি বেঁচে থাকব, আর যতোটা পারি সোরগোল তুলে দেব। এঁরা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যা যা বলছেন, সবই সত্যি। কিন্তু যখন এঁরা আমাকে কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে রায় দেবার চেষ্টা করছেন, তখনই এঁদের মস্ত বড়ো ভুল হচ্ছে। এখনও আমি এঁদের দেখিয়ে দেব।'

নতুন জীবনের নির্মাতা যারা, সেই কর্মিদলের মধ্যে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ানো সম্বন্ধে পাভেল কৃতসংকল্প। কী করতে হবে, তা সে এখন জানে।

শীত কেটে গেছে, খোলা জানলা দিয়ে ঘরেব মধ্যে ঢুকে পড়েছে বসন্তের জোয়ার। আরেকটা অস্ত্রোপচার সামলে ওঠার পর পাভেলের শরীরটা খুব দুর্বল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর হাসপাতালে থাকবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে। রোগ-যন্ত্রণাবিদ্ধ মানবতার এই দৃশ্যের মধ্যে থাকা, চারিদিকে মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত মানুষের গোঙানি আর বিলাপের মধ্যে এই এতো মাস ধরে থাকা—এটা নিজের যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়েও তার পক্ষে ঢের বেশি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

তাই, যখন আরেকটা অস্ত্রোপচারের জন্যে তার কাছে প্রস্তাব করা হল, সে মত না দিয়ে দৃঢ় আর কঠোর ভাবে বলল, 'না, যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট রক্ত আমি ঢেলেছি বিজ্ঞানের জন্যে। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, সেটুকু আমি অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাই।'

সেই দিন পাভেল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটা চিঠি লিখে জানাল যে, এখন তার আর চিকিৎসার সন্ধানে এখানে-

ওখানে ঘ্রে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই, সে মস্কোতেই থাকতে চায়— তার স্ত্রী এখন মস্কোতেই কাজ করছে। এই প্রথম পাভেল পার্টির কাছে সাহায্য চাইল। তার অন্রোধ রাখা হল—মস্কো সোভিয়েত তার থাকার জন্যে একটা বাসার বন্দোবস্ত করে দিল। হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময়ে সে শ্ধ্ একান্ত মনে কামনা করল যেন এখানে আর তাকে ফিরে আসতে না হয়।

ক্রপোত্‌কিন্‌স্কায়া স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে গেছে যে ছোট নিরিবিলি গলিটা, তারই ওপরে অনাড়ম্বর এই ছোট ঘরখানা পাভেলের কাছে যেন মস্ত বড়ো একটা বিলাস। প্রায়ই রাত্রে ঘ্ম ভেঙে জেগে ওঠার পর পাভেলের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তার পক্ষে হাসপাতালটা সত্যিই হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা অতীতের জিনিস।

তাইয়া ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে প্রোদস্তুর পার্টি সভ্য। চমৎকার কর্মী সে, এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও সে তার কারখানার সবচেয়ে ভালো কর্মীদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে নেই। অল্পদিনের মধ্যেই তাইয়ার সহকর্মীরা তাকে কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভ্য নির্বাচিত করে এই শান্ত প্রকৃতির অল্পভাষী মেয়েটির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল। তার স্ত্রী যে ক্রমশই একজন যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠছে—এই গর্ববোধ পাভেলের যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতাকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল।

বাঝানোভা একটা কাজে মস্কোয় এসে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা কইল তারা। অদ্র-ভবিষ্যতে তার সংগ্রামী কর্মিদলের মধ্যে ফিরে আসার

পরিকল্পনার কথাটা বাঝানোভাকে বলতে বলতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল পাভেল।

তার রগের চুলে রুপোলি রঙ ধরেছে লক্ষ্য করে কোমল গলায় বাঝানোভা বলল, 'অনেক কিছু আপনাকে সইতে হয়েছে, দেখছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে নি। এটাই আসল কথা। গত পাঁচ বছর ধরে যে কাজটা করার জন্যে আপনি তৈরি হচ্ছিলেন সেটা এবারে আরম্ভ করবেন বলে স্থির করেছেন দেখে আমি খুশি। কিন্তু কীভাবে এটা করবেন বলে ঠিক করেছেন?'

প্রত্যয়ের হাসি হাসল পাভেল, 'সোজা সোজা দাগ টানা ছক-কাটা একটা কার্ডবোর্ড স্টেন্‌সিলের মতো জিনিস কাল আমাকে এনে দেবে আমার বন্ধুরা। এতে আমি লাইনগুলো ঘুলিয়ে না ফেলেই লিখে যেতে পারব। এটা ছাড়া আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। অনেক ভাবার পরে আমার মাথায় এই ফন্দিটা আসে। বুঝতেই পারছেন—কার্ডবোর্ডের ওপরে খাঁজ-কাটা শক্ত উঁচু ধার-বরাবর পেন্সিল ধরে রেখে যদি লিখে যাই, তাহলে সোজা লাইন ছেড়ে হাত সরে যাবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য কী লিখছি সেটা যদি চোখে দেখতে না পাওয়া যায়, তাহলে লেখাটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেটা একবারে অসম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করে দেখেছি বলেই জানি। ব্যাপারটায় পটু হয়ে উঠতে অবশ্য আমার কিছুদিন সময় লেগেছে, কিন্তু এখন আমি আরও ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা অক্ষর মনোযোগ দিয়ে লিখতে শিখে যাবার ফলে ফলটা দাঁড়িয়েছে বেশ সন্তোষজনক।'

এইভাবে পাভেল কাজ আরম্ভ করে দিল।

কতোভ্‌স্কি ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের বীর সৈনিকদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিল সে। উপন্যাসের

নামটা আপনা থেকেই মাথায় এসে গিয়েছিল: 'ঝড়ের সন্তান'।

এই উপন্যাসটা লেখার লক্ষ্যে সে এখন তার সমস্ত জীবনটাকে একমুখী করে আনল। ধীরে ধীরে লাইনের পর লাইন লেখা হয়ে কাগজগুলো ভরে উঠতে লাগল। নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অচেতন হয়ে গিয়ে, চিত্রকল্পনার জগতে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে কাজ করে চলল সে এবং জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল সৃষ্টির যন্ত্রণা। বাস্তব জীবনে যেটা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর, সেই সব উজ্জ্বল আর অবিস্মরণীয় দৃশ্যগুলি যখন লিখিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রাণহীন আর নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়ায়, তখন শিল্পীর মনে কী তীব্র গ্লানি জমে ওঠে, সেটা পাভেল এই প্রথম জানল।

রচনার পুরোটাই তাকে স্মরণ করে রাখতে হচ্ছে, হুবহু শব্দগুলো পর্যন্ত। সামান্যতম ব্যাঘাতেও তার সমস্ত চিন্তার সূত্র ছিঁড়েখুঁড়ে যায়, কাজটা পিছিয়ে যায়। মা সভয়ে দেখল ছেলের এই অবস্থাটাকে।

মাঝে মাঝে স্মরণশক্তি খাটিয়ে পুরো পাতা ধরে ধরে, এমন কি গোটা একটা অধ্যায় পর্যন্ত আবৃত্তি করে যেতে হয় তাকে। আর এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তার ছেলের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়ায় মারিয়া ইয়াকোভ্লেভ্না রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। কাজের সময়ে পাভেলকে কিছু বলতে তার সাহস হয় না, কিন্তু মেঝেয় পড়ে-যাওয়া কাগজগুলো তুলে দেবার সময়ে সে ভীতসুরে বলে, 'তুই যদি আর কোনো কাজে হাত দিতিস, পাভ্লুশা, তাহলে আমি খুশি হতাম। এভাবে সমস্তক্ষণ লিখে চলাটা তোর পক্ষে মোটেই ভালো হতে পারে না...'

মায়ের ভয় দেখে উচ্চকিত হেসে ওঠে পাভেল বৃদ্ধাকে

ভরসা দিয়ে বলে, ভাবনার কিছু নেই, এখনও 'হুঁশের লাগাম কেটে বেরিয়ে' যায় নি সে।

উপন্যাসটির তিনটে অধ্যায় লেখা হয়ে গেল। ওদেসায় কতোভ্স্কি ডিভিশনের যোদ্ধাদের মধ্যে যারা পাভেলের পুরনো কমরেড, তাদের কাছে সে মতামত চেয়ে পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিল। কিছু দিনের মধ্যেই তারা তার রচনার প্রশংসা করে চিঠি লিখল। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা তার কাছে ডাকে ফেরত আসার পথে হারিয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল ছ'মাসের পরিশ্রম। সাংঘাতিক আঘাত পেল পাভেল। কোনো নকল না রেখে একমাত্র কপিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে তীব্র অনুশোচনা হল তার।

ঘটনাটা জানার পর লেদেনেভ তাকে খুব একচোট বকুনি দিল, 'এতোটা অসাবধান তুমি হলে কী করে? কিন্তু যাকগে, যা আর ফিরে পাবার উপায় নেই, তা নিয়ে মাথা খুঁড়ে লাভ কী। আবার গোড়া থেকে শুরু করতেই হবে তোমায়।'

'কিন্তু, ইন্নকেন্তি পাভলভিচ, আমার ছ'মাসের পরিশ্রমের ফল হাতছাড়া হয়ে গেল যে! দৈনিক আট ঘণ্টা করে কঠিন পরিশ্রমের ফল! হতভাগা পরগাছাগুলো যতো সব!'

বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল লেদেনেভ।

আবার গোড়া থেকে লেখা শুরু করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। লেদেনেভ তাকে কাগজের যোগান দিল, পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করিয়ে নেবার ব্যাপারে সাহায্য করল। ছ'সপ্তাহ বাদে প্রথম অধ্যায়টা নতুন করে লেখা শেষ হল।

করচাগিনরা যে ফ্ল্যাটে থাকে, তারই আরেকটা ঘরে থাকে আলেক্সেয়েভ নামে একটি পরিবার। ওদের বড়ো ছেলে আলেক্সান্দর কমসোমলের একটা জেলা কমিটির সম্পাদক।

তার বোন গালিয়া আঠারো বছর-বয়েসী প্রাণোচ্ছল মেয়েটি কারখানার ট্রেনিং ইস্কুলে পড়া শেষ করেছে। পাভেল মাকে বলল—গালিয়া তার 'সেক্রেটারি' হিসেবে কাজ করতে রাজী আছে কি না সেটা যেন মা একবার তাকে জিজ্ঞেস করে দেখে। সাগ্রহে রাজী হয়ে গেল গালিয়া। মিষ্টি হাসি-ভরা মুখে একদিন এল সে, পাভেল একটা উপন্যাস লিখছে শুনে তার ভারি আনন্দ। বলল, 'আপনাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ভারি খুশি হব, কমরেড করচাগিন। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা উচিত--সেই বিষয়ে বাবার হয়ে আমাকে রোজ ভোঁতা ভাষায় একঘেয়ে নির্দেশনামা লিখতে হয় রাশি রাশি, তার চেয়ে এ লেখা আমার ঢের বেশি ভালো লাগবে।'

সেদিন থেকে পাভেলের কাজ এগিয়ে চলল দ্বিগুণ গতিতে। সত্যিই এক মাসের মধ্যে এতোটা লেখা হয়ে গেল দেখে পাভেল বিস্মিত হল। তার এই কাজে গালিয়ার সোৎসাহ অংশগ্রহণ আর সহানুভূতি পাভেলের পক্ষে খুব বড়ো রকম সাহায্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত পেন্সিল চালিয়ে যায় গালিয়া, আর, যে-সব জায়গা তার বিশেষভাবে ভালো লাগে, সেই জায়গাগুলো বারবার করে টাইপ করে, পাভেলের এই সাহিত্যিক সফলতায় সে আন্তরিক আনন্দ বোধ করে। গালিয়াই বলতে গেলে এই বাড়ির প্রায় একমাত্র বাসিন্দা যে পাভেলের এই কাজের সার্থকতায় বিশ্বাস করে, অন্যদের ধারণা যে শেষ পর্যন্ত ও করে কিছু হবে না, পাভেল শুধু তার এই বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তার অবসরটুকু কাটাবার জন্যেই এই কাজে লেগেছে।

লেদেনেভ দিনকতকের জন্যে একটা কাজে মস্কোর বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে প্রথম কয়েকটা অধ্যায় পড়ে বলল,

'চালিয়ে যাও ভাই। তোমার সফলতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে তোমার বড় আনন্দের দিন আসছে, কমরেড পাভেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কর্মিদলের মধ্যে তোমার ফিরে যাবার স্বপ্নটা শিগগিরই বাস্তব হয়ে উঠবে। আশা ছেড়ো না, ভাই।'

পাভেল যে এতোটা উদ্যমে ভরপুর হয়ে উঠেছে, সেটা দেখে এই প্রবীণ মানুষটি গভীর একটা তৃপ্তির সঙ্গে সেদিনকার মতো বিদায় নিল।

গালিয়া নিয়মিত আসে। অবিস্মরণীয় অতীতের ঘটনাগুলিকে পুনর্জীবিত করে তুলে তার পেন্সিল ছুটে চলে কাগজের বুকের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে, একসঙ্গে অনেকগুলো স্মৃতির ভিড়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে পাভেল যখন আপন চিন্তায় ডুবে যায়, তখন গালিয়া লক্ষ্য করে তার চোখের পাতার কাঁপুনি আর সে চোখে তার মনের দ্রুত-চলমান চিন্তাগুলির প্রতিবিম্ব। তার এই চোখের স্বচ্ছ আর অম্লান তারা দুটি এতো প্রাণময় যে সেদিকে তাকিয়ে ওই চোখ দুটি দৃষ্টিহীন বলে যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

সারাদিনের কাজের শেষে গালিয়া যা লিখেছে সেটা পড়ে শোনায় আর প্রখর একাগ্রতার সঙ্গে পাভেল তার ভুরু কুঁচকে শুনে যায়।

'ভুরু কুঁচকাচ্ছেন কেন, কমরেড করচাগিন? এই জায়গাটা তো বেশ ভালোই লেখা হয়েছে, না কি?'

'না, গালিয়া, খারাপ হয়েছে।'

যে জায়গাগুলো অপছন্দ হয়, সেগুলো পাভেল নিজে আবার লেখে। ছক-কাটা কার্ডবোর্ডের সেই সরু ফাইলটা নিয়ে লিখতে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তখন মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা। আর তারপরে,

জীবন তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে বলে প্রচণ্ড রাগে পেন্সিলটা ভেঙে ফেলে, ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলে।

লেখার এই কাজটা যতোই শেষ হয়ে আসছে, ততোই তার সর্বদা-সজাগ ইচ্ছাশক্তির প্রহরা ডিঙিয়ে মনের অবরুদ্ধ আবেগগুলি বেশি বেশি করে আত্মপ্রকাশ করছে। এই নিষিদ্ধ আবেগগুলি হচ্ছে বিষণ্ণতা আর ওই ধরনের আরও কতকগুলি উষ্ণ আর কোমল সহজ মানবিক অনুভূতি—যে অনুভূতি প্রকাশে পাভেল ছাড়া আর প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। কিন্তু সে জানে—এই আবেগগুলির কোনো একটাকেও যদি সে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে, তাহলে পরিণামটা হয়ে দাঁড়াবে মর্মান্তিক।

তাইয়া অনেক রাত্রে কারখানা থেকে বাড়ি ফিরে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নার সঙ্গে নিচু গলায় দু'-চারটে কথা বলে নিয়েই রাত্রের মতো শুয়ে পড়ে।

অবশেষে শেষ অধ্যায়টি লেখা হয়ে গেল। এর পরে কয়েকদিন ধরে গালিয়া পাভেলকে পুরো উপন্যাসটি পড়ে শোনাল।

আগামীকাল এই পাণ্ডুলিপিটা লেনিনগ্রাদে প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সাংস্কৃতিক বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি সেখানে বইটা মনোনীত হয়, তাহলে এটাকে প্রকাশভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—আর, তারপরে...

কথাটা ভাবতেই তার হৃৎপিণ্ডটা উদ্বেগে ধক ধক করে উঠল। সব কিছু যদি ব্যবস্থামতো হয়ে যায়, তাহলে তার শুরু হবে নতুন জীবন—কয়েক বছরব্যাপী অবিশ্রান্ত আর ঊর্ধ্বশ্বাস পরিশ্রমের ফলে অর্জিত জীবন।

এই বইটির ভাগ্যের দ্বারাই পাভেলের নিজের ভাগ্য

নির্ধারিত হবে। পাণ্ডুলিপিটা যদি অমনোনীত হয়, তাহলে ওইখানেই তার শেষ। আর, যদি রচনাটা জায়গায় জায়গায় খারাপ হয়ে থাকে, যদি আরও কিছুদিন খাটলে দোষত্রুটিগুলোকে শুধরে দেওয়া যায়, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ফের উঠে-পড়ে লেগে যাবে।

তার মা পাণ্ডুলিপির ভারি পার্সেলটা নিয়ে গেল ডাক-ঘরে। শুরু হল উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার দিনগুলি। এর আগে পাভেল তার জীবনে আর কোনোদিন একখানা চিঠি পাবার জন্যে এমন যন্ত্রণাভরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে নি। সকালে ডাক-বিলির সময় থেকে বিকেলে ডাক-বিলির সময় পর্যন্ত সারাদিন ছটফট করে সে। কিন্তু লেনিনগ্রাদ থেকে কোন খবর আসে না।

প্রকাশকদের এই একটানা নীরবতা এতদিনে একটা অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে হতে শুরু হয়েছে। আসন্ন সর্বনাশের পূর্বানুভূতি দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। নিজের কাছে স্বীকার করল পাভেল যে যদি তার বইটা পুরোপুরি অমনোনীত হয়, তাহলে আর বাঁচবে না সে। এ আঘাত সে সইতে পারবে না। বেঁচে থাকার কোনো হেতুই আর থাকবে না।

এই রকম হতাশার মুহূর্তগুলিতে তার মনে পড়ে যায়—দক্ষিণ ক্রিমিয়ার সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের বুকে সেই পার্কটার কথা, আর, বারবার সে ওই একই প্রশ্ন করে নিজেকে, 'লোহার এই ফাঁদটা কেটে বেরিয়ে আসার জন্যে, কর্মিদলের মধ্যে ফিরে আসার জন্যে, জীবনটাকে কাজে লাগাবার জন্যে তোমার পক্ষে যতোদূর চেষ্টা করা সম্ভব সেই সবই করেছ কি?'

এবার তাকে উত্তর দিতে হল, 'হ্যাঁ আমার মনে হয়, সব রকম চেষ্টাই করে দেখেছি আমি!'

শেষ পর্যন্ত, এই অপেক্ষা করে থাকার যন্ত্রণাটা যখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন একদিন তার মা ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল। ছেলের চেয়ে মা বড়ো কম উদ্বেগ ভোগ করে নি। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল মা, 'লেনিনগ্রাদ থেকে খবর এসেছে!'

প্রাদেশিক কমিটির একটা টেলিগ্রাম। ফরমটার ওপরে লেখা সংক্ষিপ্ত একটা বার্তা: 'উপন্যাস সর্বান্তঃকরণে অনুমোদিত। প্রকাশকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। আপনার এই বিজয়-সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন।'

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল পাভেলের। তার এতোদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে! লোহার ফাঁদটাকে চুরমার করে দেওয়া গেছে। এবারে একটা নতুন অস্ত্র-হাতে সে ফিরে এসেছে সংগ্রামী কর্মিদলের মধ্যে আর জীবনের মাঝে।